রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা

এস. গুপ্ত অ্যাণ্ড ব্রাদার্স
কলিকাতা

RABINDRASAHITYER ADIPARVA

A study of the early works of Rabindranath Tagore

By Sanghamitra Bandyopadhyaya M. A. (V.B.), Ph.D. (Cal.)

প্রথম প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬

মুদ্রক : শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পিতৃদেব শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

ও

মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা রুচিরা সেন

শ্রীচরণেষু

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে-
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে।

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি,
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি।

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে ; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়।

—রবীন্দ্রনাথ

আশীর্বাণী

শ্রীমতী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
পরম কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন সম্বন্ধে বলেছিলেন— 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' এই কথাগুলি তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে আজ আমরাও বলতে পারি, আমরা (বিশেষতঃ বাঙালিরা) নিজেদের যতই জানতে থাকব তাঁকেও ততই চিনতে থাকব; এই জানা-চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না। আবার উলটো করেও বলতে পারি, তাঁকে আমরা যত চিনতে থাকব নিজেদেরও ততই জানতে পারব; এই চেনা-জানাও শেষ হবে না। যাঁরা কালজয়ের ছাড়পত্র নিয়ে আসেন তাঁদের চেনা কখনও ফুরায় না, ইতিহাসের প্রতি পর্বেই তাঁদের চেনা নূতন করে শুরু হয়। শুধু ইতিহাসের পর্বে কেন, আমার সুদীর্ঘ জীবনের প্রতি পর্বেই এ সত্যকে নূতন করে উপলব্ধি করেছি, তাঁকে নবনব রূপে চিনতে পেরেছি, এ জীবনে সে চেনা শেষ হবে না। যতই দিন গিয়েছে ততই শুধু মনে হয়েছে, 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর'। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের দীর্ঘকালের পরিচয় তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার নবনবোন্মেষ তাঁর জীবনেই শেষ হয়ে যায় নি, আমাদের জীবনেও সে প্রতিভা অনিঃশেষভাবে কাজ করে চলেছে; তাঁর প্রতিভার কিরণস্পর্শ প্রতিনিয়তই আমাদের হৃদয়মনকে বিকশিত করে তুলেছে। আধুনিক যুগের একটা মহৎ ঐতিহাসিক সত্য এই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়বৃদ্ধির প্রায় সমানুপাতেই আমাদের দেশে একই সঙ্গে জাতীয়তা ও মানবিকতার চেতনা গভীরতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। তবু এ কথাও সখেদে স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের প্রায় চার দশক পরেও তাঁর সমগ্র সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নি, পরিচয় লাভের পথও সুগম হয় নি। তাঁর বিপুল রচনাবলীতে তাঁর বহু লেখা, বিশেষতঃ তাঁর কৈশোর পর্বের লেখা সংকলিত হয় নি, তাঁর প্রচলিত খুচরো বইগুলিতেও না। এমন কি, দুই খণ্ড 'অচলিত সংগ্রহে'ও তৎকালীন বহু রচনা সংগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের এই উপেক্ষিত রচনাগুলির সঙ্গে

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে-
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে।

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি,
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি।

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে ; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়।

—রবীন্দ্রনাথ

আশীর্বাণী

শ্রীমতী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
পরম কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন সম্বন্ধে বলেছিলেন— 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' এই কথাগুলি তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে আজ আমরাও বলতে পারি, আমরা (বিশেষতঃ বাঙালিরা) নিজেদের যতই জানতে থাকব তাঁকেও ততই চিনতে থাকব ; এই জানা-চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না। আবার উলটো করেও বলতে পারি, তাঁকে আমরা যত চিনতে থাকব নিজেদেরও ততই জানতে পারব ; এই চেনা-জানাও শেষ হবে না। যাঁরা কালজয়ের ছাড়পত্র নিয়ে আসেন তাঁদের চেনা কখনও ফুরায় না, ইতিহাসের প্রতি পর্বেই তাঁদের চেনা নূতন করে শুরু হয়। শুধু ইতিহাসের পর্বে কেন, আমার সুদীর্ঘ জীবনের প্রতি পর্বেই এ সত্যকে নূতন করে উপলব্ধি করেছি, তাঁকে নবনব রূপে চিনতে পেরেছি, এ জীবনে সে চেনা শেষ হবে না। যতই দিন গিয়েছে ততই শুধু মনে হয়েছে, 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর'। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের দীর্ঘকালের পরিচয় তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার নবনবোন্মেষ তাঁর জীবনেই শেষ হয়ে যায় নি, আমাদের জীবনেও সে প্রতিভা অনিঃশেষভাবে কাজ করে চলেছে ; তাঁর প্রতিভার কিরণস্পর্শ প্রতিনিয়তই আমাদের হৃদয়মনকে বিকশিত করে তুলেছে। আধুনিক যুগের একটা মহৎ ঐতিহাসিক সত্য এই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়বৃদ্ধির প্রায় সমানুপাতেই আমাদের দেশে একই সঙ্গে জাতীয়তা ও মানবিকতার চেতনা গভীরতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। তবু এ কথাও সখেদে স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের প্রায় চার দশক পরেও তাঁর সমগ্র সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নি, পরিচয় লাভের পথও সুগম হয় নি। তাঁর বিপুল রচনাবলীতে তাঁর বহু লেখা, বিশেষতঃ তাঁর কৈশোর পর্বের লেখা সংকলিত হয় নি, তাঁর প্রচলিত খুচরো বইগুলিতেও না। এমন কি, দুই খণ্ড 'অচলিত সংগ্রহে'ও তৎকালীন বহু রচনা সংগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের এই উপেক্ষিত রচনাগুলির সঙ্গে

পরিচয় না হলে সে সাহিত্যকে পরিপূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়। যে ভূমির উপর রবীন্দ্রসাহিত্যসৌধ প্রতিষ্ঠিত, তার দৃঢ়তা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে সে সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রসাহিত্য তো 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে নি, একদিন তারও মুকুলিত অবস্থা ছিল। সে মুকুলিত সাহিত্যের পরিচয় নেওয়া চাই। নতুবা তার বিকশিত রূপের ধারণা অপূর্ণ থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথকেও একদিন আঁধার ঘরে একলা বসে 'মানিক মুকুতা লয়ে শৈশবের খেলা' খেলতে হয়েছিল। সে শৈশবখেলার পরিচয় নেওয়া দরকার। নতুবা তাঁর গড়া সাহিত্যিক মণিসৌধের কারুকৃতির অসামান্যতা হৃদয়ংগত করা সম্ভব নয়। এ কথা বুঝতে পেরেছিলাম প্রায় চার দশক আগে, বিশেষতঃ তাঁর 'মালতী-পুঁথি' নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপিখানি হাতে আসার পরে। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের কৈশোর পর্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার সংকল্প নিয়ে কিছু কাজও করেছিলাম। কিন্তু নানা কর্তব্যের ভিন্নমুখী আকর্ষণে সে সংকল্প অপূর্ণই থেকে যায়। দীর্ঘকাল সে বিফল বাসনার বেদনা বহন করেছি।

অবশেষে তুমি যখন কলেজী পড়া শেষ করে আমাকে জানালে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে তোমার কিছু কাজ করার ইচ্ছা আছে তখন সাগ্রহেই তোমার উপরে তুলে দিলাম আমার অপূর্ণ সংকল্প পূরণের গুরু দায়িত্ব। তোমার অবিচল জ্ঞাননিষ্ঠা, অনলস কর্মশক্তি এবং অভঙ্গুর অধ্যবসায়ের কথা তো আমার জানাই ছিল। তা ছাড়া, তোমার স্বাধীন মননক্ষমতার উপরেও ছিল আমার আস্থা। তাই তোমাকে এই সুকঠিন কাজের দায়িত্ব দিতে দ্বিধাবোধ করি নি। রবীন্দ্র-নাথের বাল্যরচনার যে কালক্রমিক তালিকা রচনা করতে গিয়ে আমি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম তুমি যখন তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে হাজির করলে তখনই আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম যে, এ কাজ সুসম্পন্ন করার যোগ্যতা তোমার আছে। তার পরে বহু বৎসরের ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তুমি আমার সেই সুচিরপোষিত অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করে তাকে চাক্ষুষ রূপে আমার কাছে হাজির করেছ। তা দেখে আজ আমার আহ্লাদের সীমা নেই। তা ছাড়া তুমি আমার কন্যা এবং ছাত্রী। তাই তোমার এই কৃতিত্বে আমি একই সঙ্গে গর্ব ও গৌরব বোধ করছি।

ভারতগৌরব রাজর্ষি অশোক তাঁর অক্ষয় শিলালিপিতে বলে গেছেন—"কলাণং দুকরং। য়ো আদিকরো কলাণস সো দুকরং করোতি।" অর্থাৎ কল্যাণকর্ম দুঃসাধ্য, যিনি কল্যাণকর্মের আদিকৃৎ তিনি (আরও) দুঃসাধ্য

সাধন করেন। এ ক্ষেত্রে তুমিও আদিকৃতের দুঃসাধ্য ব্রতই স্বীকার করে নিয়েছ। এই দুঃসাধ্যতার পরিমাপ সহজ উপলব্ধিগম্য নয়। কিন্তু আদিকৃতের গৌরব তোমার প্রাপ্য হয়ে থাকবে। তবে মনে রেখো আদিকর্মের গৌরব ক্রমশঃ মলিন হতে থাকে, শেষ কর্মের মহত্ত্বের কাছে হার মানতে হয়। আশা করি তোমার রচিত পথে নূতন যাত্রিকের অভাব হবে না। তাঁরা তোমার কৃতকর্মের ত্রুটি ও অপূর্ণতা মোচনে ব্রতী হবেন। তাতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্বের চিত্রটি পরিপূর্ণ আভায় উদ্ভাসিত হতে পারবে। তুমি যদি এ কাজেও সকলের সঙ্গে হাত মেলাতে পার তা হলেই তোমার এই দুঃসাধ্যসাধনের গৌরব অমলিন থাকবে, সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

যা হক, তুমি এবার তোমার দুর্গম যাত্রাপথের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছ। তোমার যাত্রারম্ভ শুভ হক এবং তোমার সাহিত্যকর্মের এই প্রথম প্রচেষ্টা তার পরবর্তী প্রত্যেক পর্যায়ে উত্তরোত্তর অধিকতর সার্থকতা লাভ করুক, তোমার প্রতি এই আশীর্বাদ রেখে গেলাম। ইতি ২৪ মার্চ, ১৯৭৮

শুভার্থী

প্রবোধচন্দ্র সেন

নিবেদন

জন্মাবধি শান্তিনিকেতনে বাস ও শিক্ষালাভ করার ফলে ওই আশ্রমটিই আমাদের কাছে একটি বৃহৎ পরিবারের মতো হয়ে উঠেছিল। ছোটোবেলা থেকেই ওখানকার ইতিহাস এবং আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা গল্প শুনেছি, সর্বত্র অনুভব করেছি তাঁদের জীবন্ত অস্তিত্ব। কেননা শান্তিনিকেতনের সমগ্র পরিবেশের সঙ্গেই যেন তাঁদের জীবন ও প্রেরণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, নানা উৎসবে, অনুষ্ঠানে, অভিনয়ে, গানে, নাটকে, এক কথায় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পিতা ও পুত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকেই আমরা জেনেছি সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গভাবে। শিশুর যেমন সবচেয়ে আপন তার পিতা, মাতা ও পারিবারিক পরিবেশ, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আশ্রম-পরিবেশই আমাদের কাছে হয়ে উঠেছিল সর্বাধিক আপন। আমার শিক্ষারম্ভও হয় তাঁরই রচিত শিশুপাঠ্য বই 'সহজপাঠ' দিয়ে। সেই থেকেই তাঁর প্রতি একটা অজানিত অদৃশ্য আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে এম এ. পাশ করা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আদর্শই ছিল আমাদের জীবনমন্ত্র। তাই স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ করে যখন গবেষণার জন্য উৎসুক হই, তখন বিষয় হিসাবে স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়েছিল সকলের আগে। তবে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের কোন্ বিশেষ অংশটি অবলম্বন করে এই কাজে ব্রতী হব তা স্থির করতে পারি নি।

এ অবস্থায় রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর -কীর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার পিতা অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই পর্বটি তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনালোকিত, অনালোচিত এবং বলা যায় অনাদৃতও। আমার পিতা স্বয়ং এই বিষয়টির প্রতি বহুদিন থেকেই বিশেষ আগ্রহী ও উৎসুক ছিলেন। তিনি এ-বিষয়ে কয়েকটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন এবং কয়েকটি প্রবন্ধও লেখেন। কিন্তু নানা কাজের দায়িত্বে এ বিষয়ে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আলোচনা করে উঠতে পারেন নি বলে তাঁর মনে ছিল গভীর আক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা বোধহয় অবান্তর হবে না। —

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে বিশ্বভারতীতে যোগ দিই তখনই আমি দুটি গ্রন্থের পরিকল্পনা নিয়ে

কাজে অগ্রসর হই— রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ও ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ। প্রথমটির উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের আদিপর্বে, যে পর্বের রচনাবলী এখন 'অচলিত' বলে চিহ্নিত সে পর্বে কবির মনোবিকাশের ও তৎকাল-রচিত সাহিত্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া। আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বাঙ্গীকৃত করে তাকে নবরূপে জন্মান্তরিত করলেন তার পরিচয় দেওয়া। নানা কর্তব্যের তাড়নায় ও প্রতিবন্ধকতায় এদিকে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। ফলে দুটি কাজই অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই আশায় ছিলাম যদি কোনো যোগ্য ছাত্রের সন্ধান পাই তবে তাদের দিয়েই নিজের অপূর্ণ সংকল্পকে পূর্ণতা দান করা যাবে।"[১]

তাঁর দ্বিতীয় সংকল্পটিকে সফল করলেন আমার পিতার অন্যতম কৃতী ছাত্রী শ্রীমতী পম্পা মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' গ্রন্থটি রচনা করে। আর প্রথম বিষয়টি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার গুরুভার তিনি তুলে দিলেন আমার হাতে। তাঁর আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কাজে নিযুক্ত হলাম। নানা তথ্যসমৃদ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্বের মোটামুটি একটি পূর্ণরূপ গঠন করতে স্বভাবতঃই বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছে। এই কার্যে আমার সামান্যতম সফলতাও যদি আমার পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে থাকে, তবে তাই হবে আমার সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। আর, এই গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রজীবনের শৈশব ও কৈশোরকালটি যদি সামগ্রিকরূপে পরিস্ফুট হয়ে থাকে তবে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিও এটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

শুধু বিশ্বকবিরূপে নয়, সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারীরূপেও রবীন্দ্রনাথের নাম আজ আর কা'রও অজানা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে 'রবি' আজ পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে মধ্য গগনে বিরাজ করে সমস্ত বিশ্বে আলোর প্লাবন এনেছেন তাঁর প্রথম উদয় কোন্ কালে, কোন্ গগনে হয়েছিল সে সম্বন্ধে সকলে অবহিত নন। কেউ কেউ এ-বিষয়ে আংশিক বা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্র-অভ্যুদয়ের প্রথম পর্ব নিয়ে সামগ্রিক ও ধারাবাহিক আলোচনা

১ পম্পা মজুমদার-প্রণীত 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' গ্রন্থের ভূমিকা (১৯৭২ জুন ২৮)

এখনও পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর জীবনের (বয়স তেরো থেকে পঁচিশ) অর্থাৎ 'শৈশব সংগীত' রচনাকাল থেকে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকাল পর্যন্ত মোট চোদ্দ বৎসরের (১৮৭৪-৮৬) সাহিত্যসৃষ্টির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার প্রয়াস বোধ করি এই গ্রন্থেই প্রথম করা হল। রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম উপেক্ষিত বা অনাদৃত পর্বটির প্রতি সুবিচার করার এবং এদিকে সকলের দৃষ্টি যথোচিতভাবে আকৃষ্ট করার প্রয়াসহেতু বইটিকে অভীষ্ট স্বল্পপরিসরে সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নি। তাই অনবসর পাঠকদের জন্য এখানেই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন জানতে গেলে স্বভাবতঃই তখনকার জাতীয়-জীবনের, বিশেষতঃ সাহিত্যবিকাশের একটু পরিচয় নিতে হয়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই-তিন দশকে এদেশে ও বিদেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। সিপাহি বিদ্রোহকে উপলক্ষ করে সমগ্র উত্তর-ভারতব্যাপী সামরিক অভ্যুত্থান, বিদেশী বণিকসঙ্ঘের শাসনাবসান এবং ইংরেজ রাজশক্তি -কর্তৃক ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, এই তিন মহাভূকম্পনে চির-নিদ্রারত ভারতে জাতীয় চেতনার প্রথম উদ্বোধন ঘটল। ওদিকে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের চেষ্টায় বহুধাবিচ্ছিন্ন ইটালী একতাবদ্ধ ও দাসত্বমুক্ত হয়। আমেরিকায় ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘটে। সুয়েজখাল উন্মুক্ত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ঢেউ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। এই সময়েই কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ঠাকুরবাড়ির পরিচালনায় হিন্দুমেলার অধিবেশনও এই সময়কার ঘটনা। জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতা লাভের উপায় যে স্বাবলম্বন তাই ছিল হিন্দুমেলার আদর্শ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই যুগে রাজনৈতিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করার জন্য সচেষ্ট হন। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা ও প্রচেষ্টায় আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দেশের এই অবস্থায় উৎসাহী যুবকরা সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য— সর্বক্ষেত্রেই দেশকে উন্নত করার কাজে অগ্রণী হলেন। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধারা, অপর দিকে প্রাচ্যের বহুকালের নিদ্রিত সভ্যতার পুনরুজ্জীবন, উভয়ের মিলনে ভারতীয় জীবনে দেখা দিল নবচেতনার প্রবাহ।

একদা দারাশিকোহ্ (সপ্তদশ শতক) 'দুই সাগরের মিলন' (*Mingling of two Oceans*) নামক তাঁর এক গ্রন্থে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের চিরন্তন বাণীর সমন্বয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের যে মিলন তা হল আরও গভীর, ব্যাপক ও স্রোতস্বিনী। এর সূচনা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর হাতে, আর সেই ধারাতেই পুষ্ট হলেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেকে। দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের এই অবস্থার মধ্যে বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-কোরকও উন্মীলিত ও বিকশিত হবার বাঞ্ছিত সুযোগ পেয়েছিল। তখনকার জীবনে নূতন নূতন চিন্তা ও ধারণা ওই বালককে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল এবং সর্বতোমুখী কিরণসম্পাতে তাঁর মুকুলিত কিশোর মনকে বিকশিত করে তুলেছিল সহস্রদল পদ্মের মতো। তখন থেকেই তিনি সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস সর্বক্ষেত্রেই নিজেকে এগিয়ে দিতে চেষ্টিত হলেন। বলা বাহুল্য, সাহিত্যেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করেছিল এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাই দেখাতে প্রয়াসী হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের একেবারে প্রত্যুষেই। নবজাগরণের প্রভাতবেলায় বহু সাহিত্যিকের লেখা বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার এবং বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকা এই জিজ্ঞাসু বালকের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তিনি যে এইসব বিচিত্র বিষয়ের বুভুক্ষু পাঠকমাত্রই ছিলেন তা নয়, তাঁর তরুণ মনে তৎকালীন সমস্ত রচনার ভাব, ভাষা, বিষয় নির্বাচন প্রভৃতি সর্ববিষয়েরই ভালোমন্দ বিচার করে দেখার একটা প্রবণতাও ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠছিল। নিজের বিচারশক্তির বলে তিনি কখনও পূর্বসূরীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসরণ করেছেন, আবার কখনও সোজাসুজি বর্জন করতেও দ্বিধা করেন নি। তাই বালক বয়স থেকে পরিণতি পর্যন্ত সমস্ত জীবনই তিনি কখনও ছিলেন তাঁদের সমর্থক, কখনও বা বিরূপ সমালোচক। এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানস কিভাবে বিকাশ লাভ করেছে তারও কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান আলোচনার নানা পর্যায়ে।

বাল্যকাল থেকে শুরু করে 'মানসী' রচনার কাল (১৮৮৭-৯০) পর্যন্ত, মোটামুটি পনেরো-বোলো বছরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল পরিমাণ বিচিত্র ধরনের সাহিত্য রচনা করলেন, তা সাধারণ পাঠকের নিকট অনেকাংশই অজ্ঞাত

বা অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরবর্তী কালে তাঁর এইসব রচনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ওগুলি 'কপি-বুক' যুগের রচনা। তাঁর অভিমত অনুসারেই আজও ওই রচনাগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত সংগ্রহে'ই অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তা ছাড়া আরও বহু রচনাই অচলিত সংগ্রহেও স্থান পায় নি। শুধু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাগুলিই আছে উক্ত সংগ্রহে। যে-সব রচনা কখনও কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত ও অসংকলিত অবস্থায় আছে। সাধারণের নিকট অজানা এইজাতীয় রচনার সংখ্যাও কম নয়। বর্তমান গ্রন্থে সেই অপরিচিত রচনাবলীর স্বরূপ ও মূল্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা গেছে।

সে যুগের রচনার সত্যকার স্বরূপ নিরূপণ করতে গেলে দেখা যাবে. ওগুলি ঠিক 'কপি' করা লেখা নয়। আসলে ওই যুগকে বলা যায় আহরণ ও স্বাঙ্গীকরণের যুগ। শিশুরা প্রথম লেখা শেখে বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতের লেখা নকল করে। অথচ তার মধ্য দিয়েই তার হাতের অক্ষরে একটা স্বকীয়তা দেখা দেয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম পর্বেও দেখি তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বা সমকালীন লেখকদের অনুগামী হলেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থেকেই পরিস্ফুট হতে থাকে। তিনি যেন তাঁদের প্রভাবকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে নিজের ভাবে ও ভঙ্গীতে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এইভাবেই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অতঃপর তার উপর সৌধ গড়ে তোলার পালা। কিন্তু এই সৌধ গড়ার প্রথম পর্বটি সম্বন্ধে কবির মনে চিরকালই দ্বিধা ছিল এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। কোনো বস্তুকে যখন পরিপূর্ণরূপে জানা যায় তখন মানুষের মনে স্বভাবতঃই তার প্রাথমিক অবস্থা বা রূপের কিছু অবমূল্যায়ন ঘটে, দেখা দেয় একটা অবহেলার ভাব। আর সেজন্যই তরুণের রচিত অবিকশিত সাহিত্য বিশ্লেষণ করে তার উত্তরকালীন পরিণত রূপের পূর্বাভাস খুঁজে পাওয়া আরও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

১৮৭৪-৮৬ সাল পর্যন্ত সময়ে রবীন্দ্র-রচিত যে সাহিত্যপর্ব সে যেন কুঁড়ির ভিতরে মুকুলিত পুষ্পের কান্নার পর্ব। এই 'কুঁড়ি'টি প্রস্ফুটিত হয়ে কি রূপ নেবে সেকালে তা কবির নিজেরও জানা ছিল না এবং বাঙালি পাঠকের নিকটও ছিল তা অজ্ঞাত। তাই বালক রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ বাঙালি সেদিন বুঝতে পারেন নি; উপলব্ধি করতে পারেন নি তাঁর অন্তরের আবদ্ধ বাণীকে। সেই রবি ছিলেন কুজ্‌ঝটিকার অন্তরালে, মেঘে ঢাকা। তাঁর দীপ্তি ছিল প্রচ্ছন্ন— নির্মল আলোকের প্রখরতা তখনও প্রকাশ পায় নি। তাই বহু সমালোচকের বহু

বিরূপ বাক্য, বহু ব্যঙ্গোক্তি তাঁকে আত্মস্থ করতে হয়েছিল। বাড়ির আত্মীয়-স্বজনেরাও তাঁর উপর কোনো ভরসা করতে না পেরে হতাশ হয়েছিলেন। কবি নিজেও যেন নিজেকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। নিজের হৃদয়-অরণ্যের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তাঁর অন্তরের গুপ্ত ক্রন্দন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে তখনও অনেক বিলম্ব। তাই পরবর্তী কালেও নিজের সেই অবস্থাটার কথা স্মরণ করে কবি বলেছিলেন—

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে।

কিন্তু তবু তিনি মনের আশা ছাড়তে পারেন নি। তাই 'অনাদর' ও অবহেলা'র মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' হাতে নিয়ে। 'দিনের পথিকে'র পথকে আলোকিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই যাত্রা। মনের এই দৃঢ়তাটুকুকে ভরসা করে তিনি যেন অন্তর থেকেও আশ্বাস পেয়েছিলেন—

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।

লক্ষ করতে হবে, প্রথমাংশে কবির যে মনোবেদনা এবং দ্বিতীয়াংশে তারই জন্য যে সান্ত্বনা ও অভয়বাণী, তা কবিকণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল বহুদিন পরে, নিজের সম্বন্ধে যখন তাঁর মনে জেগেছে অবিচল প্রত্যয়। আর, আজ আমরাও যে সেই ছোটো বালকটিকে পরিচিত করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তাও তাঁকে পুরোপুরি জানার পরেই। 'রবি' যখন তাঁর পূর্ণতেজে বিশ্বকে আলোকিত করেছেন, তখনই আমরা ফিরে তাকিয়েছি সেই উদয়াচলের দিকে। কবি নিজেও জীবনের অন্তিমে পৌঁছে তাঁর সেই প্রত্যূষপর্বের সাহিত্যকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন—

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরিশিখর-পানে
অস্ত মহাসাগর তট হতে—

নবজীবনযাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিসখানি অরুণ-আলোস্রোতে।[২]

তাঁর যে সেই ছেলেবেলার সাহিত্যের 'খেলাঘর' তা 'মায়াসম' নিশ্চিহ্ন হবে জেনেও কবি বারেবারে বলেছেন "উদয়গিরি তবুও নমো নমো।" অর্থাৎ তাঁর 'নবজীবনে'র যে আশীর্বাদ তা-ই পরিণত জীবনে তাঁকে অনেকখানি সার্থকতা দান করেছে। একদা তাকে অবহেলাভরে বর্জন করলেও শেষ জীবনে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন।

যে কুঁড়িটি বিকশিত হবার পূর্বে ক্রন্দন করেছিল প্রস্ফুটিত হবার পরেই তার ক্রন্দনের কারণটি অনুভব করা যায়। ফোটা ফুলের শোভা একবার দেখার পরই কুঁড়ির অন্তর্নিহিত বিকাশ-বেদনাটি বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই পরিণত রবীন্দ্রনাথ যে কীর্তি রেখে গেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর আদিজীবনের সাহিত্যচর্চার মূল্য বিচার করে দেখা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"— কবি-উচ্চারিত এই বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের পরিণত পর্ব অপেক্ষা আদিযুগ সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কারণ পরিণতির প্রায় সমস্ত সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছিল তাঁর জীবনের সূচনায়। কবি Wordsworth যে তাঁর 'Rainbow' কবিতায় বলেছিলেন "The Child is father of the Man"— সে কথাটি এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আদিজীবন সম্বন্ধে প্রয়োগ করা বোধহয় অনুচিত হবে না। শৈশবের বিশেষত্বগুলিই পরবর্তী জীবনে তাঁকে সার্থকতা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আদিযুগের যে সাহিত্যসৃষ্টি তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে সেই বিপুল সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য বিচার করার প্রয়াস করা গেছে। তাঁর মনোবিকাশের সুপ্রশস্ত পটভূমিকাটিরও পরিচয় দেওয়া গেছে যথাযোগ্যস্থানে। যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখাতেই এক-একটি বিশাল সৌধ গড়ে তুলেছিলেন সেই ভিত্তিভূমির আয়তন, গভীরতা ও দৃঢ়তাটুকু দেখানোই এই গ্রন্থের লক্ষ্য, তার উপর নির্মিত বহুতল ও বহুকক্ষ সাহিত্য-সৌধের নয়। বিরাট্ অট্টালিকা নির্মাণের পর তার বহিরঙ্গের রূপসম্পদ্ দেখেই লোকে মুগ্ধ হয়। তার কারুকার্য ও বিশালত্ব মনকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু মাটির তলায়

২ বীথিকা, 'প্রণতি' (১৯৩৪)

গাঁথা যে ভিত্‌টি তাকে ধারণ করে থাকে তার কথা কারও স্মরণ থাকে না। বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের এক-একটি শাখায় যে এক-একটি বহুকক্ষ অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিরই ভিত্‌-নির্মাতা যে একক কারিগর, তাঁর নিপুণতা ও বিশিষ্ট নির্মাণকৌশলটি দেখিয়ে পাঠকবর্গের মনে একটা ধারণা প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায়ও লক্ষিত হবে এই গ্রন্থের সর্বত্র।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থে আমি প্রধানতঃ আদিপর্বে রচিত রবীন্দ্রসাহিত্যের ঐতিহাসিক তথ্যের দিক্‌টিতেই বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। তবে বিভিন্ন তথ্যের তাৎপর্য নিরূপণ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিচারের প্রশ্নও মাঝে মাঝে এসেছে। কেননা, পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যের অঙ্কুর যে এই প্রথম পর্বেই উপ্ত হয়েছিল তা দেখানোও এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্বে আসে তথ্যের উদ্‌ঘাটন, তার মূল্য-বিচার আসে পরে। এই গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায় রবীন্দ্রজীবনের এই প্রথম পর্বের সমস্ত সাহিত্যিক তথ্যকে অজানার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ও যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করা। আশা করি তাতে এই অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত তথ্যাবলীর আলোকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন মনন-প্রকৃতি ও সাহিত্যকৃতির স্বরূপ সুষ্ঠুতররূপে উপলব্ধি করা সহজ হবে। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের চিন্তা, কর্ম ও সাহিত্যের প্রতিক্ষিপ্ত আলোকে এই প্রথম পর্বের তথ্যাবলীর পুনর্বিচার করে তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করার পথও প্রশস্ত হবে। তখনই আসবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও উত্তর উভয় পর্বের মননধারা ও সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যবিচারের যথার্থ অবকাশ। আমার এই প্রচেষ্টার দ্বারা যদি সেই শুভক্ষণ কিছুমাত্র ত্বরান্বিত হয় তা হলেই নিজেকে চরিতার্থ মনে করব।

'পরিশেষ' বিভাগে বর্তমান গ্রন্থের কালসীমার অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রতিটি রচনা-প্রকাশের কালক্রম, পাঠ-পরিবর্তন, গ্রন্থভুক্তি বা বর্জন ইত্যাদির পরিচয়সহ একটি তালিকা দেওয়া হল। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা দুটি নবাবিষ্কৃত কবিতা ('ভারত ভূমি' ও 'হোক্‌ ভারতের জয়') এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারত ভূমি' কবিতা সম্পর্কে 'মা ভৈঃ'-শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ দুটি চিত্রলিপিসহ পুনর্মুদ্রিত হল। আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের নিত্যব্যবহারের জন্য এই 'পরিশেষ' অংশটি পৃথক্‌ পুস্তিকারূপেও প্রকাশ করা গেল। আশা করি এই স্বল্পায়তন পুস্তিকাটির দ্বারা জিজ্ঞাসু পাঠকের আশু প্রয়োজনসাধন সহজ হবে।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থ রচনার উৎসাহ সর্বপ্রথম পেয়েছিলাম আমার পিতৃদেব অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের নিকট সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার কাজে যেভাবে পিতৃপ্রতিম গুরুর ন্যায় নিরলস উৎসাহদান ও সহায়তা করে থাকেন, আমার এই গবেষণার কাজেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সেই উৎসাহই আমার মনে নিরন্তর উদ্দীপনা জুগিয়েছে। সে সঙ্গে আমার মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা রুচিরা সেনও প্রতিক্ষণই আমার জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করে আমার মনের আশা ও উৎসাহকে জাগিয়ে রেখেছেন। তারই ফলে এই গ্রন্থ রচনা ও যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এ কথা স্মরণ করে পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে আমার প্রণাম জানিয়ে এই গ্রন্থটি তাঁদেরই হাতে তুলে দিলাম।

গবেষণাকার্যে ও গ্রন্থ রচনায় আমার নির্দেশক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে যে সাগ্রহ আনুকূল্য ও উৎসাহ পেয়েছি আমার কাছে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বয়ং তিনি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ও সুখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর অমলেন্দু বসু এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য, এই তিন অভিজ্ঞ বিচারকের অনুমোদনক্রমে গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. উপাধিলাভের যোগ্য গবেষণাকর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে (১৯৭৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটি পড়ে এটির সম্বন্ধে তাঁর অভিমত আমাকে সাগ্রহে লিখে পাঠিয়েছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে এইসব শ্রদ্ধার্হ অধ্যাপক ও মনস্বী বিচারকের অনুকূল অভিমত আমার পক্ষে শুধু যে আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হয়েছে তা নয়, ভাবী কালের জন্য আমার উৎসাহ ও প্রেরণার উৎসস্থলও হয়ে রইল। যোগমায়া দেবী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুব্রত গুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিকতা ও সক্রিয় সহায়তার ফলেই এই গ্রন্থ এত সত্বর প্রকাশ করা সম্ভব হল।

গ্রন্থপ্রকাশের কাজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আর যাঁরা আমাকে নানাভাবে

অক্লান্ত সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য আমার স্বামী অধ্যাপক দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এ ছাড়া আরও অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, নানাপ্রকারে সাহায্যও করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করি। গ্রন্থমুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্মী শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সযত্ন সহযোগিতা প্রীতির নিদর্শনরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। একটি চিত্র প্রতিমুদ্রণে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীমান গৌতম সেনগুপ্ত।

গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহে যেসব গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয় এবং যোগমায়া দেবী কলেজ গ্রন্থাগার। এইসব গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমার কর্মকে সহজতর করে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বতন সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওই গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী শ্রীসুভাষ সমাজদার, রবীন্দ্রভবনের শ্রীসনৎকুমার বাগচী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয়ের শ্রীতুহিনকান্তি ঘোষ, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, শ্রীশংকর ঘোষ ও শ্রীসুবোধ বসু এবং যোগমায়া দেবী কলেজের শ্রীযুক্তা মণিকা রায়। তবে এ-বিষয়ে আমার সবচেয়ে বড়ো সহায়ক হয়েছে আমার পিতৃদেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রতিকৃতি ও একটি পাণ্ডুলিপি প্রতিচিত্রিত করার অনুমতি দিয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ এবং একটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন কলকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরণজিৎ রায়। চিত্র-নির্বাচন বিষয়ে প্রবীণ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও শিল্পী-কবি শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয় পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা বৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। চিত্র প্রতিমুদ্রণের কাজে USIS কার্যালয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির মুদ্রক শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ ও শ্রীবরুণ চৌধুরী এবং চিত্রমুদ্রক শ্রীবিমল দাশগুপ্তর সহায়তার কথাও এ প্রসঙ্গে সানন্দে স্মরণ করছি। গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছি তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্যভাবে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক প্রীতি জানাই।

এ জাতীয় সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ের আলোচনায় নানারকম জটিলতার গ্রন্থি মোচনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার প্রয়োজন সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে সর্বপ্রকারে

ক্রটিহীন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবুও নানাবিষয়ে কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, এ রকম বিষয়ে মতভেদেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কোনো সহৃদয় পাঠক আমার অজ্ঞানতা বা অনবধানতাজাত তথ্যগত ক্রটি বা অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উপকৃত হব এবং ভবিষ্যতে সেসব ক্রটি নিরসনেও সচেষ্ট হব।

বিনীতা

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়ক্রম

নবম অধ্যায়

চিত্রক্রম

শব্দ-সংক্ষেপণ

জী-স্মৃ = জীবনস্মৃতি (১৯৬২)

র-জি = রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড (১৯৬৫)

র-জী = রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (১৯৭০)

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা: প্রথম পর্যায়

শিশুর মন স্বভাবতঃই গড়ে ওঠে নিজের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর জীবনের সাহিত্য-রচনার মূল্যবিচার ও পরিধি নির্ণয় করতে হলেও সর্বপ্রথম দেখা দরকার তাঁর জীবনগঠনের পটভূমিকাটি কিরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "আমাদের পরিবারে আমার জীবন-রচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-রচনা'র ভূমিকা বিচার করতে হলে তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে সেকালে বাংলাদেশ ও বঙ্গসমাজের সম্পর্কটা কিরূপ ছিল তাও জানা দরকার। তাই সর্বপ্রথম সমাজ ও পরিবারের প্রতিই আলোকপাত করা প্রয়োজন।

(১) সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ

সামাজিক— নানা দিক্ থেকেই রবীন্দ্রনাথের জন্মকালকে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ বলে বিবেচনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের (১৩৬২ সংস্করণ, পৃ ২০২) একটি উক্তি স্মরণীয়—

> "১৮৫৬ হইতে ১৮৭১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।"

তখন বাংলাদেশে এক যুগের অবসান ও আর-এক যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, জাতীয়তাবোধ, সর্বক্ষেত্রেই সেই নূতনত্বের প্রকাশ। এই পরিবেশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল দেশবাসীর নিকট প্রায়

সব বিষয়েরই আদর্শস্থানীয়। সেই যুগে এবং সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই নিজেকে গড়ে তোলবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন আমাদের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর *The Religion of an Artist* গ্রন্থে (১৯৫৩) বলেছেন :

> "I was born in 1861. That is not an important date of history, but it belongs to a great epoch in Bengal, when the currents of three movements had met in the life of our country. One of these, the religious, was introduced by a very great-hearted man of gigantic intelligence, Raja Rammohan Ray. It was revolutionary, for he tried to reopen the channel of spiritual life which had been obstructed for many years ..
>
> This was happening about the time I was born. I am proud to say that my father was one of the great leaders of that movement."

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাঁর পিতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার থেকে মুক্ত ও উপনিষদ্‌প্রোক্ত ধর্মাদর্শের একনিষ্ঠ সাধক। এর ফলে পুরাণ-পূর্ব প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই মহর্ষি যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রচলিত ধর্মের সংস্কারাচ্ছন্নতা বা ভাবালুতা প্রবেশ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই পিতার এই ধর্মবোধ ও উপনিষদের ধর্মাদর্শকে আত্মস্থ করে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

২

এই ধর্মীয় আন্দোলন ছাড়া আরও দুটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "There was a second movement equally important. Bankimchandra Chatterjee, who, though much older than myself was my contemporary and lived long enough for me to see him, was the first pioneer in the literary revolution which happened in Bengal about that time... He lifted the dead weight of ponderous forms from our language

and with a touch of his magic wand aroused our literature from her age-long sleep."

—পূর্ববৎ

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব এবং সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গাতেই এই কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর সুবিখ্যাত উক্তি,—

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।···কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র' ১৩০১ বৈশাখ

এ প্রসঙ্গে একটি কবিতার কথাও মনে পড়ে যায়। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—

"মনে আছে সেই প্রথম বয়স
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে
বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি' যেন
রক্ত কমল ফুটে।"

—মানসী, 'পরিত্যক্ত' ১৮৮৮ জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গদর্শনের যুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব উপলক্ষ্য করেই তিনি এই উক্তি করেছেন, এ কথা অস্পষ্ট নয়। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিকরাও সেযুগে আবির্ভূত হয়ে বাংলা কাব্য, নাটক, ভাষা, ছন্দ সর্বক্ষেত্রে নূতন নূতন দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তার ঢেউএ আন্দোলিত হল কিশোর রবীন্দ্রচিত্ত, এই অধ্যায়েরই শেষাংশে তার আলোচনা করা যাবে।

৩

সাহিত্যের এই নূতন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কবির রচনায় স্বদেশ-প্রীতির সুরও শোনা যাচ্ছিল। কবির ভাষাতেই বলা যায়, তখনকার অনেক কবির কবিতায় "দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়" (আত্মপরিচয়, ৫) এবং এ কথাই তিনি বাংলাদেশের নবযুগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"There was yet another movement started about this time called the National. It was not fully political, but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality."

—The Religion of an Artist

রবীন্দ্রনাথ যখন নিতান্তই শিশু তখন নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬৭)। এই মেলায় ঠাকুরবাড়ির উৎসাহ ও সহায়তা ছিল প্রধানতম। হিন্দুমেলার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা গান রচনা করেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই মেলায় দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন। প্রকৃতপক্ষে, জনজীবনে জাতীয়তা ভাবের উন্মেষ ঘটানোই ছিল হিন্দু মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়" ('স্বাদেশিকতা', জী-স্মৃ)। অপরপক্ষে, স্বদেশী উদ্দীপনাকে প্রধানতঃ সংগ্রামীরূপ দেবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে একটি গুপ্তসভা গঠন করেছিলেন, নাম 'সঞ্জীবনী সভা'। তার পরিচয় 'জীবনস্মৃতি' (স্বাদেশিকতা) ও 'আত্মপরিচয়' (৫) গ্রন্থদ্বয়ে কবি বিস্তৃতভাবেই দিয়েছেন। এই হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

দেশের এই পরিবর্তনের যুগে জন্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন এই সব কয়টি দিকেই সচেতন হয়ে উঠছিল।—

"These three movements were on foot and in all three the members of my own family took active part."

—পূর্ববৎ

পারিবারিক—ধর্মে, চিন্তায়, সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশের অগ্রগতি রবীন্দ্রনাথের জীবন গঠনের পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছিল। সেসঙ্গে তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের পরিবারের যে স্বতন্ত্র ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল আপন বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। পরিবারের এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে শৈশব থেকেই স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।—

"My family had to live its own life, which led me from my young days to seek guidance for my own self-expression in my own inner standard of judgement."

—পূর্ববৎ

পরিবারের যে মুক্ত পরিবেশে কবির জন্ম, তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—

"আমি এসেছি যখন এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নূতন কাল সবে এসে নামল।" তাই "জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণযুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ রাখতে হয়নি।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫ (১৩৩৮ পৌষ) ও অধ্যায় ৬ (১৩৪৭ বৈশাখ)

এই পরিবারটি সেযুগে দেশের সর্ব-নবীনতার আকরস্থানীয় হলেও বাংলার তথাকথিত সমাজব্যবস্থা থেকে নিজেদের পৃথক্ করে রেখেছিলেন।—

"আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।···পিতামহের ঐশ্বর্য দীপাবলী নানাশিখায় একদা এখানে দীপ্যমান্ ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা।···আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা-জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫ ১৩৩৮ পৌষ

ঠাকুরপরিবারের এই 'স্বাতন্ত্র্য' তাঁদের ভাষায়, বেশভূষায়, আচারঅনুষ্ঠানে, চিঠিপত্র-লেখাপড়ায়, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে অর্থাৎ তাঁদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলাভাষাকে তাঁরা মহাসমাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে প্রকাশ পেত এমন একটি বিশেষ ভঙ্গী, যাকে লোকে বলত 'ঠাকুরবাড়ির ভাষা'।

তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নূতন ও পুরাতনের সংযোগে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত। একদিকে উপনিষদের চর্চা, অপরদিকে ইংরেজি সাহিত্যের আবহাওয়া প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। শেক্‌সপীয়র, ওয়াল্টার স্কট প্রমুখ সাহিত্যিকরা ছিলেন তাঁদের পরিবারে বিশেষ সমাদৃত।

স্বাদেশিকতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতারা স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনে অগ্রণী হন। এ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়।—

"মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।...গঙ্গার ধারে কোনো বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থান-কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে...হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সেসব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৩৮

প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন শিশু রবীন্দ্রনাথের চিত্ত গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। সাহিত্য, শিক্ষা, সঙ্গীত, স্বাদেশিকতা সর্বদিক্‌ থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সচেতন ও সুদক্ষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন ; এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর বাল্যকালের যেসব স্মৃতি খুব স্পষ্ট হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল বাড়ির সাহিত্য ও আর্টের আবহাওয়া। এক্ষেত্রেও অগ্রণী ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতারা। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁদের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক্‌ দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশেভূষায়, কাব্যেগানে, চিত্রেনাট্যে, ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।"

—'বাড়ির আবহাওয়া'

গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে তাঁদের বাড়িতে একটি নাটকীয় দল গঠিত হয় এবং তাঁদের উৎসাহে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' কয়েকবারই অভিনীত হয়। "এইসব অভিনয়ের ক্ষীণ স্মৃতিকণিকাগুলি বালকের অবচেতন মনের স্তরে সঞ্চিত ছিল এবং উত্তরকালে তাহারাই পূর্ণাঙ্গ আর্টরূপে কবির জীবনে প্রকাশ পায়।"

—র-জী, পৃ ২৬

তাঁদের বাড়িতে কাব্য ও গীতচর্চার স্রোতও ছিল সর্বদা অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত। তাঁরা সকলেই ছিলেন সুকবি ও সুগায়ক। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কথা কবির মনে চিরদিন জাগ্রত ছিল। কবির শিশুকালের গানের সমঝদার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্ত শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তিনি নিজেও ছিলেন সুগায়ক। এছাড়া ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, যদুভট্ট প্রমুখ বিখ্যাত ওস্তাদদের নিকট সংগীতশিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের প্রভাবও তাঁর পরবর্তী জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। এই বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

এইভাবে নানাজনের সাহচর্য ও প্রভাবে এবং নানা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও উদ্‌যোগের মধ্যে দিয়ে শিশু ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সচেতনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। তাঁর জীবন কঠিন শাসনে বাঁধা ছিল না। এই বালক ছিলেন সমাজশাসন ও স্কুল-শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও ছিল ঢিলে। কারণ, পিতা বৎসরের বেশির ভাগ সময় কাটাতেন বাইরে। ভ্রাতারাই ছিলেন শাসনকর্তা এবং তাঁকে তাঁরা নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় বন্ধুর মতই গ্রহণ করেছিলেন। তাই কবির সাহিত্যরচনার স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে সুযোগও মিলেছিল জীবনের অতি প্রত্যুষেই। 'ঘরের কোণে' আপন মনে হল তাঁর সাহিত্যরচনার সূত্রপাত। সেই রচনায় ছিল, "বালকের যা-তা ভাবের এলো মেলো কাঁচা গাঁথুনি" এবং "ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে" (আত্মপরিচয়, ৫)। তবুও এই অপরিণতি নিয়েই তিনি সবেগে এগিয়ে চললেন পূর্ণাঙ্গ পরিণতির দিকে।

(২) ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

ধর্মবোধ—পূর্বেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মেছিলেন সে সময়টা ছিল বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁসের যুগ। একদিকে ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাব, অপরদিকে প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক বা

বেদোত্তর বৌদ্ধসংস্কৃতি প্রভৃতি পুনরুদ্ধারের ফলে ভারতীয় নবচেতনার সূচনা হয়। এই নবচেতনা দেখা দিল ধর্ম, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই। তবে ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্যতম সম্পদ যে ধর্ম, তাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু হল, সেকথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এই নবযুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে এগিয়ে এলেন বহু মনীষী। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলাদেশে রামমোহনের আবির্ভাব এবং তাঁর ধর্মসংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন রূপটা সংক্ষেপে জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,—

> "যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।
>
> একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল···আমি জানি—এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার।···সেদিন সে ছিল না—অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।" তারপর—
>
> "শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে।···নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি।" তাই সেদিন "অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত" ভারতবর্ষের "আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্য পরিচয় ছিল আচ্ছন্ন।"
>
> —চারিত্র পূজা, 'ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়' ১

ভারতবর্ষের এই তামসিকতার যুগেই হঠাৎ আবির্ভূত হলেন রামমোহন রায়—"সেই আত্ম-বিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে।" ভারতবর্ষের এই বহুবৎসর সঞ্চিত গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন, "A very great-hearted man of gigantic intelligence."

২

রাজা রামমোহন জন্মেছিলেন 'সত্যের ক্ষুধা' নিয়ে। এই সত্য হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যসাধনা, মানুষের ঐক্যসাধনা। এই ভারতবর্ষেই যুগে যুগে কত মনীষী জন্ম নিয়েছেন—যাঁরা ভারতের এই চিরন্তন বাণীকে প্রচার করে গেছেন আপন আপন সাধনার মাধ্যমে। বৈদিক যুগ থেকে এই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন,—

> "ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয়নি।...ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।...অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধি-বিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক্ করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই।"
>
> —পূর্ববৎ

তবু এই পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে দিয়েও ভারতবর্ষের শাশ্বতবাণীকে জয়যুক্ত করার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন মহাপুরুষরা। তাই ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে বারেবারেই ঘটেছে ধর্মবিপ্লব। মধ্যযুগে এই বাণী নিয়েই এসেছিলেন কবীর, দাদূ, রজ্জব। যে ঐক্যের বাণী ছিল তাঁদের প্রধান অবলম্বন তাকেই কবি বলেছেন ভারতপথ এবং সেইজন্য এঁরা সকলেই ছিলেন ভারত-পথিক। বর্তমানযুগে সেই পথেরই মহাপথিক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনের যখন আবির্ভাব হয়, তখনও আমাদের দেশের নবযুগ পুরোপুরি শুরু হয়নি। বিদেশী বা স্বদেশী কেউই এই যুগকে তখনও স্পষ্ট করে জানতে পারে নি। অথচ, তিনি সেদিন বাংলাদেশের প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে দাঁড়িয়েও বুঝতে পেরেছিলেন এযুগের আহ্বান "সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান"। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতেরই হৃদয়, ভারতের সত্য পরিচয় তিনি আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সেদিন তিনি দেশবাসীর কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুসলমান, খৃষ্টান ও ভারতের সর্বজনকে—"হিন্দুর এক পংক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

রামমোহন ভারতের যে মহামন্ত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ম্',—এই নিয়ে আবির্ভূত হয়ে

ভারতবর্ষে যে নূতন পথ দেখিয়ে দিলেন, সেই পথেই আবির্ভূত হলেন আরও অনেক মহাপুরুষ।

৩

অপরদিকে, ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাবে ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ দেখা দিল—তার প্রধান লক্ষণ ছিল মানবিকতা। মধ্যযুগে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পরলোক, ধর্মসাধনা ও মুক্তির দিকে। জাগতিক ও মানবিক ব্যাপারের প্রতি তখনকার লোকে ছিল উদাসীন। তবে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপের মানবিকতা বা Humanism ছিল মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষের মানবিকতা ধর্মকে ত্যাগ করেনি। বরঞ্চ, ধর্মকে নবরূপ দিতে চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষে মানবিকতা ও ধার্মিকতার মিলনে এক নবরূপের সৃষ্টি হয়েছে—যাকে বলা যায় 'Religion of Man' বা 'মানুষের ধর্ম'।

ভারতবর্ষে নবযুগের নেতাদের মধ্যে এই বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ সকলেই আধ্যাত্মিক নীতি ও জাগতিক সত্তার সমন্বয়কেই মানুষের আদর্শ বলে প্রচার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' তার প্রমাণ। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মুখেও সেই সমন্বয়ের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে,—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

ভারতের নব অভ্যুত্থানের যুগে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাখাগুলির নব নব বিকাশ ঘটেছে। বৈদিক-পূর্ব যুগকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন স্বামী দয়ানন্দ এবং ঐ যুগকেই যথার্থ সত্যযুগ বলে গ্রহণ করেছে বর্তমান কালের 'আর্যসমাজ'। বৈদিক-উত্তর যুগ অর্থাৎ উপনিষদ্ যুগের আদর্শ রয়েছে ব্রাহ্মসমাজের মূলে। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই বাণীর দ্বারাই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে মহবোধি সমাজে। শঙ্কর প্রচারিত বেদান্ত ধর্ম নবকলেবর ধারণ করেছে রামকৃষ্ণমিশনকে আশ্রয় করে। এর প্রেরণাদাতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বৈষ্ণব ধর্মেরও পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে। কিন্তু এইসকল শাখাই সেই সমন্বয়বাদকে অবলম্বন করে রূপায়িত হয়েছে। প্রাচীন কালের বুদ্ধ অশোকের মৈত্রীর বাণী এবং পরবর্তী কালের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' ইত্যাদি বাণীতে ওই সমন্বয়ের

আদর্শেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষীয় মানবিকতা ধর্মহীন নয় এবং ভারতবর্ষীয় ধর্মও মানবিকতাবর্জিত নয়। এই আদর্শটিকে সামনে রেখেই আমাদের দেশে যুগে যুগে ধর্মযাজকগণ আবির্ভূত হয়েছেন।

৪

রবীন্দ্রনাথের চিত্তও জেগে উঠেছিল এই বাণীকে অবলম্বন করেই। তাঁর অন্তরের নিবিড়তম কামনা ছিল—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

বলাবাহুল্য, তাঁর এই চেতনা দেখা দিয়েছিল জীবনের একেবারে প্রত্যুষেই। রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন ব্রহ্মউপাসক। উপনিষদের চর্চা ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকে এই আবহাওয়ায় মানুষ। কিন্তু ক্রমে তাঁর ধর্মমত একটি নিজস্ব রূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"আমার জন্ম যে পরিবারে সে-পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ-ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।...বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তিদ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে।...উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। পিতার কাছে গায়ত্রী-মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি।...এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড।...এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"

—মানুষের ধর্ম, 'মানবসত্য'

এই যে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা বোধ, এই ছিল কবির অন্তরের সত্য। একেই তিনি তাঁর ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি, উপনিষদের বাণীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু তারই মধ্যে থেকে কবি তাঁর স্বকীয় ধর্মের দিকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। কবির এই ধর্মবোধ কোনো বিশেষ ধর্মবাদকে অনুসরণ করে নি। সে ধর্ম যে কি জাতীয়, সে সম্বন্ধে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন না। 'হিবার্ট লেক্‌চারস্‌' দিতে গিয়ে কবি নিজেই এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলেছিলেন,—

> "আমার ধর্ম হইল একজন কবির ধর্ম—এধর্ম কোনো নিষ্ঠাবান সদাচারী লোকের ধর্মও নয়, কোনো ধর্মতত্ত্ব বিশারদের ধর্মও নয়। আমার গানগুলির প্রেরণা যে অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই পথেই আমি আমার ধর্মের সকল স্পর্শ লাভ করিয়াছি।... তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে।" কারণ তিনি 'গানের ভিতর দিয়ে'ই এই 'ভুবন'কে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

আসলে প্রধানতঃ উপনিষদের ভাবধারার প্রতি কবির একটা আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল। সেই ভাবধারাই কবির মনে নবরূপ নিয়েছিল। এর প্রকাশ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। তাই দেখি, "রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেক কবিতার ভিতর দিয়া কবিমনের যে অপটু আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার উপরে উপনিষদের প্রভাব ছিল না, অথচ পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে মিলাইয়া এগুলিকে যখন গ্রহণ করিতে চাই তখন ভাবধারার অন্তর্নিহিত একতানতা আমাদিগকে বিস্মিত করে, কবি নিজেও এই আবিষ্কারে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত এবং চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছেন।"

—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস (১৩৬৮) পৃ ১২
শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৫

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে আরও একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, কবি ছিলেন সেই সত্যে বিশ্বাসী, যে সত্য পৃথিবীর সকল পৃথক্‌ বস্তুকে এক মৈত্রীসূত্রে এক ঐক্যবোধে বেঁধে রাখতে পারে। কবি তাঁর 'Religion' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিজেই বলেছেন,—

> "I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy."

—The Religion of an Artist

এই যে অসীমের সঙ্গে একাত্মতাবোধ, সত্যলাভের আনন্দ এরমধ্যে দিয়েই

মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে,—'বৈরাগ্যসাধনে' নয়। কবি তাই বলেছেন, মানুষ হয়ে জন্মে এই বাণীকেই জীবনের লক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা দরকার—

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।"

—*চিত্রা, 'এবার ফিরাও মোরে' ১৩০০ ফাল্গুন*

এই 'সত্যে'র জন্য কোনো বিশেষ ধর্মবাদের দরকার হয় না। কবির 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালাতে দেখি, "উহার মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিবাদ, জীবন-শিল্পীর কর্মবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার নির্দেশ দিতেছে।"

—রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (১৯৬১) পৃ ২০৪

৬

বলাবাহুল্য, এই সমগ্রতাবোধ ও অখণ্ডতার অনুভূতি কবির বাল্যবয়স থেকেই দেখা দিয়েছিল। যেদিন কবি ফ্রি স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেছিলেন, সেদিনকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন,—

"মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে।…কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম।…সেইসময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।"

—মানুষের ধর্ম, 'মানবসত্য'

সেইসময় থেকেই কবি নিজের মধ্যে দুটি সত্তা অনুভব করেছিলেন। -"এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা।"

—পূর্ববৎ

এই উভয়ের মিলিত যে অনুভূতি কবি তাকেই বলেছেন 'সর্বানুভূতি'। এই অনুভূতি লাভের সমকালেই লেখা 'প্রভাত সংগীতে' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবির হৃদয় শুনতে পেল 'মহাসাগরের গান'। এই 'মহাসাগর'কেই

তিনি পরে বলেছেন 'মহামানব'। 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় তাঁর এই অনুভূতিরই প্রকাশ,—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।"

এই বিশ্ব-আনন্দের অনুভূতিকে কবি উপলব্ধি করেছিলেন 'প্রভাত-সংগীতে'র যুগ থেকেই। সেই শুভমুহূর্তের জন্য বারেবারেই কবি অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর দীর্ঘজীবনপথে। তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন,—

"মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ।… এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে।"

—পূর্ববৎ

৭

ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ যে সত্য অনুভব করেছিলেন পরবর্তী জীবনে তা ক্রমেই গভীরতর ও প্রবলতর হয়েছে। তাই যে কবি 'কড়ি ও কোমলে' লিখেছিলেন,—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

সেই কবিই পরে 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (চিত্রা), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতি কবিতায় পৃথিবীর সৌন্দর্যকে পেতে চেয়েছেন তাঁর হৃদয়ের বিস্তার দিয়ে। আর তারই চরম পরিণতি ঘটেছে 'Religion of Man' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। এই 'মানুষের ধর্ম'ই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, তাঁর জীবনের সাধনা। ছোটবেলা থেকেই এই সাধনার সূত্রপাত। ভারতপথিক রামমোহন নব-ভারতে যে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সাধনাকে অবলম্বন করে সেই মহাপথেরই শ্রেষ্ঠ যাত্রীরূপে সিদ্ধিলাভ করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

জাতীয়তাবোধ—ধর্মের মতই জাতীয়তাবোধের ফল্গুধারা কিভাবে কবির অন্তরে প্রথম প্রবাহিত হয়েছিল তার ইতিহাসটাও জানা দরকার। "রবীন্দ্রনাথের অন্তরে…বালক বয়সে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির বুনিয়াদ কিভাবে পত্তন

হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে বাংলাদেশের··· প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসটা জানা প্রয়োজন।"

—র-জী, পৃ ৪৫

বাংলাদেশে এই স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব ও গভীর প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথই বলেছেন তাঁর 'মহাজাতিসদন' (কালান্তর) প্রবন্ধে—

"আমার বিশ্বাস, য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানা দিক্‌ থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্বযুগের অজগর নিদ্রা থেকে।··· আচারধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল।"

বস্তুতঃপক্ষে, জাতীয়তাবোধ বা nationalism পদার্থটা ইউরোপীয় শিক্ষারই ফল। বিদেশী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের চিত্তে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাই নবযুগের যুবকদের মন হয়ে উঠল চঞ্চল। সে সময়ে দেশে স্বদেশবোধ সঞ্চারে ঠাকুর-পরিবারেরও একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়।—

"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

—জী-স্মৃ, 'স্বাদেশিকতা'

প্রধানতঃ এই পরিবারের আনুকূল্যেই সেকালে 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দু-মেলা' নামে একটি বার্ষিক মেলা প্রবর্তিত হয়েছিল (১৮৬৭, এপ্রিল ১২), সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের নূতন স্বাদেশিকতা ও সাজাত্যবোধের প্রথম দীক্ষাগুরু। 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে' 'জাতীয় গৌরব' প্রতিষ্ঠা করার বাণী প্রচারই ছিল রাজনারায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর এই আন্তরিক অভিপ্রায়কে বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা স্থাপনের দ্বারা। ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্য এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা তাকে পরিপূর্ণতা দান করে। এই মেলার সম্পাদক ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহসম্পাদক নবগোপাল মিত্র। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতচর্চা, কুস্তি-ব্যায়ামাদির

উৎসাহদান ইত্যাদি ছিল এই মেলা স্থাপনের উদ্দেশ্য। সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।" রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ('স্বাদেশিকতা') বলেছেন—

"এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

প্রকৃত পক্ষে, 'স্বাবলম্বন' বৃত্তির দ্বারা জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ উদ্‌বোধনই ছিল হিন্দুমেলার লক্ষ্য। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ গঠনমূলক। এই হিন্দুমেলাকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৮৬৮) উদ্‌বোধন হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত সংগীতটি দিয়ে—

মিলে সবে ভারতসন্তান
একতান মন-প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

"এটিই হল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত— বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' ও রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানের অগ্রদূত ও প্রেরণাস্থল।"

—প্রবোধচন্দ্র সেন : 'রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ', সাহিত্যসংখ্যা দেশ (১৩৭৪), পৃ ১১৯

এই জাতীয় মেলা সম্বন্ধে মনোমোহন বসু যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তার সারমর্ম হল এই—"ওই মেলার প্রচেষ্টায় স্বদেশক্ষেত্রে যে 'ঐক্যনামা মহাবীজ' রোপিত হবে তার থেকে উৎপন্ন বৃক্ষের 'সৌভাগ্যপুষ্প' বিকশিত হয়ে একদিন সমগ্র ভারতভূমিকে আমোদিত করবে।" এই বৃক্ষের ফলের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন—

"তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না। অপরদেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা!" নাম দিয়া তাহার অমৃতস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনও দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের

আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না।…অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"[১]

এর থেকে বোঝা অসম্ভব নয় যে, হিন্দুমেলার গঠনমূলক ও ঐক্যমূলক যে উদ্দেশ্য ছিল, তা স্বাধীনতালাভেরই পথপ্রদর্শক সে কথা মনোমোহনের মত মনস্বীও সেদিন নিঃসন্দেহচিত্তে আশা করেছিলেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই মনোমোহন রচনা করেছিলেন,—

দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে 'পরাধীন'।[২]
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অপমানে তবু ক্ষীণ॥

এর থেকে বেশ বোঝা যায়, বাঙালীর মনোজগতে তখন বিপ্লব ঘটেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তখন আর কবিকল্পনা বা স্বপ্নের বস্তু নয়, তা হয়ে উঠেছে সংকল্প ও সাধনার বস্তু। এর পূর্বের বাংলাসাহিত্যে— ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব যখন খুব বেশি, তখনও স্বদেশপ্রেমের সুর শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল প্রধানতঃ কবির কল্পনার বস্তু, সাধনার বস্তু হয়ে উঠতে পারে নি। তাই ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেমমূলক একটি কবিতায় দেখি, কবি বলেছেন, "এরূপ স্বপন যত, হয় কত মনোগত।" অর্থাৎ স্বাধীনতা তাঁর স্বপ্ন ও মনের কল্পনামাত্র। স্বাধীনতালাভ সম্বন্ধে তিনি স্থিরনিশ্চিত নন। তাই 'ফলে তাহা কবে হবে' বলে আক্ষেপ করেছেন মাত্র, দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারেন নি—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন, হবেই হবে।"

১ হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) মনোমোহনের বক্তৃতাংশ।

দ্রষ্টব্য : যোগেশচন্দ্র বাগল, 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' পৃ ১০-১১। এই উক্তি থেকে লক্ষণীয়— কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেশের 'স্বাধীনতা' লাভ সম্বন্ধে কোনো স্থির লক্ষ্যের প্রকাশ এই প্রথম ঘোষিত হল। এর আগে তা ছিল কবিকাকলি মাত্র। এর দীর্ঘকাল পরে ১৯২৯ সালের ৩১এ ডিসেম্বর জওহরলালের নেতৃত্বে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই জাতীয় আন্দোলনের চরমতম লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল এবং পরবর্তী ২৬এ জানুআরি তারিখটি ভারতবর্ষের সর্বত্র 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হল।

২

এই দৃপ্ততা দেখা দিল হিন্দুমেলা স্থাপনের সময় থেকে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্যতা দেখালেন ঠাকুরপরিবারের নবযুবকেরা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা। তাঁরা অনেকেই স্বদেশবোধের গান রচনা করতে লাগলেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত-সন্তান', গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে', দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' প্রভৃতি গানগুলি যে সেদিন একটি বালকের মনকেও ক্রমশঃ জাগিয়ে তুলছিল, তা বোধহয় কেউ লক্ষ করেন নি। তিনিই বালক রবীন্দ্রনাথ। হিন্দুমেলার এই স্বাজাত্যাভিমানের পরিবেশেই 'রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের উদ্বোধন ঘটে'। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনেই তার আদর্শ ও সত্যরূপের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। "হিন্দুমেলা স্থায়ী হয়েছিল চৌদ্দ বৎসর, তার শেষ অধিবেশন হয় ১৮৮১ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি বৎসর। অর্থাৎ বাল্যকাল থেকে যৌবনের উন্মেষকাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুমেলার প্রভাবাধীন ছিলেন। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, এই মেলার প্রেরণায় তাঁর কল্পনায়, চিন্তায় ও সংকল্পে ভারতীয় জাতীয়তার একটা সুপরিস্ফুট রূপ দূরপনেয় রূপেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।"

—'রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ', প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ ১২১

এই হিন্দুমেলার প্রেরণাতেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামক কবিতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন (১৮৭৫)। স্বনামে মুদ্রিত এই তাঁর প্রথম কবিতা। সম্প্রতি 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত' আরেকটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নাম 'হোক্ ভারতের জয়'। কবিতাটির শেষে স্বাক্ষর আছে 'র'। এছাড়া ভাবে-ভাষায় 'হিন্দুমেলায় উপহার' তথা ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্য গ্লানি অনুভব করে সেযুগে আরও যেসব কবিতা লিখেছিলেন তার কোনো কোনোটির সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তাই এই কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথই হিন্দুমেলার জন্য লিখেছিলেন বলে অনুমান করা হয়েছে।[৩] এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনা প্রসঙ্গে (৩য় অধ্যায়) বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

৩

বালক রবীন্দ্রনাথের মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্রে হিন্দুমেলার মতই স্থায়ী ফলপ্রসূ হয়েছিল আর একটি প্রতিষ্ঠান। তার নাম 'সঞ্জীবনী সভা'।

এই সভা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দুমেলার অতিবিস্তারের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সংগ্রামশীল ব্যাপক সঙ্ঘ রূপে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই রাজনারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিরা একটি সক্রিয় ক্ষুদ্র সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে নাম দিলেন সঞ্জীবনী সভা। এই সভা গঠনের সম্মুখে আরও একটি আদর্শ ছিল। ১৮৭১ সালে ইটালীর রাষ্ট্র-স্বাধীনতা ও ঐক্যলাভের জন্য যে আন্দোলন হয়, তা বাংলাদেশের শিক্ষিত মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। ইটালীর জাতীয় নায়ক ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি ছিলেন বাঙালীর কাছে আদর্শ নেতা। তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে ছিল 'কারবোনারি' নামে এক গুপ্তসভা। এই সমিতির দ্বারাই তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত। রাজনারায়ণ বসু সম্ভবতঃ সেই আদর্শেই অনুপ্রেরণা লাভ করে সঞ্জীবনী সভাকে একটি গুপ্তসভা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার মূল লক্ষ্য ছিল মন্ত্রগুপ্তি। এর সংকল্প ও কার্যকলাপ সমস্তই লিখিত হত একটি সাংকেতিক গুপ্ত ভাষায়। সে ভাষায় সঞ্জীবনী সভাকে বলা হত 'হাম্‌চুপামুহাফ্।' এই সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> "জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন। ঋক্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫

সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠানই ছিল রহস্যে আবৃত। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তাই বলেছেন,—

> "দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুরই প্রয়োজন ছিল না।"

—জী-স্মৃ, 'স্বাদেশিকতা'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে বলেছেন,—

> "ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নব দীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৬৭

এই সঞ্জীবনী সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল 'জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর' সকল প্রকার কার্য করা। কিন্তু তার আদর্শ ছিল প্রধানতঃ বৈপ্লবিক ও

২৪৯৭৮

সংগ্রামমূলক। যেদিন কোনো নূতন সভ্য দীক্ষা নিতে আসতেন, সেদিন সভাপতি রাজনারায়ণ লাল পট্টবস্ত্র পরিধান করতেন। টেবিলের উপর থাকত লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের পুঁথি, একটি কোষমুক্ত তরবারি আর দু'পাশে দু'টি মড়ার মাথার খুলি। তার চক্ষুকোটরে বসানো হোত দুটি প্রজ্বলিত মোমবাতি। মড়ার মাথা হল মৃতভারতের প্রতীক আর প্রদীপ্ত মোমবাতি ভারতের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার ও জ্ঞানচক্ষু ফোটাবার ইঙ্গিত। সভার কার্যকলাপ শুরু হত 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই বেদমন্ত্র দিয়ে। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বলেছেন,—

> "রাজনারায়ণ বসুর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার [দেবেন্দ্রনাথ] পুত্র যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই স্রোতে একেবারে গা ঢালিয়া দিলেন।"

—সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৪৯, ৪র্থ খণ্ড

সঞ্জীবনী সভার এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, ঐ সভায় একাধারে ক্ষত্রিয় আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য বেদমন্ত্রের আদর্শ— দুইই অনুসৃত হত। প্রকৃতপক্ষে, দেশের জন্য জ্ঞানবল ও বাহুবল উভয়েরই প্রয়োজন। নিছক বাহুবল অনেক ক্ষেত্রেই পশুবলের সমান। তাই তার সঙ্গে চাই জ্ঞানবল, চাই চিন্তাশক্তি। এই উভয়ের মিলনে যে শক্তি তাতেই মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। সঞ্জীবনী সভায় রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের শিক্ষা পেয়েছিলেন। তদুপরি তিনি পেয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসুর সাহচর্য, যিনি ছিলেন ইটালীর ম্যাট্‌সিনির আদর্শ-প্রণোদিত তৎকালীন বাংলাদেশের জাতীয় নেতা। আর তাঁরই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবল উদ্যমে বাঙালীর মনে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষসাধনের যে চেষ্টা করেছিলেন, তা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পাবার উপযোগী।

৪

এঁদেরই প্রভাবে ও সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকাল কেটেছিল। তার নিদর্শন রয়েছে তৎকালে রচিত তাঁর কবিতায়, সংগীতে। সেগুলির আলোচনা যথাযোগ্য স্থানে করা হবে। তবে এখানে এটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'হিন্দুমেলায় উপহার' (১৮৭৫) ও 'দিল্লি-দরবার' (১৮৭৭) কবিতায় এবং 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' ও 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গান দুটিতে সঞ্জীবনী সভার বর্ণনা ও 'আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়েছে এবং স্থানে স্থানে ধ্বনিত হয়েছে ঐ সভায় উচ্চারিত সংকল্পবাণী।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ, দেশপ্রেম ও ভারতচিন্তা সর্বজনবিদিত। পরিণত

বয়সে তিনি এ সম্বন্ধে এত কথা বলেছেন, এত গান লিখেছেন যে তা একটি পৃথক্ গবেষণার বিষয় হতে পারে। এই স্বাদেশিকতারই প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার প্রভাবে, সেটিই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ভারতচিন্তা ও স্বদেশকর্মের আদর্শ সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় ভূমিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

সঞ্জীবনী সভার দৃঢ়তা, ঐক্যবোধ ও সশস্ত্র সংগ্রামনীতিতে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন বিশ্বাসী ছিলেন। পরিণত বয়সে এই আদর্শকে তিনি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত আকারে গ্রহণ করেন। সংগ্রামনীতিতে তিনি আস্থা হারালেন না। তবে একতা, আত্মশক্তি ও মনোবল সম্বল করে তিনি নিরস্ত্র সংগ্রামকেই জাতীয় মুক্তিসাধনের অন্যতম প্রধান উপায় বলে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর এই আদর্শ সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের (১৩১৬ বৈশাখ) ধনঞ্জয় চরিত্রে। আর তাকে স্ফুটতর ও পূর্ণতর-রূপে উপস্থাপিত করলেন পরবর্তী কালে 'মুক্তধারা' নাটকের (১৩২৯ বৈশাখ) ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে।[৪] বস্তুতঃ সঞ্জীবনী সভার সংগ্রাম-নীতিকে রবীন্দ্রনাথ কখনই ত্যাগ করেন নি। তবে প্রয়োজনভেদে কখনও নিরস্ত্র সংগ্রাম আবার কখনও বা সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। একসময়ে তাঁর বাণী ছিল 'বিনা অস্ত্রে বিনা সহায় লড়তে হবে' এবং এই সংগ্রামকে সমর্থন করে বলেছেন, নিরস্ত্র সংগ্রামে যে প্রাণ দেয় সে 'মৃত্যুঞ্জয়' (পুনশ্চ, 'শিশুতীর্থ', ১৩৩৮ শ্রাবণ)। এ বিষয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণের মধ্যেও সার্থকতা আছে সে কথাও কবি চিরদিনই স্মরণ রেখে-ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য যিনি সশস্ত্র সংগ্রাম করেন তিনিও 'মৃত্যুঞ্জয়'। তার দৃষ্টান্তও আছে তাঁর কবিতায়।—

"লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।"

—'পত্রপুট', পনেরো (১৩৪৩ বৈশাখ)

৪ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— দেবীপদ ভট্টাচার্য: 'রবীন্দ্রচর্চা' (১৯৭৩), পৃ ১৯২-৯৪

এ প্রসঙ্গে তাঁর 'এখন আর দেরী নয়' গানটিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। দেশোদ্ধারের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে ঐ গানে তিনি বলেন, 'আন্ গো বলির খড়্গ' ('ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশিত সংস্করণ, ১৩১২ ফাল্গুন), অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র ব্যবহারের উৎসাহও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের নিরস্ত্র আইনের জন্য ঐ পঙ্‌ক্তি পরে বর্জিত হয়। তিনি তখন বলেন, 'আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর গো'। গীতবিতানে ঐ পাঠই গৃহীত হয়েছে। যাই হোক, এই কারণেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও সংগ্রামকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এইসব বীর্যবত্তাসূচক চিন্তাধারায় বাল্যের হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভা তথা পারিবারিক স্বদেশচিন্তা সুদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল।

হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার আর একটি আদর্শ ছিল স্বাবলম্বন। সমষ্টিগত স্বাবলম্বন সাধনার জন্য চাই একতা ও সমবায়। রবীন্দ্রনাথ এই একতা ও সমবায়নীতিকে স্বদেশসাধনার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশবিষয়ক সমস্ত রচনা ও কর্মেই তার পরিচয় আছে। তাঁর 'আত্মশক্তি' [সমূহ] 'পল্লীপ্রকৃতি' ও 'সমবায়নীতি' গ্রন্থত্রয় রচনা এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পল্লীসংগঠন, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মেলা গঠন ইত্যাদি সর্ব কর্মসাধনারই মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী শিল্প, স্বাবলম্বন ও সমবায়নীতির চর্চা করা। এ বিষয়ে তিনি হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার অনুষ্ঠাতাদের, বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বসুর কাছে প্রাথমিক প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ঐক্য ও সমবায় সাধনাই ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনা। এই সাধনার পথ হল 'ভারতপথ'। যুগে যুগে মনীষীরা তাকেই যুগোচিত রূপ দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ভারতের এই চিরন্তন মহাপথেরই মহাপথিক। 'সর্বমানবের সমন্বয়সাধনের ভারতীয় আদর্শকে তিনি বাণী দিয়েছেন' তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায়। ওই কবিতায় ভারতের চিরন্তন মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে গেছেন,—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, ঐক্য ও সমবায়ের সাধনাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি মূল প্রেরণা। তাঁর ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি এই বোধই তাঁকে ছেলেবেলা থেকে জাগ্রত করে তুলেছে। একেই তিনি ধর্মীয় রূপ দিয়ে 'কবির ধর্ম' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর সেই চিন্তাই তাঁর জীবনে নবরূপ পেয়েছে স্বাদেশিকতার সাধনায়।

(৩) শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ছড়া ও রূপকথা রাজ্যের অপরূপ গল্প শুনে। রবীন্দ্রনাথেরও ছেলেবেলায় নানাধরনের ছড়া শুনে অনেক সন্ধ্যা কেটেছিল। এইসব ছড়া-পাঁচালি-রাজ্যের প্রধান সঙ্গী ছিল বাড়ির ভৃত্যরা। পরিণত বয়সেও অতি শৈশবের যেসব স্মৃতি কবির মনে অঙ্কিত ছিল, তার মধ্যে অন্যতম এই ছড়ার রাজ্যে বিচরণ এবং সেই সঙ্গে বাড়ির ভৃত্য ঈশ্বর বা ব্রজেশ্বর, খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জে এবং তাঁর পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্জের কথা।

তাঁদের বাড়ীতে ভৃত্য ছিল অনেক। তাদের মধ্যে ঈশ্বরের স্মৃতিই ছিল তাঁর মনে সবচেয়ে স্পষ্ট। এই ভৃত্যটি সম্বন্ধে তিনি 'ছেলেবেলা' (৩য় অধ্যায়) এবং 'জীবনস্মৃতি' (ভৃত্যরাজকতন্ত্র) গ্রন্থদ্বয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মূলতঃ একই প্রকার। কিন্তু 'ছেলেবেলা'য় তিনি তার নাম বলেছেন 'ব্রজেশ্বর' এবং 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন 'ঈশ্বর'। অথচ, দুই গ্রন্থে এই দুই ব্যক্তির স্বভাবের যে পরিচয় পাই তাতে মনে হয় এরা একই ব্যক্তি, দুই গ্রন্থে দুই নামে উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র।

এই ঈশ্বর পূর্বে গ্রামে 'গুরুমশায়গিরি' করত। তাই সে-ই এই পরিবারে এসেও সন্ধ্যেবেলা বালকদের 'সংযত' রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়ত, আর শোনাত চাণক্যশ্লোক। যেদিন থাকত লব-কুশের পালা শোনার দিন, সেদিন বালকদের উত্তেজনা হয়ে উঠত অপ্রতিরোধ্য।

> "সেই পড়ার মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্জে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর-সমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা—'ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ্ ঘটেছে বিলক্ষণ।' তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক্ঝক্ করছে। গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে। পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ।" —'ছেলেবেলা', অধ্যায় ৩

স্বভাবতঃই শব্দ ও ছন্দ-সচেতন বালকের চিত্ত সেই মিলের তানে ঝংকৃত হয়ে উঠত। 'জীবনস্মৃতি'তে তাই তিনি বলেছেন,—

"পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

—জী-স্মৃ, 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র'

এই স্মৃতিটির ছবি কবি এঁকেছেন 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের 'বালক' কবিতায়। 'ছেলেবেলা'র মুখবন্ধেও সেটি মুদ্রিত হয়। তার একটি অংশ নিম্নরূপ,—

কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া;
মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

বিদ্যালয়-বিমুখ এই স্বভাবকবি তখন থেকেই যে নিজেকে বন্ধনহীন বিশ্বের মাঝে মুক্ত করে দেবার স্বপ্ন দেখতেন, তার ক্ষুদ্র রূপটি এই অংশের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভারী রসিক ব্যক্তির কথা বলেছেন। তিনি কৈলাস মুখুজ্জে। এই ব্যক্তিও অতি দ্রুতবেগে একটি ছড়া বলে শিশুকবির মনোরঞ্জন করতেন। এই ছড়ার নায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং এক ভাবী নায়িকার আগমনের ছবি তাতে অতি উজ্জ্বল রঙে অঙ্কিত ছিল। এই ছড়াটিও কবির মনকে চঞ্চল করত। কিন্তু তা সেই ছবির বর্ণনার জন্য নয়, তার 'দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা'র জন্য। এখানে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত কৈলাস মুখুজ্জে ও কিশোরী চাটুজ্জে নামক দুই পৃথক্ ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দুই ব্যক্তিকে একই সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। তিনি কিশোরী চাটুজ্জের গুণগুলি আরোপ করেছেন কৈলাস মুখুজ্জের উপরে।[৫]

এইসব ছড়া-পাঁচালি শুনে শুনে সেই শিশুবয়স থেকেই কবির মন ছন্দ-

৫ র-জী, পৃ ২৮-২৯

সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিল। কবিতা ও ছন্দ রচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পরে (৩য় ও ৮ম অধ্যায়ে) বিস্তৃততর আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কল্পনাপ্রিয় ও ভাবপ্রবণ শিশুর মনে এইসব ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার কাহিনী যে তরঙ্গ সৃষ্টি করত তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বারে বারে শোনা গেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। পরবর্তী কালে তিনি যে অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের ছড়া ও ছন্দ রচনায় অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যসাধন করেছিলেন, তা এই শৈশবেরই অপ্রত্যক্ষ ফল বললে বোধহয় ভুল হবে না।

২

এই ছড়ার রাজ্যে বিচরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবির অক্ষরপরিচয়ও শুরু হল। এর প্রধান মাধ্যম ছিল মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ (১৮৪৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ (১৮৫৫), 'বোধোদয়' প্রভৃতি সে যুগের সর্বজনবিদিত শিশুপাঠ্য বইগুলি। তার অল্পদিনের মধ্যেই 'কান্নার জোরে' তাঁর স্কুলে পড়ার জীবনও শুরু হল। তখন সম্ভবতঃ তাঁর বয়স চার বৎসর।[৬] এই স্কুলে পড়ার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নানা জায়গাতেই বলেছেন। তাই এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ইস্কুলের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর কাছে বড়ই ক্লান্তিকর; তাতে আকর্ষণের কোনো কারণই কবি খুঁজে পেতেন না। বরঞ্চ, তাঁর বাড়ির অভিজ্ঞতা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মনের অনুকূল। মাত্র সাত-আট বৎসর বয়সে ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ তাঁকে পয়ার ছন্দের নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে কবিতা-রচনার যে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতেই শুরু হয়েছিল কবির প্রথম কবিতা রচনার প্রচেষ্টা। কবিতা ও ছন্দ রচনার ইতিহাসে এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি চিরদিন স্মরণ রেখেছিলেন।

ইস্কুলে পড়ার যুগেই সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বালকদের জন্য বাড়িতে করেছিলেন 'নানা বিদ্যার আয়োজন।' ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতরকম বিদ্যা-শিক্ষা যে করতে হত তার বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রই জানেন। এর ফললাভ একদিকে হয়েছিল এই যে, "তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে" (ছেলেবেলা, অধ্যায় ৭); আর একদিকে, নানা বিদ্যার নানা অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিল অনেকখানি। তাঁর সাহিত্য ও কর্ম জীবনের পদে পদে রয়ে গেছে তার বহু দৃষ্টান্ত। বিশেষতঃ, বিজ্ঞান বা

৬ দ্রষ্টব্য: প্রবোধচন্দ্র সেন: 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়', বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

কৃষিবিদ্যা বিষয়ে তিনি যেসব রচনা ও কীর্তি রেখে গেছেন, তা তাঁর বাল্য-অভিজ্ঞতারই পরিণত রূপ বললে অসমীচীন হবে না। অপরপক্ষে, স্কুলজীবনের বিষাদময় যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'তোতাকাহিনী' জাতীয় প্রবন্ধ রচনা ও শান্তিনিকেতনের মতো মুক্তবিদ্যালয় গঠন করেছিলেন, এ ধারণাও হয়তো ভুল নয়।

প্রকৃতপক্ষে, ইস্কুলেই হোক বা গৃহেই হোক, কোনো শিক্ষকই তাঁকে নির্দিষ্ট নিয়মে কোনোদিন বাঁধতে পারেন নি। বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের প্রতি তাঁর বিরূপতার কারণ তিনি নিজেই নির্দেশ করেছিলেন,—

> "I neglected my studies because they rudely summoned me away from the world around me, which was my friend and my companion and when I was thirteen I freed myself from the clutch of an educational system that tried to keep me imprisoned within the stone-walls of lessons."
>
> —The Religion of an Artist

কিন্তু যেখানে কবি বাঁধনছাড়া, আপনমনের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া, সেখানে তিনি নানা পত্রিকা, নানা গ্রন্থ এবং নানা জনের কাছ থেকে উজাড় করে জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং নিজেও লিখে চলেছেন অবাধ গতিতে, স্বাধীন মনে। তার প্রমাণও পেয়েছি তাঁর জীবনের পদে পদে।

৩

কবি তাঁর স্কুলে পড়ার যুগেই [প্রধানতঃ নর্মাল স্কুল] একটি নীল কাগজের খাতা যোগাড় করে তাতে কবিতা লিখতে থাকেন। এরপরেই এল তাঁর বোলপুর-শান্তিনিকেতন হয়ে পিতার সঙ্গে হিমালয়-যাত্রার পালা। কবি এই সময়েই প্রাণভরে দেখলেন প্রকৃতিকে, রূপ দিতে চাইলেন তাকে আপন মনের মাধুর্যে। এই সময়েই তিনি বোলপুরে বসে লিখেছিলেন 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে 'বীররসাত্মক কাব্য'— যার কোনো চিহ্ন আজ আর পাওয়া যায় না। এরপর তিনি অমৃতসর ও হিমালয়ে গিয়ে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করলেন আরও নিবিড় রূপে। এই সময়ে তাঁর পিতৃদেবের সাহচর্যও তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের সীমাকে করল অনেক দীর্ঘায়ত। পিতার নিকট জ্যোতির্বিদ্যাশিক্ষা, গান গাওয়া, ইংরেজী পড়া, সংস্কৃত পড়া সকল বিষয়েই তিনি পেতেন এক

তৃপ্তিজনক আনন্দ। কারণ, "তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না।"

—জী-স্মৃ, 'হিমালয়-যাত্রা'

স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষার এখানেই ছিল পার্থক্য। শিশুদের শিক্ষায় তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, এ বিষয়ে তিনি সতর্ক থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে, শিশু রবীন্দ্রনাথের উৎসুক হৃদয় ছিল এই জাতীয় শিক্ষালাভের জন্যই আগ্রহী।

হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরেই তাঁর স্কুলের পড়া চিরতরে সমাপ্ত হল। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য কোনোক্রমেই তাঁকে বাঁধতে না পেরে 'কুমারসম্ভব' ও 'ম্যাক্‌বেথ' অনুবাদ করে পড়াতে লাগলেন এবং তাঁকে দিয়ে তা তর্জমাও করাতেন। কিন্তু বাঁধাধরা পাঠ্য-তালিকার মধ্যে আবদ্ধ হতভাগ্য বালকের অপাঠ্য বইএর প্রতি টানই ছিল প্রবল। সেযুগে যদিও 'বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল', তবুও তিনি যে কয়টি বই বা পত্রিকা হাতে পেতেন, তার কোনোটিই না পড়ে ছাড়তেন না। এর মধ্যে মৎস্য নারীর কথা, সুশীলার উপাখ্যান, রবিন্‌সন্ ক্রুসোর কথা এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' প্রহসন উল্লেখযোগ্য।

আর বাংলা মাসিক পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'বিবিধার্থসংগ্রহ' নামে ছবিওয়ালা একটি পত্রিকা। হেমেন্দ্রনাথের আলমারী থেকে তারই একটি বাঁধানো-সংগ্রহ যোগাড় করে মনোযোগ সহকারে সেটি তিনি 'বারবার' পাঠ করতেন। অপরদিকে, দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারীতে তিনি পেয়েছিলেন 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা। এ সম্বন্ধে কবি বলেছেন,—

> "এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল।...এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।"

—জী-স্মৃ, 'ঘরের পড়া'

"এই পৌলবর্জিনীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার মধ্যে অস্পষ্ট নহে", অপরপক্ষে, "পৌলবর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, 'বিহারীলালের কাব্যের সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত' হইয়া তাঁহার কবিতাকেই কাব্যাদর্শ করিয়া লইলেন।" —র-জী, পৃ ৩৫

এইসব পত্রিকা যখন পড়ছেন, তখন তাঁর বয়স নয়-দশ বৎসর বলেই অনুমান করা হয়। কিন্তু তখন থেকেই তাঁর স্বাভাবিক সাহিত্যরসবোধ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। আর একটু বড় বয়সে (১১) তাঁর হাতে এসে পড়ল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এক বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিল—"বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুরবেলা কারও ঘুম থাকত না" (ছেলেবেলা, অধ্যায় ১২)। কারণ, "সেযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিবিধ রচনাসম্ভারে উহা পূর্ণ থাকিত।" বালককবিও এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর পাঠের সীমা বাড়িয়ে দিলেন আরও অনেকখানি। এইসময়েই সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' (১৮৭৪-৭৬) রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি 'লোভের সামগ্রী' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এর মাধ্যমেই তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, স্কুলের বিধিবদ্ধ পাঠ্যব্যবস্থায় বিতৃষ্ণা থাকলেও তাঁর প্রকৃত বিদ্যার পরিধি ছিল অনেক প্রসারিত ও স্বাভাবিক। আসলে রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, স্বশিক্ষাই জীবনে সবচেয়ে সুশিক্ষা। এই শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কম ছিল না। তাই তার ফল পেতেও বিলম্ব হল না। এর অল্পদিনের মধ্যেই ১৮৭৪ সালে কবির দুটি কবিতা 'ভারতভূমি' ও 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয়, যদিও স্বনামে নয়। এইভাবে একদিকে তাঁর জ্ঞানাহরণ এবং অপরদিকে আত্মপ্রকাশ শুরু হয়ে গেল পূর্ণোদ্যমে। এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি পুরোপুরি উৎসাহ ও সাহচর্য পেতে লাগলেন বাড়ীর আত্মীয়স্বজন ও সমকালীন সাহিত্যিকদের কাছ থেকে এবং নানা সাহিত্যিক অধিবেশন ও পত্রপত্রিকার মারফত।

৪

সে যুগে ঠাকুরবাড়ি ছিল বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সেই আবহাওয়া পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাড়ির এই আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল একটি মূল্যবান্ উপহারের মত।—

> "Most of the members of my family had some gift— some were artists, some poets, some musicians and the whole atmosphere of our home was permeated with the spirit of creation."
>
> —**The Religion of an Artist**

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁদের সকলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার অনবদ্য বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখি না। তবুও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব ও দার্শনিকচিন্তা, গণদাদার ইতিহাস, নাটক, সঙ্গীতচর্চা ও সমাজচিন্তা এবং গুণদাদার মনের বিরাট্ ঔদার্য বালক রবীন্দ্রনাথকে বিস্ময়ে মুগ্ধ তথা সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করতে যে অপরিসীম প্রেরণা জাগিয়েছিল সেটুকু উল্লেখ করা এখানে অবাঞ্ছিত নয়।

তবে, 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়' জ্যোতিদাদাই ছিলেন তাঁর 'প্রধান সহায়'। কবি বলেছেন,—

"তিনি আমাকে খুব একটা বড়োরকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।…প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে-সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।…জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর ভিতর দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।"

—জী-স্মৃ, গীতচর্চা'

সংগীত রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য কিভাবে গ্রহণ করতেন তার বর্ণনা উভয় ভ্রাতাই দিয়েছেন আপন আপন স্মৃতিগ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'কথা'গুলিকে নিজের দেওয়া সুরে বেঁধে রাখতে তথা জ্যেষ্ঠ হয়েও কনিষ্ঠভ্রাতাকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিজের নাটকে প্রয়োগ করতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনো দ্বিধা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা কম বড় প্রাপ্তি ছিল না। শুধু সংগীত নয়, নাট্যরচনা ও অভিনয়, সাহিত্যচর্চা, স্বাদেশিকতা, শিকার, পত্রিকা পরিচালনা— সর্ববিষয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী রূপে গ্রহণ করে তাঁর জীবনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন।

শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথই নন, তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ভগ্নী স্বর্ণকুমারী— এঁদের সকলের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বিকশিত করে তুলতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছিল। ঠাকুর পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র (১৮৭৫) কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে। স্বপ্নপ্রয়াণে কবি অতি সুকৌশলে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন,—

"ভাতে যথা সত্য-হেম মাতে যথা বীর
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।"

—বিলাসপুর-প্রয়াণ

এই পঙ্‌ক্তিগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবর্তে যদি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, তাহলেও কোনো ত্রুটি হবে না। 'হেম-জ্যোতি' পূর্ণ 'দেব-নিকেতনে' জন্মগ্রহণ করার ফলেই যে তাঁর জীবন ও সাহিত্য অনেকখানি বিকশিত ও সার্থক হয়ে উঠেছিল এ কথা তিনি বারেবারেই নানা জায়গায় বলেছেন।

ঠাকুরপরিবারের বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চার ফলে দেশের জ্ঞানীগুণী সকলেই সমাদৃত হতেন এই বাড়িতে। তার ফলে কিশোরকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করেন এবং তাঁদের উৎসাহে নিজেকে চিনতে, জানতে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই অক্ষয়চন্দ্রের অধিকার ছিল সমান। সংগীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগের সীমা ছিল না। আসলে, সর্ববিষয়েই "আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল।" এই অক্ষয়চন্দ্রের কাছেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তথা বিচিত্র বিষয় নিয়ে 'তর্কবিতর্ক', 'আলোচনা-সমালোচনা'র সুযোগ হয়েছিল। বস্তুতঃ,—

"সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

—জী-স্মৃ, 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী'

অপরপক্ষে, বিহারীলালের কাব্য রবীন্দ্রনাথের মনকে কত আকর্ষণ করত, সে-সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। 'আর্যদর্শনে' বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' পড়ে (১৮৭৪) সে বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। তাই সেই সময় থেকেই বিহারীলালের মত কবি হবার একটা আশা তিনি মনে পোষণ করতেন।

নানা জনের সঙ্গে পরিচয় ও নানা জাতের জ্ঞানলাভের সুযোগ কবির মিলেছিল আরও একটি উপায়ে। তাঁদের বাড়িতে মাঝেমাঝে সাহিত্যসম্মেলন হত। এইসব সম্মেলনে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর দেখাশোনা ও ভাবের আদানপ্রদান চলত। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে 'বিদ্বজ্জন-

'সমাগম' নামে এইরকম একটি সম্মিলনী হত (প্রথম অধিবেশন, ১৮৭৪)। এই সমাগমে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীরা নিমন্ত্রিত হতেন এবং গীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় কবিতা-প্রবন্ধাদি পাঠ ইত্যাদির অনুষ্ঠান হত। রবীন্দ্রনাথও এই সভার সদস্য হবার সুযোগ পেয়েছিলেন অতি অল্পবয়স থেকেই। তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' নাট্যদ্বয়ের প্রথম অভিনয়ও হয়েছিল এই সম্মেলন উপলক্ষ্যেই।

'ভারতী' প্রকাশের পর 'সারস্বত-সমাজ' (প্রথম অধিবেশন, ১৮৮২) নামে অনুরূপ আর একটি সম্মেলনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই 'সমাজে'র স্থিতিকাল খুব দীর্ঘ হয় নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন তার সভাপতি।

এইভাবে নানা জনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং নানা পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনের পটভূমিকাটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। একে অবলম্বন করেই 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার যুগ থেকে (১৮৭২) গদ্য-পদ্য-নির্বিশেষে কবির সাহিত্য প্রকাশ শুরু হল পূর্ণোদ্যমে। তা আরও গভীর, ব্যাপক ও বিস্তৃত হল 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ (১৮৭৭) ও বিলাত-যাত্রার পর ((১৮৭৮)। সে সম্বন্ধে এরপরেই আলোচনা করা যাবে।

পরিশেষে এ কথাই বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ আসলে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা তাঁর স্বোপার্জিত। তাই তা ছিল এত গভীর, এত প্রশস্ত, এত সক্রিয় ও প্রেরণাজাত। কোনো বাইরের বাধা তাকে রোধ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রেই বলেছেন, তিনি স্কুল-পালানো ছেলে, তাই তাঁর শিক্ষা লাভ হয় নি। কিন্তু সে শিক্ষা যে রবীন্দ্রনাথের মত সপ্রতিভায় মহিমোজ্জ্বল ছাত্রের পক্ষে ছিল দুর্বল ও ভিত্তিহীন তা এই আলোচনা থেকেই পরিস্ফুট হবে। আপন অন্তর থেকে সৃষ্টিশীল যে শিক্ষা তা না লাভ করলে রবীন্দ্রনাথের এত বড় সাহিত্যজীবন গড়ে উঠতে পারত কি না সন্দেহ। তাঁর আপন-অর্জিত শিক্ষাই ছিল তাঁর পক্ষে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অতুলনীয়। এই শিক্ষাই মানুষকে পূর্ণবিকশিত করে তোলে। এই পূর্ণবিকশিত মনুষ্যত্বেরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তাঁর দীর্ঘস্থায়ী জীবনের কর্মে ও সাহিত্যে, এ কথাটিই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

(৪) ভারতী পত্রিকা ও বিলাতবাস

ভারতী পত্রিকার প্রকাশ ও বিলাতগমন রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জীবনগঠনকে করেছিল আরও অনেক প্রসারিত সে কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে

উল্লেখ করা হয়েছে। 'ভারতী' প্রকাশের পূর্বে তখন বাংলাদেশে কোনো সুপ্রচলিত ও সুবিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা ছিল না। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' মাত্র চারবৎসর (১৮৭২-৭৬) চলে বন্ধ হয়ে যায়। 'তত্ত্ববোধিনী' ছিল প্রধানতঃ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা। তাই ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকেই একটি নূতন পত্রিকা সম্পাদনের আগ্রহ দেখা দিল। শেষপর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একান্ত আগ্রহে ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশ হল 'ভারতী' (১৮৭৭)। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার নাম দিতে চেয়েছিলেন 'সুপ্রভাত'। অবশেষে, অপর সকলের অনুমোদনক্রমে তার নাম হল 'ভারতী'। প্রকৃতপক্ষে, ভারতী ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানসকন্যা'। ফলে স্বভাবতঃই তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি এই পত্রিকা পরিচালনা তথা সাহিত্যরচনায় একটি প্রধান স্থান লাভ করলেন।

সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে একটি স্থান লাভ করার ফলে রবীন্দ্রনাথকেই পত্রিকার রচনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক মহলে ঘোরাঘুরি করতে হত। ফলে বিচিত্র সাহিত্যিক ও তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হল প্রশস্ততর। অপরদিকে, পারিবারিক পত্রিকা বলে তাঁর নিজের লেখাও প্রকাশিত হবার সুযোগ হল অনেক বেশি। তাই ভারতীর প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর উৎসাহ পূর্ণ ফলপ্রসূ রূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। একই সঙ্গে কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, ছোটগল্প অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে উঠল। এক-কথায় বলা যায়, 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রসাহিত্যের 'প্রভাতকাল' দেখা দিল। পরবর্তী চারবৎসরে এই রচনার সীমা আরও অনেকখানি প্রসারিত হয়। তার কোনোটি পরবর্তী কালে গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে, কোনোটি হয়েছে বর্জিত। 'পরিশেষ' বিভাগে যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে তার থেকেই পাঠক ভারতীতে কবির আত্মপ্রকাশের পরিমাণ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারবেন। কবি নিজে পরিণত বয়সে এই 'কাঁচা বয়সে অল্প সম্বলে' রচিত 'অদ্ভুত কীর্তি'মালার অধিকাংশই বর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও যে অল্পবয়সের 'উৎসাহ' তথা পরিণত রচনার প্রথম অঙ্কুর নিহিত ছিল, সে কথা পাঠকবর্গ বা লেখক নিজেও অস্বীকার করতে পারেন নি।

ভারতী পত্রিকা স্থায়ী হয়েছিল পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি। ফলে একে অবলম্বন করে রবীন্দ্রসাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল অতি সহজেই। শেষ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা ভারও গ্রহণ করেন (১৩০৫)। তখন রবীন্দ্রসাহিত্যের চরম বিকাশের কাল। তখনও দেখি ভারতীতে তাঁর মননশীল চিন্তাধারা এগিয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সম্পাদক ও সাহিত্যিক রূপে

তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাই এই সিদ্ধান্ত করা অবাঞ্ছনীয় নয় যে, 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের দান ও রবীন্দ্রজীবনে ভারতীর দান— উভয়েই ছিল উভয়ের পরিপূরক। রবীন্দ্রজীবনের পরিপূর্ণতায় এই পর্বটি তাই একটি পৃথক্ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

২

কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে শৈশব থেকে ভারতী প্রকাশ পর্যন্ত কবি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভের যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাই গভীরতর, প্রশস্ততর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিল বহির্বিশ্বে অবতরণের পর, তাঁর বিলাত-প্রবাসের পর্বে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর-১৮৮০ ফেব্রুআরি)। বিলাতযাত্রার পথে আমেদাবাদ ও বোম্বাইএ তিনি থেকেছিলেন কয়েকমাস তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। পরিবারের আত্মীয়দের উদ্দেশ্য ছিল বিলাত যাবার জন্য ইংরেজি কথাবার্তা ও আদবকায়দা শেখার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করানো। রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগটিকে গ্রহণ করলেন আরও পূর্ণরূপে। তাঁর স্বোপার্জিত শিক্ষার সীমাকে তিনি দেশকাল নির্বিশেষে বহুদূর বিস্তৃত করে দিলেন। তার নিখুঁত বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি' তে ('আমেদাবাদ' অধ্যায়)। মেজদাদার বিরাট লাইব্রেরিতে কত বই তিনি পেলেন হাতের কাছে। কি ভারতীয়, কি বিদেশী সাহিত্য তিনি পড়তে লাগলেন অপরিসীম আনন্দে, স্বাধীন ইচ্ছায়। এই যে পড়ার স্বাধীনতা ও জ্ঞানের বিস্তার তা তাঁর চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিল অনেকখানি। গদ্যপদ্য নির্বিশেষে তাঁর অজস্র লেখাও প্রকাশিত হতে লাগল ভারতীর পাতায় পাতায়। দান্তে, পেত্রার্ক, গ্যেটে প্রমুখ সাহিত্যিকরা তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের কবিতানুবাদসহ তিনি তাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন। আর লিখলেন চীনের, জাপানের, ফরাসীদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও সমস্যার কথা। তাদের সাহিত্যের বিচার ও অনুবাদ করতেও তিনি বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেলেন। এইভাবে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, তাঁর বিশ্বের সঙ্গে সাক্ষাত পরিচয়লাভের ভূমিকা রচনা করল।

আমেদাবাদের পরে বোম্বাইবাসের পর্বে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু-কন্যা আন্না তড়্খড়ের সঙ্গে পরিচয়। মানুষের হৃদয় যে 'হৃদয়ের দখলের সীমানা' কত বড়ো করে দিয়ে যেতে পারে তার সুন্দর বর্ণনা 'ছেলেবেলা'তেই (অধ্যায় ১৩) কবি দিয়েছেন। এই তরুণীটি

ছিলেন রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যবিকাশের অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী। ইনিই 'রবীন্দ্রকাব্যে প্রভাত-রবির নলিনী।'

—রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, সজনীকান্ত দাস, পৃ ২৪৫

৩

এই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের পরিচয় তথা সাহিত্য, সমাজ, ভাষা প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাপকতর পরিচয় ঘটল বিলাত যাবার পর। পথেই শুরু হল তাঁর নানা অভিজ্ঞতা এবং পত্রাকারে সেগুলিকে 'য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' রূপে পাঠাতে লাগলেন ভারতী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য।

বিলাতে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন পালিত। কবি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—

"বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত। আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল।··· সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে।·· লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই।··· আমাদের কাব্যালোচনা ও সঙ্গীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে শুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে-সঙ্গেই অবসান হইয়াছে।"

—জী-স্মৃ. 'লোকেন পালিত'

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেন্‌রি মর্লির (১৮২২-৯৪) সাহচর্য ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি মূল্যবান্ পুরস্কারের ন্যায়। অধ্যাপক হেন্‌রির অধ্যাপনা-প্রণালী রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করে।

"সাহিত্য যে ভাষাশিক্ষার যন্ত্রমাত্র নহে, তাহা যে মুখ্যত অন্তর দিয়া রসসম্ভোগের বিষয়, তাহা তিনি ইঁহার অধ্যাপনা হইতে অনুভব করিলেন।"[৭]

—র-জী, পৃ ৯২

লণ্ডনে কবি ইংরেজির সঙ্গে একাধারে ল্যাটিনও শিখেছিলেন। শুধু ভাষা বা সাহিত্য নয়, বিলাতি সংগীত, নাট্যাদর্শ ও অভিনয় এই সকল বিষয়েই

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি খুলে গেল— তিনি আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের দেশের একটা বিরাট্ পার্থক্য অনুভব করলেন। এরই অব্যবহিত ফলস্বরূপ দেশে ফিরে অভিনব সংগীতরচনা ও নাট্যাভিনয়ে তিনি অভূতপূর্ব নবীনতা আরোপ করলেন। হেন্‌রি মর্লি ছাড়া বিলাতে আরও দু'জন মনীষী কবির মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন জন্ ব্রাইট্ (১৮১১-৮৯) এবং গ্লাড্‌স্টোন্ (১৮০৯-৯৮)। ব্রাইটের সৌম্য শান্ত চেহারা ও গ্লাড্‌স্টোনের বক্তৃতা কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

বিলাতে বাসকালে ডাক্তার স্কট্ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কবির পরিচয় ও আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা কতখানি হয়েছিল তার দীর্ঘ বর্ণনা আছে জীবনস্মৃতিতে। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে কবি অনুভব করেছিলেন মানুষে মানুষে আকর্ষণ এবং পিতৃস্নেহ, পুত্রস্নেহ, মাতৃস্নেহ বা ভ্রাতা-ভগিনীতে যে সম্পর্ক তা কোনো দেশ-কালের অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবতঃ তাঁর এই অনুভূতির প্রতিফলনই দেখা যায় পরবর্তী কালে রচিত 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে। স্কট্ পরিবারে এসে মিসেস্ স্কটের পতিভক্তি দেখে কবি সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন।—

> "এই পরিবারে বাস করিয়া আমি একটা জিনিস লক্ষ করিয়াছি— মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে; য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই।"
>
> —জী-স্মৃ. 'বিলাত'

এইভাবে বিলাতে গিয়েও নানা জনের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে কবি এক-একটি নূতন সত্য অনুভব করতে লাগলেন, বিচার করতে শিখলেন সমাজ-ব্যবস্থাকে— এগুলিও তাঁর শিক্ষালাভের পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। নানা ভাষাশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে এই অনুভবের শিক্ষাও কবির জীবনে কম লাভজনক হয়নি।

বিলাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিশেষতঃ স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ। মেয়েপুরুষের একত্রে অবাধ মেলামেশা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ইত্যাদি সবই ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে 'অভাবনীয় মুক্তি'। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের স্বাভাবিকতাকে তিনি সেখানে পেয়েছিলেন পরিপূর্ণরূপে। 'পাশ্চাত্ত্য জগতের গতিশীল জীবনের প্রচণ্ডতা মুক্তজীবনের সহজ স্বাধীনতা' তাঁর 'অনভিজ্ঞ তরুণ জীবনের

বহু সংস্কারের মূলে' আঘাত হেনেছিল। কলকাতার সমাজজীবনের সংকীর্ণতা তথা বৈচিত্র্যহীনতা তাঁর কাছে নিতান্তই নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল।[৮]

এই বিচিত্র শিক্ষা, চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা কবির দৃষ্টিভঙ্গীকে করল অনেকখানি প্রসারিত এবং য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রশ্রেণীতে নবীন দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে চাইলেন। অপরপক্ষে, সম্পাদক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন প্রাচীনপন্থী দার্শনিক। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে চলল প্রচুর তর্ক-বিতর্ক। এর ফললাভ যাই হোক না কেন, নবীন লেখকের লেখনীর ক্ষমতা গেল অনেকখানি বেড়ে। তা হয়ে উঠল ক্রমশঃ যুক্তিপূর্ণ ও শাণিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতাও কনিষ্ঠকে অবজ্ঞা না করে তাঁর আপন যুক্তিগুলি বোঝাতে চাইলেন। বয়সের অত দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কনিষ্ঠের আলোচনার এই অধিকার ভবিষ্যতে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন বহু প্রতিষ্ঠিত মনীষী ও লেখকের সঙ্গে সম আসনে বসবার তথা তাঁদের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করবার একটা প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

এর অনতিকাল পরেই দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে এক নতুন পর্ব দেখা দিল। বাল্মীকিপ্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, বৌঠাকুরাণীর হাট, সন্ধ্যাসংগীত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হল। বিলাতযাত্রার অপরিহার্য ফলস্বরূপই এত বিষয়ে এত গ্রন্থ নিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন নূতন আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল, সে কথা বলা অসঙ্গত হবে না।

বিলাতি মানুষের মনের অকৃত্রিম বিশ্বাস, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, অপরদিকে তাদের স্বাধীনতা ও কর্মক্ষমতা— এই সবের একটা বাস্তব রূপ দেখলেন তিনি প্রথমবার বিলাতে গিয়েই। অনুভব করলেন তাদের দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজ ও শিক্ষার পার্থক্য। ভারতের বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে চিনলেন নূতন আলোকে, নবীন দৃষ্টিতে এবং বিশ্বের আলোকে ভারতীয় মনকে গড়ে তোলার এক বিপুল উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলেন। এই সকলের সমবেত শিক্ষা তাঁর সমস্ত জীবনকে নব আলোকে উদ্‌ভাসিত করে দিয়েছিল। তাই বিলাত গমনের যে প্রধান কারণ ব্যারিস্টার হওয়া, তা বিফল হলেও কবি সার্থক হলেন আবার তাঁর আপন-শিক্ষা অর্জনের পথে। তাই একদিকে 'ভারতী'র আবির্ভাব অপরদিকে বিলাত গমন কবিজীবনের পূর্বরচিত ভিত্তিভূমিটিকে আরও এক স্তর দৃঢ় ও উন্নত করে তাঁর জীবনকে সার্থকতর ও পূর্ণতর করে তুলল।

৮ দ্রষ্টব্য: র-জী পৃ ৯৪

রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

বাংলাসাহিত্যের নবযুগ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো যুগবিভাগের প্রধান লক্ষণ সাহিত্যের দেহে ও মনে একটা অনুভবযোগ্য পরিবর্তন ও দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলাদেশে একটা যুগান্তর এসেছিল। সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর মন জেগে উঠেছিল একটি নূতন চেতনায়। এর ফলেই বাংলাদেশ ও সাহিত্যে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের সূচনা হয়।—

> "বাঙালীর প্রাণমনের পূর্ণ জাগরণ ঘটিল,…সে আত্মপ্রকাশের ভাষাও খুঁজিয়া পাইল—নব্য বাংলাসাহিত্যের জন্ম হইল। এই নব্যসাহিত্যই জাতিহিসাবে তাহার পূর্ণজাগরণের নিদর্শন।"
>
> —মোহিতলাল মজুমদার : 'বাংলার নবযুগ' (১৩৫২) পৃ ৮০-৮/০

বাংলার প্রাচীনসাহিত্য ছিল একান্তভাবে ধর্মঘটিত। মানুষের প্রতি মানুষের নিশ্চল শ্রদ্ধা তখনও আসেনি। দৈবের হাতে পৌরুষের পদে পদে লাঞ্ছনার একশেষ করতে তখনকার কবিদের উৎসাহের সীমা ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যযুগে এই গতানুগতিকতার পরিবর্তন কিছুটা ঘটে। তখন দেবতার পরিবর্তে পূতচরিত্র মহাপুরুষদের জীবনী নিয়েই কাব্য রচিত হতে লাগল। অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে একদিকে ছিল দেবতার মহিমা প্রচার ও বৈষ্ণব কবিদের পদে "কানু ছাড়া গীত নাই"— এই সুর, অপরদিকে মানুষকেও দেবতার মহিমায় অধিষ্ঠিত করা। তাই কৃত্তিবাসের হাতে বাল্মীকির রাম হয়েছেন ভক্তের আরাধ্য দেবতা। তবে কালপ্রবাহে ক্রমশঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকতার দিকে অগ্রসর হল, মানুষ ক্রমে পেল তার আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই ভারতচন্দ্রের (১৮শ শতক) শিব একজন বেদিয়া। সাধারণ মানুষ তাকে আপন শ্রেণীর মনে করেই,—

> "কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
> ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥"

"মানুষ এই যে দেবতার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনে এবং জাতীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই একটি নবযুগের সূচনা।"

—শশিভূষণ দাশগুপ্ত : 'বাংলাসাহিত্যের নবযুগ' (১৩৬৩) পৃ ১৭

এখান থেকেই মানুষ জীবনকে নিবিড়ভাবে পেতে আরম্ভ করেছিল। তাই 'অন্নদামঙ্গলে'র ঈশ্বর পাটনী দেবীর কাছে কোনো মোহমুক্তি বা রাজৈশ্বর্যের বর প্রার্থনা করেনি, তার সরল হৃদয়ের কামনা—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।"

ভারতচন্দ্রের সমকালেই রামপ্রসাদ সেন এবং তাঁর পরবর্তী কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের হাতে বাংলার মানুষ ক্রমশঃ আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। তবে এ যুগের দেবদেবীর যে মনুষ্যমহিমা তা প্রধানতঃ মধুর সম্পর্কের। মানুষের জীবন তার খুঁটিনাটি সমস্ত সমস্যা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায়। ভাবে ভাষায় তিনি বাংলার স্বাভাবিকতাকে অনেকখানি আলোকোজ্জ্বল করে তুললেন। তাই বলা যায়,—

"আধুনিক সাহিত্যের গোড়াপত্তন পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে নয়, গোড়াপত্তন কালপ্রবাহে,...একটু একটু করিয়া কালপ্রবাহ নিজেই আধুনিক যুগের যে গোড়াপত্তন করিয়াছে, পশ্চিমের হাওয়া আসিয়া সেই ইতিহাসের ধীর প্রবাহের উপরে সজোরে ধাক্কা দিয়াছিল,— তাহাতে আমাদের কাব্যকবিতার গাঙে একেবারে বান্ ডাকিল।"

—পূর্ববৎ পৃ ২৫

২

পশ্চিমের এই হাওয়ার ধাক্কায় মানুষ এবার অনুভব করল তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যে দেখি ব্যক্তিত্বের জয়, মানুষের মহিমা। আর গীতিকাব্যগুলি আত্মসর্বস্বতার জালে দিশাহারা। এই মুক্তি সকলপ্রকার সামাজিক বন্ধন ও অত্যাচার তথা ধর্মের অন্ধ কারাপাশ থেকে মুক্তি। ব্যক্তিত্বের এই মুক্তির মন্ত্রে নারীজাতিও তাদের শত শত বৎসরের রুদ্ধ ব্যথাবেদনা, সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা, স্নেহপ্রেম নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এই যুগের ধর্ম আসলে 'মানুষের ধর্ম'। সেখানে মানুষের সঙ্গে দেবদেবীর সম্পর্ক নেই। ভগবান্‌কে খুঁজে পেয়েছি আমরা মানুষের অন্তরে অন্তরে। মধুসূদনের রাবণ তাই 'Grand Fellow', মেঘনাদ সত্য সত্যই 'ইন্দ্রজিৎ'। হেমচন্দ্রের দধীচিমুনি তাঁর বিশাল আত্মত্যাগে ইন্দ্রের মহিমা

ম্লান করে দিয়েছেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ, অমিতাভ, খ্রীষ্ট সকলেই মানুষ,—শৌর্যবীর্য, জ্ঞানে গরিমায়, প্রেমে ত্যাগে সার্থক মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও শারীরিক ও মানসিক সকল মনুষ্যগুণের পূর্ণতায় আদর্শ পুরুষ। এই মনুষ্য-প্রীতিই স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মের মূল মন্ত্র। এই মানবিকতাই রবীন্দ্র-নাথের ধর্মেরও প্রধান সম্বল।

প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ যে শুধুই মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, তা নয়। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ দুটি। একদিকে, ধর্মের পথ ছেড়ে মানুষের প্রতিষ্ঠা, পরকাল থেকে ইহকালে অবতরণ; অপরদিকে, কবির নিজের অন্তরের সুরকে সর্বজনীন রূপ দেওয়া। এই দুইএরই সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এতক্ষণ মানুষ কিভাবে ধর্মের পথ ছেড়ে নেমে এল পৃথিবীতে, সে কথা আলোচনা করা হল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি সম্বন্ধেও সেদিন এই ধারণাই ছিল যে, বাংলা কাব্যের আধুনিক ধারাটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তা নিতান্তই ইউরোপীয় কাব্যের স্পর্শে সৃষ্ট। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন,—

> "যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে একটা কথা লক্ষ করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়, তাতে সন্দেহ নেই।"
>
> —'বাংলাকাব্য পরিচয়' (১৩৪৫), ভূমিকা

কিন্তু এ বিষয়ে সেদিনকার এই ধারণা, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেও চূড়ান্ত বলে মনে না করার পক্ষে যুক্তি আছে। গঙ্গা নদী যেমন গঙ্গোত্রী থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত প্রবাহিত, কিন্তু তার জলধারার সঙ্গে এসে মিশেছে ছোট বড় নানা জলধারা তেমনি বাংলাসাহিত্য-প্রবাহও বয়ে চলেছে বহুযুগ ধরে। তারই 'হৃদয়গত' ভাবধারার সঙ্গে এসে মিশেছে 'বহিরাগত ভাবধারা' এবং সেই মিশ্রণেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে পূর্ণ বেগে। কিন্তু তাতে তার প্রকৃতিগত বিকার ঘটে নি। কারণ, বাইরের সম্পদকে গ্রহণ করার ক্ষমতা বাঙালিজাতি ও বাংলাভাষার প্রকৃতিগত।[৯] তাই য়ুরোপীয় সভ্যতার সকল বৈশিষ্ট্যকে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> "অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার

৯ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৭ কার্তিক-পৌষ।

আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবনসঞ্চারে, সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে।…প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না। যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নবযুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায় নি—বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই তার সত্য পরিচয়।"

—কালান্তর, 'মহাজাতিসদন'

তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সংক্ষেপে বলব, "বাঙালির স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজশক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে" (কালান্তর, 'দেশনায়ক') বাঙালী সেদিন পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিল। তাই বাঙালীর হাতে সেদিন সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলি সুপরিবর্তিত, সুসংস্কৃত ও নবীনতার রসে মণ্ডিত নবরূপ পরিগ্রহ করল।

৩

বাংলাগদ্যের বিকাশ—নবযুগের সর্বপ্রকার লক্ষণ যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম বিচ্ছুরিত হয়েছিল, তিনি রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ধর্মসংস্কার কার্যে তাঁর যে দান, সে সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের (১ম পর্যায়) প্রথমাংশে কিছু বলা হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সমাজসংস্কারেও তাঁর কীর্তির কথা বাঙালীর অজানা নয়। কিন্তু শুধু ধর্ম বা সমাজ নয়,—

"শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল…বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

—'ভারতপথিক রামমোহন রায়' (১০), ১২৯১ মাঘ ৫

প্রকৃতপক্ষে, রামমোহনের পূর্বেও গদ্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু সে ছিল প্রধানতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য রচিত গদ্য। সমগ্র জাতির মননশীলতা জাগ্রত করার জন্য, তাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আত্মসমীক্ষণের জন্য যে গদ্যরচনার উৎপত্তি তার সূত্রপাত হয় রামমোহনের হাতে। এক কথায়, জাতীয় চিত্তের উদ্বোধন করাই ছিল তাঁর গদ্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য। সেইসময় থেকেই গদ্যরচনা জাতীয় সাহিত্য বলে গণ্য হয়। ফলে রামমোহনকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জাতীয় প্রবর্তক বলে গণনা করা নিরর্থক নয়।

রামমোহন ও তারপর কিছুকাল পর্যন্ত যে গদ্য ছিল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বক্তব্যের প্রকাশ। কিন্তু গদ্যের রসমাধুর্য বা রচনাশৈলীগত যে সৌন্দর্য আছে, তা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হল বিদ্যাসাগরের হাতে (১৮২০-১৮৯১)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।...তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

—চারিত্রপূজা, 'বিদ্যাসাগরচরিত'

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিও স্মরণযোগ্য।—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"[১০]

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলাভাষার যে পথ নির্মিত হল সেই পথেই আবির্ভূত হলেন আরও বহু গদ্যরচয়িতা— তাঁদের অসংখ্য প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা নিয়ে। তার বিবরণ দেওয়া এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। তবে বাংলাগদ্যের গতিধারাকে যে কয়েকজন বিশেষভাবে চিহ্নিত করে গিয়েছেন, বাংলাসাহিত্য ও শিক্ষাকে ক্রমশঃ প্রাঞ্জল করেছেন, তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। এঁদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) কথা একটু পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করব। কারণ, পিতার শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও ভাষা বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তের জাগরণে ছিল অন্যতম প্রধান সহায়। জোড়াসাঁকো বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা (১৮৩৯) ও তার মুখপত্র হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ (১৮৪৩) বাংলা গদ্যবিবর্তনের ইতিহাসে কতখানি সহায়ক হয়েছিল, তা সর্বজনবিদিত। এই তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়েছিল এক সাহিত্যগোষ্ঠী এবং দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন তার নেতৃস্থানীয়। পরবর্তী কালে এই সভা ও পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি।—

"ধর্ম ও সাধনার জগতের অধিবাসী হলেও তাঁর মনটি ছিল বিশুদ্ধ

১০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'
দ্রষ্টব্য : সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৮, ২য় খণ্ড

সাহিত্যরসে ভরা···তাঁর ভাষারীতি তাঁর চরিত্রের মতোই পবিত্র, উজ্জ্বল ও সাত্ত্বিক গুণময়। তাঁর বিখ্যাত পুত্রেরা যে বাক্‌নির্মিতিতে প্রজাপতি ব্রহ্মার সমতুল্য হয়েছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁরই সাত্ত্বিক অথচ রসার্দ্র প্রভাব।"[১১]

দেবেন্দ্রনাথের শান্ত, সংযত, শিল্পীসুলভ বাংলাভাষা রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর 'আত্মজীবনী'টি। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর পিতৃঋণের কথা বারেবারেই উল্লেখ করতে গর্ব অনুভব করেছেন। এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাভাষা ও গদ্যরীতির ভিত্তিটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে পরিপূর্ণ একটি সৌধ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৮১)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—

"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র' ১৩০০

কিন্তু এই 'বঙ্গসাহিত্য' অর্থাৎ "আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা" (রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ) তাকেই সর্বপ্রথম তিনি 'বলবতী' ও 'মহীয়সী' করে তুলবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তারপর 'সব্যসাচী'র মত উপন্যাস ও প্রবন্ধ, 'গঠন ও সমালোচনা' সর্ববিষয়েই তাঁর শাণিত চিন্তা ও লেখনীকে প্রয়োগ করে বঙ্গসাহিত্যকে দ্রুত পরিণতির পথে অগ্রসর করলেন। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলাগদ্য গঠনে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের যথার্থ উত্তরসূরী হলেন রবীন্দ্রনাথ।

৪

কাব্য—কাব্যের ক্ষেত্রে নবযুগের মানসিকতা প্রথম সূচিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) কবিতায়। অনেক সমালোচক ঈশ্বর গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর কাব্যে একাধারে প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটেছিল। ঈশ্বর

১১ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলাসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— দেবীপদ ভট্টাচার্য: রবীন্দ্রচর্যা, পৃ ২-৬

গুপ্ত সম্বন্ধে এই উক্তিটি একটু বিচার করে দেখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,—

"যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।...তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে...বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত।"

—ভূমিকা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। কালের প্রবর্তক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাসম্ভারকে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই দুই দিক্ থেকে চিন্তা করে দেখা দরকার। বহিরাঙ্গিক বিচারে দেখি, ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী প্রধানতঃ বিচ্ছিন্ন বা খুচরো কবিতারই সংকলন। কোনো উপাখ্যান বা মহাকাব্য রচনার চেষ্টা তিনি করেন নি। সেদিক্ থেকে তাঁর কবিতায় আধুনিক গীতিকবির চিন্তারই প্রতিফলন দেখা যায়। খুচরো কবিতা লেখা হয় সাধারণ পাঠকের জন্য; পত্রপত্রিকায় তা পড়ে পাঠক আনন্দ লাভ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকার সম্পাদক রূপে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছিলেন। তদুপরি ঈশ্বরপ্রেম মানবিকতাবোধ, স্বদেশপ্রীতি, নীতিতত্ত্ব, প্রকৃতিপ্রেম ও সমসাময়িক ঘটনাবলীকে লক্ষ করে কবিতা লিখে তিনি সমকালীন চিন্তাধারার সঙ্গেও তাল রক্ষা করেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—

"যাহা আছে ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।"

—পূর্ববৎ

প্রকৃতপক্ষে, যে গীতিকবিতা বাংলার প্রাণস্বরূপ, আধুনিক যুগে তিনিই তার প্রথম প্রবর্তক বলা চলে। ঈশ্বর গুপ্তের চিন্তাধারার গভীরতা ও আধুনিকতা ব্যাপকতর হয়েছে তাঁর গদ্যরচনায়। তাঁর রচিত কবিজীবনী-সংকলন তাঁর গভীর ইতিহাসবোধেরই পরিচায়ক। তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনাতেই সেদিন দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সকলেই সাহিত্যের আসরে প্রথম প্রবেশ লাভ করেছিলেন। এদিক্ থেকে নবযুগের বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের দান নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়।

কিন্তু অভাব ছিল তাঁর শিক্ষাদীক্ষার। তিনি য়ুরোপীয় শিক্ষা বা ইংরেজি

ভাবাদর্শের প্রেরণা লাভ করেন নি। তাই তিনি 'বাংলার গ্রাম্যদেশের কবি।' সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে মার্জিত রুচির অভাব ও অশিক্ষিত শব্দ প্রয়োগের আধিক্য লক্ষ করা যায় এবং এই কারণে অনেকে তাঁর কাব্যে প্রাচীনত্বের ছাপ দেখতে পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আধুনিক যুগের ইউরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার প্রভাব ছিল না ঠিকই, কিন্তু কালের প্রভাবটিকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। তবে আধুনিক যুগের কবিতায় যে অন্তরঙ্গ অনুভূতি তা তাঁর কাব্যে ততটা প্রকট হয়নি। তাঁর গীতিকাব্যিক প্রতিভা মেঘাচ্ছন্ন থেকে গেল যথার্থ শিক্ষালাভের অভাবে। এই অভাবটুকু অতিক্রম করতে পারলেই তিনি বাংলা কাব্যকে আরও 'ত্রিশ বৎসর' অগ্রগণ্যতা দিতে পারতেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, "তাঁর কাব্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শৈশবসংগীত ধ্বনিত হয়েছিল।"[১২] ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ধারায় তদানীন্তন বহু কবিই প্রতিষ্ঠালাভের ভূমিকাটুকু গড়ে নিয়েছিলেন এবং মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত সেই ধারাই ছিল অক্ষুণ্ণ।

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ও পরবর্তী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) কাব্যে আধুনিকতার ভূমিকাকে আরও একটু প্রতিষ্ঠা দিলেন। স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা ও ইতিহাসের চিন্তা তাঁর কাব্যকে অনেকটা বলিষ্ঠ করতে পেরেছিল। কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যগুলি ছিল প্রধানতঃ উপাখ্যান জাতীয়। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় কাব্যরচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে রঙ্গলালের প্রভাব একান্তই দুর্লক্ষ্য।

ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের নির্মিত পথে বাংলা কাব্যের আধুনিকতা পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) রচনায়।—

> "ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।"
>
> —শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৩৬২) নবম পরিচ্ছেদ

কিন্তু মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব মহাকাব্য রচনার প্রয়াস নিয়ে। অথচ, বাংলাদেশের কাব্যভূমি কোনোদিনই মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয়। তাই মহাকাব্য রচয়িতা হলেও গীতিকাব্যের প্রতি ছিল তাঁর একটা স্বাভাবিক

১২ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন : 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদিকথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৯ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ৫-১৫ এবং ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত-'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (১৯৬৮), পৃ ২১৩-২৫০

প্রবণতা। এ বিষয়ে তাঁর স্বীকৃতিও আছে।—"I think I have a tendency in the Lyrical way."[১৩] তাই মহাকাব্য রচনায় তাঁর প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ঘটতে পারেনি। আসলে,

> "তাঁর মহাকাব্যের ভেরীধ্বনির অন্তরালেও গীতিকবিতার কলধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এবং তাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেছে।"
>
> —প্রবোধচন্দ্র সেন : 'উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা'
> বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৭ কার্তিক-পৌষ, পৃ ২১০

প্রকৃতপক্ষে, মহাকাব্য রচনার প্রয়াস না করে প্রথমাবধিই যদি মধুসূদন গীতিকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্য অন্ততঃ আরও 'ত্রিশবৎসর' অগ্রসর হতে পারত। তা না হওয়ায় পরবর্তী হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রেরও যথার্থ প্রতিভার স্ফুরণ অনেকটা ব্যাহত হয়েছিল। আসলে, মহাকাব্যের পর্বটি বাংলা কাব্যধারার গতিপথকে কিছুকালের জন্য নিরুদ্ধ করে বাঙালী কবিপ্রতিভার স্বধর্মচ্যুতি ঘটিয়েছিল। বাংলাকাব্যে এটি একটি আকস্মিক ও বিস্ময়কর ঘটনার নিদর্শনরূপেই গণ্য হবার যোগ্য। এই কারণেই বোধহয় বালক রবীন্দ্রনাথ ভারতীর পৃষ্ঠায় মেঘনাদবধ কাব্যের এমন তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং তাকে মহাকাব্য বলে স্বীকার করেও নিতে পারেননি। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি এই সমালোচনার সুরকে পরিবর্তিত করে বলেন,—

> "মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন।"
>
> —সাহিত্যের পথে, 'সাহিত্যরূপ'

অর্থাৎ মহাকবি হিসাবে তিনি সার্থক না হলেও তিনি যে প্রেরণাটুকু দিয়ে গিয়েছিলেন, বাংলাসাহিত্যে তার একটা মর্যাদা স্বীকার্য। তবুও রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই মহাকাব্য রচনার পথটিকে বর্জন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—

"আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

১৩ মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গ রচনার সময় (১৮৬১ শেষার্ধ) রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রের উক্তি।

মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।"

—ক্ষণিকা, 'ক্ষতিপূরণ'

তবে মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ রচনা ও শব্দপ্রয়োগ-গুণকে রবীন্দ্রনাথ বারেবারে স্বীকৃতি জানিয়েছেন বাংলা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে। তার পুনরুল্লেখ এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। শুধু এটুকুই বলা যায়, কাব্যে যুক্তাক্ষর বহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে ও নবছন্দ প্রবর্তন করে কাব্যোন্নতির যে পথ মধুসূদন প্রদর্শন করে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সে পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

মহাকাব্যের তুলনায় তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', এমনকি 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যও সার্থকতর। চতুর্দশপদী অনেকগুলি কবিতা গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপিত হতে পারে এবং ব্রজাঙ্গনাতেও ভাষা ও ছন্দে লিরিক্যাল সুর অনেকক্ষেত্রেই সার্থকভাবে উৎসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বোধহয় সর্বাগ্রগণ্যতার দাবী করতে পারে তাঁর 'আত্মবিলাপ' (প্রথম প্রকাশ ১৮৬১) কবিতাটি।[১৪] প্রকৃতপক্ষে, বিহারীলাল থেকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার যে ধারাটিকে চিহ্নিত করা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাকে সমর্থন করতেন, এই কবিতাটি যে সেই কালসীমারই পূর্বগামী ছিল সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন না।

সে যাই হোক, মধুসূদনের কাব্যে মহাকাব্যের দিকটি বাদ দিলে কি গীতিকবিতার সুর, কি শব্দপ্রয়োগের ঝঙ্কার, কি ছন্দের গতি সবদিক্ থেকেই মধুসূদনের প্রভাব উত্তরকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে অলক্ষিত নয়।

মহাকাব্য ধারায় মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম আবির্ভূত হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)। এই ধারায় রচিত তাঁর 'বৃত্রসংহার' কাব্যটিকে সেদিন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন (বঙ্গদর্শন ১২৮১ মাঘ-ফাল্গুন) এবং বালক রবীন্দ্রনাথও মেঘনাদবধের বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে তুলনামূলক ভাবে কাব্যটির উচ্চ প্রশংসা করেন। এ ছাড়া হেমচন্দ্র

১৪ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা', বিশ্বভারতী পত্রিকা (১৩৭৭, কার্তিক-পৌষ) এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' (১৯৭৬), পৃ ২৬-৬৬৭

সংস্কৃত শ্লোক রচনার যে পদ্ধতি তাঁর কাব্যে অনুসরণ করেছিলেন, বালক রবীন্দ্রনাথও একদা তাঁর কবিতা রচনায় সে রীতির অনুগামী হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এইসব সমালোচনা বা অনুসরণ আসলে বয়সোচিত উত্তেজনার প্রকাশমাত্র। এইসব মহাকাব্যগুলি রচনার প্রয়াস যে আসলে যুগোচিত হয়নি সে বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন। তাই সাহিত্যে তিনি এইসব কাব্যের অনুসরণ করতে পারেন নি।

প্রকৃতপক্ষে, এসব কাব্যরচনা একটি যুগের খেয়াল মাত্র বলা যায়। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা মহাকাব্যের ধারাটি দীর্ঘমেয়াদী হতে পারল না। মধুসূদনের মত হেমচন্দ্রেরও মহাকাব্যের অন্তরালে বারেবারে দেখা দিয়েছে গীতিকাব্যিক প্রতিভা। গীতিকবি হিসাবেই হেমচন্দ্র সার্থকতর। আর, তার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলি বিশেষভাবে ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। তাঁর পরাধীন ভারতবাসীর দাস মনোবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়ে লেখা 'ভারতসংগীত' কবিতাটি সেদিন বালক রবীন্দ্রচিত্তকে বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামক কবিতা রচনা ও পাঠ করার পিছনে ভারতসংগীতের প্রেরণা যে অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল, সে কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে। অপরদিকে, 'ভারতবিলাপ' কবিতার ছাপ লক্ষ করা যায় 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায়।[১৫] হেমচন্দ্রের গীতিকবিতাগুলি ভাবে-ভাষায়-ছন্দে সে যুগের কবিদের অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া তাঁর প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত ছিলেন।

অনুরূপভাবে, নবীনচন্দ্র সেনও (১৮৪৭-১৯০৯) তাঁর 'ত্রয়ী' মহাকাব্য অপেক্ষা গীতিকাব্য রচনার ক্ষেত্রেই ছিলেন অধিকতর সফল। তবে তাঁর সবগুলি গীতিকবিতাতেও পরের অন্তরে অনুভূতি জাগাবার মত বিশ্বজনীন গভীরতা লক্ষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই এই কবিকেও তাঁর কাব্যরচনার আদর্শ বলে গণ্য করতে পারেননি। তিনি বলেছেন,—

"তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না, যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম।"

—কড়ি ও কোমল, 'কবির মন্তব্য'

১৫ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ভোরের পাখি' (দ্বিতীয় পর্যায়) বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৮ কার্তিক-পৌষ।

৫

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় মহাকাব্য রচনা-প্রবাহের অল্পকালের মধ্যেই আখ্যানকাব্য ও গাথাকাব্য রচনার উদ্ভব হয়। গাথাকাব্যে একদিকে থাকে মহাকাব্যের আখ্যানধর্মিতা, অপরদিকে কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ জড়িত হয়ে তাতে গীতিকবিতাসুলভ বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়। এই কাব্যধারার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮)। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'উদাসিনী' কাব্য (১৮৭৪) সেদিন বহু কবির সঙ্গে বালক রবীন্দ্রের মনকেও বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের অনেক রচনাই বহন করছে। তাঁর জীবনে কাব্যে-গানে-প্রবন্ধে-সমালোচনায় তথা শিক্ষালাভে অক্ষয়চন্দ্রের দান যে কতখানি ছিল তা তিনি বারেবারেই বলেছেন তাঁর নানা রচনায়। অপরদিকে, অক্ষয় চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-নাটকে তাঁর অকৃত্রিম সাহচর্যের নিদর্শনস্বরূপ রেখে গেছেন তাঁর সহৃদয় নানা রচনার ছাপ। একাধারে ইংরেজিসাহিত্য ও মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্য দুইই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পড়েছিলেন তাঁরই কাছে। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকা এবং পারিবারিক স্মৃতিখাতায়[১৬] অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের নানাবিষয়ে আলোচনার যেসব দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে, তার থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মননশীলতাকে তীক্ষ্ণতর করতে অক্ষয় চৌধুরীর দান ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথও তার স্বীকৃতি দিয়ে বলে গেছেন,—

> "ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"
>
> জী-স্মৃ. পাণ্ডুলিপি

বাংলা আখ্যানকাব্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ও তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের (১৮৭৫) কথা পাঠকসমাজে অপরিচিত নয়। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র একটি যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ,—

> "স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্রমূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান, ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে,

১৬ পারিবারিক-স্মৃতি-লিপি-পুস্তক [বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত]; 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব' বিষয়ে ২৬নং রবীন্দ্রনাথের ও ৪৭নং অক্ষয় চৌধুরীর [তারিখ নেই] লেখা।

রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি সেটি তো সহজ নহে।”

—জী-স্মৃ, 'সাহিত্যের সঙ্গী'

দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে বিহারীলালের সারদামঙ্গলের মতই বহু খণ্ডিত অংশের সমাবেশ। কিন্তু সবগুলি মিলিয়ে এর মধ্যে একটা সমগ্রতা আছে, এখানেই কাব্যটির সার্থকতা। বড়োদাদার এই স্বপ্নপ্রয়াণের রস বালকবয়সেই রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ,—

“স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত, তাহার ঠিকানা নাই।...সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।...এত ছড়াছড়ি যাইত যে আমাদের মতো প্রসাদ আমারও পাইতাম। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম।...লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না,...কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম, তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।”

—জী-স্মৃ, 'বাড়ির আবহাওয়া'

এর থেকে বোঝা যায়, স্বপ্নপ্রয়াণের 'সৌন্দর্য' কবির 'হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে' জড়িত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যরস কবি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন,—

“এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল।...ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।”

—জী-স্মৃ, 'সাহিত্যের সঙ্গী'

তার কারণটিও কবি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন।—

“বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধহয় মিল ছিল না, সেইজন্য ভাল লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি।”

—কড়ি ও কোমল, 'কবির মন্তব্য'

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর কাব্যকে প্রভাবিত করতে পারে নি, তবুও যে কাব্যসমুদ্রে তিনি সাধ মিটিয়ে 'ঢেউ' খেয়েছেন, যে কাব্যরস তাঁর 'শিরায়-উপশিরায়' প্রভাবিত হয়ে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, সে কাব্য যে তাঁর অবচেতন মনেও কিছুটা সাড়া জাগিয়েছিল, এ অনুমান বোধহয় নিরর্থক হবে না। কবির পরবর্তী কালে লেখা “ 'দুইপাখী', 'পরশ পাথর', 'হিং-টিং-ছট্‌', 'আকাশের চাঁদ' প্রভৃতি বহু কবিতায় রূপকের ব্যাপক প্রয়োগ বস্তুত উনিশ

শতকের প্রচলিত রূপক আন্দোলনেরই ফল বলে মনে হয়।"[১৭] শুধু তাই নয়, পরিণত বয়সে লেখা 'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'রথের রশি' প্রভৃতি রূপক নাট্যগুলিও সর্বতোভাবেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত বলে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের ছাপও তাতে লক্ষ করা যায়। আর তার মধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণের স্থান অন্যতম বলেই মনে হয়। তবে এই কাব্যটির প্রভাব হয়তো কবির অলক্ষিতেই কার্যকরী হয়েছিল। স্বপ্নপ্রয়াণের মত তিনি 'রূপকের' 'রাজপ্রাসাদ' হয়তো গড়েন নি, কিন্তু সেই 'বাগানবাড়ির' 'ফোয়ারা'-নিঃসৃত ধারাটি কখন যে অজ্ঞাতে তাঁর কাব্যে প্রবাহিত হয়েছে তা তিনি জানতেও পারেন নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিকে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মত রূপক ও আখ্যানকাব্য লিখেছেন, অপরদিকে তিনি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কৌতুক কবিতা লেখাতেও পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাতযাত্রার পর বাঙ্গালীর বিলাতযাত্রার লিপ্সাকে উপহাস করে শিখরিণী ছন্দে একটি কবিতা লিখে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, ছন্দের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপান্তরণ। কাব্যে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ছন্দকে এমনভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন যে, তার আসল রূপটা ধরাই অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্বপ্নপ্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই মৌলিকতা সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যে জ্যেষ্ঠের এই প্রভাব যে একেবারে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।[১৮]

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যাবার পর তাঁর য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রশ্রেণী যখন 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন ভারতীর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রগুলি সম্পর্কে তর্কবিতর্কমূলক আলোচনা অনেকদিন চলেছিল। জ্যেষ্ঠের সঙ্গে এই বাদানুবাদের ফলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভাবনের সহায়তা হয়েছিল। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> "পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।"

---

১৭ আশুতোষ দত্ত: 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলাসাহিত্য', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৭১ প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, পৃ ১০

১৮ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৮০-৮১ ও ১১১-১৩

অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যের উপরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তাঁর চিন্তাশক্তি আরও গভীর ও ব্যাপক হতে পেরেছে। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে কবি এই যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে' দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক আলোচনাও এর আর একটি দৃষ্টান্ত।[১৯] এর ফলে পরবর্তী কালে সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বা অপরের সঙ্গে তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হয়েছিল। তার আরও কিছু দৃষ্টান্তের কথা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গে একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট গীতরচয়িতাও ছিলেন। তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলিই তার দৃষ্টান্ত। তাছাড়া হিন্দুমেলায় গীত তাঁর 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' সেদিনকার জাতীয় আন্দোলনে মোহমন্ত্রের কাজ করেছিল। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মসংগীত বা স্বদেশীসংগীত রচনায় বালক রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছ থেকে অনেকখানি প্রেরণা পেয়েছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রচিত্ত বিকাশের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রায় সর্বাঙ্গীণ প্রভাব অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।

৬

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় প্রায় একই সঙ্গে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই সবগুলি ধারার মধ্যে বাংলা কাব্যের মূলস্বরটি হল গীতিকাব্যের সুর। বাংলাদেশ ও বাঙালীর হৃদয় চিরকালই গীতিকবিতার অনুকূল। তাই চর্যাগীতির যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত ঐ সুরই কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবানুসরণ করে বলা যায়, আদিযুগ থেকে [চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ বা বাউল গানের স্তর অতিক্রম করে] আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা গীতিকবিতার যে ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তার মধ্যে 'বস্তুগত কোনো পার্থক্য নাই'[২০] অর্থাৎ প্রাচীন ও নবীন গীতিকবিতার প্রাণবস্তু একই। পার্থক্য যেটুকু তা বহিরাঙ্গিক, আভ্যন্তরিক নয়। ১৮৫৯-৬০ সালের যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাকাব্য নবজন্ম লাভ করে নবকলেবরে আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র; কিন্তু তার জীবনধারা ছিল অবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ তার দেহেরই রূপান্তর ঘটেছিল, আত্মার নয়।

১৯ ঐ খাতার ৫৩নং দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ৫৫নং রবীন্দ্রনাথের আলোচনা।
২০ দ্রষ্টব্য—বঙ্কিমচন্দ্র : 'গীতিকাব্য', বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম খণ্ড

এই নবরূপে সজ্জিত গীতিকাব্যিক সুর মধুসূদনের হাতেই প্রথম ঝংকৃত হয়, সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সকলের হাতেই তা কিছু কিছু রূপান্তর লাভ করেছে। আর বিহারীলালের কাব্যে তা পূর্ণ আবেগে প্রবাহিত হয়ে বাংলাকাব্যে একটা জোয়ার এনে দিল। আসলে সেইজন্যেই অনেকে বিহারীলালকে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যধারার প্রথম কবি বলে অভিহিত করে থাকেন।

এই যুগের গীতিকাব্যে কল্পনা, ভাষারীতি ও আবেগের একটা মুক্তির উল্লাস লক্ষ করা যায়। এতদিন ধরে মহাকাব্যের ভেরীধ্বনিত পথে গীতিকাব্য চলেছিল কিছুটা সন্তর্পণে। এবার সে পথ হল মুক্ত। এ পথের যাত্রীরূপে একে একে আবির্ভূত হলেন বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু প্রমুখ মহিলা কবিগণ। 'কল্পনাপ্রধান চিত্তবৃত্তির অসাধারণ উৎকর্ষ' এই যুগের গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে অনুভূত হল।[২১]

রবীন্দ্রনাথও কবি বিহারীলালকে (১৮৩৫-১৮৯৪) আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম কবিরূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি প্রথম নিজের সুরে গাওয়া একটি 'ভোরের পাখি'র সুমিষ্ট সংগীত শুনেছিলেন। এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) পাঠ করে যথার্থ কবিত্বের দীক্ষালাভ করেছিলেন। এই কাব্যের,—

"সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন
চারিদিকে ঝালাফালা
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।"

এই পঙ্‌ক্তিগুলি কবির নিকট যেন একটা 'ভাবের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত' করে দিল। কবি বলেছেন,—

"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন

২১ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৩৬৭) পৃ ১৪১

কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে— কিন্তু তাহা বিরল— এবং চতুর্দশ-পদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।···তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।···কবি যখন গাহিলেন 'সর্বদাই হু হু করে মন' তখন বালকের অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বিহারীলাল' ১৩০১

কবির নিজের এই উক্তি ও স্বীকৃতি থেকে জানতে পারা যায়, বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিহারীলালের কবিতা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিহারীলালের "সর্বদাই হু হু করে মন" ইত্যাদি কবিতাতে কবি তাঁর 'নিজের সুর' প্রথম শুনেছিলেন এ কথাও সত্য। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে এটিই কি প্রথম কবির নিজের সুর? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না' এবং এ বিষয়ে ইতিহাস অনুধাবন করে দেখা গেছে ও পূর্বে উল্লেখ করাও হয়েছে যে, এর পূর্বে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১) কবিতাটিতে আধুনিক যুগে কবির নিজের সুর প্রথম শোনা গিয়েছিল। 'সর্বদাই হু হু করে মন' রচনায় কবির যে মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' কবিতাতে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে অন্য রূপে ও অন্য ভাষায়। অর্থাৎ বিহারীলালের কবিতার গীতিকাব্যিক সুর প্রথম শোনা গিয়েছিল মধুসূদনের কবিতায়।

তবে বিহারীলালের কাব্য একটি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। শুধু ভাবে নয় বিহারীলালের ভাষা ও ছন্দেও সেদিন কবি কোনো 'দৈন্য' লক্ষ করেন নি। 'বঙ্গসুন্দরী'র পরে আর্যদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' কাব্য (প্রথম প্রকাশ ১২৮১) পাঠ করেন। কবি বলেছেন,—

"প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বিহারীলাল'

কিন্তু সারদামঙ্গলের একটি প্রধান দুর্বলতা, তার মধ্যে 'আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থে'র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না।

"প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না।"

—পূর্ববৎ

এ ছাড়া বঙ্গসুন্দরী বা সারদামঙ্গল— সবগুলিতেই বিহারীলালের আন্তরিক নিবিড় উপলব্ধি প্রকাশিত হলেও কাব্যগঠনের দিক্ থেকে তিনি প্রাচীনপন্থী মনোভাবই দেখালেন,—'সারদামঙ্গল কাব্য' নামকরণ এবং সর্গ বিভাগের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। সারদামঙ্গল নামকরণের মধ্যে মধ্যযুগীয় চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদির অনুবৃত্তি দেখা যায়। তার সর্গ বিভাগের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় মহাভারত বা কালিদাসের আদর্শ। এদিক্ থেকে কবি পরবর্তী কবিদের মনে আবেদন জাগাতে পারেন নি। বরঞ্চ, তাঁর 'কল্পনাটি' যদি 'হাজার গীতে' খণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেত, তবে হয়তো তার মূল্য হত অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথ বালকবয়সে বিহারীলালের সঙ্গে একাধারে পারিবারিক যোগসূত্রে ও কাব্যগত ভাবরসে মুগ্ধ হয়ে অন্তরে অন্তরে বিহারীলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তাঁর কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম শুনেছিলেন কবির নিজের সুখদুঃখের সুর, শুনেছিলেন নারীবন্দনা, প্রকৃতি ও মানবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা। কবির হৃদয়বীণার তারে এই সুরগুলি সে যুগেই অনুরণন জাগিয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন,—

> "তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।...তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গেই ফিরিত। তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল— তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।...বিহারীবাবুর মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ওই পর্যন্ত দৌড়িত।"

—'সাহিত্যের সঙ্গী'

পারিবারিক দিক্ থেকেও রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সাহচর্য লাভ করেছিলেন অনেকখানি। কারণ,

> "যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।"[২২]

বিহারীলাল বাংলাকাব্যে যে সুর শোনালেন, সে সুর চিরকালই বাঙালীর

২২ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা ('পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রথম পর্যায়, পৃ ১৭২), দ্রষ্টব্য: সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ২, বিহারীলাল।

অন্তরে নিহিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নবযুগের প্রারম্ভকালে কখনও তা দেখা দিয়েছে মহাকাব্যের অন্তরালে কখনও বা আখ্যানকাব্যের আবরণে, অতি সন্তর্পণে। বিহারীলাল সেই আবরণ অনেকাংশে উন্মোচিত করলেন। সেই ধারায় আবির্ভূত হলেন বহু কবি, এমন কি, কোনো কোনো মহিলাকবিও। এই ধারারই শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বিহারীলাল-প্রদর্শিত রূপটি তাঁরা গ্রহণ করেননি, করেছিলেন শুধু সুরটি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

"এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর এক দিকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার কার আছে। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি।"

—সাহিত্যের পথে, 'সাহিত্যরূপ'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যের 'মূল ভাবটি, এমনকি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত সারদামঙ্গলের আরম্ভ ভাগ' থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো কোনো গানেও ('অয়ি বিষাদিনী বীণা' প্রভৃতি) শোনা যায় বিহারীলালের ভাষার প্রতিধ্বনি। আসলে বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব কবির জীবনের একেবারে প্রথম দিকেই কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা মুছে গিয়েছিল। কবি নিজেই বলেছেন,—

"আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল।"

—কড়ি ও কোমল, 'কবির মন্তব্য'

৭

বিহারীলালের ধারা অনুসরণ করে যে কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, তাঁদের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষ দেখা যায় না। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫২-১৯২০) রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রমানসিকতার সাদৃশ্য কিছু কিছু লক্ষ করা যায়। প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের ভাব ও ভাষা অনুসরণ করে কাব্য লিখেছিলেন। তাই কবি নিজে বলেছেন,—

"আমি পুরাতন 'স্কুলে'র— মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের 'স্কুলে'র কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত।"

প্রকৃতপক্ষে, এই কবিগোষ্ঠীর আমলে রবীন্দ্রনাথ কাব্যক্ষেত্রে প্রায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠা

পেয়েছেন। কারণ, তিনি নিজেও তো ছিলেন বিহারীলালের উত্তরস্থরী। ফলে, এঁরাই অনেকে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ হয়েও রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্রনাথও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং 'কবিভ্রাতা' সম্বোধন করে তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন।[২৩]

অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০-১৯১৯) কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের ছাপ কোথাও কোথাও দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে,—

"অক্ষয়কুমারের রচনার ভাবে বিহারীলালের প্রৌঢ় কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতার মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস রহিয়াছে।"[২৪]

বিহারীলালের অনুসারী মহিলা কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) একদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর গাথাকাব্যের আদর্শ ও অপরদিকে বিহারীলালের ছন্দের আদর্শ গ্রহণ করে কবিতা লিখেছিলেন। কিশোর ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের রচনা ও তাঁর আদর্শ নিজ কাব্যমধ্যে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথও ভগিনীরচিত সাহিত্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

এক্ষেত্রে আরও তিনজন কবির নাম করা কর্তব্য। তাঁরা হলেন রাজকৃষ্ণ রায়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী—যথাক্রমে 'অবসর সরোজিনী', 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' কাব্যের রচয়িতা। এঁদের এই কাব্যগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধে)। এঁরা কেউই বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী নন এবং রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশে তাঁদের দানও নগণ্য। রবীন্দ্রনাথ এঁদের কাব্যের যে সমালোচনা করেছেন, তা আসলে তাঁদের ব্যক্তিগত সমালোচনা নয়; তৎকালীন ঐ শ্রেণীর কবিদের বিভিন্ন কাব্যধারার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা উপস্থাপিত হয়েছেন মাত্র। বলা বাহুল্য, কবির প্রথম জীবনে লেখা এই মনোভাবটি পরবর্তী কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বাংলাসাহিত্যে রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) নিরলস লেখক ছিলেন। তাঁর কাব্য ও নাটকের পরিমাণ অসংখ্য। কিন্তু অধিকাংশ লেখাই সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। শুধু সাহিত্য নয়, 'বীণা' পত্রিকা ও 'বীণা' রঙ্গালয় স্থাপন করেও তিনি বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করতে চেয়েছিলেন। তবে রাজকৃষ্ণের

২৩ সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬১, ৫ম খণ্ড, 'দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্মৃতিকথা'।

২৪ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড, ১৩৭৭) পৃ ৪৮৮-৮৯

যেটুকু স্বকীয়তা লক্ষ করা যায় তা হল ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা 'পদ্য-পৌওক্তিক-গদ্যের' [পদ্যপঙ্‌ক্তি-গদ্য] প্রবর্তন। 'অভিনয় সৌকর্যার্থ বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি'[২৫] করেই রাজকৃষ্ণ এই ছন্দ প্রবর্তন করেন। এ ছন্দে লেখা তাঁর প্রথম নাটক 'হরধনুর্ভঙ্গ'। ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর 'বিরাট্ সম্ভাবনা' আনলেও রবীন্দ্রনাথকে এ ছন্দ বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বলে মনে করা যায় না।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণের 'অবসর সরোজিনী'কে প্রশংসা করতে পারেন নি। তিনি বলেন,—

"রাজকৃষ্ণ বাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না।...তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে, কিন্তু অনুরাগের জলন্ত তেজ নাই।...সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশলবাক্যের আড়ম্বর আছে, কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না।"

—ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী (১২৮৩)

রাজকৃষ্ণ রায় যদিও জোড়াসাঁকো বাড়ির সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তবুও তাঁর কাব্যাদর্শ কবির হৃদয় বা কাব্যকে স্পর্শ করতে পারে নি।

রাজকৃষ্ণের তুলনায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২) কবি হিসাবে খুব শ্রেষ্ঠ না হলেও সে যুগের পাঠকসমাজ এবং রবীন্দ্রনাথের মনে একটি আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কারণ, তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতারই বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশবোধ ও ভারতের পরাধীনতা-জনিত ধিক্কারবোধ। তাঁর কাব্যের মূল্য খুব উৎকৃষ্ট না হলেও তাতে শোনা গিয়েছিল কবির আপন হৃদয়ের সুর। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,—

"ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বন্ধ রচনা আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।...ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

—পূর্ববৎ

রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের 'সিন্ধুদূত' কাব্যেরও সমালোচনা করেছিলেন (ভারতী

২৫ সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৫০, ৪র্থ খণ্ড, রাজকৃষ্ণ রায়

২৬ রবীন্দ্রনাথ: 'ছন্দ' (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), ২৯৮-৩০১

১২৯০ শ্রাবণ)। ঐ সমালোচনায় বাংলাছন্দের 'প্রাণগতভাব' ও তার ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বাংলার 'স্বাভাবিক ছন্দে'র ভবিষ্যৎ দিক্‌টি নির্দেশ করেছেন।[২৭]

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাসাহিত্যে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর উক্ত দুটি কাব্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার জন্যই অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সেগুলি থেকে কোনোরকম রসগ্রহণ করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ কবি হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর (১৮৫৪-১৯৩০) কাব্য 'দুঃখসঙ্গিনী'রও ভাবগত ও ভাষাগত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,—

> "তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট।·· তাঁহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে।"
>
> —পূর্ববৎ

আগেই বলা হয়েছে, এইসব কবিরা রবীন্দ্রনাথের মনে বা কাব্যে কোনো স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেন নি। যুগের বিচারে বিহারীলালের পরবর্তী কবিদের কাব্যগুলি সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রাচীন কাব্যের অনুসরণ করেছেন, আবার কখনও তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতি এত প্রবল হয়েছে যে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রে তা ধ্বনি জাগাতে পারে নি। এইসব কবিদের তুলনায় বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভাবলে বাংলা গীতিকাব্যের ভূমিতে সৌন্দর্যের ফসল ফলাতে শুরু করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও ভাবাদর্শ ছিল এঁদের তুলনায় অনেক স্বতন্ত্র। ফলে তাঁদের কাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি। বরঞ্চ, অনেক ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাব্যগুলিই তাঁর প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়েছে। আলোচ্য পর্ব হচ্ছে, রবীন্দ্রমানসের বিকাশের পর্ব। তাই এঁদের কাব্যে তাঁর যা প্রভাব তা বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের প্রভাব— অনেক ক্ষেত্রেই তা বর্তমান নিবন্ধের কালসীমা-বহির্ভূত।

পরিশেষে এটুকুই বলব, নব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যের পরিমণ্ডলে থেকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির বলে তাঁর কাব্য-সোনারতরীকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন তাঁর নিজেরই খনন করা ধারাপথে।

৮

নাটক—বাংলাকাব্যের মতই আধুনিক বাংলা নাটকেও মধুসূদনই সর্বপ্রথম সর্বাঙ্গীণ সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেই বাংলানাট্যক্ষেত্রে 'প্রভাতের

২৭ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ ২০-২১

সূর্যোদয়' ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে মধুসূদন-রচিত নাটকগুলির প্রকৃতি বিচার করা অসঙ্গত হবে না।

মধুসূদনের মৃত্যুর (১৮৭৩ জুন) মাত্র চার বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "মধুসূদন ডাহা ইংরেজ"। এ উক্তির সত্যতা বিচার করতে গিয়ে উপনিষদের 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্' এই উক্তিটি মনে পড়ে যায়। সত্যদৃষ্টি পেতে হলে হিরণ্ময় পাত্রকে অনাবৃত করা প্রয়োজন। মধুসূদনের জীবনপাত্রটি অনাবৃত করলে তাঁব অন্তর্জীবনের খাঁটি বাঙালী রূপটি উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। তাঁর কাব্যগুলিতেও এই সত্যেরই প্রকাশ।

নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর অনুরূপ মনোভাবটিই প্রকাশিত হয়েছিল। একদা কবির চিত্তে মাতৃকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল,—

"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"

মাতার এই 'আজ্ঞা' পালন করে কবি বলেছেন,—

পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

এরই ফল মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্য ও নাটক। বাংলায় তাঁর রচিত যে সাহিত্যসম্পদ্, তা মাতৃভাষার আবরণে পাশ্চাত্য সাহিত্য মাত্র নয়, সে বিষয়ে মধুসূদন নিজেও সচেতন ছিলেন। বাংলাসাহিত্যে তিনি নবশক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন এবং সে শক্তির অন্যতম উৎস ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের যথার্থ প্রকৃতিকে অব্যাহত রেখে তাকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রমাণ আছে তাঁর বহু চিঠিপত্রে ও রচনায়।

বাংলাসাহিত্যে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯) নিয়ে কবির প্রথম আবির্ভাব। এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে।—

শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর
হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয় ॥

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়॥

এই উক্তি 'ডাহা ইংরেজে'র নয়, বরং যথার্থ দেশপ্রেমিক ভারতীয় তথা বাঙালীর উক্তি। শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতির নাম উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় এই নাটকটির বিষয়-বস্তু এবং ভাবাদর্শ তিনি স্বদেশ থেকেই গ্রহণ করেছেন, বিদেশ থেকে নয়। তাঁর পরবর্তী পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) প্রভৃতি অন্যান্য নাটকগুলি সম্বন্ধেও একথা অনেকাংশেই প্রযোজ্য। স্বদেশের সম্পদকে তিনি বিদেশের সাজে সাজিয়ে দিলেন মাত্র।

আঙ্গিকগত দিক্ থেকেও মধুসূদন তাঁর নাট্যজীবনের স্বল্পপরিসরের মধ্যে রচিত মাত্র কয়েকটি নাটকের মাধ্যমে বাংলার জনসাধারণের দৃষ্টি খুলে দিলেন। তিনি নাটকে স্বাদেশিকতা, ঐতিহাসিকতা ও ট্র্যাজিক রস সঞ্চার করে বাংলার নাট্যসাহিত্যের মান ও আদর্শ অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, নাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর ইউরোপীয় নাট্যপদ্ধতি-চর্চারই প্রত্যক্ষ ফল। নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বোধহয় 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামক প্রহসন দুটি। বাংলায় প্রহসন রচনার আদর্শ এই প্রথম। তদুপরি ঐ প্রহসন দুটিতে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা যে এ যুগের পক্ষেও অনবদ্য হয়ে আছে—সে বিষয়ে আমরা সর্বদা সচেতক থাকি না।

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নাট্যাদর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে হয়তো প্রভাবিত হন নি। কিন্তু ভাবে-ভাষায়-আঙ্গিকে মধুসূদন বাংলা নাটক ও প্রহসনের যে ক্ষেত্র গঠন করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী নাট্যকাররা তার উপরেই তাঁদের ফসল ফলিয়েছিলেন। আর আরও পরবর্তী কালে এ পথেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের উত্তরসূরী ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)। কিন্তু মধুসূদনের আদর্শ তিনি ঠিক অনুসরণ করেন নি। তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে গুরুর অপেক্ষা

তিনি উচ্চ আসনের অধিকারী। দীনবন্ধু সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—

> "১৮৫৯।৬০ সাল বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়— উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাংলাকাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।"
>
> - দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা

পূর্বের আলোচনা থেকে অবশ্য আমরা ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে এই উভয় কবি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি সর্বত্র সঠিক বলে মানা যায় না। তবে দীনবন্ধু ছিলেন এই দুইএর মধ্যবর্তী সে কথাটাই এখানে বিবেচ্য। দীনবন্ধুর ছিল অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল এবং এর কারণ হল বাংলার সমাজ সম্পর্কে তাঁর বহুদর্শিতা। কর্মোপলক্ষ্যে তাঁকে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করতে হয়েছে বারেবারে। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল ব্যাপক ও বিচিত্র। তার প্রতিফলন দেখা গেছে তাঁর রচিত বিভিন্ন চরিত্রে। শুধু অভিজ্ঞতা নয়,

> "সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই···তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র;··· ইহা সর্বব্যাপী।···তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।"
>
> —পূর্ববৎ

এই 'সর্বব্যাপী' সহানুভূতির জন্য দীনবন্ধু-রচিত চরিত্রগুলি হয়েছে একেবারে বাস্তব ও উজ্জ্বল। তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক। অপরদিকে, তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) তাঁর নিগূঢ় জীবনবোধের ফলে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত হয়েও তাকে যেন ছাড়িয়ে গেছে। নিমচাঁদ একদিকে ব্যক্তিগতভাবে, অপরদিকে সে যুগের সমাজের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

সে যাই হোক, দীনবন্ধু তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে যুগের বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে গিয়েছিলেন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর এইসব রচনা রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে বা অল্প পরে। কিন্তু তাঁরা যা রেখে গেলেন, তারই ভিত্তিভূমিটুকু রবীন্দ্রনাটকের সহায়ক হয়েছিল এটুকুই এক্ষেত্রে বলা চলে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নির্মিত পথে এরপর আবির্ভাব হয়েছে বহু নাট্যকারের।

তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। একমাত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) রচনায় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ছন্দের নতুন আস্বাদ এবং এইজাতীয় ছন্দ যে বাংলা কাব্যরচনার পথে প্রেরণাদায়ক সে কথা তিনি বলেন গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাট্যদ্বয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে (ভারতী ১২৮৮ মাঘ)। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলেন,—

"কি মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয় ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা, ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

ঐ প্রবন্ধটি রচনার সমকালে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীতের 'ভাঙাছন্দ' নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তাই নাটকগুলিতে 'ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা' লক্ষ করে সেযুগের 'ছন্দপরীক্ষণরত' রবীন্দ্রনাথ যে উপকৃত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।[২৮] কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ঐটুকুই। ভাবের দিক্ থেকে রাবণবধ বা অভিমন্যুবধের তিনি নিন্দাই করেছেন। এছাড়া গিরিশচন্দ্র-রচিত অসংখ্য নাটকের ভাব বা নাট্যাদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

এ বিষয়ে বরঞ্চ তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে (১৮৪৮-১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গাতেই বলেছেন তাঁদের বাড়িতে ছিল নাট্যকে আবহাওয়া এবং ঠাকুরবাড়ির নাট্যাভিনয়ে জ্যোতিদাদার উৎসাহই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করতে ও অভিনয় শিক্ষাদানে ছিলেন পারদর্শী। তাঁর কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত ও রোমান্টিক নাটক এবং মার্জিত রুচির প্রহসন ও নক্‌শা সে যুগের নাট্যামোদী বাঙালীসমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দুমেলার সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে নাটকের সাহায্যে জনচিত্তে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা জাগে। তাই ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী-বিষয়ক কয়েকটি নাটক তিনি রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যাবলী সাহিত্যমূল্য বিচারে খুব উৎকৃষ্ট না হলেও রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের পক্ষে অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল। তিনি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) বলেছেন,—

২৮ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'মুক্তক ছন্দের বিবর্তন', ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২৩-২৪ এবং দেবীপদ ভট্টাচার্য: 'গিরিশ রচনাবলী', (২য় খণ্ড, ১৯৭১), সম্পাদকের নিবেদন, পৃ ১৭

"সরোজিনী প্রকাশের [নভেম্বর ১৮৭৫] পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

আবার দেখি, বিলেতে থেকে কিশোর রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' রচনা করে উৎসর্গ পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম লিখছেন, তখন জ্যোতিদাদাও প্রবাসী ভ্রাতাকে স্মরণ করে 'অশ্রুমতী' (১ম সং ১৮৭৯) নাটক তাঁকেই উৎসর্গ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, গিরিশচন্দ্রের ভাব-পরিমণ্ডলে তথা পৌরাণিক ভক্তিরসের প্লাবনের মধ্যে থেকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রস ও স্বদেশপ্রেমের বাস্তব আবেগ বাংলা নাটকে সঞ্চার করেছিলেন। সেদিক্ থেকে তাঁর নাটক পৃথক্ মর্যাদা পাবার অধিকারী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত নাটকীয় পরিমণ্ডল ও ভাবধারা স্বভাবতঃই কনিষ্ঠভ্রাতার চিত্তে নাটকের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জ্যোতিদাদার বহু নাটকে গান রচনা করে দিয়ে তার ভাবধারাকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন, সে ইতিহাস রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭) প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর অভিনয় জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল।

শুধু নাটকরচনা বা অভিনয় নয়, সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) পূর্বে যেসব শৌখিন অভিজাতশ্রেণী বাংলা অভিনয়ের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৯] বাড়িতেও যে রঙ্গমঞ্চ গঠন করে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করানো যায়, তার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই। এইসব প্রভাব তাঁর মনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল, এ অনুমান নিরর্থক নয়। মধুসূদন থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে পটভূমিকা স্থাপিত হয়েছিল, তা বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিত্তের জাগরণ ও দৃষ্টির উন্মোচনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তার সঙ্গে বিলাতে গিয়ে বিলাতী নাটক, নাট্যাভিনয়, এমন কি, নাটকীয় সংলাপের উচ্চারণভঙ্গীটি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শ্রুতিবোধকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।[৩০]

২৯ দ্রষ্টব্য—বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত : 'বাংলা থিয়েটারের বয়ঃসন্ধি ও ঠাকুরবাড়ির নাট্যালয়', দেশ ১৩৮০ বৈশাখ ২২

৩০ রবীন্দ্রনাথ : 'ছন্দ', পৃ ৮-৯

অপরদিকে ছিল বাংলার মধ্যযুগীয় যাত্রাগানের বৈশিষ্ট্য। সবগুলি আদর্শ তাঁর হৃদয়-কোরকের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। তারপর তা ক্রমবিকশিত ও প্রস্ফুটিত হল আপন বর্ণ, সৌরভ ও সৌন্দর্য নিয়ে।

১০

কথাসাহিত্য: উপন্যাস—উপন্যাস-সাহিত্য নিতান্তই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। মানুষ যখন স্বর্গ থেকে মর্ত্যের দিকে চাইল, দেখা দিল তার জীবনে মানুষের জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল, তখনই উপন্যাসের আবির্ভাব। এর পূর্বে উপন্যাসের অঙ্কুর যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে তখনও বাঙালীর মন সচেতন হয়ে ওঠে নি। পাশ্চাত্ত্য হাওয়ার ধাক্কায় উপন্যাসের সেই ক্ষীণ আভাসটুকু একেবারে পরিপূর্ণ ও বাস্তব রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে মানুষের জীবন সম্বন্ধে গভীর মমতাবোধ, অপরদিকে সুপরিণত বাংলাগদ্যের। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ দুইএরই অভাব ছিল।

আধুনিক যুগে উপন্যাসের প্রথম পথনির্মাতা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আলালের ঘরের দুলাল'। ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয় দিক্ থেকেই তিনি বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পথকে করলেন সুগম। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।—

> "আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোনো বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।…উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়,…।
>
> আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,…যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল।"
>
> —বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান

বাংলাসাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদের যে স্থান তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে বঙ্কিমের এই উক্তিতে। তবে স্বভাবতঃই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দুর্বলতা কিছু থেকে

গিয়েছিল। প্যারীচাঁদের ভাষাও যে সর্বতোভাবে সার্থক হয়নি, তাকে যে আরও উন্নত করার অবকাশ ছিল সে বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ভাষা ও বিষয়ের সামঞ্জস্যে আলাল আধুনিক উপন্যাসের আদিরূপ হলেও উপন্যাসের উপযোগী শিল্পরূপ তখনও তাতে পরিস্ফুট হতে পারে নি। তবুও প্রথম সূচনা হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানলাভের যোগ্য

দর অনুসরণ করে আরও যে-সব উপন্যাস-রচয়িতার আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই তেমন সাফল্য দেখাতে পারলেন না। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৬২-৬৩)-এর অন্তর্গত 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' কাহিনীটির মধ্যে কিছুটা উপন্যাসের রস উপলব্ধি করা যায়। অনেক সমালোচকই কাহিনীটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) পূর্বাভাস লক্ষ করে থাকেন।

এই যুগে কোনো কোনো লেখক ঠিক উপন্যাস নয়, নকৃশাজাতীয় রচনায় সাধারণ মানুষের জীবনকথা অঙ্কন করেছিলেন। এর মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাচার নকৃশা' (১৮৬৪) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সাধারণ জীবনের সহজ চিত্র তাঁর মত করে আর কেউ সেদিন আঁকতে পারেন নি। তবে এই রচনায় উপন্যাসের কোনো লক্ষণ ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠলেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৮১)। প্রখর দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিণত গদ্য নিয়ে বাংলা উপন্যাসে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> "পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র'

বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ও রচনার বৈচিত্র্য তথা উপন্যাসের পূর্ণ সাফল্য রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই যথার্থভাবে প্রতিপন্ন করা যাবে। আজ উপন্যাস যখন আমাদের একান্ত পরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের সর্বদা স্মরণ থাকে না যে,

"বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত...নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন।"

—পূর্ববৎ

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি উক্তি স্মরণীয়।—

"নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র।"

—বাংলাভাষা পরিচয় (১৯৩৮)

উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রথম আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে রমেশচন্দ্র দত্তও বলেছিলেন,—

"যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল।...কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব দেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে।"

—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১ শ্রাবণ, পৃ ৪

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি ছিল 'কাহিনী'। ইংরেজিতে এগুলিকে বলে রোমান্স। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত,—

"আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"

—প্রবাসী, ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ ৮০৬-৭

তাঁর এই 'কাহিনী'র অভিনবত্ব বাঙালীর মনকে আলোড়িত করল বঙ্গদর্শনের মারফত। তাই,—

"'বঙ্গদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলা কারও ঘুম থাকত না।" কারণ, "সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।"

—'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১২

বলা বাহুল্য, সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথও এই নতুন-পাওয়া বাঙালীর নিজের ঘরের কাহিনী পরম আনন্দ ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে উপভোগ করতেন। সেই সঙ্গে বঙ্কিমের ভাষা ও রচনা-আদর্শটিও তাঁর মনেঃ

অবচেতনে সঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি যে উপন্যাস-সাহিত্যেরও একজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টিকার হতে পেরেছিলেন তার প্রথম ভিত্তিটি স্থাপিত হয়েছিল এখান থেকেই। প্রথম জীবনে ইতিহাসের রস আশ্রয় করে ও পরে সামাজিক জীবনকে উপন্যাসে রূপ দিতেও তিনি বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথটিকেই স্মরণ রেখেছিলেন। তবে স্বভাবতঃই তাঁর স্বাতন্ত্র্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মতো তাঁর উপন্যাসকেও করেছিল একান্তভাবে তাঁর স্বকীয় সম্পদ্।

বঙ্কিমের সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯) প্রথমদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রেরণায়। সামাজিক উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন দুটি। উপন্যাস-রচনায় সে যুগে বঙ্কিমেরই প্রায় সমকালে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-৯১) 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) সামাজিক উপন্যাস হিসাবে বাঙালীর মনে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। বস্তুতঃ, স্বর্ণলতা ছিল বিষবৃক্ষের চেয়েও বাস্তবতর। কিন্তু তারকনাথের রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিল্পগুণে সমুজ্জ্বল হতে পারে নি। তদুপরি, তিনি 'স্বর্ণলতা'র ধারাটিকেও আর সুদূর প্রবাহিত করলেন না। তাই তাঁর সামাজিক উপন্যাসের সাফল্য সেখানেই শুদ্ধ হল।

নিজেদের পরিবারে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করতে দেখেছিলেন ভগিনী স্বর্ণকুমারীকে। সামাজিক উপন্যাস রচনায় স্বর্ণকুমারী সে যুগে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর গল্প, কবিতা, নাটক, গান সবগুলির মত উপন্যাসেরও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অনুরাগী ও উৎসাহী পাঠক।

ইতিহাসের খাতিরে এইসব ঔপন্যাসিকের নাম ও তাঁদের উপন্যাসগুলি বিশেষভাবেই উল্লেখ করার যোগ্য। কিন্তু বর্তমান আলোচনায়, রবীন্দ্রমানসের বিকাশে এইসব উপন্যাস বিশেষ ছাপ রাখতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করেছেন সবচেয়ে বেশি। কারণ, শিল্প-প্রতিভায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এঁদের সকলের উপরে।

কথাসাহিত্য : ছোটগল্প— কথাসাহিত্যের ছোটগল্প শাখাটির প্রথম ও শ্রেষ্ঠশিল্পী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশে এর পূর্বে গল্প-আখ্যান প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথই যথার্থ ছোটগল্পের জীবন দান করেন। তাঁর আগে সঞ্জীবচন্দ্রের দু'একটি রচনায় গল্পের কিছু লক্ষণ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত গল্পের শিল্পকলা সম্বন্ধে কেউ অবহিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথই

গল্পকে প্রথম শিল্পময় করেন। তার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী ছোটগল্পকারদের হাতে বাংলা ছোটগল্প একদা যে মানে উন্নত হয়েছিল, তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশাখাগুলির সমকক্ষতা লাভের যোগ্য হয়েছিল।

১১

প্রবন্ধ—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ প্রবন্ধ-সাহিত্য। ব্যক্তির চিন্তাশীল ও মননশীল উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশই হল প্রবন্ধ। আধুনিক যুগের বহু মনীষীর মনে সেদিন জীবনের নানা জিজ্ঞাসা উত্থিত হয়ে বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করা উচিত অক্ষয়চন্দ্র দত্তের (১৮২০-৮৬)। তাঁর মনে কোনো আবেগের স্থান ছিল না। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে তিনি বাঙালী মানসের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক-পদ গ্রহণ করে তিনি নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চিন্তাশীল গদ্যলেখকদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) এবং 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩) জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে প্রায় 'বঙ্গদর্শনে'র মতই জনপ্রিয় হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল ও তৎকালীন অন্যান্য মনীষীরা তাঁর পত্রিকায় পাশ্চাত্ত্য রীতিতে গ্রন্থ-সমালোচনা আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে আধুনিক বাংলা সমালোচনা প্রবর্তনের কৃতিত্বটি সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলাল ও তদনুসারী সাহিত্যিক-গোষ্ঠীরই প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরের পড়া'র যুগেই সেজদাদার আলমারি থেকে এই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা সংগ্রহ ও পাঠ করে কত 'খুশি' হয়েছিলেন তার পরিচয় দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে (ঘরের পড়া)। তাছাড়া 'ভারতী' পত্রিকার যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নিকট রচনা-সংগ্রহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলালেরও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন। 'সারস্বত সমাজে'র সভাপতি রূপেও তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে পরিচয় দিয়ে বলেছেন,—

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে। ··এক-একদিন···তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। · কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া, ভারি একটা দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন।"

—জী-স্মৃ. 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র'

উদ্ধৃতি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও, তৎকালীন বাংলাদেশ ও সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের যে কতবড় প্রতিষ্ঠা ও মনীষা ছিল তা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার স্বীকৃতিও আছে তাঁর এই উক্তিতেই। শিক্ষায়, সাহিত্যালোচনায়, বিশেষতঃ মননশীলতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখ অন্য কারো চেয়ে কম ছিল না। নিজের সাহিত্যজীবনে তিনি তাঁর দানটিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনকে উজ্জ্বলতর ও প্রখর আলোকে আলোকিত করেছিলেন আর একজন 'সব্যসাচী'; তিনি বঙ্কিমচন্দ্র।

"সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ··রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র'

বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উপন্যাস রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন তেমনি ঐ পত্রিকাই ছিল প্রধানতঃ তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলীরও প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাহিত্যে কর্মযোগী' বলেছেন। কারণ, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি চিন্তা করেছেন, লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। নবীন বঙ্গসাহিত্যে সকল বিষয়েই আদর্শ

স্থাপন করে যাওয়া ছিল বঙ্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য। 'নির্মল, শুভ্র, সংযত' হাস্যরস তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাসাহিত্যে আনয়ন করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি সহজ, লঘু ও কৌতুকাবহ ভাষায় তিনি বাঙালীজাতির পরাধীন প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়েছেন। কমলাকান্ত কবিপ্রেমিক তথা স্বদেশপ্রেমিক।—

"তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে।...'আনন্দমঠে'র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ।...আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা শুরু।"

—সাহিত্যসাধক চরিতমালা ২২, ২য় খণ্ড

আধুনিক যুগের পটভূমিকায় তিনি গীতার শ্রীকৃষ্ণকে নূতন দৃষ্টিতে বিচার করে হিন্দুধর্মের পুনর্বিচারে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গদর্শনের পরে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকাদ্বয় তাঁর এই আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন,—

"বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।"

এইভাবে 'ভগীরথের ন্যায় সাধনা' করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে 'ভাব-মন্দাকিনীর অবতারণ' করেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চাও তাঁর হাতে শাণিত ও দীপ্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করে একদিকে বঙ্কিম নিজে যেমন অসংখ্য ভাবের প্রবন্ধ লিখলেন, তেমনি এক বিরাট্ সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠে বাংলাসাহিত্যকে আরও বিকশিত করে তুলল। এই পটভূমিকাতেই বালক রবীন্দ্রনাথের 'হৃদ্‌পদ্ম' বিকশিত হয়েছিল। তখন থেকেই বঙ্কিমের রচনাবলী তাঁর সামনে ছিল আদর্শস্থানীয়।

বঙ্কিমের সাহিত্যাদর্শ ও ভাষাদর্শ রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্ত জীবনই স্মরণ রেখেছিলেন। স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা যে আদর্শ আমাদের দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথের মনও তাতে বিশেষ আন্দোলিত হয়। তার পরিচয় নবতর ও বিচিত্রতররূপে পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে

দেখা দিয়েছে বারেবারেই।[৩১] বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের প্রভাবে রবীন্দ্রমননের যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল তাকে আরও উর্বর করে তুলতে বঙ্কিমানুসারী প্রবন্ধ-সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও তাঁদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যথেষ্ট সহায়ক হল। এঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর পত্রিকা 'আর্যদর্শন' (১৮৭৪), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও তাঁর দুটি পত্রিকা সাধারণী (১২৮০) ও নবজীবন (১২৯১), চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং তৎসম্পাদিত পত্রিকা 'বান্ধব' (১৮৭৪), রাজনারায়ণ বসু ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেনও ছিলেন তাঁর 'বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে' প্রবেশের অদ্বিতীয় বন্ধু। আরও একজনের নাম এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র। তিনি তাঁর বহু সাহিত্যকীর্তির মধ্যে প্রধানতঃ অমর হয়ে থাকবেন 'পালামৌ' (১২৮৭-৮৯) গ্রন্থটির জন্য। সৌন্দর্য, কবিত্ব, প্রকৃতিচিত্র, দার্শনিকতা, মনন-শীলতা তথা ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসাবে 'পালামৌ' বাংলাসাহিত্যের একটি অনবদ্য ও আদর্শ গ্রন্থ।

এই সমস্ত সাহিত্যিকদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন অল্পাধিক উপকৃত হয়েছিল এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। উল্লিখিত পত্রিকাগুলির অনেক-গুলিতেই রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে, যথাযোগ্য স্থানে। একদা মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে বলেছিলেন,—

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই উক্তি সমভাবে প্রয়োগ করা যায়। তিনিও বিভিন্ন সাহিত্যিকের রসমাধুর্য গ্রহণ করে যে বিশাল প্রবন্ধসাহিত্য রচনা করলেন, তা একান্তভাবেই তাঁর স্বকীয় সম্পদ্। আর, তাঁর এই প্রবন্ধসাহিত্যই যে তাঁর সৃষ্ট কাব্যনাটকাদি সমগ্র সাহিত্যের সুদৃঢ় ভূমিকারূপে কাজ করেছে এবং তাঁর সুগভীর ও বিচিত্র কবিকল্পনার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে, তা বিচক্ষণ সাহিত্যদ্রষ্টামাত্রই স্বীকার করবেন। পরবর্তী প্রবন্ধসাহিত্যের অধ্যায়ে তার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যাবে।

৩১ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ', কালি ও কলম, ১৩৭৯ বৈশাখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিপর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যের সাধারণ পরিচয়

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্বের (১৮৭৪-১৮৮৬) রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে রচনাগুলির কালক্রম সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর দ্বারা বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের ক্রমবিকাশ ও সাহিত্যিক স্ফুরণের স্তরগুলি অনুধাবন করা সহজ হবে। তাই এই অধ্যায়ে আদিপর্বে রচিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের রচনাকাল, প্রথম প্রকাশ (সাময়িক পত্রাদিতে) এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের (প্রথম সংস্করণ) তারিখ ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে একটি তালিকা নির্মাণের প্রয়াস করা গেল। গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ প্রধানতঃ উল্লিখিত হলেও যেসব গ্রন্থের পরিবর্তন ও সংস্করণ খুব বেশি হয়েছে, সেগুলির গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত রূপটির কথাও বলা হল। এই পর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির অন্তর্গত প্রত্যেকটি রচনার (গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি) খুঁটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একটি তালিকা নির্মাণ করা হয়েছে 'পরিশেষ' বিভাগে।

'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মোট তেইশটি গ্রন্থ ('রামমোহন রায়'-পুস্তিকাসহ) প্রকাশিত হয়েছিল। 'করুণা' ও 'মুকুট' উপন্যাসদ্বয় গ্রন্থমূল্য লাভেরই উপযোগী ; কিন্তু গ্রন্থরূপে প্রকাশ পায়নি। তাই এ ক্ষেত্রে ঐ দুটিকে গ্রন্থতালিকার অন্তর্গত করে বিবৃত করা হল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল অনুযায়ী তালিকা এখন পর্যন্ত বহু জায়গাতেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধে গ্রন্থগুলির ক্রম নির্দিষ্ট হল গ্রন্থভুক্ত কবিতা বা প্রবন্ধাদির রচনারম্ভের কাল অনুযায়ী। প্রত্যেকটি গ্রন্থের নামের পাশে রচনারম্ভের কাল থেকে রচনাসমাপ্তি পর্যন্ত সময় নির্দেশ করা হয়েছে। আর, যেসব গ্রন্থের রচনাকাল উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের প্রথম তারিখ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ করা গেল। 'প্রকাশ' শব্দটি সাময়িক পত্রে প্রকাশের অর্থেই ব্যবহার করেছি। যেসব গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে রচিত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি, সেগুলির কেবল গ্রন্থাকারে রচনা বা প্রকাশের তারিখই উল্লিখিত হয়েছে। মোটামুটি ভাবে

গ্রন্থপ্রকাশের ইংরেজি তারিখগুলি দেওয়া হয়েছে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'র তারিখ অনুসরণ করে এবং বাংলা তারিখগুলি অনুসন্ধান করে উল্লেখ করা হল তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে।

এই কালপর্বের মধ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এমন বহু কবিতা ও প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি তৎকালীন কয়েকটি সাময়িক পত্রিকারই অঙ্গীভূত হয়ে আছে, গ্রন্থভুক্ত হয় নি ; সম্প্রতি কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আবার এমন রচনাও আছে যেগুলি আজও পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাতেই রয়ে গেছে। সেইসব রচনাগুলিকে এ ক্ষেত্রে যথাযোগ্য গ্রন্থের অঙ্গীভূত করা হল সংযোজন-অংশ রূপে। এমন কি, যোগ্য গ্রন্থটি প্রকাশের পরেও রচিত অথবা প্রকাশিত, অথচ, তার অন্তর্গত হবার যোগ্য, এমন সব কবিতা বা প্রবন্ধগুলিকেও তারই অংশ রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে নিজের বিচার ও বিবেচনা অনুসারে সংযোজিত অংশগুলিকে নির্বাচন করেছি। তাই সিদ্ধান্ত সর্বত্রই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত না-ও হতে পারে। তবুও যথাসাধ্যভাবে উপযুক্ত মূল্য দেবারই প্রচেষ্টা করা গেল।

এই গ্রন্থসূচীর শেষাংশে উল্লিখিত কয়েকটি ছোটগল্প, হেঁয়ালিনাট্য ও ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ সেযুগে কোনো গ্রন্থের অন্তর্গত হয়নি, বর্তমানে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। ঐ বিচ্ছিন্ন রচনাগুলিকে সংযোজিত করার মত কোনো গ্রন্থ তখনও প্রকাশ হয় নি। তাই ঐ রচনাগুলিকে বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে এবং কালক্রম অনুসরণ করে 'অনুষঙ্গ' হিসাবে উল্লেখ করা হল। 'পরিশেষ' বিভাগে এগুলি যথাস্থানে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের তৃতীয়াংশে আলোচ্য নিবন্ধের সমগ্র কালপরিমাণকে ঘটনাবলীর প্রভাব তথা রবীন্দ্রমানসের বিকাশ অনুসারে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে রবীন্দ্রচিন্তার বিবর্তন ও ক্রমপরিণতির ধারাটি পরিস্ফুট করারও একটা প্রচেষ্টা করা গেল।

গ্রন্থানুক্রম

১। শৈশবসংগীত : কাব্যগ্রন্থ।

রচনারম্ভ— আ ১২৮১ / ১৮৭৪-রচনাসমাপ্তি ১২৮৬ / ১৮৭৯

গ্রন্থ—১৮৮৪ মে ২৯ [১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ১৭]।

'শৈশবসংগীত' প্রথম সংস্করণের সতেরোটি কবিতার মধ্যে তেরোটি প্রথম 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৪ অগ্রহায়ণ-১২৮৭ পৌষ)। তিনটি

কবিতা পূর্বরচিত কবিতার রূপান্তর ও একটি গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।"

তদনুযায়ী গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির রচনাকাল নির্ণয় হল। 'শৈশবসংগীতে'র কবিতাগুলি রচনার প্রায় সমকালে লিখিত আরও অন্ততঃ কুড়িটি কবিতা আছে; সেগুলি 'শৈশবসংগীতে'র অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কবিতাগুলিকে উক্ত গ্রন্থের সংযোজন-অংশ রূপে গ্রহণ করা যায়। নীচে যথাসম্ভব রচনার কাল অনুসরণ করে কবিতাগুলিকে সাজানো হল :—

বিচ্ছেদ (আ ১৮৭৪), মদনভস্ম (আ১৮৭৪), ম্যাক্‌বেথ-'ডাকিনী' (আ ১৮৭৪), ভারতভূমি (১৮৭৪ জানুআরি), অভিলাষ (১৮৭৪ নভে-ডিসে), হিন্দুমেলায় উপহার (১৮৭৫ ফেব্রুআরি/১২৮১), হোক্ ভারতের জয় (১২৮১), প্রকৃতির খেদ (১২৮২), প্রলাপ-১ (১২৮২), প্রলাপ-২ (১২৮২), প্রলাপ-৩ (১২৮৩), ভারতী (১২৮৪), হিমালয় (১২৮৪), আগমনী (১২৮৪), 'প্রথমসর্গ' (১২৮৪), 'শৈশব-সঙ্গীত' (১২৮৪), উপহার-গীতি (১২৮৪), 'পাষাণ হৃদয়ে কেন' (১২৮৪), দিল্লি-দরবার (১২৮৪), অবসাদ (১২৮৫)।

'প্রথমসর্গ', 'শৈশব-সঙ্গীত', 'উপহার-গীতি' ও 'পাষাণ হৃদয়ে কেন'— এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে কোনো সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় নি। এগুলির পাণ্ডুলিপি আছে 'মালতীপুঁথিতে'। বর্তমানে 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'য় (১ম খণ্ড, ১৯৬২) মুদ্রিত হয়েছে। শৈশবসংগীতের যুগেই লেখা 'বিষ ও সুধা' (আ ১২৮৬) কবিতাটি 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রথম সংস্করণে (১৮৮২/১২৮৯) গৃহীত ও পরে বর্জিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে (১৯৬৯) পুনরায় গৃহীত হয়েছে। তাই কবিতাটিকে উপরের তালিকাভুক্ত করা হল না।

২। বনফুল : কাব্যোপন্যাস।

প্রকাশ— ১২৮২ অগ্রহায়ণ-১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক।

গ্রন্থ— ১৮৮০ মার্চ ৯ [১২৮৬ ফাল্গুন ২৭]।

রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বনফুলে'র স্থান দ্বিতীয় হলেও রচনাকালের দিক্ থেকে এটি পূর্ববর্তী। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার (১২৮২ অগ্র-১২৮৩ আ-কা) সাতটি সংখ্যায় এর প্রথম প্রকাশ।

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী : কাব্যগ্রন্থ।

রচনারম্ভ—আ ১২৮৩-৮৪/১৮৭৬-৭৭-রচনাসমাপ্তি আ ১২৯২-৯৩/১৮৮৫-৮৬

গ্রন্থ—১৮৮৪ জুলাই ১ [১২৯১ আষাঢ় ১৮]।

কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩) ভূমিকায় লিখিত আছে,—

"ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্তী কালের লেখাও আছে।"

১৫ বৎসর বয়সে যদি লেখা শুরু হয়, তবে ১২৮৩/১৮৭৬ সালে এর আরম্ভকাল বলে ধরে নিতে হবে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (২য় খণ্ড) ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনায় কবি বলেছেন, প্রাচীন পদাবলীসাহিত্য নিয়ে তিনি যখন 'নাড়াচাড়া' করতেন, তখন মোটামুটিভাবে তাঁর বয়স ছিল চোদ্দ। অতএব, তার এক বছর পর থেকে তিনি যে পদ লেখার চেষ্টা করেছিলেন, সে অনুমান একেবারে অসমীচীন নয়। তবে এই পদরচনার নতুন পরীক্ষা কবি দীর্ঘদিন ধরে করেছিলেন সে স্বীকৃতি তাঁর নিজের উক্তিতেই আছে।—

"ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।"

—সূচনা, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

ভানুসিংহের তেরোটি পদ 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১২৮৪ আশ্বিন-১২৯০ জ্যৈষ্ঠ)। সাতটি পদ গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত এবং একটি বাল্যরচনা। 'কো তুহুঁ' পদটি ভানুসিংহের প্রথম সংস্করণের অন্তর্গত ছিল না। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রচার' পত্রিকায় (১২৯২-৯৩)।[১] পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। ১৩০১ সালে "ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী সম্বলিত" কড়ি ও কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণে পদটি ভানুসিংহের পদাবলী অংশে স্থান পায়।

৪। করুণা : উপন্যাস।

প্রকাশ— ১২৮৪ আশ্বিন-১২৮৫ ভাদ্র।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮৪ আশ্বিন-১২৮৫ ভাদ্র)। উপন্যাসটি সাতাশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থাকারে কখনো প্রকাশ হয়নি। তবে বর্তমানে 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ডে পরিশিষ্ট অংশে (১৩৬৯/১৯৬২) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে (১৩৬৮/১৯৬১) সংকলিত হয়েছে।

৫। কবি কাহিনী : কাব্য।

প্রকাশ—১২৮৪ পৌষ-১২৮৪ চৈত্র।

গ্রন্থ—১৮৭৮ নভেম্বর ৫ [১২৮৫ কার্তিক ২০]।

১ দ্রষ্টব্য : 'শনিবারের চিঠি,' ১৩৪৬

ষোলো বৎসর বয়সে লেখা কবির 'কবিকাহিনী' ১২৮৪ সালের ভারতী পত্রিকায় পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বনফুলের পরে লেখা হলেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত এটি কবির প্রথম পুস্তক।

৬। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র : ভ্রমণবৃত্তান্ত ও পত্রপ্রবন্ধ।

রচনারম্ভ—১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০/১২৮৫ ভাদ্র।

প্রকাশ—১২৮৬ বৈশাখ-১২৮৭ শ্রাবণ।

গ্রন্থ—১৮৮১ অক্টোবর ২৫ [১২৮৮ কার্তিক ১০]।

সতেরো বছর পাঁচমাস বয়সে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০) কবি বিলেত যাত্রা করেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র প্রথম পত্রে কবি লিখেছেন,—

"বিশে সেপ্টেম্বর আমরা 'পুনা ষ্টীমারে' উঠলেম।"

অর্থাৎ পথেই পত্রলেখার সূত্রপাত। সুতরাং গ্রন্থটির রচনারম্ভ হয় ১৮৭৮/১২৮৫ সালে। পরে 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১২৮৬ বৈশাখ-১২৮৭ শ্রাবণ)। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

৭। ভগ্নহৃদয় : গীতিকাব্য।

রচনারম্ভ—আ ১৮৭৯/১২৮৬-রচনাসমাপ্তি আ ১৮৮১/১২৮৮, ৯ বৈশাখের পূর্বে।

গ্রন্থ—১৮৮১ জুন ২৩ [১২৮৮ আষাঢ় ১০]।

'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন,—

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো।" অর্থাৎ ১৮৭৯/১২৮৬ সালে তিনি লিখতে শুরু করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বিলেতে। পরে দেশে ফেরার পথে কিছু অংশ লেখেন ও দেশে ফেরার পর (১৮৮০ ফেব্রুআরি / ১২৮৬ মাঘ) কাব্যটি লেখা শেষ হয়। চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত দীর্ঘ কাব্যটির প্রথম ছয় সর্গ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৭ কার্তিক-ফাল্গুন সংখ্যা)। বাকি অংশ একত্রে গ্রন্থে প্রকাশিত। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন সমগ্র কাব্যটির রচনা সম্পূর্ণ হয় ১২৮৮, ৯ বৈশাখের পূর্বে; অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রার পূর্বে।[২] পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

৮। সন্ধ্যাসংগীত : কাব্য।

প্রকাশ—১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ-১২৮৯ বৈশাখ।

গ্রন্থ—১৮৮২ জুলাই ৫ [১২৮৯ আষাঢ় ২২]।

---

২ দ্রষ্টব্য : পরিশেষ, ভগ্নহৃদয়

সন্ধ্যাসংগীত প্রথম সংস্করণের পঁচিশটি কবিতার মধ্যে বারোটি কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ-১২৮৯ বৈশাখ)। বাকি কবিতাগুলি গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত। কবি গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন, —

"ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, কেবল 'বিষ ও সুধা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'বিষ ও সুধা' শৈশবসংগীত যুগের রচনা।

৯। সমালোচনা : প্রবন্ধ গ্রন্থ।

প্রকাশ—১২৮৭ ভাদ্র-১২৯১ ফাল্গুন।
গ্রন্থ—১৮৮৮ মার্চ ২৬ [১২৯৪ চৈত্র ১৪]।

'সত্যের অংশ' প্রবন্ধটি ছাড়া এই গ্রন্থের সবগুলি প্রবন্ধই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ হয় (১২৮৭ ভাদ্র-১২৯১ ফাল্গুন)। গ্রন্থটির সমকালে বা তৎপূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ ১৯টি সমালোচনা প্রবন্ধ আছে ; সেগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় নি। সেইসব প্রবন্ধগুলিকে সমালোচনা গ্রন্থের সংযোজন-অংশ রূপে গণ্য করা যায়।—

ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী (১২৮৩), মেঘনাদবধ কাব্য (প্রথম প্রবন্ধ-১২৮৪), বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য (১২৮৪), স্যাক্‌সন্ জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্‌সন্ সাহিত্য (১২৮৫), বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (১২৮৫), কবিতা পুস্তক (বঙ্কিমের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-১২৮৫), পিত্রার্কা ও লারা (১২৮৫), গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ (১২৮৫), নর্মানজাতি ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য (১ম প্রস্তাব-১২৮৫ ও ২য় প্রস্তাব-১২৮৬), চ্যাটার্টন বালক কবি (১২৮৬), প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ [বিদ্যাপতি] (১২৮৮), প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ [উত্তর-প্রত্যুত্তর] (১২৮৮), বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট (১২৮৮), অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি (১২৮৮), "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" (গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাটকদ্বয়ের সমালোচনা-১২৮৮), প্রত্যুত্তর (১২৮৯), "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা-১২৯০), কৈফিয়ৎ (বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধের সমালোচনা-১২৯১)।[৩]

১০। প্রভাতসংগীত : কাব্যগ্রন্থ।

প্রকাশ—১২৮৭ আশ্বিন-১২৯০ বৈশাখ।
গ্রন্থ—১৮৮৩ মে ১১ [১২৯০ জ্যৈষ্ঠ ২৯]।

৩ দ্রষ্টব্য : পরিশেষ

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' কবি লিখেছেন,—

> " "শরতে প্রকৃতি", "শীত" ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যতীত প্রভাতসঙ্গীতের আর সমুদয় কবিতাগুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।"

প্রভাতসংগীত প্রথম সংস্করণের একুশটি কবিতার মধ্যে 'শরতে প্রকৃতি', 'শীত' প্রভৃতি কবিতাগুলিসহ যোলোটি কবিতা তত্ত্ববোধিনী ও ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৭ আশ্বিন-১২৯০ বৈশাখ)। কিন্তু কবি-উল্লিখিত 'শরতে প্রকৃতি' প্রভৃতি কবিতার রচনাকাল আরও আগে। তবে তারিখ সঠিক বলা যায় না বলে এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। বাকি পাঁচটি কবিতা গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত।

১১। বাল্মীকিপ্রতিভা : গীতিনাট্য।

গ্রন্থ—১৮৮১ ফেব্রুআরি ১২ [১২৮৭ ফাল্গুন ২]।

বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে অভিনয় উপলক্ষ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয়। জোড়াসাঁকো বাড়িতে নাটকটির অভিনয় হয় ১৮৮১ ফেব্রুআরি ২৬/১২৮৭ ফাল্গুন ১৬। গ্রন্থটি তৎপূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত। অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি ও ভ্রাতুষ্পুত্রী, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা সরস্বতী সেজেছিলেন।— "বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"

১২। রুদ্রচণ্ড : নাটিকা।

রচনা—আ ১২৮৮, ৯ বৈশাখের পূর্বে।

গ্রন্থ—১৮৮১ জুন ২৫ [১২৮৮ আষাঢ় ১২]।

প্রথমবার বিলেত থেকে ফেরার পর 'ভগ্নহৃদয়' রচনার সমকালে রচিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন, দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার পূর্বে ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড দুটি গ্রন্থই সম্পূর্ণ রচিত হয়ে যায়।

Hindoo Patriot-দৈনিক পত্রে (১৮৮১ মে ২৩/১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ ১১) রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং তারও দুই সপ্তাহ পূর্বে (৯ মে) ওই পত্রে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকৃত হয়। অতএব, রুদ্রচণ্ড গ্রন্থাকারে তৎপূর্বেই প্রকাশ হয়। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরিতে গ্রহণের তারিখ তার অনেক পরে (২৫ জুন, ১৮৮১)। বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখ যে সর্বত্র অভ্রান্ত তাও নয়; কিন্তু অন্য নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে ঐ লাইব্রেরির তারিখই অনুসৃত হল।[৪]

৪ দ্রষ্টব্য—পুলিনবিহারী সেন : 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী', পৃ ৪২-৪৩ ; এ প্রসঙ্গে 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮৮, ৩য় সংখ্যা) 'রুদ্রচণ্ডে'র সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

রুদ্রচণ্ডই রবীন্দ্ররচিত প্রথম নাটক। ১৮৭৩ (মার্চ) সালে বোলপুরে লেখা 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের সঙ্গে এর মিল লক্ষণীয়, হয়তো বা তারই নাট্যরূপ।[৫]

১৩। কড়ি ও কোমল : কাব্যগ্রন্থ।

প্রকাশ—১২৮৮ আষাঢ়-১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন।

গ্রন্থ—১৮৮৬ নভেম্বর ১৭ [১২৯৩ অগ্রহায়ণ ২]।

'কড়ি ও কোমলে'র বহুসংখ্যক (১১৭) কবিতার মধ্যে অনেকগুলি কবিতা (৪৫, বিদেশী ফুলের গুচ্ছসহ) ভারতী, প্রচার, বালক এবং ভারতী ও বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৮ আষাঢ়-১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন)। তিনটি কবিতার রচনাকাল অনুমান করে উল্লেখ করা হয়েছে 'পরিশেষে'র তালিকায়। সাময়িক পত্রে অপ্রকাশিত কবিতাগুলি গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত ও তৎপূর্বেই রচিত বলে অনুমান করা যায়। কড়ি ও কোমল গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে বহু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন হয়। সে সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত বিবরণদানে নিরস্ত থাকা গেল।[৬] কড়ি ও কোমলে কয়েকটি গানও আছে।

১৪। বিবিধ প্রসঙ্গ : প্রবন্ধগ্রন্থ।

প্রকাশ—১২৮৮ শ্রাবণ-১২৮৯ বৈশাখ।

গ্রন্থ—১৮৮৩ সেপ্টেম্বর ১১ / ১৮০৫ শক [১২৯০ ভাদ্র ২৭]।

১২৮৮ সালের বর্ষাকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত চন্দননগরে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচনা করেন এবং ঐ সময় থেকেই ভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে (১২৮৮ শ্রাবণ-১২৮৯ বৈশাখ)। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' রচনার সমকালে, তৎপূর্বে বা পরে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরও অন্ততঃ ২৮টি প্রবন্ধ আছে; সেগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্তর্গত হয়নি। কতকগুলি প্রবন্ধ গ্রন্থপ্রকাশের পরেও রচিত। অথচ, ভাবের দিক্ থেকে এই গ্রন্থেরই যোগ্য। সেইসব প্রবন্ধগুলিকে বিবিধ-প্রসঙ্গের সংযোজন-অংশরূপে গণ্য করে এবং যথাসম্ভব রচনার কাল অনুসরণ করে নীচে সাজানো হল।—

বঙ্গে সমাজ বিপ্লব (১২৮৪), সান্ত্বনা (১২৮৪), সামুদ্রিক জীব প্রথম প্রস্তাব কীটাণু (১২৮৫), ইংরেজদিগের আদবকায়দা (১২৮৫), অকারণ কষ্ট (১২৮৭),

৫ পূর্ববৎ

৬ দ্রষ্টব্য—পুলিনবিহারী সেন : 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী', পৃ ১৬৮-১৭৭

পারিবারিক দাসত্ব (১২৮৭), জুতাব্যবস্থা (১২৮৮),[৭] যথার্থ দোসর (১২৮৮), চীনে মরণের ব্যবসায় (১২৮৮), জাপানের বর্তমান উন্নতির মূলপত্তন (১২৮৮), গোলামচোর (১২৮৮), নিমন্ত্রণ সভা (১২৮৮), জাপানের বর্তমান উন্নতি (১২৮৮), চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় (১২৮৮), দারোয়ান (১২৮৮), জীবন ও বর্ণমালা (১২৮৮), রেলগাড়ি (১২৮৮), সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় (১২৮৮), চেঁচিয়ে বলা (১২৮৯), জিহ্বা আস্ফালন (১২৯০), সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার [প্রতিবাদ] (১২৯০), তৃতীয় পক্ষ (১২৯০), ন্যাশনাল ফণ্ড (১২৯০), টোনহলের তামাশা (১২৯০), অকালকুষ্মাণ্ড (১২৯০), হাতেকলমে (১২৯১), পুষ্পাঞ্জলি (১২৯২), 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-১৩টি প্রবন্ধের একটি গুচ্ছ (১২৯২)।

১৫। ছবি ও গান : কাব্যগ্রন্থ।

প্রকাশ—১২৮৮ শ্রাবণ-১২৯০ পৌষ।

গ্রন্থ—১৮৮৪ ফেব্রুআরি ২৩ [১২৯০ ফাল্গুন ১২]।

'ছবি ও গান' প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।"

'অভিসার', 'নিশীথজগৎ' ও 'নিশীথচেতনা' এই শেষ তিনটি কবিতা-সহ আটটি কবিতা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৮ শ্রাবণ-১২৯০ পৌষ)। 'বিজ্ঞাপনে' রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যায় গ্রন্থটির মোট ত্রিশটি কবিতার মধ্যে বেশির ভাগ কবিতা (২২) ১৮৮৩ সালে লেখা। শেষ তিনটি কবিতা যথাক্রমে নিশীথজগৎ, নিশীথচেতনা ও অভিসার (মরণ রে, তুঁহু মম) 'পূর্বেকার লেখা'। এর মধ্যে 'অভিসার' ভারতীতে প্রকাশিত হয় ১২৮৮ শ্রাবণ, অর্থাৎ গ্রন্থ প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে। নিশীথজগৎ ও নিশীথচেতনা কত পূর্বের রচনা বলা যায় না। তবে ভাবে ও ভঙ্গীতে কবি এগুলির স্বাতন্ত্র্য নিজেই উল্লেখ করেছেন। পূর্বরচিত এই কবিতা তিনটি 'ছবি ও গানে'র সংযোজন-অংশ হিসাবে গণ্য।

১৬। বৌঠাকুরাণীর হাট : উপন্যাস।

প্রকাশ—১২৮৮ কার্তিক-১২৮৯ আশ্বিন।

গ্রন্থ—১৮৮৩ জানুআরি ১১ [১২৮৯ পৌষ ২৮]।

---

৭ 'জুতাব্যবস্থা' প্রবন্ধে লেখা আছে (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত)। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন "ভুলক্রমে রচনার কাল ১৮৯০ মুদ্রিত হইয়াছিল, উহা ১৮৮০ হইবে।" —র-জি, পৃ ২৫৮

১২৮৮ সালে চন্দননগরে বাসকালে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধগুলির সঙ্গে সঙ্গেই 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন। তাই রচনারম্ভের কালানুযায়ী 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র সমকালবর্তী। কিন্তু প্রকাশকালের দিক্ থেকে 'ছবি ও গানে'র পরবর্তী। তাই এখানে ছবি ও গানকেই আগে স্থান দেওয়া হল। চল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ও ১১টি গান-সম্বলিত উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় (১২৮৮ কার্তিক-১২৮৯ আশ্বিন)। গ্রন্থ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত। এই উপন্যাসটি রচনার বহু বৎসর পরে এর গল্পাংশ অবলম্বন করে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৯০৯) রচনা করেন। তার বিশ বৎসর পর ঐ নাটককে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে লেখেন 'পরিত্রাণ' নাটক (১৯২৯)। উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে 'প্রায়শ্চিত্ত'কে কিছুটা ভেঙেচুরে লেখেন 'মুক্তধারা' নাটক (১৯২২)। বৌঠাকুরাণীর হাট প্রকাশের দুই-তিন বৎসর পর কেদারনাথ চৌধুরী এই উপন্যাসের গল্প অবলম্বন করে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটক লেখেন। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (১৮৮৬ জুলাই ৩)। 'রাজা বসন্ত রায়' গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

১৭। কালমৃগয়া : গীতিনাট্য।

গ্রন্থ—১৮৮২ ডিসেম্বর ৫ [১২৮৯ অগ্রহায়ণ ২০]।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র ন্যায় 'কালমৃগয়া'ও বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিনয়ার্থে রচিত। জোড়াসাঁকো বাড়িতে এর অভিনয় হয় ১৮৮২ ডিসেম্বর ২৩, শনিবার [১২৮৯ পৌষ ৯]। কালমৃগয়া পৃথক্ গ্রন্থ আকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নি। বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৬ ফেব্রুআরি ২০) সঙ্গে অনেকাংশে মিশ্রিত হয়েছে। কালমৃগয়া প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয় রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে (বিশ্বভারতী ১৩৪৭ আশ্বিন)। পরে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডেও পুনর্মুদ্রিত হয় (১৩৫৭ আশ্বিন)।

১৮। প্রকৃতির প্রতিশোধ : নাট্যকাব্য।

রচনাকাল—আ ১২৮৯ চৈত্র / ১২৯০ বৈশাখ-১২৯০ আষাঢ়।

গ্রন্থ—১৮৮৪ এপ্রিল ২৯ [১২৯১ বৈশাখ ১৮]।

এই নাট্যকাব্যটি রবীন্দ্রনাথের কারোয়ার বাসপর্বে (১৮৮৩ মার্চ-জুন / ১২৮৯ চৈত্র-১২৯০ আষাঢ়) রচিত। কারোয়ার বাসের পর্ব সম্বন্ধে কবির আলোচনা থেকে মনে হয়, কারোয়ারে কবি 'ছবি ও গানে'র অন্তর্গত 'পূর্ণিমায়' কবিতাটি লিখেছিলেন (আ ১২৮৯ চৈত্র ১০ অথবা ১২৯০ বৈশাখ ১০, কোনো

এক পূর্ণিমা তিথিতে)। পরে আষাঢ় মাস পর্যন্ত কোনো এক সময়ে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিত বলে অনুমান।

১৯। আলোচনা : প্রবন্ধ গ্রন্থ।

প্রকাশ—১২৯০ চৈত্র-১২৯১ কার্তিক।

গ্রন্থ—১৮৮৫ এপ্রিল ১৫ / ১২৯২ বৈশাখ ৩]।

'আলোচনা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ভারতী, তত্ত্ববোধিনী ও নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৯০ চৈত্র-১২৯১ কার্তিক)। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ ছয়টি প্রবন্ধ আছে এবং প্রত্যেক প্রবন্ধ কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত।

২০। নলিনী : নাট্য।

রচনাকাল—১২৯১ বৈশাখ ৮/১৮৮৪ এপ্রিল ১৯, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে।

গ্রন্থ—১৮৮৪ মে ১০/১২৯১ বৈশাখ ২৯।

স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর সঙ্গে ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহবাসরে (১২৯০ মাঘ-ফাল্গুন) আমোদ উৎসবের জন্য 'বিবাহ উৎসব' নামে একটি গীতিনাটিকা রচিত হয়। এই নাটকে মোট ৭টি দৃশ্যে ৪৫টি গান ; তার মধ্যে ২৮টি রবীন্দ্ররচিত।[৮] এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরিবারের সদস্যরা একটি যৌথনাট্য রচনা করার পরিকল্পনা করেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ লিখে সমবেতভাবে একটি নাট্যরূপ দান করেন। শেষপর্যন্ত তাকে যথার্থ রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রিয় নামানুসারে নাম দেওয়া হয় 'নলিনী'। এই তাঁর প্রথম গদ্যনাটক। পূর্ববর্তী রচনা 'ভগ্নহৃদয়ে'র ছাপ ও পরবর্তী 'মায়ার খেলা' নাটকের পূর্বাভাস এই নাটকটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। পরিবারে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসায় (কাদম্বরী দেবী, ১২৯১ বৈশাখ ৮ ও হেমেন্দ্রনাথ, ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ২৪) অভিনয় আর শেষপর্যন্ত হয় নি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে 'নলিনী'র পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ রক্ষিত আছে। নলিনী আর পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত হয়নি। দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৩৪৭ আশ্বিন) ও পশ্চিমবঙ্গ রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'নলিনী'র মুদ্রিত কপিতে

৮ দ্রষ্টব্য : সাহিত্যসাধক চরিতমালা ২৮, ২য় খণ্ড—স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবন ও সাহিত্য ; গীতবিতান (অখণ্ড) গ্রন্থ পরিচয়, পৃ ৯৭৬ ; শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-রচিত রবীন্দ্রস্মৃতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩ মাঘ-চৈত্র, পৃ ১৯৪-৯৫ ; সরলা দেবী : 'জীবনের ঝরাপাতা' পৃ ৫৭ ; র-জী পৃ ১৯৩ ; পশুপতি শাশমল : 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য' পৃ ৩০৭-৩০৯। এই গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে 'বিবাহ উৎসবে'র (১৮৯২, মে) রচয়িতা স্বর্ণকুমারী দেবী।

কবিকর্তৃক সংযোজিত একটি অংশ পাওয়া গেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে কয়েকটি গানেরও সন্ধান মিলেছে।[১]

২১। **রামমোহন রায় : প্রবন্ধ**।

রচনা—১২৯১ মাঘ ৫-এর পূর্বে।

পুস্তিকা—১৮৮৫ মার্চ ১৮ [১২৯১ চৈত্র]।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় সিটি কলেজগৃহে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন (১২৯১ মাঘ ৫)। পরে ভারতী পত্রিকায় (১২৯১ মাঘ) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (শক ১৮০৬ চৈত্র) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পরবর্তী কালে 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে (১৩১৪) খণ্ডিত আকারে গৃহীত ও পরে বর্জিতও হয়। বর্তমানে 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' গ্রন্থে (শতবার্ষিক সংস্করণ) ঐ খণ্ডিতরূপ পরিমার্জিত আকারে সংকলিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (বিশ্বভারতী-৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ-১১শ খণ্ড) মূল প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২২। **মুকুট : উপন্যাস**।

প্রকাশ—১২৯২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

'মুকুট' উপন্যাসটি 'বালক' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল (১২৯২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি কখনো প্রকাশ পায়নি। বহুকাল পরে,—

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে" মুকুট নামে একটি নাটিকা রচিত হয়। ঐ নাটকটি উক্ত উপন্যাসেরই নাট্যরূপ। বর্তমানে 'মুকুট' উপন্যাস গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে (১৯৬২) পুনর্মুদ্রিত।

২৩। **রবিচ্ছায়া : গীতগ্রন্থ**।

গ্রন্থ—১৮৮৫ জুন/১২৯২ জ্যৈষ্ঠ ২১।

গ্রন্থটিতে প্রকাশকের মন্তব্য অংশে প্রকাশক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বলেছেন,—

> "১২৯১ সনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।"

'রচয়িতার নিবেদন' অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> "ভানুসিংহের সমস্ত গান এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইল না। কারণ, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা হইতে গুটিকতক গান উদ্ধৃত হইল।"

রবিচ্ছায়া গ্রন্থের গানগুলি তিনভাগে বিভক্ত : বিবিধসংগীত, ব্রহ্মসংগীত ও জাতীয় সংগীত। এছাড়া একটি পরিশিষ্ট আছে।

১ দ্রষ্টব্য—পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী পৃ ১২৫-১২৮

২৪। চিঠিপত্র : আলোচনা প্রবন্ধ।

প্রকাশ—১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র।

গ্রন্থ—১৮৮৭ জুলাই ২ [১২৯৪ আষাঢ় ১৯]।

'চিঠিপত্রে'র 'দাদামহাশয়' ষষ্ঠীচরণ ও 'নাতি' নবীনকিশোরের মধ্যে সামাজিক প্রসঙ্গ আলোচনা-বিষয়ক পত্রগুলি প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র)।

অগ্রহায়ণ-সংখ্যার 'শ্রীচরণেষু' কিস্তি রবীন্দ্ররচিত নয় এবং নবীনকিশোরের নামে প্রকাশিতও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন। এই কিস্তি লেখা হয় নন্দকিশোর শর্মার নামে। সে-ও লিখছে,—

"দাদামহাশয়, নবীনভায়া পূজার ছুটিতে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন।" অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'শ্রীচরণেষু' লিখেছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইজন্য এই অংশ চিঠিপত্র-গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

'চিঠিপত্র' পরে 'সমাজ' গ্রন্থের (১৩১৫) অঙ্গীভূত হয়েছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ডে (বিশ্বভারতী ১৩৪৬ পৌষ) এবং পশ্চিমবঙ্গ-রচনাবলী ১২শ খণ্ডে এটি পুনরায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে গৃহীত হয়েছে।

২৫। রাজর্ষি : উপন্যাস।

প্রকাশ—১২৯২ আষাঢ়-মাঘ, ২৬শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত।

গ্রন্থ—১৮৮৭ ফেব্রুআরি ১১ [১২৯৩ মাঘ ৩০]।

'রাজর্ষি' উপন্যাস চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ আষাঢ়-মাঘ)। 'রাজর্ষি' সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ আশ্বিন। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরিতে গ্রহণের তারিখ ১৮৮৭ ফেব্রুআরি ১১ [১২৯৩ মাঘ ৩০]। রাজর্ষি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রথম-অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উনবিংশ-চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদ। এছাড়া উপসংহার ও পরিশিষ্ট আছে। রাজর্ষি উপন্যাসের 'প্রথমাংশ' অবলম্বন করে পরে 'বিসর্জন' নাটক (১৮৯০) রচিত হয়েছিল।

॥ অনুষঙ্গ ॥

উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া এই যুগে (১৮৭৪-৮৬) রবীন্দ্রনাথের আরও কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি সে সময়ে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পরবর্তী কালে এগুলি 'গল্পগুচ্ছ' (১ম ও ৪র্থ খণ্ড) এবং

'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭) ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭) গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়। বর্তমানে এইসব রচনাগুলিকে বিষয়বিভাগ করে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো হল এবং যথাসম্ভব কালক্রম রক্ষা করারও প্রয়াস করা গেল।—

ছোটগল্প—ভিখারিণী (ভা ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র), গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ডের (১৯৬২) পরিশিষ্ট ; ঘাটের কথা (ভা ১২৯১ কার্তিক) ও রাজপথের কথা (নবজীবন ১২৯১ অগ্রহায়ণ), গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড।

হেঁয়ালিনাট্য--(হাস্যকৌতুক) :—রোগের চিকিৎসা, পেটে ও পিঠে, ছাত্রের পরীক্ষা, অভ্যর্থনা, চিন্তাশীল, ভাব ও অভাব, রোগীর বন্ধু, খ্যাতির বিড়ম্বনা, অনার্য ও আর্য, অন্ত্যেষ্টি সৎকার, আশ্রমপীড়া।

ব্যঙ্গপ্রবন্ধ—(ব্যঙ্গকৌতুক) :—রসিকতার ফলাফল, ডেঙে পিঁপড়ের মন্তব্য। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' (নবজীবন ১২৯১ শ্রাবণ) প্রবন্ধটিকে এই গ্রন্থেই সংযোজিত করা সঙ্গত। হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের রচনাগুলি 'বালক' এবং 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৯২ ও ১২৯৩ সালে।

যুগবিভাগ

কোনো কবির সাহিত্য রচনার কালকে ভাববৈচিত্র্য অনুযায়ী বা কালানুসারে বিভক্ত করা সহজ নয়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে সাহিত্যরচনার যে যুগ, তাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা খুবই কঠিন। কারণ, তখন তাঁর চিত্ত আত্মগঠন ও ভাবরূপের সন্ধানেই মগ্ন ছিল। পরে সেই আত্মগঠিত ভাবধারা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গেছে জীবনের শেষ পর্যন্ত। তা ছাড়া, প্রথম জীবনে যে চিন্তা করেছেন, পরবর্তী জীবনে সেই ভাবধারায় যে কিছু লেখেন নি এমনও নয়।

তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত সময়টিকে মোটামুটি ভাববৈচিত্র্য ও বিশেষ কয়েকটি ঘটনার কাল অনুসরণ করে দু'রকমভাবে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমতঃ, তাঁর কবি-মানসের স্তরবিভাগ করতে গেলে 'শৈশবসংগীতে'র পর্ব (১৮৭৪-৮০) ও 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্ব (১৮৮০-৮৬) এই দুইভাগে ভাগ করা সম্ভব। কারণ, 'তেরো হইতে আঠারো' বছর বয়স পর্যন্ত (১৮৭৪-৭৯) শৈশবসংগীত রচনার যুগ। এই যুগে রচিত নাটক, প্রবন্ধাদিও একই সুরে গাঁথা। এর পরের স্তরে উন্নীত হলেন সন্ধ্যাসংগীতে এসে। তারপর কবির মনোভাব ক্রমঃপরিণতি লাভ করেছে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত। প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটকাদিও তারই সঙ্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, কবির জীবনগঠনের দিক্ থেকে বিচার করলে দেখি, কয়েকটি ঘটনা কবিজীবনের এই পর্বটিকে আরও কয়েকটি সূক্ষ্মতর বিভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।—

১) 'ভারতী'-পূর্ব যুগ ; ১২৮১-১২৮৪ শ্রাবণ [১৮৭৪-১৮৭৭ জুলাই]

২) 'ভারতী'র যুগ-প্রথম পর্যায় ; ১২৮৪ শ্রাবণ-১২৮৫ বৈশাখ [১৮৭৭ জুলাই-১৮৭৮ এপ্রিল]

৩) 'ভারতী'র যুগ-দ্বিতীয় পর্যায় ; ১২৮৫ বৈশাখ-১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ [১৮৭৮ এপ্রিল-১৮৮০ মে-জুন]

৪) উন্মেষ ও বিকাশের যুগ ; ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ-১২৯৩ কার্তিক [১৮৮০ মে-জুন-১৮৮৬ নভেম্বর]

এ ক্ষেত্রে কবির মনোজীবন বিশ্লেষণের পক্ষে এই স্তরবিভাগটিকেই বেশি উপযোগী বলে স্বীকার করা গেল।

(১) 'ভারতী'-পূর্ব যুগ ॥ ১২৮১-১২৮৪ শ্রাবণ/১৮৭৪-১৮৭৭ জুলাই। এই পর্বে একদিকে দেখা যায়, 'ঘরের পড়া' করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ম্যাক্‌বেথ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব প্রভৃতির অনুবাদ করছেন। অপরদিকে, 'ভারতভূমি', 'অভিলাষ' 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ', 'প্রলাপ'-কবিতাগুচ্ছ, 'বনফুল' কাব্য, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এর পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পর্ব। এই মানসিক ভিত্তি গঠনে সহায়ক হয়েছিল সে যুগের বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা। তিনিও স্বীকার করেছেন,—

> "তখন পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"
>
> —জী-স্মৃ, 'ঘরের পড়া'

এছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা (১৮৫১), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ-কর্তৃক প্রকাশিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা (১২৭০/১৮৬৩ ; পুনঃপ্রকাশ— ১২৭৩/১৮৬৭ ; এই সময় থেকে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'অবোধবন্ধু'র স্বত্বাধিকারী হন) ইত্যাদি ছিল কবির নিত্যসঙ্গী। তাঁর 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা'র আলমারিতে অবোধবন্ধু "কতক বাঁধানো কতক বা খণ্ড আকারে" রক্ষিত ছিল। জ্যেষ্ঠদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কবি সেগুলি গোপনে পাঠ করতেন। বিহারীলালের কাব্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ও হয় এই পত্রিকাতেই। 'পৌলবর্জিনী'র

গল্পও তিনি এই পত্রিকাতে পড়েই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের পূর্বে প্রকাশিত 'অবোধবন্ধুর' সাহিত্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন,—

"বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বিহারীলাল'

বিহারীলালের কাব্য সেই পত্রিকায় পাঠ করে তিনি বলেন,—

"তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মনহরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির স্বরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।"

—জী-স্মৃ 'ঘরের পড়া'

এইসব পত্রিকা যখন কবি পড়ছেন, তখন তাঁর বয়স ৯।১০-এর বেশি হবে বলে মনে হয় না।

তারপরে এল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), তখন কবির বয়স এগারো বৎসর। এই পত্রিকা সেদিন 'বাঙালীর হৃদয়' একেবারে 'লুট' করে নিয়েছিল। বাংলাসাহিত্যে 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব যে কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই স্পষ্ট করে বলা যায়।—

"পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।···আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম, সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র'

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর অতি উৎসাহী পাঠক। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সমকালীন বহু লেখকের রচনা বালক কবির অন্তরে সুপ্ত শতদলটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের অচিরকালের মধ্যেই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'আর্যদর্শন' নামে একটি "মাসিকপত্র ও সমালোচন" প্রকাশিত হয় (১৮৭৪ এপ্রিল / ১২৮১ বৈশাখ)। এই আর্যদর্শনও "একখানি সুপরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র ছিল।"[১০] এই আর্যদর্শন পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, "জ্ঞান ও নীতির চর্চা এবং প্রচার।" এ সম্বন্ধে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার অবতরণিকায় সম্পাদক বলেছিলেন,—

১০ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৩১, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৯

"ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে এবং কাব্য কলা ও উপাখ্যানের জন্যও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক। সময়ে ২ নব্যসমাজ এবং নব্যসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্তব্যের বিষয় কীর্তন হইবেক এবং উভয়ের সহিত প্রাচীন ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক।···আমাদের বাসনা এই, যাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসম্বাদী, তাহাই প্রচার করিব।"[১১]

এই আর্যদর্শনেই কবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' পাঠ করেছিলেন। এছাড়া স্বয়ং যোগেন্দ্রনাথ ও সমকালীন লেখকদের রচনাগুলিও তিনি পাঠ করতেন বলে অনুমান করা যায়।

বঙ্গদর্শন ও আর্যদর্শনের সমকালে ঢাকা থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় 'বান্ধব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত (১৮৭৪ জুন / ১২৮১ আষাঢ়)। এই পত্রিকাতেও 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ' বহু লেখকের রচনা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনাদি বালক রবীন্দ্রনাথের সপ্রতিভ চিত্তকে বিভিন্নমুখী হয়ে উঠতে ও বিচিত্র ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল এ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন। কবির কাছে এটি ছিল একটি 'লোভের সামগ্রী'। এর মাধ্যমেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মেছিল এবং তারই ফলস্বরূপ তিনি লিখেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরে'র

এই যুগে নিজের মনোগঠনের ইতিহাস সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন,— "যখন আমার বয়স তেরো, তখন এডুকেশন বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তারপর থেকে যে-বিদ্যালয়ে হলেম ভরতি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়।···শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ ভার গেল কমে।"

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' (অধ্যায় ৩)

এইভাবে দেখি, কবির মনোজীবন-গঠনের এই স্তরে তিনি তাঁর মনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা-অর্জনকাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আর, বিদ্যাগ্রহণের সঙ্গে

১১ পূর্ববৎ, 'সাহিত্য-সেবা' অংশ।

সঙ্গে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাটাও ক্রমশঃ সজাগ হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শৈশবসংগীতে'র কবিতাগুলির রচনারম্ভের কাল হিসাবে এই সময়টির কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ঐ গ্রন্থে তাঁর 'তেরো' থেকে 'আঠারো' বছর বয়স পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(২) 'ভারতী'র যুগ—প্রথম পর্যায় ॥ ১২৮৪ শ্রাবণ-আ ১২৮৫ বৈশাখ [১৮৭৭ জুলাই-আ ১৮৭৮ এপ্রিল-মে]

'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ (১২৮৪ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। তখন তাঁর বয়স ষোলো বৎসর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' প্রকাশিত হলে তিনি 'পরম উত্তেজনা' অনুভব করেছিলেন। সম্পাদক-মণ্ডলীর মধ্যে তিনিও স্থান পেলেন। এর পূর্ব-যুগটায় তাঁর কাব্যরচনার যে মনোভূমি গড়ে উঠেছিল তারই উপর ভিত্তি করে রচিত বহু লেখা এবার ভারতীর পৃষ্ঠাগুলিকে পূর্ণ করে তুলল। তার মধ্যে কোনো কোনো লেখা ভারতী প্রকাশের পূর্বরচিতও ছিল। ভারতীর প্রথমবর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা (প্রবন্ধ), কবিকাহিনী (কাব্য) করুণা (উপন্যাস) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের যে ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল তার উপরেই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী জীবনের সাহিত্য-সৌধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ভারতী পত্রের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

> "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালীর কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচালেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা। যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।" —জী-স্মৃ, 'ভারতী'

'ভারতী' যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি আলোকিত অধ্যায়ের সূচনা করল, তেমনি সমগ্র বাঙালী জীবনকে আন্দোলিত করে তুলতেও পত্রিকাটির দান সামান্য ছিল না। এ সম্পর্কে শরৎকুমারী চৌধুরাণী লিখেছেন,—

"তখন 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র চিহ্নমাত্রও ছিল না, 'বঙ্গদর্শন' মধ্যাহ্ন-আকাশ হইতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আর 'আর্যদর্শন' ধূমকেতুর মতো বোধহয় ছয়মাস বা নয়মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত। এমন সময় 'ভারতী' যখন নিয়মিত-রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল তখন সাহিত্যসমাজে যে আন্দোলন ও তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা এখনও [১৩২৩ আষাঢ] থামে নাই।"[১২]

এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রজীবনে 'ভারতী' পত্রিকার গুরুত্ব কতখানি ছিল। সেই যুগে 'নিয়মিতরূপে প্রকাশিত' ঐ একটিমাত্র পত্রিকাকে রবীন্দ্রনাথ যদি যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে না পারতেন, তাহলে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ অনেকটা বিলম্বিত হত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(৩) **'ভারতী'র যুগ—দ্বিতীয় পর্যায়॥** ১২৮৫ বৈশাখ-১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ [১৮৭৮ এপ্রিল-মে-১৮৮০ মে-জুন]

এই পর্বটিকে 'আমেদাবাদ ও বিলাতবাসে'র পর্বও বলা যেতে পারে। ভারতীর পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথের লেখনী যখন অশ্রান্ত গতিতে সচল হয়ে উঠেছে সেইসময়ে তাঁর বিলাতযাত্রার প্রস্তাব এল। বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আমেদাবাদে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্র-জীবনীতে দেখি, রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে চারমাস ও বোম্বাইএ দুইমাস বাসের পর, অর্থাৎ কলকাতা ত্যাগের ছয়মাস পর বিলাতযাত্রা করেন (সেপ্টেম্বর ২০, ১৮৭৮)। এর থেকে মনে হয়, ঐ বৎসর এপ্রিল-মে মাসে তিনি আমেদাবাদ গিয়েছিলেন।[১৩] এই সময়েই 'ভারতী'র দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়।

এই আমেদাবাদে বাসের পর্বটিও রবীন্দ্রসাহিত্য ও মনোজীবন গঠনে প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিল। মেজদাদার বিরাট লাইব্রেরিতে তিনি দেশীবিদেশী বহু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পেলেন। একদিকে টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ, অপরদিকে সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ। গ্রন্থগুলির সবই তিনি বুঝতেনও না। তবু পড়ে যেতেন পড়ার আনন্দে, জানার উৎসাহে। এই ভাবেই "সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি ও ছন্দের গতি"র প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এইসব নানা জিনিস পড়তে পড়তেই কবির লেখনীতে উৎসারিত হয়ে ওঠে অজস্র কবিতা, গান, প্রবন্ধ। বিলাতযাত্রার প্রস্তুতির জন্য তাঁকে বহু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যও পাঠ করতে হয়েছিল। ফলে অনেক পাশ্চাত্ত্য কবি সাহিত্যিক ও তাঁদের রচনার সঙ্গে

১২ 'ভারতীর ভিটা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ

১৩ র-জী, পৃ ৯০

পরিচয় হবারও সুযোগ ঘটে। এই যুগে রচিত তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ ও অনুবাদ-কবিতা তারই প্রত্যক্ষ ফল। আর, জজসাহেবের প্রাসাদোপম নীরব অট্টালিকার ছাদে এক-একটি নিস্তব্ধ রাত্রি যাপনকালে, তিনি রচনা করেছিলেন কয়েকটি অমর সংগীত। যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করা যাবে। মোটকথা, আমেদাবাদে বাসকালে রবীন্দ্ররচিত সাহিত্যের পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে থাকে।

আমেদাবাদের পর বোম্বাইবাসের পর্বে রবীন্দ্রনাথ আন্না তড়খড়্ নামে একটি তরুণীর সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'নলিনী'। ভালবাসার মাধ্যমে এই তরুণী কবির মনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করেই বলেছিলেন, "আপন মানুষের দূতী" রূপে এসে তিনি "হৃদয়ের দখলের সীমানা" অনেকখানি বড় করে দিয়েছিলেন।

—'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১৩

তৎকালে রচিত কবির বহু লেখার মধ্যে 'নলিনী'র নাম ও প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে নলিনীর দান যে অনেকখানি তা বিশেষভাবেই স্বীকার্য। এইসব দিক্ থেকে বিচার করে বলতে হয়, রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসের পর্বটি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তাঁর এইসব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর হল বিলাতযাত্রার পর।

বিলেতে যাবার ফলে কবির নূতন নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছিল অনেক। ইংরেজ সমাজকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারলেন, সুযোগ পেলেন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করার। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—

> "বিলেতে গেলেম, ব্যারিষ্টর হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাইনি। নিজের মধ্যে পেয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।"

—'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১৪

বিলাতে কবির একটি সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল লোকেন পালিতের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর কথা প্রথম অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তে এবং অন্যত্র তিনি লোকেন পালিতের কথা বলেছেন বিস্তৃতভাবে।[১৪] এ ক্ষেত্রে তাই পুনরুল্লেখ করা অবান্তর মনে করলাম। এছাড়া, জীবনে শিক্ষা ও শিক্ষকতার যথার্থ মহান্ আদর্শ কী হওয়া উচিত তার এক নির্মল পরিচয় পেয়েছিলেন অধ্যাপক হেনরি মর্লির কাছে। সদ্য যৌবনে উপনীত রবীন্দ্রনাথের

১৪ দ্রষ্টব্য—দেবীপদ ভট্টাচার্য: 'রবীন্দ্রচর্যা' পৃ ৩৮-৬২

শিক্ষার্থী মনকে তাঁর অধ্যাপনা শিল্প কী গভীরভাবে উদ্‌বোধিত করেছিল তার একটি চমৎকার ছবি তিনি অঙ্কন করেছেন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্র-জীবনীকারও বলেছেন,—

"বহুবার মরলির নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি।"

র-জী, পৃ ৯২

প্রকৃতপক্ষে, মর্লির 'অধ্যাপনা-প্রণালী'ই রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম ইংরেজি-সাহিত্যের রসসম্ভোগের অধিকার দিয়েছিল।

বিলাতে লেখা 'ভগ্নতরী'[১৫] কবিতা, 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-শ্রেণী, 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য রচনারম্ভ ইত্যাদির কথা তো কবি নিজেই বলেছেন। এ ছাড়া য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হয়েছিল, তাতে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছিল অনেকখানি প্রসারিত। এই সংগীতের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন রোমান্টিকতা। তাঁর ধারণা হয়েছিল এই সংগীত মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে প্রকাশ করে। এই কারণেই হয়তো দেশে ফেরার পর তিনি বহু গান য়ুরোপীয় ছাঁচে রচনা করেন।

এছাড়া য়ুরোপে গিয়ে তিনি নৃত্য ও নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে। সেই যৌবনের প্রারম্ভকালেই তিনি ইংরেজদের অভিনয়ের কৌশল ও শব্দোচ্চারণের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের দুর্বলতা অনুভব করতেও অসুবিধা হয় নি। তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশে।—

"ভালো ইংরেজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দামগতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়-স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্য তাহাতে সর্বত্রই একপ্রকার দুর্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে।"

—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', ছন্দ (৩য় সং ১৯৭৬) পৃ ৮-৯

এক কথায় বলা যায়, বিদেশের নৃত্য, নাটক, গীত তথা শিক্ষকতা বা মানসিকতা সবই রবীন্দ্রজীবনে একটি স্থায়ী ছাপ অঙ্কন করেছিল। সেই

১৫ দ্রষ্টব্য—'মগ্নতরী'-জী-স্মৃ. বিলাত; 'ভগ্নতরী'-র-জী. 'বিলাতে', পৃ ৯৩; ভারতী ১২৮৬ আষাঢ়; রচনাবলী অ ১।

সতেরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাস করে বৃহত্তর ভারতবর্ষকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর, বিলাতে যাবার ফলে জানলেন বিশ্বকে, ভারতবর্ষকে দেখলেন নূতন করে, সত্য রূপে। কিশোর বয়সের এই দুই অভিজ্ঞতা তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী কার্যকরী হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর চিন্তাশক্তি হল অনেক প্রখর ও ব্যাপক, দৃষ্টিভঙ্গী হল স্বচ্ছ—সমস্ত জীবনব্যাপী সাহিত্যরচনার যথার্থ পথ খুঁজে পেলেন এরই মাধ্যমে। তবুও এই তিনটি কালপর্বে কবি পূর্বস্থরীদের অনুসরণ করেছেন আর তার মধ্যে দিয়েই নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তাই তাঁর ভাষাতেই বলা যায়, এই সমগ্র কালপর্বটি ছিল 'কপিবুকে'র যুগ।

(৪) **উন্মেষ ও বিকাশের যুগ** ॥ ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ-১২৯৩ কার্তিক [১৮৮০ মে-জুন-১৮৮৬ নভেম্বর]

পূর্ব-আলোচিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে যখন রবীন্দ্রজীবনে 'আত্মগঠনে'র পর্ব অনেকটা দৃঢ় হয়ে এসেছে, তখন 'কপিবুকে'র বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে শুরু হল কবির আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। এই সাধনার প্রথম প্রকাশ 'সন্ধ্যাসংগীতে' (১৮৮০-৮২)। সন্ধ্যাসংগীত রচনার পর তিনি এর পূর্বযুগের রচনাগুলিকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কারণ, কবির মতে সেগুলি ছিল 'বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করে' লেখা।

"সেই কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত।"

—সন্ধ্যাসংগীতের ভূমিকা (কবির মন্তব্য), রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩৪৬ আশ্বিন)

অবশ্য আমরা এর পূর্বযুগের ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি সেটা নিতান্তই কপিবুকের যুগ ছিল না। কবি ঐ সময়ে একাধারে পূর্বস্থরীদের অনুগমন করেছেন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন আপন স্বাতন্ত্র্য তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, সেই বিকাশের ইতিহাসটি দেখানোই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

তবুও কবি সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যেই প্রথম দেখেছিলেন তাঁর আপন রূপ। কচি আমের গুটি বা সত্য ডিম-ফোটা পক্ষীশাবকের সঙ্গে তিনি তাঁর এই রূপের তুলনা করেছেন।

> "তাহার ছন্দ ভাষা ভাব সমস্তই কাঁচা হইতে পারে এবং কাঁচা হইবারই কথা, কিন্তু দোষগুণসমেত তাহা আমার।"

—জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ

সন্ধ্যাসংগীতের এই সার্থকতা পরিণত বয়সেও কবি অনুভব করেছিলেন বলে লিখেছেন,—

"আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়।" —জী-স্মৃ 'সন্ধ্যাসংগীত'

এই 'কাব্যলেখার ইতিহাস' অনুসরণ করলে দেখব, এই ধারায় পরপর এসেছে 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'। শুধু কাব্য লিখেই কবি শান্ত থাকেন নি। উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান সবই এবার তিনি প্রচুর পরিমাণে লিখতে শুরু করলেন। তাঁর মন ক্রমশঃ 'হৃদয়-অরণ্যে'র জটিলতা থেকে মুক্তিলাভ করেছে। তাঁর অন্তরে প্রভাতের সূর্যোদয় হয়েছে, হয়েছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। তারই ফলে তাঁর মনে লেগেছে নানা 'ছবি'র রং, প্রাণে জেগেছে 'গানের' সুর। এই মানসিক প্রেরণারই ফলস্বরূপ প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গানের কবিতাগুলি, বিবিধপ্রসঙ্গ, সমালোচনা-আলোচনার প্রবন্ধগুলি, বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাস, বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া প্রভৃতি গীতিনাট্য ও রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ কাব্যনাট্য এবং রবিচ্ছায়ার গানগুলি স্বতোধারায় উৎসারিত হয়ে উঠেছে। অবশেষে 'কড়ি ও কোমলে'র ঘাটে এসে কবি পেয়েছেন তাঁর মনের আর একটি পরিণত সুর। এই পর্যন্ত যাত্রা করে তিনি পৌঁছেছেন 'খাসমহলের দরজা'র কাছে। এখানেই স্থাপন করেছেন, তাঁর 'মানসী' প্রতিমাকে।

পরবর্তী কালে এই 'মানসী'র ('৮৯০) পর্ব থেকেই তিনি তাঁর যথার্থ কাব্যসৃষ্টির কাল বলে গণ্য করেছেন। তৎপূর্বযুগটাকে তিনি আর তখন স্বীকার করতে চান নি। নেহাতই ইতিহাসরক্ষার খাতিরে কাব্যগুলিকে রচনাবলীর মধ্যে রক্ষা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি রয়েছে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে।—

"অঙ্কুর যদিও উদ্ভিদ্‌জাতীয় তবু তাকে গাছ বলা চলে না, ঐ লেখাগুলিও তেমনি কাকুতি কিন্তু কাব্য নয়। ওতে এই অতি সহজ কথাটার প্রমাণ হয় যে এক সময়ে আমি বালক ছিলুম। অমৃতং বালভাষিতং বলে একটা কথা আছে—কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হলে সেই বালভাষিতকে কেউ রক্ষা করে না— করলেও সেই অমৃত ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য থাকে না।"

—সন্ধ্যাসংগীত (এবং প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান) প্রসঙ্গে, ১৫ নভেম্বর ১৯৩/১৯ কার্তিক ১৩৩৮

'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকাতেও (১৩৩৮ পৌষ/১৯৩১) কবির পরিণত জীবনের একটি উক্তি লক্ষণীয়।—

"আমার অল্পবয়সের যেসকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।···সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চল্‌ছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ।···ঐ তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায়নি।"

কিন্তু তবু, অন্ততঃ ইতিহাসরক্ষার খাতিরেও তাঁর মানসী-পূর্ব কাব্যগুলি রক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, বীজের মধ্যে থেকেই 'অঙ্কুরে'র উদ্ভব এবং অঙ্কুর থেকেই কাব্যমহীরূহের সৃষ্টি। তাই বীজটি বা অঙ্কুরটির স্বরূপ যদি না জানা যায়, তবে বিশাল বৃক্ষটির স্বরূপও বিশ্লেষণ করা সহজ হয় না। সেই কারণেই আলোচ্য গ্রন্থে শুধু সন্ধ্যাসংগীত নয়, 'ভারতভূমি' ও 'অভিলাষ' রচনার কাল থেকেই কবির মনোবিশ্লেষণ করার একটা প্রচেষ্টা করা গেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস করা যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্যসাহিত্য

(১) বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনার পর্ব

বাংলা কাব্যসাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, ১৮৭৪ সাল সর্বসাধারণের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সূচনাকাল বলে গণ্য হতে পারে। ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের পর 'রবি'র দীপ্তি উজ্জ্বলতর রূপে বিকশিত হতে শুরু করে। তার পূর্ববর্তী তিনটি বৎসরে তারই একটি ভূমিকা রচিত হয়েছিল। তাই 'ভারতী'র পরবর্তী সময়টাকে যদি রবীন্দ্রজীবনের 'প্রভাতকাল' বলা যায়, তবে তৎপূর্ববর্তী সময়টা 'প্রত্যুষ' বলে গণ্য হতে পারে। ভারতীর পূর্বে বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, অমৃতবাজার, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতা প্রকাশ হয়। এই সময় থেকেই কবির সাহিত্যরচনা নিরবচ্ছিন্ন-ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন,—

> "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সল্‌তে পাকানো।"
>
> —'যোগাযোগ' উপন্যাস

রবীন্দ্রজীবনেও সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্বে একটি নেপথ্যবিধান লক্ষ করা যায়। সেটি হল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' প্রভৃতির পূর্বযুগটি। একে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রজীবনের 'প্রাক্‌প্রত্যুষ' বা 'অরুণাভাসে'র যুগ। প্রকৃতপক্ষে, এই সময় থেকেই কবির সাহিত্যসাধনা শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম অধ্যায়টি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই প্রাক্‌প্রত্যুষ যুগেরও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। তবেই বালক রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে। 'জীবনস্মৃতি'র প্রথমেই 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায়ে কবি বলেছেন,—

> "তখন কর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি—জল পড়ে পাতা নড়ে। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।"

এখানে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে এই 'আদিকবি'টি কে? এবং এই কবিতা তিনি পেলেনই বা কোথায়? মনে হয় এই 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' কবিতা তাঁর কোনো পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু সেটিই বা কোন্ পুস্তক? রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, এটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগের অন্তর্গত।[১] এর প্রথম অংশেই 'কর', 'খল' শব্দ দুটিও আছে। কিন্তু 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' কোথাও পাওয়া যায় না। বইটির এক জায়গায় আছে,—'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে।' কিন্তু সে নেহাতই গদ্য। একে আদিকবির কবিতা বলা যেতে পারে না। অতএব, অন্যান্য কোন্ কোন্ পুস্তক রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং সেখানে কোথাও এ কবিতাটি পেয়েছিলেন কিনা, তা সন্ধান করে দেখা দরকার।

সেকালে আর-একটি প্রচলিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ছিল—মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথমভাগ। মদনমোহন ছিলেন তৎকালীন সুখ্যাত ছন্দোবিলাসী কবি। শিশুদের ছন্দ ও সাহিত্যবোধ উদ্দীপ্ত করার পক্ষে তাঁর ঐ বইটি ছিল আদর্শস্থানীয়। ঐ বইএর প্রথমেই কর, খর, কল, খল ইত্যাদি বর্ণযোজনার ছন্দোবদ্ধ দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তার কিছু পরেই আছে 'জল পড়ে, ছাতি ধরে'। এখানে দেখি, রবীন্দ্রবর্ণিত সেই প্রথম কবিতার সঙ্গে ছন্দোগত মিল আছে, কিন্তু তথ্যগত মিল নেই। অপরপক্ষে, বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে তথ্যের মিল আছে, কিন্তু ছন্দের কোন যোগ নেই। এর থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ আসলে ঐ দুই গ্রন্থই পড়েছিলেন এবং একটি থেকে তথ্য ও অপরটি থেকে ছন্দ গ্রহণ করে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' ওই আদি কবিতাটি কল্পনা করে নিয়েছিলেন।

তবে এই কবিতারচনা বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর অপেক্ষা মদনমোহনের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ, মদনমোহনের গ্রন্থ পাঠের আরও দৃষ্টান্ত আছে কবির রচনাবলীর মধ্যে। প্রসঙ্গক্রমে, একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। শিশুশিক্ষা বইটিতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালায় দীর্ঘ ৯৯, দীর্ঘ ঃ এবং 'ক্ষ' যথাক্রমে রক্ষিত ছিল। অপরপক্ষে, বর্ণপরিচয়ে ঐ তিনটি বর্ণ 'পরিত্যক্ত' হয়। 'সুবোধপুঁথি'তে[২] প্রাপ্ত রবীন্দ্র-রচিত সূত্রগুলির (আ ১৩০২) মধ্যে ঐ তিনটি বর্ণ দেখা যায়,—

১ র-জী, 'শিক্ষাকাল', পৃ ২৯ এবং জী-স্মৃ, তথ্যপঞ্জী ; পৃষ্ঠাটীকা ৩।৪

২ অমিতাভ চৌধুরী : 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক', শারদীয়া দেশ, ১৩৭৭

দুই বুড়ো ঋ ৠ
চলে ধীরি ধীরি।
দুই বোন ঌ ৡ
হাসে খিলি খীলি।
হ হাঁচে হ ক্ষ,
ক্ষ কাশে খ ক্ষ।

বর্ণপরিচয়ের প্রভাব থাকলে এই বর্ণগুলি আসতে পারত না।[৩]

যাই হোক, শুধু 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এই 'আদি' কবিতাটি নয়, নানা গ্রন্থ পাঠ করে বা নানা সূত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করে তাকে নিজের মত করে গড়ে তোলার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের শিশু বয়স থেকেই ছিল। সে সব দৃষ্টান্ত তাঁর সমগ্র জীবনে তো বটেই, বাল্যবয়সেও কিছু কম ছিল না। সে কথা কবি নিজেও 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃপ্রত্যুষ যুগে কবির মানসিক ভিত্তি গঠনে এগুলির মূল্য খুব কম নয়।

কবিতার মধ্যে ছন্দ, অলঙ্কার ও মিলের যে প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তার যে মাধুর্য, তা কবি অতি শৈশবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে মদন-মোহনের শিশুশিক্ষা কবির মানসিক গঠনে অপরিসীম মর্যাদালাভের অধিকারী। কবি এ সম্বন্ধে বলেছেন,—

"সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না।"

—জী-স্মৃ. 'শিক্ষারম্ভ'

সে প্রসঙ্গে খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের 'আউড়ে' যাওয়া ছড়ার "অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা" কবির মনকে কেমন চঞ্চল ও আনন্দোজ্জ্বল করত তার বর্ণনাও আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি।

"আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান্' ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

—পূর্ববৎ

এইরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে কবির স্মৃতিচারণের মধ্যে। ভৃত্যমহলে তিনি শুনেছিলেন রামায়ণ মহাভারতের কথা; কিশোরী চাটুজ্জের কাছে শুনতেন দাশুরায়ের পাঁচালি। তাঁর পাঠ্যপুস্তক 'সচিত্র শিশুবোধকে' তিনি

৩ দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন: 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়', আজাহারউদ্দীন খান্ ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ' (১৯৭৪), পৃ ৩৫-৩৮

পড়েছিলেন 'হিরণ্যকশিপুর' গল্প আর চাণক্যের শ্লোক।[৪] কবি তাঁর সংগীতগুরু, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর কাছে যে সব দেশিগান শিখেছিলেন, "সেগুলো পাড়া গেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়"। যেমন—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি-পরা যেমন-তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি—
ঠাকুরঝি
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি—
ঠাকুরঝি।

আরও আছে—

এক যে ছিল কুকুরচাটা
শেয়াল কাঁটায় বন
কেটে করল সিংহাসন।

এ জাতীয় দেশি, গ্রাম্য ছড়া কবির মনগড়া কবিতা রচনায় অনেকখানি সাহায্য করেছিল। তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। শিশুকবি কাঠের সিঙ্গিকে বলি দেওয়ার একটি মন্তর বানিয়ে ছিলেন—

সিঙ্গিমামা কাটুম্,
আন্দিবোসের বাটুম্,
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড়্ কুড়্,
আখ্‌রোট বাখ্‌রোট খট্ খট্ খটাস্—
পট্ পট্ পটাস্।

এরমধ্যে একমাত্র 'আখরোট' কথাটিই কবির নিজের। অন্যগুলি সবই বিভিন্ন ছড়া থেকে ধার করা।[৫] কিন্তু কৃতিত্বের বিষয়, বিভিন্ন ছড়ার ধার করা অংশ নিয়ে সমবেতভাবে একটি 'মন্তর' তিনি বানালেন; এখানেই তাঁর স্বকীয়তা। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ছড়ার ছন্দে লেখা, এটিই কবির প্রথম কবিতা।

দিদিমার কাছে রূপকথার যে সব গল্প শুনতেন, সেগুলিও কবির মনে কল্পনার

৪ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'শিশুবোধক শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়', পৃ ১৩ এবং 'ছেলেবেলা'-অধ্যায় ৮
৫ প্রবোধচন্দ্র সেন: পূর্ববৎ, পৃ ৩৫

মায়াজাল রচনা করত। এই বিভিন্ন লৌকিক ও দেশি ছড়া, পাঁচালি, গল্প, গান কবির মনে একত্র সমবেত হয়ে তাঁর অতি শৈশবের 'প্রাক্-প্রত্যুষ' পর্বে একটি শিশুকবিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাই বোধহয় কবি বলেছেন, —

"যে মৃত্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি।"

—'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১৪

এইভাবে যখন তাঁর মনে 'বাংলাদেশে'র নানা উপকরণ সংকলিত হচ্ছে, সেইসময় একই সঙ্গে তাঁর কাঁচাহাতের কবিতা রচনার পালাও শুরু হল। তখন তিনি নর্মালস্কুলে পড়তেন। এখানে তাঁর বাংলারচনার ভিত্তিও দৃঢ়তর হয়েছিল। একটি 'নীলকাগজের খাতা' এইসময় তাঁর সাহিত্যসঙ্গী হল। এটিই তাঁর প্রথম 'কাব্যগ্রন্থ'। এই সময়ই একদিন তিনি তাঁর ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের নিকট পয়ার বন্ধের মাত্রাবিন্যাস শেখেন। তখন তাঁর বয়স সম্ভবতঃ সাত-আট বৎসর (অর্থাৎ ১৮৬৮-৬৯)। খাতাটি বহুদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হয়। তবে কবি তার মধ্যে অন্ততঃ সাতটি কবিতার সন্ধান দিয়ে গেছেন।

প্রথম কবিতাটি ছিল পদ্মের উপর। তার মধ্যে একটি শব্দ ছিল 'দ্বিরেফ'। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে (অধ্যায় ১১) এ সম্বন্ধে বলেছেন,—

"সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল। এমন-কি তার উপরে ভ্রমর বসবারও জায়গা পেল।"

কিন্তু নবগোপাল মিত্র মহাশয়কে শোনাবার পর তিনি শব্দটি শুনে এত প্রবল হাস্য করেছিলেন যে, বালক ক্ষুব্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য ওই শব্দটি বর্জন করেন।

আর একটি কবিতা লিখেছিলেন তাঁর ইস্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে। এর দুটি মাত্র পঙ্‌ক্তি কবি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন।—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে ;
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে ॥

তৃতীয় কবিতাটি একটি ব্যক্তিগত বর্ণনা। এরও দুটি পঙ্‌ক্তি কোনোক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে আছে।—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি' তাহাতে কদলী দলি'
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হাপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ।
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে ॥

এ ছাড়া একটি ছিল নীতিকবিতা। ইস্কুলের শিক্ষক গোবিন্দবাবুর আদেশে তিনি সেটি লিখেছিলেন। আর দুটি ছিল ঈশ্বরস্তব। শ্রীকণ্ঠবাবু এই স্তবগুলি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। সপ্তম কবিতাটির উল্লেখ তিনি জীবনস্মৃতিতে করেন নি, করেছেন 'ছেলেবেলা'তে। এর পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেন,—

"মনে পড়ে পয়ার-ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম ; তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন, আত্মীয়রা বললেন,— ছেলেটির লেখবার হাত আছে।"

—'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১১

এরপর কবি পুরোনো 'নীলখাতা'টি বিদায় করে এবং একটি 'বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি' সংগ্রহ করে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের মাত্র দুটি কবিতার সংবাদ তিনি দিয়ে গেছেন। তবে এই দুটি কবিতারই একটু ইতিহাস আছে।

এক, ১৮৭৩ সালের ৬ ফেব্রুআরি কবির উপনয়ন সংস্কার হয় এবং তারপর তিনি পিতার সঙ্গে উত্তরভারত ও হিমালয় (ডালহৌসি পাহাড়) ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণে যাত্রার পথে কিছুদিন তিনি পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ঐ সময়েই লেট্‌স্ ডায়ারিতে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি 'বীররসাত্মক' কাব্য লেখেন (ফেব্রুআরি ১৮৭৩)। ১৮৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায়,—

"সেটা লিখতে দিন-সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।"

—'ছিন্নপত্রাবলী' (১৯৬০), পৃ ৩৬৩-৬৪

কেউ কেউ মনে করেন, এই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'ই রূপান্তরে ও ভাবান্তরে 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকায় উপস্থাপিত হয়েছে।

দুই, হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেও তাঁর কবিতারচনার ধারা চলতেই থাকে। জীবনস্মৃতিতে 'ভারতমাতা' সম্বন্ধে একটি কবিতার উল্লেখ আছে। এই কবিতাটি হিমালয় থেকে ফেরার পর রচিত এবং লেট্‌স্ ডায়ারির অন্তর্গত বলে মনে হয়। এতেও তিনি 'নিকট' শব্দের সঙ্গে 'শকট' শব্দের মিল অতি

অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করায় গুণেন্দ্রনাথ নবগোপালবাবুর মতই প্রবল হাস্য করেছিলেন। ফলে 'দ্বিরেফ' শব্দের মতই কবি 'শকট' শব্দটিও আর কোনোদিন ব্যবহার করেন নি।

এই বারো বছর বয়স পর্যন্ত কবি নিজেই ছিলেন 'মুদ্রাকর' ও 'প্রকাশক'। বৃহত্তর জগতের কাছে প্রকাশের তখনও কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তবে রচনার পরিধি পরিচিত মণ্ডলীর সীমা অতিক্রম করে ক্রমে বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়ছিল। তবুও সেটি ছিল তাঁর অজ্ঞাতবাস-পর্বেরই অন্তর্গত। পরবর্তী কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করলেই তা সপ্রমাণ হবে।

'লেট্‌স্ ডায়ারি' নামক দ্বিতীয় খাতাখানি কবে শেষ হল এবং তৃতীয় আর একটি খাতায় কখন তিনি লিখতে শুরু করলেন তা নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নি। সম্ভবতঃ এই তৃতীয় খাতাটিই কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত (বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত) 'মালতীপুঁথি'। এই খাতাটিতে কবির রচনা শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৮৭৪ সালে এবং এটি অন্ততঃ ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত বোম্বাই, আমেদাবাদ, এমন কি বিলাতেও কবির 'সাহিত্যের সঙ্গী' রূপে রক্ষিত হয়েছিল। পরে কবে যে এটি অন্তর্হিত হল তা সঠিক বলা যায় না।[৬]

এই খাতায় যখন লেখা শুরু হয়, তখন কবির 'ঘরের-পড়া'র যুগ চলছিল। এতে কবির বালক ও কিশোর বয়সের শিল্পচর্চা ও সাহিত্যচর্চার বহু নিদর্শন আছে। তাই এর মাধ্যমে কবির তৎকালীন জীবন, শিক্ষা ও চিন্তাধারার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মালতীপুঁথিতে যখন কবির হাত-পাকাবার-আসর জমে উঠেছিল সেই সময়েই কবি 'ঘরের পড়া'র পাঠক্রম অনুসারে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে কুমারসম্ভব ও ম্যাক্‌বেথ এবং রামসর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়তেন (আ ১৮৭৪)। এ সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন,—

> "ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি [জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য] কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন।".

তখনই তাঁর কুমারসম্ভব ও ম্যাক্‌বেথ পড়ার পালা শুরু হল।—

> "আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাঙলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ

৬ দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন: 'মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়,' র-জি, পৃ ১৩৯ ও ১৬৩

ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।... রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।"

—জী-স্মৃ, 'ঘরের পড়া'

রবীন্দ্রনাথের এইসময়কার কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা-অনুবাদের কিয়দংশ পাওয়া গেছে মালতীপুঁথিতে। ম্যাক্‌বেথের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রসঙ্গেই বলেছেন, "সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হাল্কা হইয়াছে।"

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ম্যাক্‌বেথের সব অংশ হারিয়ে যায় নি। ১২৮৭ সালের (১৮৮০) আশ্বিনসংখ্যা 'ভারতীতে' সম্পাদকের বৈঠক-বিভাগে ম্যাক্‌বেথ অনুবাদের ডাকিনী' অংশটি পাওয়া গেছে। তার প্রথম অংশটা ছিল নিম্নরূপ;—

১ম ডা—ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনজনে।
২য় ডা—ঝগড়াঝাঁটি থামবে যখন
হারজিত সব মিটবে রণে।
৩য় ডা—সাঁজের আগেই হবে সে ত ;
১ম ডা—মিলব কোথায় বলে দে ত।
২য় ডা— কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা— ম্যাকেথ সেথা আসচে আজ।

কিন্তু এই অংশটি ম্যাক্‌বেথ অনুবাদের প্রাথমিক রূপ বলে মনে হয় না ; এটি সম্ভবতঃ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। কারণ, এই ম্যাক্‌বেথ অনুবাদের একটা বিশেষ ইতিহাস ছিল। রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে একদিন রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ শোনাতে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন।[৭] তিনি এই তর্জমা শুনে কবিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

"নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।"

৭ সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী অংশে বলেছেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নয়, বন্দ্যোপাধ্যায় [রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে ভ্রমক্রমে 'মুখোপাধ্যায়'' লিখিয়াছেন এবং ভুলটি বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে]। এই মতান্তর

এই উক্তি থেকে মনে হয়, ডাকিনীর উক্তিসহ সমগ্র ম্যাক্‌বেথ গ্রন্থখানা প্রথমে কবি একই 'ভাষা ও ছন্দে' রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভারতীতে প্রকাশিত ডাকিনী অংশের ভাষা ও ছন্দে একটু 'অদ্ভুত বিশেষত্ব' লক্ষ করা যায়। তাই এই অংশ সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে পরিমার্জিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। এটি জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কৃত প্রথম অনুবাদ নয়। রাজকৃষ্ণ বাবুর উপদেশানুসারে অংশটি পুনর্লিখিত হয়। ভারতীর ডাকিনী অংশের ভাষা ও ছন্দে কবি লৌকিক রীতি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে লৌকিক রীতির এটিই প্রথম নিদর্শন (পূর্বোল্লিখিত 'সিঙ্গিমামা কাটুম্' ছড়াটি বাদে)। সেদিক্ থেকেও রচনাটির একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার্য।

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের শিক্ষকতায় রবীন্দ্রনাথ ম্যাক্‌বেথের সঙ্গে সঙ্গে কুমার-সম্ভবও পড়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু ম্যাক্‌বেথের ন্যায় কুমার সম্ভবের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন কিনা সে কথা রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেননি। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত মালতীপুঁথিতে কুমারসম্ভবের খানিকটা অনূদিত অংশ পাওয়া গেছে। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, তিনি শিক্ষক মহাশয়ের কাছে কুমারসম্ভবের তিনটি সর্গ পড়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছেন,

"[কুমারসম্ভব] তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।"

কিন্তু তিনি পঠিত তিনটি সর্গই অনুবাদ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। মালতীপুঁথিতে কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের তেতাল্লিশটি শ্লোকের (২৫-২৮,৩১,৩৫-৭২) অনুবাদ পাওয়া গেছে। অনূদিত অংশের আরম্ভ মহাদেবের তপোবনে অকালবসন্তসমাগমের বর্ণনা দিয়ে, আর শেষ হয়েছে হরকোপানলে মদনভস্মের কথা দিয়ে। যদিও এরমধ্যে মূলের পাঁচটি শ্লোক এবং দুটি শ্লোকের (৩৭ ও ৫৫) অর্ধাংশ বাদ গেছে তবুও অনুবাদটির মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণতা আছে। উপরে শিরোনাম দিয়েছেন 'কুমারসম্ভব'। হয়তো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে তিনি ঐ শ্লোকগুলি বাদ দিয়েছিলেন এবং শুধু ঐ অংশটুকুরই অনুবাদ করেছিলেন, এ অনুমানও করা হয়ে থাকে।

কতখানি সত্য তা বিবেচ্য। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যোগাযোগ ছিল ঠিকই। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার্থে তাঁর কাছে যেতেন এবং সেই উপলক্ষেই বিদ্যাসাগর 'উপক্রমণিকা'র প্রথম খসড়া তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন (উপক্রমণিকা প্রকাশ আ ১৮৫৪)। রাজকৃষ্ণ ইংরেজিতেও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন কিনা সন্দেহ। অপরপক্ষে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কবি; সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁর সুখ্যাত পাণ্ডিত্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তাই তাঁর উপস্থিতিই অধিক সম্ভব বলে মনে হয়।

কিন্তু কুমারসম্ভবের অনুবাদ-সমস্যার এখানেই শেষ নয়। কারণ, মালতী-পুঁথিতে প্রাপ্ত কুমারসম্ভবের অনুবাদ আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজে করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে বর্তমানে কোনো কোনো অনুসন্ধানীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৮] এই সংশয়ের প্রধান কারণ, মালতীপুঁথিতে কুমারসম্ভবের একটি নয়, দুটি অনুবাদ পাওয়া গেছে এবং দ্বিতীয়টির শিরোনামে লেখা আছে 'কুমারসম্ভব'। এই দুটি অনুবাদই খসড়া এবং দুটিতেই অনেক কাটাকুটি আছে। এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভোরের পাখি' (প্রথম পর্যায়) প্রবন্ধে প্রায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এ দুটির একটি প্রাথমিক খসড়া ও দ্বিতীয়টি তারই পরিশোধিত রূপ। 'ভারতী' পত্রিকায় (প্রথমবর্ষ, ১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৯-৩১) এই অংশটুকুর আর একটি উন্নততর তৃতীয় রূপ পাওয়া গেছে। সেটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রূপেরই আরও পরিশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ। এই রূপটির অবশ্য কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত খসড়া দুটির খুঁটিনাটি বিচার এবং তুলনা করলে দেখা যাবে প্রথম রূপটিতে কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।[৯] অনুবাদ সর্বত্র মূলানুগ হয়নি এবং পয়ারের বাঁধা রীতি (আট-ছয় বিভাগ) সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এই রূপটিতে কাটাকুটি করে উন্নত করার চেষ্টাও দেখা যায়। দ্বিতীয় অনুবাদ-টিতেও প্রচুর কাটাকুটির দৃষ্টান্ত আছে। তবে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় অনুবাদে পাকাহাতের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া দ্বিতীয়টি প্রায় সম্পূর্ণ মূলানুগ। অনুবাদকে মূলানুসারী করার জন্য পয়ারের বাঁধাপথকে অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হয়েছে। বালক রবীন্দ্রনাথের ঐ বয়সের পক্ষে এতখানি আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়াস সে যুগে বোধহয় প্রত্যাশিত ছিল না। তাই প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এই সমস্যার সিদ্ধান্ত করে বলেছেন,—

> "আমার বিশ্বাস, অনুবাদটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে দ্বিতীয়-রূপে দাঁড় করানোর ব্যাপারে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত কাজ করেছে বহুল পরিমাণে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আশা করি তাঁরা এই ধারণাকে উপেক্ষণীয় মনে করবেন না।"
>
> —'ভোরের পাখি', পৃ ৩৪২-৪৫

'ভারতী'র রূপটি দ্বিতীয় অনুবাদেরই পরিমার্জিত রূপ। অর্থাৎ এটি মালতী-

৮ দ্রষ্টব্য : র-জী, পৃ ৪৪ পা-টী ১

৯ 'ভোরের পাখি' : শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ, ১৩৬৮ বৈশাখ

পুঁথির প্রথম খসড়াটির তৃতীয় সংস্করণ। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, পাণ্ডুলিপিতে প্রথম অনুবাদটির কোনো শিরোনাম নেই। দ্বিতীয়টির শিরোনাম 'কুমারসম্ভব' ও ভারতীর তৃতীয় রূপটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল 'মদনভস্ম'। তিনটি অনুবাদের তুলনা করলে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রথম রূপটি বালক রবীন্দ্রনাথের কাঁচাহাতের একটি প্রয়াস মাত্র এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপটিতে আছে কোনো পাকা হাতের পরিমার্জনা। সেই হাত সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের। এই অনুবাদটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'সম্পাদকের বৈঠক' বিভাগে এবং সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ— এ কথাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। অবশ্য ষোলো বৎসরের রবীন্দ্রনাথও এই সম্পাদকমণ্ডলীর বাইরে ছিলেন না।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কুমারসম্ভবের অনুবাদ করেছিলেন কিনা তা উল্লেখ করেন নি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মনে হয়, কুমারসম্ভবের অনুবাদটুকু কবি করেছিলেন নিজের মনের প্রেরণায়। রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয় বিদ্যাসাগরকে কবির ম্যাকবেথের অনুবাদটি শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কুমারসম্ভবের অনুবাদ শোনাবার কোনো প্রসঙ্গ নেই। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার বলেন,—

> "সেইজন্য ইহার [কুমারসম্ভবের] যে অনুবাদ ১২৮৪ সালে ভারতীতে প্রকাশিত হয় তাহার অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[১০]

প্রকৃতপক্ষে, মনে হয়, ম্যাকবেথের অনুবাদে রামসর্বস্ব যে কৃতিত্ব দেখেছিলেন, কুমারসম্ভবে হয়তো তা দেখেননি। তাই বিদ্যাসাগরকে শোনাতেও উৎসাহ বোধ করেন নি। আর, ভারতীতে ম্যাকবেথ ও কুমারসম্ভবের দুটি অংশ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে ম্যাকবেথ প্রসঙ্গ কবি উল্লেখ করেছেন। অথচ, কুমারসম্ভবের কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি। এর কারণ আর কিছু নয়, ম্যাকবেথের পরিমার্জিত ছন্দ ও রূপ রবীন্দ্রনাথেরই কৃত, তাই তিনি এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুমারসম্ভবের উন্নতিবিধানের কৃতিত্ব তাঁর নয়, তাই বোধহয় এ বিষয়ে নীরবতা রক্ষা করা হয়েছে,— এ অনুমান একেবারে অসঙ্গত হবে না।

কিন্তু মালতীপুঁথিতে কুমারসম্ভবের অনুবাদের পাশেই ম্যুরের 'আইরিশ মেলোডিজে'র দুটি কবিতা ও আরও কতগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদ রয়েছে।

১০ র-জী, পৃ ৪৪ পা-টী ১

রবীন্দ্রজীবনীকার ম্যুরের কবিতাগুলি রবীন্দ্রকৃত বলে স্বীকার করেছেন অথচ কুমারসম্ভব রবীন্দ্রকৃত নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে— এটা কেমন অসংগত বলে বোধ হয়। এ বিষয়ে মালতীপুঁথির প্রাথমিক খসড়াটি রবীন্দ্রকৃত বলে ধরে নেওয়াটাই যথাযথ হবে।

অনুবাদটির ছন্দ বিচার করলেও দেখা যাবে, তিনটি অনুবাদই অপ্রবহমান অমিল পয়ার বন্ধে রচিত হয়েছে। তবে প্রথমটিতে পয়ারের আট-ছয় বিভাগের বাঁধারীতি যথাসম্ভব রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে তা সর্বত্র রক্ষা হয় নি এবং স্থানে স্থানে সাত-সাত বিভাগও স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু পয়ার বন্ধে সাতের বিভাগ কখনও রবীন্দ্রনাথের 'প্রসন্ন-অনুমোদন' পায় নি। এইদিক্ থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কুমারসম্ভব অনুবাদটির প্রথম খসড়া রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন এবং তারই পরিশোধিত ও সুসংস্কৃত দুটি রূপদান করেছিলেন বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ।

অতঃপর, 'ঘরের-পড়া' যুগে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা পাঠ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয় যে রবীন্দ্রনাথকে মানে করে 'শকুন্তলা' পড়াতেন এবং এই পড়ানো যে একেবারে ব্যর্থ হয়নি তার দৃষ্টান্তও আছে মালতীপুঁথিতে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'এর একটি শ্লোকের অনুবাদ কবি করেছিলেন,—

"শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে
অধীর হৃদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
অংশুক তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।"

শেষের দুটি পঙ্‌ক্তি কবি পরে নূতন করে লিখেছিলেন। প্রথম রূপটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তি মালতীপুঁথিতে স্পষ্টভাবে পড়া যায় না। তাছাড়া সেই পঙ্‌ক্তিগুলির প্রাথমিক রূপটি কবির বোধহয় পছন্দও হয়নি। তাই পরে আবার লিখেছিলেন। প্রথম রূপটির যেটুকু পাওয়া যায়, সেটি নিম্নরূপ,—

"[শরীর] সে ধীরে ২ যাইতেছে আগে
[অধীর] হৃদয় কিন্তু চায় পিছুবাগে
.. .. যায় যবে তরী
... ... আগে ধায় ফিরি ২।"

এই অনুবাদটুকু পরবর্তী কালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৫

মাঘ সংখ্যা)। তাতে শেষ লাইনের 'অংশুক' স্থলে 'পতাকা' লিখিত হয়। এছাড়া মালতীপুঁথির পাঠ ও ভারতীর পাঠ অবিকল এক।

রবীন্দ্রনাথের এই 'ঘরের পড়া'র যুগে ম্যাকবেথ, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলা পাঠ ও অনুবাদের দৃষ্টান্ত থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের উপর এই সময় থেকেই তাঁর অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সংস্কৃতশিক্ষা ও পাঠের দৃষ্টান্ত এর পূর্বেও কিছু কিছু আছে। কিন্তু এই সময় থেকে কালিদাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক হতে থাকে। অপরপক্ষে, ইংরেজি সাহিত্যের উপরও যে তাঁর যথেষ্ট দখল হয়, তার প্রমাণও আছে বিভিন্ন বিদেশী কবিতানুবাদের মধ্যে। পরবর্তী কালে তিনি যে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি বিষয়ে পরিণত চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, লিখেছিলেন 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে', 'প্রাচীনভারত' প্রভৃতি কবিতা এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও তপোবনের আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এইযুগেই। তাঁর পরিণত সাহিত্যের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে কালিদাস ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ। তাই দেখি 'ঘরের পড়া' যুগের (আ ১৮৭৪) 'পড়া'গুলি 'লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে' তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী কার্যকরী হয়েছিল। 'শিক্ষারম্ভ' বা 'কাব্যরচনাচর্চা'র অতি প্রত্যুষে তিনি 'বাংলাদেশের' যে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে শুরু করেছিলেন, 'ঘরের পড়া'র যুগে তারই সঙ্গে ভারতীয় তথা পাশ্চাত্ত্য দেশের 'মাটি' যুক্ত হয়ে সেই মূর্তিকে আরও নিপুণ, আরও সূক্ষ্ম করে গড়ে তুলতে কবিকে নিযুক্ত করল। সেইজন্য রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যে এই যুগটি একটি অসামান্য মূল্য ও মর্যাদালাভের অপেক্ষা রাখে।

২

এর অচিরকালের মধ্যেই শুরু হল কবির জীবনে আর একটি নূতন পর্ব। একটি নয়, দুটি কবিতা নিয়ে সাধারণ পাঠকের সামনে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন ১৮৭৪ সালের জানুআরি ও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। কবিতা দুটি যথাক্রমে **'ভারতভূমি'** ও **অভিলাষ'**।

এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকসমাজে ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা তাঁর 'অভিলাষ' কবিতা (তত্ত্ববোধিনী ১৭৯৬ শক/১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর)। কিন্তু সম্প্রতি দ্বিমত দেখা দিয়েছে। ১৮৭৪ সালেরই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৮৭৪ জানুআরি/১২৮০ মাঘ, পৃ ৪৫৬-৫৮) ভারতবর্ষের দুঃখলাঞ্ছনার গ্লানি অনুভব করে **'ভারতভূমি'** নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে অনুমান করা হয়েছে। ঠিক সম্প্রতি নয়, প্রকৃতপক্ষে, এ সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৩৪৯)[১১] বিজ্ঞাপনে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র অল্পদিন পরে। তিনি ঐ 'বিজ্ঞাপনে' জানান যে বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১২৮০ সালের মাঘ সংখ্যায় 'ভারতভূমি' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐটিই রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম প্রকাশিত কবিতা'। কবিতার শীর্ষে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ছিল—

> "এই কবিতাটি এক চতুর্দশবর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।[১২] কোনো কোনো স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

সুকুমার সেন বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো চোদ্দ।' রচনারীতি এবং ভঙ্গিও বালক রবীন্দ্রনাথের রচনারই 'অনুরূপ'। বিশেষতঃ, "যবে তুই ফুলবালা, গলে ধরি করে খেলা" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথের 'ফুলবালা'র যুগের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। 'ফুলবালা'র যুগ ছিল প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব-সংগীতে'র কবিতাগুলি রচনার পর্বে। ঐ গ্রন্থের কবিতাগুলি 'তেরো' থেকে 'আঠারো' বৎসর বয়সের রচনা। 'ভারতভূমি'ও প্রায় তেরো বৎসর বয়সেরই রচনা। যাই হোক, সুকুমারবাবু আরও বলেন, ঐ বৎসরেরই বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ-সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। তাই সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথই কনিষ্ঠভ্রাতার কবিতাটি প্রকাশার্থে বঙ্গদর্শনে দিয়েছিলেন। তৎকালে রবীন্দ্রনাথ যে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করেছিলেন তারও ছায়াপাত লক্ষ করা যায় কবিতাটিতে। আর, সে সময়ে তাঁর রচনার প্রধান অবলম্বন ছিল 'দেশানুরাগ' এবং তার ভাব ছিল 'বিষাদময়'। ভারতভূমি কবিতাটি এই সব ভাবেরই অনুকূল।

যে কোনো নূতন আবিষ্কারেরই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি থাকে। সুকুমার সেনের উক্ত অভিমত প্রকাশের অল্পদিন পরেই শ্রীকালিদাস নাগ তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৪৯ ফাল্গুন) তাঁকে সমর্থন জানালেন। তিনিও বলেন,—

> "ভারতভূমি' কাঁচা রচনা হলেও কাব্যসরস্বতীর পাদপীঠে শিশু রবীন্দ্রনাথের কাঁচা হাতের প্রথম আল্‌পনা।"

---

১১ দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয়' পৃ ৭০-৭১

১২ দ্রষ্টব্য: বঙ্গদর্শন (১২৮০ মাঘ, পৃ ৪৫৬) 'বালকের রচনা বলিয়া'। সুকুমার সেন বলেন, 'বালকের বলিয়া'। সুশান্তবাবু বলেন, 'বালকের রচিত বলিয়া'।

কিন্তু কালিদাস নাগ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি একদিকে বলেছেন, কবিতাটি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের রচনা হলে তার মধ্যে পাওয়া যাবে বঙ্কিমের গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। যে বঙ্কিম সন্ধ্যাসংগীতের জন্য বালক রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাঁর আট-নয় বছর আগেকার রচনার মধ্যেও প্রতিভার সন্ধান পাওয়া বঙ্কিম ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ, তিনি ছিলেন সেকালের কড়া সমালোচক। তাঁরই সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে 'ভারতভূমি' ছাপা হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুকুমার সেনও এ প্রসঙ্গে আগেই বলেছিলেন,—

> "রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের সংশোধনের জন্য আমরা দুঃখিত নই। কিন্তু তিনি যে কবিতাটি অংশতঃ ছাঁটিয়াছিলেন সেজন্য ক্ষোভ হইতেছে।"

কিন্তু অপরদিকে কালিদাস নাগের সন্দেহ, যদি বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিতাটি প্রকাশের জন্য বঙ্গদর্শনে দিয়ে থাকেন, তবে কনিষ্ঠভ্রাতার বয়স নিশ্চিতভাবে বারো জেনেও বঙ্কিমের মন্তব্যের 'চতুর্দ্দশবর্ষীয়' স্বীকার করে নিলেন কি করে বোঝা যায় না। অথচ, কয়েকমাস পরে 'সেজদাদা' [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] তত্ত্ববোধিনীতে স্পষ্ট করে 'দ্বাদশবর্ষীয়' বালকের উল্লেখ করেছিলেন।[১৩] তাই এক্ষেত্রে 'ভারতভূমি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের না হয়ে বঙ্কিমের পরিচিত অন্য কোনো বালক কবিরও হতে পারে বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কালিদাস নাগ মহাশয় সুকুমার সেনের আবিষ্কারকে অবলম্বন করেই তাঁর আলোচনাটি করেছেন। কোনো নিশ্চিততর সিদ্ধান্ত বা প্রমাণ তিনি দেন নি।

কিছুদিনের মধ্যেই (প্রবাসী, ১৩৫০ বৈশাখ) এই আলোচনার সূত্র ধরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সুকুমার সেনের আবিষ্কার বা তাঁর সমর্থিত কালিদাস নাগের আলোচনা—কোনোটিই সত্য নয়। তাঁর মতে, ভারতভূমি কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিষচন্দ্রের ডায়ারি থেকে তাঁর স্বীকৃতি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, বয়সের দিক্ থেকেও কোনো ভ্রান্তি নেই। তাঁর বয়স তখন ছিল পূর্ণ 'চতুর্দ্দশ' বৎসর। সুতরাং

১৩ প্রকৃতপক্ষে, সেজদাদা ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন। আর, তত্ত্ববোধিনীর 'দ্বাদশবর্ষীয়' তথ্যটিও সঠিক নয়। কারণ, তখন কবির বয়স দ্বাদশের অধিক।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে "এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের রচনা" বলে যে মন্তব্য করেন তাতেও ভুল নেই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের রচনা নিজে সংশোধন করে দিয়েছেন, এও অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, 'বারো বৎসর সাত মাস' বয়সের রবীন্দ্রনাথকে চতুর্দ্দশ বৎসর বলে কল্পনা করে সুকুমার সেন যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা তিনি মানতে পারেন নি। এছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ আরও বলেন যে, যে বঙ্গদর্শন ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণাস্থল তাতে কবিতা প্রকাশ হলে রবীন্দ্রনাথ কি সে কথা বিস্মৃত হতেন? কাজেই তিনি সুকুমার সেন ও কালিদাস নাগের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁর 'রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয়ে'ও (১৩৫০ মাঘ ১০) তিনি তাঁর এই মতে অবিচলিতই থেকেছেন।

আজ থেকে প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে এই তিন গবেষকের মধ্যে যে মত-পার্থক্য হয়েছিল, তা এতদিন পর্যন্ত আর পুনরুত্থাপিত হয় নি। 'অভিলাষ'ই প্রথম প্রকাশিত কবিতার মর্যাদা লাভ করে এবং ঐ নিয়েই এতদিন পর্যন্ত যা-কিছু আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র আবিষ্কার করেছেন যে,[১৪] 'ভারতভূমি' কবিতাটি শুধু বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়নি, ঐ একই বছরে একই সময়ে (১২৮০ মাঘ ১৭/১৮৭৪ জানুআরি ২৯) দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতাটির মোট ২২ স্তবকের মধ্যে ৮টি স্তবক (১, ২, ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১২) অবলম্বন করে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। এই প্রকাশের কথা সুকুমার সেন, কালিদাস নাগ ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই উল্লেখ করেন নি। সম্ভবতঃ, ঐ তথ্য তাঁদের কারুরই লক্ষ্যগোচর হয় নি। শ্রীসুশান্তকুমার অমৃতবাজার থেকে ঐ তথ্য উদ্ধার করে দেখান, তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক শিশির কুমার ঘোষ ঐ কবিতাটি সম্বন্ধে অমৃতবাজারে 'মা ভৈঃ' শীর্ষক এক সপ্রশংস সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সুশান্তকুমার বলেছেন,—

> "উনিশ শতকের কোনো সংবাদপত্রে, একমাত্র ভারতভূমি ছাড়া অন্য কোন কবিতাকে কেন্দ্র করে কোনো সম্পাদকীয় রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অমৃতবাজারের মত সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়তে (ব্রিটিশ সরকারও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন) স্থান পাওয়া ভাগ্যের কথা।"

আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ঐ প্রবন্ধে ভারতভূমির কবিকে লেখক যে

---

১৪ সুশান্তকুমার মিত্র: 'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা', 'অমৃত' ১৯৭৫ জুন ২০-জুলাই ১৮ (১৫ বর্ষ); পুস্তিকা ১৯৭৫ অক্টোবর।

সম্মান দিয়েছেন, তা যে কোনো বাঙালীর পক্ষেই গৌরবজনক। শিশিরকুমার বালক কবিকে 'পরাধীন দেশ ও আসন্ন মুক্তির প্রতিভূরূপে' চিহ্নিত করে বলেছেন,—

"ঈশ্বর পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের ক্রন্দন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন, কিন্তু যখন সুমতি বালকেরাও দেশে দুর্গতির নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়াছে, তখন ভারতবর্ষ উদ্ধারে আর বিলম্ব নাই।"

এতখানি সম্মান যেখানে শিশিরকুমার দিয়েছেন এবং অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় একদা যখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশের চেয়েও ছিল 'গৌরবজনক', তখন জ্যোতিষচন্দ্রের ডায়ারিতে তার উল্লেখ থাকা অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্র কবিতাটির সপক্ষে সমস্ত নিদর্শন রেখে যাওয়া সত্ত্বেও এই প্রশংসা-পত্রটির উল্লেখ না করায় সুশান্তবাবু সিদ্ধান্ত করেছেন, ব্রজেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত ডায়ারির দৃষ্টান্ত তথা কবিতাটি জ্যোতিষচন্দ্র-রচিত, এই সব তথ্যই অসত্য বা কাল্পনিক। অমৃতবাজারের এই সম্পাদকীয় ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে না পড়লেও ডায়ারীতে উল্লেখ থাকলে এ বিষয়টা নিয়ে সে-সময়েই আলোচনা হতে পারত। এই মতবিরোধ এবং তার পক্ষে বিপক্ষে বহু যুক্তিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন সুশান্তবাবু। বর্তমান প্রসঙ্গে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

আলোচ্যক্ষেত্রে, সর্বাগ্রে লক্ষণীয়, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কি-না এবং তা কতখানি প্রমাণযোগ্য। এরপক্ষে, সুশান্তকুমারের প্রদর্শিত অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় খুব বড় একটা বহিরাঙ্গিক প্রমাণ। বিশেষতঃ শিশিরকুমার ঘোষ বলেছেন, "আমরা বোধহয় এই বালকটিকে চিনি।" এই চেনা বালকটি রবীন্দ্রনাথ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, শিশিরকুমার ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তাই এই প্রতিভাবান্ বালকটিকে তিনি চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছিলেন। একবছর পরেই যে বালকের স্বনামে প্রকাশিত প্রথম রচনা 'হিন্দুমেলায় উপহার' অমৃতবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বোধহয় শিশিরকুমার দেখেছিলেন 'ভারতভূমি'র কবির রচনায়। অপরপক্ষে, বঙ্গদর্শন ও তার সম্পাদক বঙ্কিমের সঙ্গে অমৃতবাজারের সম্পর্ক ছিল মোটামুটি বিরূপ। তাই শিশিরকুমারের ঐ উক্তি বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে বিশেষ প্রযোজ্য বলেও মনে হয় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বয়সের ব্যাপারটি নিয়ে কালিদাস নাগ ও ব্রজেন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে কবিতাটির রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় জাগাটা খুবই স্বাভাবিক। তবে সে যুগের অনেক দৃষ্টান্ত থেকেই দেখা যায়, তখন রচনায় রচয়িতার

নাম অথবা সঠিক বয়স উল্লেখ করা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা ছিল অনেক কম। তাই 'অভিলাষ' কবিতা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বৎসর ৭ মাস হওয়া সত্ত্বেও বলা হয়েছে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত।' ১৮৭৫ সালে হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত কোনো কবিতা (সম্ভবতঃ 'হোক্ ভারতের জয়') সম্বন্ধেও মতপার্থক্য দেখা যায়। সমকালীন পত্রিকা 'The Indian Daily News' এ (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১৫) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয়, "a hındsome lad of some 15"। ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন, "১৫ নহে—১৩ বৎসর ৯ মাস।"[১৫] যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ তখন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক।"[১৬] আবার, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা রচনা ও পাঠের সময় কবির বয়স ছিল পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর। কিন্তু 'সাধারণী' পত্রিকায় কবিতাটির সংবাদ প্রকাশকালে বলা হয়, "রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।"[১৭] প্রকৃতপক্ষে, এই কবিতাগুলিতে ('অভিলাষে'র শীর্ষে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও) বয়স নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটি বিষয়ে এমনও তো হতে পারে, যে বালক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের পরিচয়ে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে কবিতা প্রকাশ করলেন এবং তার দশ মাস পরে তত্ত্ববোধিনীতে সেই বঙ্কিমেরই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করলেন,[১৭ক] তাঁর পরিচয়টিকে গোপন করার জন্য বয়সটিকেও তাঁর ভ্রাতারা গোপন করেছিলেন। বিশেষতঃ, বঙ্কিমের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের তো তার পূর্বেই মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল।[১৮] এ ছাড়া অনেকসময় আবার বাৎসল্যবশতঃ বালক বালিকার বয়স প্রকৃতের চেয়ে কম বলে বিশ্বাস করার প্রবণতাও দেখা যায়।[১৯] 'অভিলাষ' কবিতাটিতে হয় তো সেই স্নেহেরই প্রকাশ ঘটেছিল জ্যোতিদাদার হাতে। অর্থাৎ বয়সটা নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা তখনকার দিনে তত প্রবল ছিল না। প্রয়োজনভেদে বয়স বাড়ানো বা কমানোতে তাঁরা বিশেষ গ্রাহ্য করতেন বলে মনে হয় না। তাই 'ভারতভূমি'তে সাড়ে বারো বছরের ছেলেকে যখন চৌদ্দ বৎসর বলা হল, তখন তা নিয়ে বড়োদাদা বিশেষ চিন্তা করেন নি। মাত্র সাড়ে বারো বৎসরের বালকের লেখা পাঠকসমাজে হয়তো বিশেষ আবেদন জাগাতে পারবে না, তাই বয়স সামান্য বাড়িয়ে দিলেন

১৫ রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয় (১৩৫০), পৃ ৭৫
১৬ হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (১৯৬৮), পৃ ৪২
১৭ দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন : 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', শশিভূষণস্মারক গ্রন্থ, পৃ ১১৮-১৯
১৭ক দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন : 'ভোরের পাখি', শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ, পৃ ৩৫৫-৫৮
১৮ দ্রষ্টব্য—সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ।
১৯ প্রবোধচন্দ্র সেন : 'ভোরের পাখি', শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ, পৃ ৩৫৮-৫৯

পত্রিকাটির সম্পাদক—এই অনুমানও নেহাত অমূলক হবে না। এইভাবে নানাদিক্ থেকে বিচার করে বয়স-সমস্যাটির যদি একটা সমাধান করা যায়, তবে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বলে মেনে নিতে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যায়।

সুশান্তকুমার এই কবিতাটির মধ্যে ভাবী রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপটি আবিষ্কার করে এবং তাকে সপ্রমাণ করার জন্য বহু বহিরাঙ্গিক ও আভ্যন্তরিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এই আবিষ্কার ও আলোচনাকে সমর্থন জানিয়েছেন স্বনামধন্য অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও স্বয়ং সুকুমার সেন। তবে লক্ষণীয়, সুকুমার সেন মহাশয় বাংলাসাহিত্যের কথা—তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে যে কথা অনেকখানি সবিস্তারে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, পরবর্তী কালে তার প্রতিধ্বনি কিন্তু বিশেষ শোনা যায় নি। বর্তমানে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় খণ্ড, 'রবীন্দ্রনাথ') চতুর্থ সংস্করণে (১৩৭৬, পৃ ৩২, পা-টী ২) তাঁর সেই বক্তব্যকে তিনি অতি সংক্ষেপে ও মৃদুভাবে উপস্থাপন করেছেন। বরঞ্চ, ইতিমধ্যে তিনি ঐ গ্রন্থেই 'শ্মশানে রজনীগন্ধা' (জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ বৈশাখ) নামে একটি কবিতাকে "রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা ছোট কবিতা (লিরিক)" বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। কবিতাটির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন, পরবর্তী 'ক্ষণিকা'র (১৯০০) 'দুর্দিন' কবিতার প্রথমাংশের সঙ্গে তার মিলও আছে।[২০] কিন্তু এতদিন পরে সুশান্তকুমারের আলোচনার পর এবং নতুন তথ্য (শিশিরকুমারের মন্তব্য) সংযোজিত হওয়ায় তিনি আবার তাঁরই প্রথম আবিষ্কৃত 'ভারতভূমি'র বিষয়ে জোর পেলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি 'ভাষা-ভিত্তিক' নতুন প্রমাণ দিয়ে বক্তব্যকে আরও জোরালো করারও প্রয়াস করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকায় সংশয়ের একটু কণা থেকেই যাবে।"

প্রকৃতপক্ষে, সুশান্তবাবু বহিরাঙ্গিক ও আভ্যন্তরিক যত প্রমাণ দিয়েছেন, সেগুলি সবই প্রায় পরোক্ষ প্রমাণ। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী অথবা শেলী প্রমুখ কবির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার রচনায় ছিল ঠিকই। কিন্তু ঐ রকম প্রভাব অন্য বালক কবির রচনাতেও কি থাকতে পারে না? বিশেষতঃ, অনুসরণ করার প্রবণতা যখন বালক বয়সেরই ধর্ম। আর, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনাবলীও অন্য লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হতে পারে। কাজেই তাঁর প্রদর্শিত এইসব দৃষ্টান্ত যে একেবারে অখণ্ডনীয়, তা

২০ বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), পৃ ৪৪

নয়। তবে ভারতভূমি যে রবীন্দ্ররচিত, এই সম্ভাবনাকে তিনি অনেকাংশেই নিশ্চিততর করেছেন। সন্দেহের যে 'কণা'টুকু সুকুমারবাবুর মনে রয়ে গেছে তাকে উচ্ছেদ করার জন্য আরও গভীর চিন্তার অবকাশ রয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম একটি হল শব্দপ্রয়োগজাত প্রমাণ। ব্যক্তি বিশেষের কোনো বিশেষ শব্দের প্রতি আকর্ষণ তথা শব্দপ্রয়োগ, অলংকার, ভাষার ভঙ্গি প্রভৃতি নানাবিধ রচনা বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে এবং পরবর্তী কালে সে বিষয়ে তাঁর উক্তি থেকে তারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে অনেকসময় অ-নামী রচনাকে প্রমাণ করা যায়।[২১] এ ক্ষেত্রে সেই রকমই একটা সুযোগ রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র প্রথমবর্ষেই মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যটির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ভাষা, ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগকে তিনি কোনোদিনই অশ্রদ্ধা করেন নি। ভারতভূমি কবিতাতেও পঙ্‌ক্তিগঠন, শব্দপ্রয়োগ ও উপমাসৃষ্টিতে রয়েছে মধুসূদনের গভীর অনুসরণ। এ বিষয়টি সুকুমার সেন ও কালিদাস নাগও লক্ষ করেছিলেন এবং সুশান্তবাবুও দেখিয়েছেন বিস্তৃতভাবেই। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিততর সিদ্ধান্ত করার আরও অবকাশ আছে। বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগের অভিনবত্ব দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

> "ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ভাষার প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে, সেটা ও ভাষার accent-এর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না।…কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না।…এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষর বহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এইজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে।"[২২]
>
> "বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন" (সাহিত্যের পথে, 'বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' ১৩৪১) তার দৃষ্টান্ত দেখাতে রবীন্দ্রনাথ 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিটির

২১ বর্তমান গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাট্যদ্বয়ের সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধটি (৪র্থ অনুচ্ছেদ) দ্রষ্টব্য।

২২ রবীন্দ্রনাথ: 'ছন্দ বিচার' (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ), ছন্দ (১৯৭৬) পৃ ১২৪ এবং প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ছন্দজিজ্ঞাসা' পৃ ২৭৫

তরঙ্গায়িত ধ্বনি-আঘাতটির কথা বারেবারেই উল্লেখ করেছেন।[২৩] এমন কি, মেঘনাদবধের দুটি 'কঠোর সমালোচনা'তেও (ভারতী ১২৮৪ শ্রাবণ-পৌষ ও ১২৮৯ ভাদ্র) তিনি ঐ পঙ্‌ক্তিটির প্রশংসাই করেছিলেন।

মধুস্থদনের শব্দ ও ধ্বনিপ্রয়োগের বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে দৃষ্টান্ত কিছু বেশি দেওয়া হল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'ইরম্মদ' শব্দটি সম্বন্ধে কবির সচেতনতা। মধুস্থদনের এত বিচিত্র শব্দপ্রয়োগের মধ্যে 'যাদঃপতিরোধঃ যথা' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি ও 'ইরম্মদ' শব্দটি তিনি জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত স্মরণ রেখেছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় ষাট্ বৎসর পূর্বে লেখা 'ভারতভূমি' কবিতাতেও মধুস্দন-ব্যবহৃত বহু শব্দের মধ্যে কবি ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন— 'পড়িলেক ইরম্মদ কালমেঘ হতে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে (১০ম স্তবক)। আসলে তাঁর মনের গভীরে ঐ শব্দটির ছাপ জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। একদা নতুন শব্দ প্রয়োগ করবার ঝোঁকে কবি 'দ্বিরেফ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু নবগোপালবাবুর প্রবলহাস্যে তিনি চিরকালের জন্য তা পরিত্যাগ করেন। অথচ, দ্বিরেফের চেয়েও অনেক কঠিন 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দ যখন তিনি মধুস্থদনকে অনুসরণ করে ব্যবহার করতে লাগলেন, তখন আর কারো হাস্যের পরোয়া করেন নি। এই ধরণের বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগের (যেমন— ইরম্মদ) প্রমাণ তথা এই নিয়ে আলোচনা অন্য কারো রচনায় দেখি না। তাই এই দৃষ্টান্তের দ্বারা কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

কিন্তু শুধু শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যই নয়, আরও কয়েকটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য কবিতাটির মধ্যে দেখা যায়। সে যুগের সামাজিক ও পারিবারিক যে পটভূমিকা রবীন্দ্র-জীবন গঠনে কার্যকরী হয়েছিল (১ম অধ্যায়-১) তার স্পষ্ট-অস্পষ্ট ছায়া অনেকক্ষেত্রেই কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই কবিতা রচনার প্রায় সমকালেই দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ'। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তিনি বড়োদাদার এই কাব্যের অনুসরণ করেন নি। কিন্তু এই কাব্যে যে রূপকের ব্যবহার দ্বিজেন্দ্রনাথ করেছেন তার একটা অপ্রত্যক্ষ প্রতিফলন কবিতাটির স্থানে স্থানে দেখা যায়। 'অমরবেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর' (২য় স্তবক) ও 'চলি যাবে আনন্দেতে দেব-নিকেতনে' (১৯শ স্তবক) পঙ্‌ক্তি দুটির কাব্যগত অর্থ যাই হোক, 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র (১ম সং ১৮৭৫) অন্তর্গত—

---

২৩ 'ছন্দ', পৃ ৯, ২৬ পা-টী ১, ১২৪

ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর,
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি ॥ ২৫ ॥

— বিলাসপুর প্রয়াণ, পৃ ৬৪

— এই শ্লোকটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে শ্লেষার্থ প্রয়োগ করেছেন তার একটা ক্ষীণ ও পরোক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়। 'দেব-পুরন্দর' অর্থাৎ 'দেবেন্দ্র' এবং 'অমর-বেষ্টিত' অর্থে 'সত্য-হেম', 'বীর', 'গুণ-জ্যোতি' ও 'সোম আর রবি' প্রভৃতি ভ্রাতাদেরও ইঙ্গিত হতে পারে। আর 'দেব-নিকেতন' শব্দটি তো হুবহুই অনুসৃত হয়েছে। এই ভ্রাতারা যে দেবেন্দ্রর গৃহকে সর্বদা আলোকোজ্জ্বল করে রাখতেন, তার একটা শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত আছে বলেই মনে হয়।

শুধু বড়োদাদা নয়, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ও অনুসরণও কবিতাটির স্থানে স্থানেই লক্ষ করা যায়। সুশান্তবাবুও দেখিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' সংগীতের " 'হিমাদ্রি' 'ভারতভূমি' ইত্যাদি শব্দই নয়, 'গাও ভারতের জয়' স্থলে 'গাইয়ে ভারতজয়' পঙ্‌ক্তিরও সাদৃশ্য" রয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আরও মিল দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ "বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী", "ভীষ্ম-দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ, পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলিতে ভারতবর্ষের প্রাচীন বীরত্ব-গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ভারত-ভূমি'র রচয়িতাও তাঁদের স্মরণ করে বলছেন—"বাখানিবে এ ভুবনে নব হিন্দুবীরে" (১৮শ স্তবক)। এ প্রসঙ্গে 'হিন্দুবীরে' ও "ডুবিল 'হিন্দু'র নাম কলঙ্ক সাগরে" (৯ম স্তবক) ইত্যাদি স্থলে 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার 'হিন্দুমেলা'র কথাও কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুমেলার পরিবেশে মানুষ হচ্ছিলেন। অপরপক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথের 'যবনের ধূমকেতু' ও ভারতভূমির 'প্রাণভয়ে দিনু তারে যবনের করে' (৯ম) পঙ্‌ক্তিগুলির 'যবন' শব্দের মধ্যে মিল এবং বিদেশী শত্রুর প্রতি ধিক্কারই সূচিত হয়েছে।

পারিবারিক-সামাজিক প্রভাব ও প্রেরণা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতা, তার নামকরণ ও তৎকালীন ছন্দখেলার নিদর্শনও রয়েছে কবিতাটির মধ্যে। সমকালীন কবিতাগুলির সঙ্গে ভাব, ভাষা ও ছন্দোগত সাদৃশ্য সুশান্তবাবুও দেখিয়েছেন। কিন্তু আরও একটু গভীর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, শুধু পরবর্তী কবিতাগুলি নয়, নাম-তারিখহীন 'ভারতমাতা' সম্বন্ধীয় কবিতার 'ভারতমাতা' শব্দটিরও পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এই

কবিতায়।[২৪] অপরদিকে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের 'ভারতভূমি' শব্দপ্রয়োগের প্রভাব। অর্থাৎ কবিতাটিতে খুবই অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে বড়োদাদা, মেজদাদা প্রমুখ ভ্রাতাদের প্রভাব এবং কবির নিজের আন্তরিক প্রেরণা।

ছন্দ-বিষয়েও কবিতাটিতে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছন্দপরীক্ষার ছাপ। তিনি তাঁর ছেলেবেলার কাব্যরচনাচর্চা বিষয়ে বলেছেন,—

> "পয়ার-ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট-অক্ষর ছয়-অক্ষর দশ-অক্ষরের চৌকো চৌকো কত-রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ ভাঙাগড়ার খেলা।"
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫

এই ছন্দ নিয়ে খেলার দৃষ্টান্ত স্বরূপই তিনি বলেছেন,—

> "মনে পড়ে পয়ার-ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম।···অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন।"
>
> —'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১১

অর্থাৎ অক্ষয়বাবুর মত কাব্যরসিক ব্যক্তি তাঁর এই কবিতার ভাব ও ছন্দের নূতনত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অথচ, এই পয়ার বা ত্রিপদী কোনোটিই বাংলা কাব্যে নূতন নয়। কবির রচনার কৌশলে তা-ই হয়ে ওঠে অভিনব। রবীন্দ্রনাথও এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বিহারীলাল' (১৩০১) প্রবন্ধে বলেছেন,—

> "আর্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সংগীত [১৮৭৯] যখন প্রথম বাহির হইল তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী;[২৫] কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

বিহারীলালের এই ছন্দের একটি দৃষ্টান্তও কবি দিয়েছেন।—

"সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।"

শুধু বিহারীলাল নয়, তাঁর বহু পূর্বেই মধুসূদনের কাব্যে ('উষা', 'মলয় মারুত'

---

২৪ দ্রষ্টব্য—জী-স্মৃ, 'বাড়ির আবহাওয়া' (ভারতমাতা সম্বন্ধে কী একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম)

২৫ দৃশ্যত ত্রিপদী হলেও আসলে এ ছন্দ চৌপদী।
দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথ: 'ছন্দ', পৃ ১২-১৩ ও ১৩ পা-টী ২

প্রভৃতি কবিতা, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬১) এই 'প্রচলিত ত্রিপদী' ছন্দ লক্ষ করা যায়। মধুসূদন ও বিহারীলালের ত্রিপদী ৮॥৮॥ ৪ ভাগে বিভক্ত ; এর পূর্বে ত্রিপদী ছিল প্রধানতঃ ৮॥৮॥১০— এই ভাগে বিভক্ত। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল-মধুসূদন-অনুসৃত ত্রিপদীরই (৮॥৮॥১৪) প্রথমে ও শেষে দুটি পয়ার যুক্ত করে নতুন ধরণের স্তবক রচনা করলেন। এই নতুন সৃষ্টিতেই ছিল তাঁর 'অবাধ-অধিকার'। 'ভারতভূমি' তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। এতে কবির ছন্দ সম্বন্ধে চেতনা যেমন প্রখর, ছন্দসৃষ্টিও তেমনি নিপুণ। অক্ষয়বাবু যে কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, শুনিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজনকে, সে এই কবিতাই কি-না তাই বা কে বলতে পারে! ভারতভূমি কবিতাতে অনুসৃত কবির এই ছন্দ-প্রবণতাও কবিতাটি যে রবীন্দ্ররচিত, তারই আনুকূল্য করে।

একসঙ্গে এতগুলি সম্ভাব্যতা বোধকরি জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা অন্য কোনো কবির রচনায় মিলবে না। প্রকৃতপক্ষে, 'অভিলাষ' কবিতাটির কথা রবীন্দ্রনাথের নিজেরও স্মরণ ছিল না। 'পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে তাঁকে দেখানোতে তিনি নিজের রচনা বলে স্বীকার করেন এবং বলেন,—

"ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল।"

সজনীকান্ত দাস মহাশয় সেই মন্তব্যের সূত্র ধরেই কবিতাটিকে তাঁর 'সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা' বলে ঘোষণা করেন।[২৬] অনুরূপভাবেই বলা যায়, 'ভারতভূমি'ও যে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা হতে পারে, তা তাঁর মনে না থাকা আরও স্বাভাবিক। কবিতাটি তাঁকে দেখালে তিনি নিজের বলে অস্বীকার করতেন কি-না সন্দেহ। অতঃপর যে আরও কবিতা আবিষ্কৃত হবে না, তা-ও বলা যায় না। এখন পর্যন্ত ভারতভূমিকেই প্রথম মুদ্রিত কবিতার মর্যাদা দেওয়া যায়।

নাম তো সে যুগের অনেক রচনাতেই থাকত না। কিন্তু আভ্যন্তরিক প্রমাণ যদি জোরালো হয় তবে নাম-না-থাকা 'সংশয়ের কণা'টিকেও নিরসন করা যায়। সুকুমার সেন নিজে একদা যে তথ্যের সন্ধান প্রথম দিয়েছিলেন তাকেই নিশ্চিততর করেছেন সুশান্তকুমার মিত্র। তবুও সন্দেহের একটু কণা সুকুমার বাবুর মনে থেকেই গিয়েছিল। বর্তমানে এই গভীরতর প্রমাণগুলি সংশয়ের সেই শেষ কণাটুকুকেও সম্পূর্ণ মুছে দেবে বলেই আশা করি। তাই বলতে পারি, 'অভিলাষ' কবিতাতে 'ভোরের পাখি'র কলকাকলি প্রথম শোনা

২৬ দ্রষ্টব্য— সজনীকান্ত দাস: 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬১), পৃ ১১২

গিয়েছিল বলে যে ধারণা এতদিন ছিল,[২৭] বর্তমানে তার পরিবর্তে ভারতভূমিকেই 'ভোরের পাখি'র প্রথম কাকলি বলে মানতে হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগা অসম্ভব নয় যে, যে 'বঙ্গদর্শন' ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে আদর্শস্থল এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই বালকের একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার তথা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, সেই বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে এরপরে কবির আর কোনো কবিতা কেন প্রকাশ হল না! এ প্রশ্নের উত্তরও এইরকম হতে পারে ;— একদিকে, 'স্বপ্নপ্রয়াণের' প্রথমসর্গ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার পর (১২৮০ শ্রাবণ, পৃ ১৮৫-৮৭) দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের সামান্য মতবিরোধ ঘটেছিল বলে মনে হয়। তাই তিনি নিজেও আর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বঙ্গদর্শনে দিলেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও আব ঐ পত্রিকার প্রতি উৎসাহিত করলেন না। অপরদিকে, তার অনতিকাল পরেই 'অভিলাষ' কবিতায় প্রকাশ পেল বঙ্কিম-অভিমতের প্রতিবাদ। বঙ্কিম-বিরোধী কথা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ পেতে পারে না। স্বভাবতঃই তা প্রকাশিত হল বাড়ির পত্রিকা তত্ত্ববোধিনীতে। তারপর 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের পর (১৮৭৭) আর কোনো বাইরের পত্রিকাকে অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা গেল আরও অনেক কমে।

পরিশেষে, কবিতাটিতে সুশান্তবাবুর স্বীকৃত পাঠ সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করি। কবিতাটির একাদশ স্তবকে তাঁর ধৃত পাঠ নিম্নরূপ।—

সেইদিন উদিলেক ম্লান শশধর
সেইদিন নিশীথিনী, জ্যোৎস্না সত্ত্বেও
মস্বিনী,
সেইদিন হতে দুখে ভাসয়ে অন্তর।
সেইদিন ছারখার ভারত সুন্দর।

তিনি বলেছেন, "সেইদিন নিশীথিনী, জ্যোৎস্না সত্ত্বেও মস্বিনী" এই অংশটিতে ছন্দের 'সৌষম্য' কিঞ্চিৎ 'নষ্ট' হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, 'মস্বিনী' শব্দটির কোনো অর্থ হয় না। অর্থ যদি করা যায়, তবে বলতে হবে, 'মস্' (অর্থাৎ চন্দ্র) শব্দ থেকেই 'মস্বিনী' হয়েছে, 'মসী' থেকে নয়। যদি তাই হয়, তবে অর্থটির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। তাই মনে হয়, এটি সুশান্তবাবুর সামান্য একটু অনবধানতারই ফল। বঙ্গদর্শনের মূল পাঠে আছে (পৃ ৪৫৭)—

"সেইদিন নিশীথিনী, জ্যোৎস্না সত্বে তমস্বিনী"

এবং কালিদাস নাগ মহাশয়ও তাঁর প্রবন্ধে কবিতাটির প্রতিমুদ্রণে এই পাঠই

---

২৭ প্রবোধচন্দ্র সেন : 'ভোরের পাখি', শতবার্ষিক জয়ন্তীউৎসর্গ

দিয়েছেন। অর্থ এবং ছন্দের দিক্ থেকে এই পাঠেই 'সৌষম্য'ও রক্ষিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর পাঠে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ত্রুটি লক্ষ করা গেছে, যেগুলি মূল বঙ্গদর্শনে নেই। যেমন—৭ম স্তবকের 'সুখসিন্ধু' হবে 'দুখসিন্ধু'; ১৬শ স্তবকের 'সুখ' হবে 'দুখ'। এই ত্রুটিগুলি থাকলে অর্থ রক্ষা হয় না। ১ম স্তবকের 'উদিছে' হবে 'উদেছে' এবং ১২শ স্তবকে 'অস্ত' হবে 'অস্তে'। তাছাড়া, ছেদজনিত কয়েকটি ক্ষুদ্র বিভ্রমও চোখে পড়েছে।

তবুও সুশান্তবাবুর এই আবিষ্কার 'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা' কোন্‌টি তা নিরূপণের পথে একটি বড় পদক্ষেপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বঙ্কিমচন্দ্র যেটুকু বর্জন ও পরিবর্তন করেছিলেন, সেটুকু না করলে ভারতভূমির কবিকে সনাক্ত করা তথা কবিতাটি রবীন্দ্ররচিত বলে সিদ্ধান্ত করা হয়তো সহজতর হতে পারত।

৩

'ভারতভূমি'র পরে ঐ বৎসরেরই শেষে (১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় '**অভিলাষ**' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিও রবীন্দ্রনাথের রচিত বলেই বিভিন্ন গবেষক নানা প্রমাণ দেখিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

> "কবিতাটিতে লেখকের নাম দেওয়া নাই, শুধু উহা 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।··· কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস (সুতরাং) ইহা আরও এক বৎসর পূর্বের রচনা।"

—রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয় (১৩৫০), পৃ ৬৬

তিনি শুধু বয়সের কথাটাই বলেছেন, কবিতাটি রচনাকালে কবির মনে কোনো প্রেরণা কাজ করেছিল কি-না, তা নিরূপণ করার প্রয়াস করেন নি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার অনুমান করেছেন,—

> "ইহাতে কি বালক কবির মনের অভিলাষই বালকোচিত ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছিল ?"

—র-জী, পৃ ৪৫

প্রকৃতপক্ষে 'অভিলাষ' কবিতাটির রচনাকাল ও প্রেরণাস্থল উভয় বিষয়েই কিঞ্চিৎ সংশয়ের অবকাশ আছে বলে মনে হয় এবং এই দুটি সমস্যার সিদ্ধান্ত হয়তো একই সঙ্গে করা সম্ভব হবে।

এই কবিতাটি রচনার প্রেরণা কবি কোথা থেকে পেলেন সে সম্বন্ধে প্রথমে একটু চিন্তা করা দরকার। এ বিষয়ে প্রভাতকুমার যা বলেছেন, সেটি বাদে আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বোধ হয়। কবিতাটির মর্মগত অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ রেখে পড়লেই বোঝা যায়, এই কবিতায় কবিচিত্তের কোনো অভিলাষ প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে মানবচিত্তের অভিলাষ বৃত্তির প্রতি কবির ধিক্কারবাণী। 'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ'কে কবি কখনও বলেছেন 'দুরভিলাষ' কখনও আবার বলেছেন 'দুষ্ট অভিলাষ' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষা'। কবির মূল বক্তব্য হল, মানুষ সুখের আশায় উচ্চাভিলাষ করে বটে, কিন্তু তা তাকে শেষপর্যন্ত চালিত করে অধর্ম ও বিনাশের দিকে। তিনি স্পষ্ট বলেছেন,—

কোথায় তোমার অন্ত রে দূরভিলাষ
স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে তা নয় তা নয়।
…সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল।

তাঁর মতে অভিলাষের প্রেরণায় মানুষ পরস্পরকে হত্যা, প্রবঞ্চনা করতেই প্রবৃত্ত হয়। অভিলাষের তাড়নায় মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তিতে বিক্ষুব্ধ হয়। ভারতবর্ষে এরজন্য কি কি ক্ষতি হয়েছে তা-ও তিনি সবিস্তারেই বর্ণনা করেছেন।—

"কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।"

অভিলাষকে যে তিনি একেবারেই সমর্থন করেন নি, তা নয়। উনচল্লিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ কবিতাটির শেষ তিনটি শ্লোকে তিনি তার প্রতি সুবিচারও করেছেন। কিন্তু বাকি ছত্রিশটি শ্লোকে দিয়েছেন ধিক্কার। ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, বালক রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ কেন 'অভিলাষ'কে এভাবে ধিক্কার দিতে উদ্যত হলেন? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের মত হল,[২৮] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বাঙালির বাহুবল' (১২৮১ শ্রাবণ) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাভিলাষকে খুব উচ্চ স্থান দিয়ে বাঙালীকে খুব জোরের সঙ্গেই ওদিকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন। 'অভিলাষ' কবিতাটি সম্ভবতঃ বঙ্কিমের ওই প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বাঙালীকে জাতীয় সুখের জন্য যে অভিলাষ তারই

২৮ 'ভোরের পাখি', শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

প্রবর্তনা দিয়েছিলেন, ধর্মের প্রবর্তনা তাতে মোটে স্থান পায় নি। এটাই বালক কবিকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিয়েছিল মনে হয়। কারণ কবির মতে—

"পবিত্র ধর্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।" (১৩শ স্তবক)

'বাঙালির বাহুবল' যখন প্রকাশিত হয়, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তা ততটা তীব্র হয়নি। পক্ষান্তরে, ঠাকুরবাড়িতে ধর্মের প্রবর্তনাই ছিল সকলের চেয়ে বড়। তাই স্বভাবতঃই এই কবিতাটিতে সুখাভিলাষকে ধিক্কৃত করে ধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। আর, কবিতাটি প্রকাশিতও হল ধর্মচিন্তার বাহক 'তত্ত্ববোধিনী'তে।

'অভিলাষ' কবিতায় আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেন,—

"জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁহার গদ্যরচনা শুরু হয় সাহিত্য সমালোচনা দিয়া, ভারতীতে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আলোচনা দিয়া রচনা আরম্ভ করিলেন। চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন।"

—র-জী, পৃ ৬৯

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের এই প্রতিবাদ-প্রবণতার প্রথম নিদর্শন 'অভিলাষ' কবিতা। আরও কিছুকাল পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ধর্মাদর্শ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করে বিচলিত করেছিলেন; তার কিছু দৃষ্টান্ত আছে পরবর্তী সপ্তম অধ্যায়ে। অতএব, বলা যায়, অভিলাষ কবিতাটি অনাগত বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিরোধের ক্ষীণ ও প্রথম পূর্বাভাস।

এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই এই কবিতাটির রচনাকালও অনুমান করা সম্ভব। কবিতাটি যদি সত্যিই 'বাঙালির বাহুবল' প্রবন্ধের প্রতিবাদরূপে গৃহীত হয়, তাহলে তার রচনাকাল ১২৮১ সালের শ্রাবণমাসের পরে। তখন কবির বয়স 'দ্বাদশ বর্ষে'র অধিক।

এছাড়া আরও একটি অনুমেয় প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়সে ম্যাক্‌বেথ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা পাঠ করেছিলেন। সেগুলি ১৮৭৪ সালের ঘটনা। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন,—

"মনে হয় কবিতাটি ম্যাক্‌বেথ পড়িবার সময়ে লিখিত— ম্যাক্‌বেথের হত্যার আভাস হত্যাকারীর অনুতাপাদির কথা আছে।"

—র-জী, পৃ ৪৫

প্রকৃতপক্ষে, কবিতাটিতে ম্যাক্‌বেথ, শকুন্তলা প্রভৃতির প্রায় স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে।—

"ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া" (২৫শ স্তবক)।

অথবা, "হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে" (২৬শ স্তবক)।

এগুলি ম্যাক্‌বেথ পাঠেরই প্রত্যক্ষ ফল। অপরদিকে দেখি,—

"নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আসন" (৯ম স্তবক)।

এই যে তপোবন ও ধর্মের প্রতি অনুরক্তি, এ স্পষ্টই শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব পাঠের ফল। অতএব, কবিতাটি ১৮৭৪ সালের শেষার্ধের রচনা বলে হয়তো অনুমান করা ভুল হবে না। তখন তাঁর বয়স 'দ্বাদশবর্ষে'র অধিক। কিন্তু বয়সের সমস্যা তখনকার দিনে প্রকাশকদের তত চিন্তান্বিত করত না, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাই এ নিয়ে এখানে ব্যাপক চিন্তা বা তর্ক করার প্রয়োজন দেখি না। ভাষা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগেও অভিলাষ কবিতায় কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। যথাস্থানে (৮ম অধ্যায়) তার আলোচনা করা যাবে।

৪

১৮৭৫ সালের প্রথমেই **'হিন্দুমেলায় উপহার'** নামে আর একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে, যে অধিবেশন শুরু হয়েছিল ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১১, সম্ভবতঃ তার চতুর্থ দিনে (৩ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুআরি ১৮৭৫) রবীন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। নিজের রচনা নিয়ে সর্বজনের সম্মুখে কবির এই প্রথম আবির্ভাব। কবিতাটি পরে রবীন্দ্রনাথের স্বনামে তৎকালীন দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ২৫)। এটি রবীন্দ্রনাথের নামযুক্ত প্রথম প্রকাশিত কবিতা। হিন্দুমেলার এই অধিবেশনের প্রথম দিনে পঠিত একটি কবিতা সম্বন্ধে সমকালীন The Indian Daily News সংবাদ দিয়েছিলেন (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১৫),—

"The Hindoo Mela. The Ninth Anniversary of the Hindoo Mela was opened at 4 P. M. on Thursday, the 11th instant, ··· Baboo Rabindra Nath Tegore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tegore a handsome

lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharat (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone, much pleased his audience."

এতদিন পর্যন্ত গবেষকরা এই কবিতাটি 'হিন্দুমেলায় উপহার' ধরে নিয়েই আলোচনা করতেন। কিন্তু সেটি 'হিন্দুমেলায় উপহার' কি না সন্দেহ। ১১ই ফেব্রুআরি কবি যে কবিতা আবৃত্তি করেন, সেটি সম্ভবতঃ অধুনা-আবিষ্কৃত 'হোক্ ভারতের জয়' নামক একটি কবিতা। কারণ ঐ কবিতার ভাব হল উদ্বোধন সূচক, তাই প্রথম দিন ঐটি দিয়ে শুরু হওয়াই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা যাচ্ছে।

হিন্দুমেলার এই নবম অধিবেশনের যেদিন 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি পঠিত হয়, সেদিন সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের আদর্শ, প্রেরণা ও প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সম্ভবতঃ হিন্দু মেলার এই অধিবেশনের পূর্বেই তিনি সঞ্জীবনী সভার সদস্য হয়ে রাজনারায়ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সঞ্জীবনী সভার আদর্শের কথাই যেন ভাষান্তরে কবি বললেন 'হিন্দুমেলায় উপহারে,'—

ভারতকঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায়রে নূতন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি ?

এর থেকে মনে হয়, হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনের পূর্বেই সঞ্জীবনী সভার জন্ম।

হিন্দুমেলা স্থাপনের সময় (১৮৬৭) রবীন্দ্রনাথ মাত্র ছয় বৎসরের শিশু। এই মেলায় ঠাকুর পরিবারের সহায়তা ছিল অন্যতম এবং শিশু রবীন্দ্রনাথ ঐ মেলার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আদর্শের পরিমণ্ডলেই মানুষ হওয়ায় তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন,— এ কথা নানা প্রসঙ্গে কয়েকবারই বলা হয়েছে। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধন সংগীত ছিল সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সবে ভারতসন্তান"। এই সংগীত সেদিন বাঙালীর মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছিল। রাজনারায়ণের লেখা থেকে এই সংগীত সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রও গানটিকে 'মহাগীত' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনেও গানটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন,—

"রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে হিন্দুমেলার যুগে 'গাও ভারতের জয়' গানের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন।... বস্তুত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গান ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত 'গাও ভারতের জয়' গানেরই উত্তরাধিকারী। তবে 'গাও ভারতের জয়' গানে যে হিন্দু আদর্শের প্রাধান্য দেখা যায়, জনগণমন গানে তার স্থানে ভারতবর্ষের সর্বজনীন আদর্শের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে।"

—'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' (১৩৫৬) পৃ ৪২-৪৩

অন্যত্রও তিনি বলেছেন, ভারতবাসীর এই প্রথম 'জাতীয়সংগীত' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ও রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানের অগ্রদূত ও প্রেরণাস্থল।[২৯]

যাইহোক, জ্যেষ্ঠভ্রাতা-রচিত এই গান তাঁর মনে গভীর প্রেরণা জাগাল জীবনের একেবারে সূচনাতেই। তারই ফলস্বরূপ রচনা করলেন 'হিন্দুমেলায় উপহার'। শিক্ষাদীক্ষা, বলবীর্য ও স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যবিহীন মৃতপ্রায় ভারতবর্ষের জন্য কবির গভীর আক্ষেপ কবিতাটির সর্বত্র পরিস্ফুট হয়েছে।[৩০] যে ভারতবর্ষে একদিন রাজত্ব করেছিলেন 'স্বাধীন নৃপতি' 'রাজা যুধিষ্ঠির', 'রাম রঘুপতি'; যে দেশে একদিন 'পৃথ্বীরাজ' সম্পন্ন করেছিলেন যথার্থ 'ক্ষত্রিয়ের কাজ' এবং রাণী 'দুর্গাবতী' আত্মাহুতি দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন সেই ভারতবর্ষেরই কিনা সমস্ত গৌরব লুপ্ত হয়ে আজ তা শ্মশানমরুতে পরিণত হয়েছে! তাই কবি আক্ষেপ করে পরিশেষে বলেছেন,—

"মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন
অনন্ত গভীর কালের জলে।"

স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং পরাধীনতাজনিত গ্লানির কথা এর আগে শোনা গিয়েছিল 'ভারতভূমি'তে। তা-ই এবার আরও দৃঢ়তা ও গভীরতার সঙ্গে ধ্বনিত হল 'হিন্দুমেলায় উপহারে'।

ভাবে-ভাষায়-ছন্দে অনেকক্ষেত্রেই কবিতাটির মধ্যে হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' কবিতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কারণ, তিনি মানুষ হচ্ছিলেন ঐসব কবিদেরই

---

২৯ 'অগ্রদূত': বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ৪১২

৩০ শ্রীমন্তকুমার জানা: 'হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনীসভা এবং রবীন্দ্রনাথ', কালি ও কলম, ১৩৭৬ ভাদ্র, পৃ ৫

ভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে। আর, তাঁদের ভাবকেই আত্মীকৃত করে তথা পরিবারের উদ্দীপনাকে আপন অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করে কবি যে কবিতা লিখলেন তা তাঁর নিজের মনেরই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

৫

'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার প্রায় একই সময়ে রচিত **'হোক্ ভারতের জয়'** নামে আর একটি কবিতার সন্ধান দিয়েছেন শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী।[৩১] প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুরাতন 'বান্ধব' পত্রিকার (১২৮১ মাঘ) পৃষ্ঠা থেকে তিনি এই কবিতাটি উদ্ধার করেছেন। কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের রচিত তার নানা সম্ভাব্যতা দেখিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

প্রথমে বহিরাঙ্গিক দিক্ থেকে বিচার করা যাক। 'বান্ধব' পত্রিকায় ১২৮৫ ও ১২৮৮ সনে যথাক্রমে 'কবিকাহিনী' ও 'রুদ্রচণ্ডে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে এই পত্রিকাটির পরিচয় ছিল ভালভাবেই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও কালীপ্রসন্নের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ। তাই তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ বঙ্গদর্শন, অমৃতবাজার বা জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশের মতই স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া কবিতাটির শেষে 'র' অক্ষরটি মুদ্রিত ছিল। রথীন্দ্রবাবু বলেন,—সে যুগে হিন্দুমেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'র' আদ্যক্ষরযুক্ত আর কোনো কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তটি অবশ্য সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নাও হতে পারে। কারণ, এই যুক্তিতে রয়েছে নেতিবাচকতা। এ ধরণের সিদ্ধান্তের কিছু ইতিবাচক যুক্তিও থাকতে পারে। তৎকালীন সব কবি বা সব ব্যক্তির সন্ধান এতদিন পরে কেই বা জানবেন! তাছাড়া 'র' অক্ষরটি যে আদ্যক্ষরই, তারই বা প্রমাণ কি? তবুও বলব, রবীন্দ্রনাথেরই আর কোনো কোনো রচনায় 'র' অক্ষরের উল্লেখ একবারে দুর্লক্ষ্য নয়;[৩২] বিশেষতঃ, 'ভানুসিংহ' নামের 'ভ' লিখতে তিনি বিশেষভাবেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই 'র' স্বাক্ষরিত এই কবিতাটি রবীন্দ্ররচিত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু বহিরঙ্গের চেয়ে আভ্যন্তরিক প্রমাণ ও মিলগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তখন রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অধিকাংশ কবিতাতেই

---

৩১ দেশ, ১৯৭৬ মে ২৯/১৩৮৩ জ্যৈষ্ঠ ১৫, পৃ ৩০৯-১১

৩২ শ্রী অঃ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]-স্বাক্ষরিত 'দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি' (ভারতী, ১২৮৯ আ-শ্রা) প্রবন্ধের 'প্রত্যুত্তর' (ভারতী ১২৮৯ ভাদ্র)—শ্রীরঃ-স্বাক্ষরিত।

ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেছেন এবং গ্লানি অনুভব করেছেন বর্তমান হীন অবস্থার কথা চিন্তা করে। 'ভারতভূমি', 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ' কোনোটিই তার ব্যতিক্রম নয়। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে একদা যাঁরা ছিলেন গৌরবস্বরূপ— ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস; ভীষ্ম-দ্রোণ-অর্জুন-যুধিষ্ঠির; রামচন্দ্র, এমনকি রাণী দুর্গাবতী পর্যন্ত— তাঁদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন 'হিন্দুমেলায় উপহারে', 'প্রকৃতির খেদে'। 'হোক্ ভারতের জয়' কবিতাতেও তারই পুনরুক্তি দেখা যায়।

এছাড়া মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গান সে যুগে ছিল ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মত এবং বালক রবীন্দ্রনাথের অন্তরে তার উদ্দীপনা ও ভাবাদর্শ গাথা হয়ে গিয়েছিল চিরকালের জন্য— সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য কবিতাটির নামকরণের মধ্যেই দেখি সেই কবিতাটির প্রত্যক্ষ প্রভাব। এ প্রভাব যে অন্য কোনো কবির রচনায় থাকতে পারত না, তা নয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রভাব কনিষ্ঠের উপরে আসা বেশি স্বাভাবিক ও সম্ভব। বিশেষতঃ তিনি তো ঐ পরিমণ্ডলেই মানুষ হয়েছিলেন। এই কারণেও কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

রথীন্দ্রবাবু সমকালীন 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির সঙ্গে হোক্ ভারতের জয় কবিতার ভাব ও ছন্দোগত মিল দেখিয়েছেন। কিন্তু শুধু ভাব ও ছন্দ নয়, শব্দগত অভিন্নতার গুরুত্বও কিছু কম নয় এবং একমাত্র প্রকৃতির খেদই নয়, ভারতভূমি, হিন্দুমেলায় উপহার প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে ভাবগত ও শব্দগত মিলও খুব বেশি। হোক্ ভারতের জয়ে ব্যবহৃত 'অভাগী মাতা' (১৪শ স্তবক) ও প্রকৃতির খেদের 'অভাগী ভারত' (৬ষ্ঠ ও ১১শ) একই শব্দ এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর, আরও পূর্বে লেখা 'ভারতভূমি'তে সেই অর্থেই দেখি 'ভারতমাতা' (৯ম) শব্দটির ব্যবহার। এছাড়া আলোচ্য কবিতার 'যবন' (১১শ) শব্দ 'ভারতভূমি'র (৯ম) যুগ থেকেই কবি ব্যবহার করছিলেন। 'হিন্দুজন' (১৯শ) বলতে হিন্দুমেলায় উপস্থিত ব্যক্তিদেরই বোঝা যায়। এই 'হিন্দু'র কথা আছে ভারতভূমিতে (৯ম ও ১৮শ), আছে প্রকৃতির খেদ কবিতার প্রতিবিম্ব-পাঠে (২৫ ও ২৭)। অপরপক্ষে, হোক্ ভারতের জয়ের 'আর্য' (১৩শ) শব্দের ব্যবহার দেখি প্রকৃতির খেদের তত্ত্ববোধিনী-পাঠে। 'সিন্ধু' শব্দের ব্যবহারও কবি করেছেন ভারতভূমি (৭ম) ও হোক্ ভারতের জয় (১৬শ) কবিতাদ্বয়ে। আর হিন্দুদের 'কলঙ্কে'র কথাও তিনি বলেছেন ভারতভূমিতে (৯ম), হোক্ ভারতের জয়ে (৪র্থ) ও 'তোমারি তরে মা

সঁপিনু এ দেহ' গানে। এগুলি ছাড়াও 'ভারত-রবি' অস্ত যাওয়া, 'স্বদেশ-হিতৈষী' হওয়া ইত্যাদি কথা বারেবারেই সে যুগের কবিতায়, গানে ধ্বনিত হয়েছে। এইসব শব্দপ্রয়োগজাত ও শব্দার্থজ্ঞাপক মিলগুলি কবিতাটি যে রবীন্দ্ররচিত, এ অনুমান করতে অনেকখানি সহায়তা করে।

রচনাকালের দিক্ থেকেও 'হিন্দুমেলায় উপহার' ও 'হোক্ ভারতের জয়' সমকালীন বলেই মনে করা যায়। কারণ, উভয় কবিতাই হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন (৩০ মাঘ - ৪ ফাল্গুন ১২৮১) উপলক্ষে রচিত হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ কবিতা দুটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল একই। কাজেই দুটি কবিতাই ১২৮১ সনের পৌষ-মাঘ মাসে রচিত বলে অনুমান করা যায়।

উল্লিখিত সবগুলি তথ্য একত্র মিলিয়ে দেখলে বোধকরি কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, হিন্দুমেলায় উপহার ও হোক্ ভারতের জয় কবিতা-দুটি একই লেখকের (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের), হিন্দুমেলার একই অধিবেশনের উদ্দেশ্যে এবং একই কালে (১২৮১ পৌষ-মাঘ) রচিত। সুতরাং, হোক্ ভারতের জয় কবিতাটির আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রকান্তের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখা যায় না।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রবন্ধের পরিশেষে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, সে সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে (১২৮১ মাঘ ৩০/১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১১) রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা 'পাঠ' করার (delivered from memory) সংবাদ দিয়েছেন সমকালীন Indian Daily News পত্রিকা (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১৫), সেটি 'হিন্দুমেলার' উপহার নয়, 'হোক্ ভারতের জয়'। তাঁর যুক্তি অনুসারে, অমৃতবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম দিয়ে যখন 'হিন্দুমেলার' উপহার প্রকাশিত হল তখন হিন্দুমেলায় পঠিত হবার কোনো সংবাদ তাতে ছিল না। অপরপক্ষে, বান্ধবে উক্ত কবিতাটিতে লেখা ছিল, 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল'। ঐ কবিতাটির 'এস এস ভ্রাতৃগণ, সরল অন্তরে', 'এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ', 'এস এস সবে করি প্রিয় সম্ভাষণ', 'এই দেখ হিন্দুমেলা' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে সমবেত সদস্যগণকে সম্বোধন করে একটা ভাষণ দেবার ভাবও আছে, সে কথা তিনি বলেছেন। অতএব, ঐ কবিতাটিকেই হিন্দুমেলায় পঠিত বলে ধরে নেওয়া যায়। 'হিন্দুমেলার' উপহার পরে ঐ অনুষ্ঠিত মেলার 'অনুপ্রেরণা'য় লেখা হয় এই সিদ্ধান্ত তিনি করেছেন।

এ বিষয়ে আসলে 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটির যথার্থ নামটি কি সে

বিষয়ে রয়ে গেছে লেখকের অনবধানতা। এ বিষয়ে অনেকেরই ত্রুটি লক্ষ করা যায়। 'হিন্দুমেলায়' উপহারকে 'হিন্দুমেলার' উপহার বললে সম্পূর্ণ অর্থটিই বদলে যায়। মনে রাখতে হবে, কবিতাটি লেখক হিন্দুমেলায় উপহার দেবার নিমিত্তই পাঠ করেছিলেন। 'হিন্দুমেলার' উপহার বললে হিন্দুমেলা উপহার দিচ্ছে— এই অর্থ দাঁড়ায়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ-রবীন্দ্ররচনাবলীতেই[৩৩] ত্রুটি রয়ে গেছে এবং রথীন্দ্রবাবু সম্ভবতঃ সেই পাঠ গ্রহণ করেই বিপথে চালিত হয়েছেন। অপরপক্ষে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয়ে'[৩৪], যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে[৩৫] এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে[৩৬] 'হিন্দুমেলায় উপহার' এই যথার্থ অর্থজ্ঞাপক নামটিই গ্রহণ করেছেন। সর্বোপরি, যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর গ্রন্থে অমৃতবাজারের যে 'আলোকচিত্র' তুলে দিয়েছেন[৩৭] তাতেও আছে 'হিন্দুমেলায়'। কাজেই ঐ কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথ উপহার-স্বরূপ হিন্দুমেলায় পাঠ বা আবৃত্তি করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, একটিকে উদ্বোধকরূপে ও অপরটিকে 'উপহার'রূপে এই অধিবেশনে উপস্থাপিত করতে কোনো বাধা দেখি না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌টি কবে পড়া বা আবৃত্তি করা হয়েছিল? মনে রাখতে হবে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন হয়েছিল পাঁচদিন, (১৮৭৫, ১১-১৫ ফেব্রুআরি) একদিন নয়।[৩৮] Indian Daily News-এর সংবাদ থেকে মনে হয় 'হোক্ ভারতের জয়' কবিতাটি রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে প্রথম দিন (১১ই ফেব্রুআরি), উদ্বোধনে আবৃত্তি করা (delivered from memory) হয়েছিল, 'পঠিত' হয় নি। কারণ, সংবাদটিতে স্পষ্টই লেখা আছে, 'A Bengail poem on Bharat (India)'. রথীন্দ্রবাবু অবশ্য 'রচিত' অর্থেই 'পঠিত' ধরে নিয়েছেন। কিন্তু 'রচিত' মানে 'পঠিত' বা আবৃত্তি করা কোনোটিই না-ও হতে পারে। তবে উক্ত সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, আবৃত্তি করাই হয়েছিল, 'পঠিত' হয় নি। সম্ভবতঃ প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হবার পরেই 'বান্ধব' পত্রিকার তরফ থেকে কবিতাটি গৃহীত হয়। অপরপক্ষে, অধিবেশনের চতুর্থ দিন (ফাল্গুন ৩ / ফেব্রুআরি ১৪), যেদিন ছিল 'মেলার প্রধান দিবস'

---

৩৩ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৮২৪
৩৪ ১৩৫০ মাঘ, পৃ ৭৫
৩৫ ১৩৭৫ শ্রাবণ, পৃ ১১৮
৩৬ প্রথম খণ্ড, ১৯৭০ পৃ ৪৭, ৪৯-৫০, ৬২
৩৭ হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃ ১১৮ সংযোজন
৩৮ হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃ ৩৯-৪২

সেইদিনই 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবি পড়লেন (অথবা আবৃত্তি করলেন)। ঐদিন সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু এবং 'বক্তৃতাপাঠ' ইত্যাদি ছিল অধিবেশনের প্রধান অঙ্গ। কবির এই কবিতায় একদিকে রয়েছে তাঁর আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশ, অপরদিকে রাজনারায়ণ-পরিচালিত সঞ্জীবনী সভার আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে, 'হোক্ ভারতের জয়' অপেক্ষা 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র সাহিত্যিক গুরুত্ব অনেক বেশি। 'হোক্ ভারতের জয়' আগাগোড়াই 'মিলে সবে ভারতসন্তানে'র একটা প্রতিধ্বনিস্বরূপ এবং বারেবারেই আছে উপস্থিত সদস্যদের প্রতি একটা আহ্বান-সূচক ভাষণের ভাব। কবির স্বকীয় অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ সে ক্ষেত্রে কম। অপরপক্ষে, 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র স্তবকে স্তবকে রয়েছে পরাধীন ভারতের জন্য গ্লানি অনুভব করে কবির বেদনাময় অনুভূতির প্রকাশ; আছে প্রাচীন ভারতের আদর্শে মৃতপ্রায় ভারতের দেহে প্রাণসঞ্চার করার উদ্দীপনা। তাঁর মনের এই গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনুভূতিসিক্ত ভাষায় ও ছন্দে। তাতেই কবিতাটির সাহিত্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। তাই কবিতাটি এই 'প্রধান দিবসে' উপহার দেওয়া বেশি স্বাভাবিক। সাহিত্যিক গুরুত্বের দিক্ থেকে 'হিন্দুমেলায় উপহার' 'হোক্ ভারতের জয়ে'র উপরে। কবিতাটির নামেই প্রকাশ সেটি হিন্দুমেলার এই অধিবেশনে উপহৃত হবার জন্য রচিত হয়েছিল। সেই কারণেই সম্ভবতঃ অমৃতবাজারে সেই সংবাদটুকু দেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল।

তাই পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করা চলে, হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে প্রথম দিন আবৃত্তি করা হয়েছিল 'হোক্ ভারতের জয়' এবং চতুর্থদিন সভার কার্যক্রম অনুসারে কবি নিবেদন করেন তাঁর 'হিন্দুমেলায় উপহার'। কিন্তু 'হিন্দুমেলায় উপহার' অনুষ্ঠিত সভার 'অনুপ্রেরণা'য় পরে রচিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।[৩৮ক]

৬

'হিন্দুমেলায় উপহার' ও 'হোক্ ভারতের জয়' কবিতা দুটি রচনার কিছু দিনের মধ্যেই কবি লিখলেন '**প্রকৃতির খেদ**'। কবিতাটিতে লেখকের নাম ছিল না। অ-নামে প্রকাশিত প্রকৃতির খেদ যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, তার পরোক্ষ প্রমাণ কি কি হতে পারে তা নির্ণয় করতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস মহাশয় বলেন,—

৩৮ ক লেখিকার—'রবীন্দ্রনাথের একটি নবাবিষ্কৃত কবিতা', দেশ, জুলাই ২৪, ১৯৭৬

"রবীন্দ্রকাব্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পঙ্‌ক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা।"

—'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ২০১-২০২

'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার সঙ্গে 'প্রকৃতির খেদে'র তুলনা করে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন,—

"ভাবগত সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ করলে এই দুটি কবিতাই যে এক-জনের রচনা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই দুই কবিতাতেই হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' (এডুকেশন গেজেট, ১২৭৭ শ্রাবণ) কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট।"

—'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', শশিভূষণ স্মারক গ্রন্থ, পৃ ১১৭

কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখি না। কারণ, এই পরোক্ষ প্রমাণগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার -সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী'র একটি সংখ্যা (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ৩ / ১৮৭৫ মে ১৬ রবিবার) থেকে জানা যায়,—

"গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভা হইয়াছিল।··· বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত এই কবিতাটি বিদ্বজ্জন সমাগম সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে পাঠ করেছিলেন, সম্ভবতঃ ১২৮২ সালের ২০ বৈশাখ তারিখে।[৩৯]

অতঃপর, ঐ বৎসরেই (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ২) শিলাইদহ থেকে গুণেন্দ্রনাথকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি পত্র থেকে এ সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করেছেন সজনীকান্ত দাস।—

"গুণুদাদা

বিদ্বজ্জনের Card ও রবির কবিতা পাঠাচ্ছি— কর্তামহাশয়

৩৯ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ভোরের পাখি' (দ্বিতীয় পর্যায় · প্রকৃতির খেদ), বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৮ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১১৬

[দেবেন্দ্রনাথ] কবিতাটি পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।" 'রবি'র কবিতাটি হল এই 'প্রকৃতির খেদ'।

—'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ২০৭

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের বলে প্রমাণিত হলেও কবিতাটির রচনাকাল ও প্রকাশকাল নিয়ে মতান্তর দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভোরের পাখি' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধে যা বলেছেন, সে বিষয়ে প্রথম আলোচনা করা যাক।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি প্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল (১৮৭৫/শক ১৭৯৭ আষাঢ়) বলে সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৫৮ মাঘ) উল্লেখ করেন যে, 'প্রকৃতির খেদ' প্রথমে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৮৭৫/১২৮২ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়েছিল।[৪০] অতঃপর এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে প্রতিবিম্ব পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পুনরায় সামান্য সংশোধনের পর মুদ্রিত হয়।[৪১]

প্রতিবিম্বে প্রকাশিত 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার শেষে লেখা আছে 'ক্রমশঃ'। কিন্তু ঐ পত্রিকার পরবর্তী দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংখ্যায় পরবর্তী অংশ আর প্রকাশিত হয় নি বলেই অনুমান করা হয়। তাই স্বভাবতঃ মনে প্রশ্ন জাগে কবি কেন প্রথমসংখ্যায় 'ক্রমশঃ' লিখেছিলেন। মনে হয়, কবিতাটিকে আরও দীর্ঘ করার সংকল্প কবির মনে ছিল। তাই কবিতাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লিখে তিনি সেই সংকল্পের আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ পরে তিনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী'তে পুনঃপ্রকাশের সময় 'ক্রমশঃ' কথাটি পরিত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে একটু পরেই আলোচনা করা যাবে।

সে যাই হোক, 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার যে পৃষ্ঠাগুলিতে 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি 'সম্পাদকীয়' পাদটীকায় লেখা আছে—

"আমাদিগের সম্ভ্রান্ত লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন।

৪০ দ্রষ্টব্য—'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮

৪১ র-জী, পৃ ৪৫ পা-টী ২

গত রবিবারের 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভায় কতিপয় মান্য বন্ধুর অনুরোধে রচয়িতাকে সাধারণ সম্মুখে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হয়। লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে আমাদিগের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়া 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভায় প্রদান করা হয়। এজন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে [।]

— প্রতিবিম্ব, ১২৮৯ বৈশাখ, পৃ ১৩ পা-টী

এই পাদটীকাটি থেকে বহু তথ্য জানা বা অনুমান করা যায়। প্রথমেই লক্ষণীয় 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভায় পাঠের জন্য কবিতাটির 'অর্ধাংশমাত্র' মুদ্রিত হয়েছিল। এই 'অর্ধাংশ' বলতে স্বভাবতঃই মনে হয়, প্রতিবিম্ব পত্রিকায় কবিতাটি যতখানি মুদ্রিত হয়েছিল তারই 'অর্ধাংশ'। আর, অর্ধাংশের মধ্যে একটা ভাবগত সম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই ছিল, তা না হলে 'অর্ধাংশমাত্র' পঠিত বা মুদ্রিত হতে পারত না। প্রতিবিম্ব পত্রিকায় কবিতাটি সাতাশটি স্তবকে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে যোলোটি স্তবকের পরে একটা ভাবের পূর্ণতা পাওয়া যায় এবং তারপর সপ্তদশ স্তবকে আছে একটা ধুয়া। কবির সংকল্প অনুসারে কবিতাটি যদি দীর্ঘতর হত, তবে বোধহয় এই ধুয়াটি এক-একটি ভাবপর্যায়ের শেষে বারবার দেখা দিত। আয়তনের দিক থেকেও ১৭ স্তবক পর্যন্ত কবিতাটির প্রায় অর্ধাংশ হয়। তাই মনে হয় বিদ্বজ্জন সমাগমে পাঠের জন্য এই সপ্তদশ স্তবক পর্যন্ত অংশই মুদ্রিত হয়েছিল।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিদ্বজ্জন সমাগমে পাঠের জন্য কবিতাটির অংশবিশেষ 'অসংশোধিত' আকারে একবার মুদ্রিত হয়। আর, প্রতিবিম্বে 'সংশোধিত' আকারে প্রকাশ হয়। তাই উভয়ের মধ্যে 'স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়'। তারপর পূর্বসংকল্পিত শেষাংশ রচনার অভিপ্রায় ত্যাগ করে ও প্রতিবিম্বের পাঠকে আরও পরিমার্জিত করে প্রকাশ করা হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। ফলে উভয় পত্রিকার পাঠের মধ্যেও 'স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়।' সুতরাং এর থেকে মনে হয়, 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি সবশুদ্ধ তিনবার মুদ্রিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'প্রতিবিম্ব' ও 'তত্ত্ববোধিনী'র দুটি পাঠ পাওয়া গেছে। প্রথম মুদ্রিত পাঠ, যেটি বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় পঠিত এবং সম্ভবতঃ বিতরিত হয়েছিল, সেটি আবিষ্কৃত হয় নি। তবে প্রাপ্ত পাঠ দুটি থেকে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তনশীল মনের একটা প্রকাশ দেখা যায়। সারাজীবনই তিনি তাঁর নিজের লেখা বারেবারে সংশোধন করেছেন। তার ফলে তাঁর প্রতিভা হয়েছে তীক্ষ্ণতর। এই অভ্যাস

যে তাঁর 'প্রকৃতির খেদ' (১৮৭৫) রচনার সময় থেকেই ছিল, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

কিন্তু প্রকৃতির খেদের এই পাঠভেদ নিয়ে বর্তমানে শ্রীআদিত্য ওহদেদার মতান্তর প্রকাশ করেছেন।[৪২] তিনি বলেছেন প্রবোধচন্দ্রের [এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রমুখ ব্যক্তিও অবশ্য একই মত প্রকাশ করেছেন] যুক্তি অনুযায়ী প্রকৃতির খেদ প্রতিবিম্ব পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পরে প্রকাশিত—এ মত তিনি মানতে পারেন না। প্রকাশের দিক্ থেকে প্রতিবিম্বের তারিখ পূর্ববর্তী হলেও রবীন্দ্রনাথের 'মানস বিবর্তনের ধারা' অনুযায়ী তত্ত্ববোধিনীর পাঠকেই তিনি পূর্ববর্তী বলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি পাঠের ছন্দ, ভাষা, ভাব, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস থেকে আরম্ভ করে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিচার করে তিনি বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস-আড়াইমাসের কালভেদ নিয়ে যে তর্কবিতর্ক তা এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। সাহিত্যিক আলোচনায় কালভেদ প্রসঙ্গ অবান্তর। বর্তমান প্রসঙ্গে কবিতাটির সাহিত্যমূল্য বিচার তথা রবীন্দ্র-কাব্য ও চিন্তার বিবর্তনে তার কি স্থান সেটি নির্ধারণ করাই মূল লক্ষ্য।

প্রকৃতির খেদ কবিতার সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে এটিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে 'হেমচন্দ্রের সুরে বাঁধা ও বিহারীলালের রঙে রঞ্জিত।'[৪৩] কবিতাটিতে ভাবের দিক্ থেকে হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' কবিতার স্বদেশপ্রেমের অনুসরণ ও বিহারীলালের সারদামঙ্গলের ভাবগত প্রেরণা হয়তো ঠিকই আছে; কিন্তু ছন্দোবন্ধ ও স্তবক গঠনে আছে 'প্রচলিত পয়ার'[৪৪] বন্ধেরই অনুবৃত্তি। এ ক্ষেত্রে সারদামঙ্গলের যেমন নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নেই, আছে প্রচলিত রীতিকেই নবতর ভঙ্গিতে রঞ্জিত করার প্রয়াস, তেমনি প্রকৃতির খেদে'ও দেখি 'ভারতভূমি' কবিতায় অনুসৃত সেই 'প্রচলিত' পয়ার-ত্রিপদীরই নবতর রূপ। তবে প্রতিবিম্বতে প্রকাশিত রূপটির শেষে লেখা ছিল 'ক্রমশঃ'। তাতে মনে হয়, কিশোর কবির অভিপ্রায় ছিল প্রকৃতির খেদ রচনাটিকে সারদামঙ্গলের মতো কয়েকসর্গে সমাপ্ত করা এবং সেইজন্যই বোধহয় প্রথমাবধিই শিল্প ও ভাবগত কল্পনায় সারদামঙ্গলের আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে যে কারণেই হোক্

৪২ 'রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' পাঠভেদের পুনর্বিচার', 'অমৃত' পত্রিকা, ১৩৭৯ বৈশাখ ২২, পৃ ১৯-২২

৪৩ ব-জী, পৃ ৪৯

৪৪ ছন্দ, 'বিহারীলালের ছন্দ', পৃ ১২

সে অভিপ্রায় ত্যাগ করেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এর যা রূপ তাতে কবির অভিপ্রেত রূপটি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটির যথার্থ মর্ম হল ভারতের দুর্ভাগ্যগীতি। ভারতবর্ষের শিয়রে হিমালয়ের কোলে বসে প্রকৃতি দেবী ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে 'খেদ' করছেন। হেমচন্দ্র তাঁর 'ভারতবিলাপ' কবিতায় যা বলেছেন, 'প্রকৃতির খেদে' ভাষান্তরে তারই যেন ছায়াপাত ঘটেছে। 'ভারতবিলাপে' কবি হেমচন্দ্র বলেছেন,—

"রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর আজি কি না এ হেন দশা!
হায়রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে, অরণ্যে রাখিলি
দাসত্ব যাতনা হত না তায়।
পাঠান, মোগল, ব্রিটনবাসী
তা হলে এখানে বারবার আসি
দিত না যাতনা গলে দিয়া ফাঁসী
পড়িতে হত না কাহার পায়।"[৪৫]

আর রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খেদে বলেছেন প্রায় সেই একই কথা—

অভাগী ভারত! হায় জানিতাম যদি,
বিধবা হইবে শেষে,
তা হলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ?…
তা হলে ভারত! তোরে,
সৃজিতাম মরু ক'রে,
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ;

দুটি কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রের কেন্দ্রগত ভাবটিকে আশ্রয় করে এবং স্বীয় প্রতিভা ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় তাঁর অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

৪৫ প্রথম সংস্করণের পাঠ। দ্রষ্টব্য; হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষৎ), কবিতাবলী, পৃ ২৪-২৫

'অভাগী' ভারতের অতীত সৌভাগ্যের পটভূমিকায় তিনি বর্তমান ভারতের দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করেছেন। ভারতের ভাগ্য তো চিরকাল একরকম ছিল না। এককালে ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন ও গৌরবান্বিত। সেই ইতিহাসের চিরন্তন সাক্ষী হচ্ছে 'উচ্চশির হিমালয়'। সে 'চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি'। এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, হিমালয়ের এই বর্ণনায় অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের হিমালয় বর্ণনার প্রভাব অনেকখানি কার্যকরী হয়েছে। যাই:হোক, সেই হিমালয়কে সাক্ষী রেখে কবি বলেছেন,—

'অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।'

কারণ, অতীতের সমস্ত কথাই,

'স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।'

'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাতেও আছে—

'সেদিনের কথা জাগে স্মৃতিপটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ-জলে ?'

এইসব উক্তির মধ্যে যেন কবির 'কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত'[৪৬]— এই বাণীটির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এর পর কবি একে একে ভারতের অতীত চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই ধরনের চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' ও 'ভারতসংগীতে'ও আছে।—

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ বাজাইত বীণা
ব্যাস্-বাল্মীকি— বিপুল বাসনা
ভারতহৃদয়ে আছিল ভরা॥
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে
হিমালয় চূড়া গগন পরশে
গাইত যখন ভারত-নাম।

—'ভারতবিলাপ'

এ ক্ষেত্রে কবি অতীতচিত্রের একটা আভাসমাত্র দিয়েছেন। এ ধরনের আভাস 'ভারতসংগীতে'ও আছে। কিন্তু 'প্রকৃতির খেদে' অতীত ভারতের ধারাবাহিক চিত্র সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়েছে। প্রথম চিত্র হল,—

৪৬ কথা (১৩০৬), 'কথা কও, কথা কও'

দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশে,
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে।

তারপরেই বলা হয়েছে—

সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল ! ··
তাহলে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল !
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল ?
সৌভাগ্যে হানিল বাজ
তাহলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হত না ?
পদাঘাতে উপহাসে,
তা হলে ত কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা ।।

'ভারতবিলাপে'ও কবি এ কথা বলেছেন, বিধাতা যদি ভারতকে অরণ্যময় করেই রাখতেন তাহলে,

'দাসত্ব যাতনা হত না তায়'
এবং 'পড়িতে হোতো না কাহার পায়'।

কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল অরণ্যময় অন্ধকার রইল না। তাই 'প্রকৃতি' দেবী বলেছেন—

আইল হিন্দুরা শেষে,
তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।

তত্ত্ববোধিনীতে 'হিন্দুরা' শব্দের স্থলে আছে 'আর্যরা'। এই পরিবর্তনে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্যদর্শন' পত্রিকার প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। যোগেন্দ্রনাথ ভারতের জাতিধর্ম-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা ও শ্রেণীবদ্ধতা তুলে দিয়ে ভারতের ঐক্যবদ্ধতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে 'আর্যদর্শনে' তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হত। 'হিন্দুমেলা'র নাম এই কারণেই বদলে তিনি 'ভারতমেলা' দিতে চেয়েছিলেন।[৪৭] তাঁর 'আর্যদর্শন' নামকরণের মধ্যেও সে ইঙ্গিতই বোধহয় রয়েছে।

৪৭ দ্রষ্টব্য; সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৩১, ৩য় খণ্ড, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আর্যদর্শনের একজন গুণগ্রাহী পাঠক। তাই তারই প্রভাবে 'হিন্দু'র বদলে 'আর্য' শব্দ হয়তো তিনি ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাঠে 'প্রতিবিম্ব' পাঠের কিছু কিছু শব্দ বা ভাবপ্রয়োগ উন্নত ও পরিণত ধরনের দেখা যায়। সেদিক্ থেকেও তত্ত্ববোধিনীর পাঠ পরবর্তী বলেই বোধ হয়। যাই হোক্, এই আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্‌ঘাটিত হল বৈদিক যুগের চিত্র, ভারতের আর-এক সভ্যতার স্তর।—

ঋষিগণ সমস্বরে
ওই সামগান করে
চমকি উঠিছি আহা! হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি॥
সরস্বতী নদীকূলে
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত॥
বীণাপাণি কুতূহলে
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত॥

এ রকমই একটি চিত্রের পুনরাঙ্কন দেখা যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশে,—

দেখ্, আর্য সিংহাসনে,
স্বাধীন নৃপতি গণে,
স্মৃতির আলেখ্য-পটে রহেছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে
ঋষিরা স্বাধীন মনে
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রহেছে ব্যাপৃত॥

প্রাচীন ভারতের এই চিত্র রচনার প্রবণতা এবং তপোবন আদর্শের প্রতি তাঁর সুগভীর আন্তরিক আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই প্রবল হয়েছিল তা এই বর্ণনাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। পরবর্তী কালে যে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে তাঁর পরিণত রচনাবলীতে। অপরপক্ষে, এর পূর্বে রচিত, 'বালকে'র 'অভিলাষ' কবিতাতেও এই চিত্র অতি স্পষ্ট। প্রাচীন

ভারতের রাজাদের 'ক্ষত্রিয় গরিমা' ও তপোবনবাসী ঋষিদের অধ্যাত্মমহিমার যে চিত্র তাঁর উত্তরকালীন সাহিত্যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল, তার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়েছিল 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায়। চোদ্দ বছরের বালকের পক্ষে এ জাতীয় চিত্র অঙ্কন সত্যই বিস্ময়কর। তখনকার কালে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিদের হাতে, এমন-কি, বিহারীলালের হাতেও এই জাতীয় চিত্র অযোগ্য বলে গণ্য হত না। 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটিকে এক কথায় কাব্যে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা বললে ভুল হবে না। পরবর্তী কালে লেখা—

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

—চৈতালী, 'প্রাচীনভারত' ১৮৯৬

এই অংশটিতে যে চিত্র দেখা যায়, তা 'প্রকৃতির খেদে'র চিত্রটিরই পরিণত ও সংহত রূপ বলা যায়।

এই তপোবন আদর্শের যথার্থ পীঠস্থানরূপে কবি গ্রহণ করেছেন সরস্বতী নদীর তীরকে। প্রকৃতির খেদে আছে—

সরস্বতী নদীকূলে
কবিরা হৃদয় খুল্যে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত॥

এই সরস্বতীনদীর প্রতি আকর্ষণ আছে তাঁর হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতাটিতেও (১৮৭৭)—

তুমি শুনিয়াছ সরস্বতীকূলে
আর্য ঋষি গান গায় মন প্রাণ খুলে।

আর, এরই পরিণত রূপ দেখছি পরবর্তী কালে লেখা 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিতে।[৪৮]

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি

৪৮ কথা, 'ব্রাহ্মণ' ১৮৯৫

শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে।

তপোবনের যে আদর্শ প্রথম অঙ্কুরিত অবস্থায় দেখা যায় 'অভিলাষ' কবিতায় তারই ঈষৎ বিকশিত রূপ ফুটে উঠেছে 'প্রকৃতির খেদ' ও হিন্দুমেলার দ্বিতীয় কবিতায়। আর সেই আদর্শই পূর্ণ পরিণতরূপে দেখা দিয়াছে 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়। এর থেকেই প্রমাণ হয় 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় কবির পরিণত মনের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল।

কবিতাটি পড়ে মনে হয়, 'অতীতকালের' এক-একটি 'চিত্র' পরপর অঙ্কন করাই কবিমনের অভিপ্রায় ছিল। তদনুসারে তিনি প্রথমে ইতিহাস-পূর্বযুগ এবং তারপর বৈদিকযুগের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বভাবতঃই মনে হয়, এরপর বেদোত্তরযুগের ছবি আঁকবেন। কবিও হয়তো সে কথা মনে রেখেই 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় কবিতার শেষে লিখেছিলেন 'ক্রমশঃ'। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, কবির সে পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুমেলায় উপহার, হোক্ ভারতের জয় ও প্রকৃতির খেদ— এই কবিতাগুলি একত্রে পড়লে কবির সে যুগের মানসরূপটির একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনটি কবিতার মধ্যেই অতীত ভারতের আদর্শে বর্তমান ভারতকে গড়ে তোলার জন্য একটি আবেদন লক্ষ করা যায়। আর এর পিছনে প্রেরণা হিসাবে কার্যকরী হয়েছে হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার প্রভাব, হেমচন্দ্র-বিহারীলাল প্রমুখ কবিদের আন্তরিক অনুভূতি এবং সর্বোপরি তাঁদের পারিবারিক উদ্দীপনা। এ বিষয়ে তাঁর সর্বপ্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী ও গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব পণ্ডিত। রামসর্বস্ব ছিলেন প্রতিবিম্বের সম্পাদক। তাঁর শিক্ষাধীনেই একদা রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা পড়েছিলেন। তিনি একাধারে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদাতা ও সাহিত্যের প্রেরণা-দাতা। স্বভাবতঃই তাঁর উৎসাহে কবিতাটি প্রতিবিম্বে প্রকাশিত হয়। অপর-পক্ষে, রবীন্দ্রচিত্তে দেশপ্রেমের প্রধান উদ্বোধক ও সর্বকর্মের সহায়ক জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রেরণাতেই প্রকৃতির খেদ বিদ্বজ্জন সভায় পঠিত হয় এবং তাঁর সম্পাদনাতে দ্বিতীয়বার কবিতাটি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবিতাটি রচনায় সবচেয়ে গভীর প্রেরণা ও প্রভাব ছিল বোধহয় কাদম্বরী দেবীর। নিজেকে সর্বজনের অগোচরে রেখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সযত্নে বিকশিত

করে তুলতে কতখানি সহায়ক ছিলেন তার ইতিহাস সকলেরই জানা। তাঁর সেই আন্তরিকতার গভীর পরিচয়ও আছে কবিতাটির মধ্যে। এঁদের সকলের সমবেত সাহচর্য ও প্রভাব একত্রে মিলিত হয়ে বালককবির অন্তরে এক নূতন অনুরণন জাগাল।

ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় ও গৌরব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে স্বকীয়, বিশিষ্ট ও চিরন্তন চিন্তাধারা, তারই একটি ভূমিকা রচনা করে দিল এই 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি। তাই বোধহয় সজনীকান্ত দাস এই কবিতাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন

"একজন চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের পক্ষে এরূপ রচনা Miracle-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।"[৪১]

৭

প্রতিবিম্বে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা প্রকাশের অল্পদিন পরেই ঐ পত্রিকায় '**প্রলাপ**' নামে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় (১২৮২ অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন; ১২৮৩ বৈশাখ)। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তার এই কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে বলেন,—

> "আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি-দুষ্কৃতি-বিচারের সময় কোনদিন তাহাদের তলব পড়িবে .. এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।"
>
> —জী-স্মৃ, 'রচনাপ্রকাশ'

কবি তার এই কবিতাগুলিকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ তুচ্ছ নয়, তার বিচার করারও অবকাশ আছে। তা ছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে, কবি ছেলেবেলার বহু লেখা যেমন বিস্মৃত হয়েছিলেন, তেমনি অনেক লেখার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। 'প্রলাপ' সেগুলির ব্যতিক্রম। তুচ্ছ মনে করেও সেগুলিকে তিনি স্মৃতিগ্রন্থে স্মরণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই কবিতাগুলি অপরিণত হলেও তার মধ্যে ক্ষীণভাবে তার বহু সম্ভাবনা ও বহু ভাবনার অঙ্কুর দেখা যায়। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' যে 'অঙ্কুরোদ্গত কবি' কবিতা লিখলেন, তা অনেকক্ষেত্রেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের অঙ্কুরস্বরূপ। তবে তাঁর সে যুগের প্রবণতাই আছে সবচেয়ে বেশি। 'কল্পনাবালা'কে সম্বোধন করে কবিতা লেখা তাঁর শৈশব সংগীত-বনফুল-কবিকাহিনী-যুগেরই প্রবণতা। 'ফুলবালা-যুগে'র রঙিন স্বপ্ন আছে কবিতাগুলির পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে,—

৪১ 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য', পৃ ২০

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াস্ বালা !
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দামিনী মালা।—(প্রলাপ ১)

কবির এই কল্পময় দৃষ্টি বাস্তব জীবনবোধের ঊর্ধ্বে। কিন্তু ভাষার সূক্ষ্মতা ও অলংকারের নৈপুণ্যে তাই হয়েছে অতুলনীয়। যেমন,—

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুন্ গুন্ গুন্ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কি বলে !—(পূর্ববৎ)

কিন্তু শুধু শৈশব সংগীতই নয়, ভগ্নহৃদয়, প্রভাতসংগীত প্রভৃতি কাব্যের ক্ষীণ ইঙ্গিতও যেন শোন যায়।—

ঢাল্ ! ঢাল্ চাঁদ ! আরো আরো ঢাল্ !
সুনীল আকাশে রজতধারা !
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা !
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি !
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি !—(প্রলাপ ২)

এ যেন প্রভাতসংগীতের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'রই পূর্বাভাস। আবার কখনও বালক কবির অন্তরের জালাও প্রকাশ পেয়েছে বেদনাময় ভাষায়।—

"মরমের তলে জ্বলেছে আগুন
হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সই !"—(প্রলাপ ৩)

অথবা, "এ ভাঙ্গা হৃদয় কত সবে আর !
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা !" —(পূর্ববৎ)

ইত্যাদি পঙ্ক্তিগুলি যেন 'ভগ্নহৃদয়ে'রই ইঙ্গিত বহন করে। আবার সন্ধ্যা-সংগীতের অবরুদ্ধ বেদনাও যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে স্থানে স্থানে।—

শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কি না সে—
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস !—(প্রলাপ ৩)

এইভাবে সে যুগের সব কাব্যেরই যেন টুক্‌রো টুক্‌রো ক্ষীণ সুর সমবেতভাবে কবিতাগুলির মধ্যে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু কোনো সুরই খুব প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। আসলে, এই বিচ্ছিন্নতাই কবির সে যুগের কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য। ক্রমে এক-একটি সুর রূপপরিগ্রহ করেছে এক-একটি গ্রন্থে। সেদিক্ থেকে প্রলাপ-কবিতাগুচ্ছকে তাঁর আদিপর্বের সবগুলি কাব্যেরই প্রচ্ছন্ন ভূমিকা বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন হলেও সেই ভাব ও ভাষা কবির 'হৃদয়ের' থেকেই নিঃসৃত। তাই তা জগতের কাছে নূতন। কবি এই নূতনত্বের আনন্দ উপলব্ধি করেই বোধহয় বলেছিলেন, যেদিন তার সুরগুলি 'আকাশ ভরিয়া' বেজে উঠবে, সেদিন, "অবাক্ জগত রহিবে চাহি !"- (প্রলাপ ১)

কিন্তু তাঁর কাব্যের সমাদর সেদিন খুব বেশি হয় নি। 'বাংলাদেশে' সেদিন তাঁর 'নিন্দুকের' অভাব ছিল না, বহু অবজ্ঞা-উপহাসের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। বাড়ির আত্মীয়েরাও তাঁর প্রতি হতাশাই প্রকাশ করেছিলেন। কবির মনে এসেছিল একটা 'অবসাদ'। কিন্তু প্রখর প্রতিভাশালী কবি সেই সাময়িক অবসাদকে উপেক্ষা করে কঠিন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেছেন তাঁর নিজের লক্ষ্যে। সে কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন এই কবিতায়—

সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা !
 কেঁদেছি যখন মরম শোকে—
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
 কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে !
সহেছি সে সব তোর তরে সখি !
 মরমে মরমে জ্বলন্ত জ্বালা !
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
 তোমারি তরে তো শিখেছি বালা !
মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
 হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয় !
তোমারি তরে লো সহেছি সে সব
 ঘৃণা উপহাস করেছি জয় !
কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
 নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে ;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রুজল
 উপেক্ষিত হয়ে এসেছি ফিরে।

এই 'উপেক্ষা'য় কবি কিন্তু কাতর হয়ে নিরাশ হন নি। 'পৃথিবী' তাঁর সহায় না হলে তিনি 'বিজনবনে' কল্পনাকে সাথী করে একা চলে যাবারই সংকল্প করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের জীবনে প্রথমদিকে তাঁকে বহুদিন পর্যন্ত তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে।[৫০] কিন্তু তিনি যে একাকী, আত্মনির্ভরশীল হয়ে সদর্পে এগিয়ে যেতে পেরেছেন, সেখানেই তাঁর মহত্ব। তাঁর এই মনোভাবের দৃষ্টান্ত 'মানসী', 'সোনারতরী' থেকে শুরু করে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত এবং আরও পরেও লক্ষ করা যায়।[৫১] তাঁর জীবনে যে কঠিন পণ তার বাণী শুনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতায়—

"বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরি কথা শুনে।
সেইদিন হতে কণ্টক পথে
চলিয়াছি দিন গুনে।
পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা
ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সব পর হয়ে যায়
ছিল যারা আপনার।
ধ্রুবতারা-পানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি,
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।"

—মানসী, 'পরিত্যক্ত' ১৮৮৮

'মানসী' কাব্যের 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন', 'কবির প্রতি নিবেদন' প্রভৃতি কবিতাতেও আছে কবির সেই অবজ্ঞার ভাব। 'সোনারতরী'র অন্তর্গত 'কণ্টকের কথা' (১৩০০) কবিতাতেও রয়েছে কবির আত্মদর্পের ইঙ্গিত—

"ওহে তরু, তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন—
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।

---

৫০ দ্রষ্টব্য : 'কড়ি ও কোমলে'র আলোচনা ; 'মিঠে ও কড়া'

৫১ এ বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ের 'সমালোচনা' গ্রন্থে 'তার্কিক', 'অবজ্ঞা' প্রভৃতি প্রবন্ধের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হইঁনা ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়—
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য,
তাহারি জয়।"

'নিন্দুক'দের অবজ্ঞার প্রতি অবহেলা এবং নিজের সাহিত্যরচনার প্রতি অনড়, অটল সংকল্প আরও স্পষ্ট হয়েছে 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যে।—

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী!
বলছে—কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চকথা।
… সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রাণী!
ফেলুক মুছি হাস্যশুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে। —'ক্ষতিপূরণ'

দেখা যাচ্ছে, যে কথা তিনি এইসব কাব্যে বেপরোয়াভাবে খুব স্পষ্ট বলেছেন, প্রলাপে তাঁর সেই অনুভূতিরই প্রথম প্রকাশ— অভিমানের ভঙ্গিতে। 'ক্ষতিপূরণে'ও তিনি 'প্রেমের প্রলাপ'কে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করতে

চেয়েছেন, আর প্রলাপেও ছিল তারই প্রথম অভিব্যক্তি। কাজেই সর্বদিক্ বিচারে প্রলাপ কবিতাগুচ্ছের একটা মূল্য স্বভাবতঃই ছিল। কবি তাঁর জীবনে এই সূত্রটিকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেলেন নি। তাই বোধহয় অচেতনভাবেই মনের গভীরে এই কবিতাগুলির স্মৃতি অঙ্কিত হয়ে ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকারও কবিতাগুলি প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ইংরেজিতে যাহাকে বলে precocious child তাহা না হইলে তেরো চৌদ্দ বৎসরের বালকের পক্ষে" এই জাতীয় কবিতা লেখা সম্ভব নয়।"[৫২]

৮

'প্রলাপ' ও 'বনফুল' প্রকাশের পর 'প্রতিবিম্বে' কবির রচনা প্রকাশের পালা শেষ হল, শুরু হল 'ভারতী'র পর্ব। ভারতীর প্রথমবর্ষ থেকেই কবির রচনা প্রকাশ শুরু হয়। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (১২৮৪ শ্রাবণ) **'ভারতী'** নামে একটি কবিতার নিদর্শন রয়েছে।

ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরবের যুগে কবি 'ভারতী'দেবীর প্রতি তাঁর বন্দনা জানিয়েছেন। একদা তাঁর সংগীতে পূর্ণ ভারতবর্ষ ছিল সকলের কাছে গৌরবস্বরূপ—

এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন গান।

তবে আজ কেন 'তুমি' স্তব্ধ? ভারতের এই দুর্ভাগ্যের দিনে তাঁর বীণায় ঝংকার উঠলে হয়তো আবার প্রাণ সঞ্চারিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন মত তাঁকে কোমল সুর বর্জন করে রুদ্রের সংগীতও গাইতে হবে।—

না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনীবীণা
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি
দেখিব ভারত জাগিবে কি না?
… তা যদি না হয় তাহলে ভারতি
তুলিয়া লও গো বিজয় ভেরী,
বাজাও জলদ গভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি!

---

৫২ [illegible]র-জী, পৃ ৬০–৬১

প্রয়োজনভেদে কোমলের সঙ্গে কঠোরের দরকার, 'মোহিনী বীণা'র পরিবর্তে 'বিজয় ভেরী' গ্রহণ করা উচিত, এ কথা কবি তাঁর জীবনে বারেবারেই বলেছেন। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন 'সঞ্জীবনী সভা'র যুগ থেকেই, প্রসঙ্গক্রমে সে কথা বলা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। সেই সুরই এই কবিতাতেও ঝংকৃত হয়েছে। দেশের জন্য দরকার হলে দেশমাতৃকাকে রুদ্ররূপ ধরতে হবে। কবির বিশ্বাস, 'ভারতী' দেবীর বীণা ঝংকৃত হলেই 'মৃতভারত' আবার হবে জাগ্রত।—

আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাও গো গান,
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ॥

'হিন্দুমেলায় উপহারে'র যুগে কবির স্বদেশচেতনারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে কবিতাটিতে। তবে 'হিন্দুমেলায় উপহারে' ছিল কবির একটা হতাশা বোধ। এখানে তিনি আশা করেন ভারতীদেবীর সংগীত ঝংকারে ভারত পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার মুখরিত হয়ে উঠবে।

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও দেবী সরস্বতীর প্রসাদধন্য বলে মনে করতেন। তাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র শেষ দৃশ্যে সরস্বতীদেবী যেমন বাল্মীকিকে বীণা উপহার দিয়ে বলেছিলেন—

"এই নে আমার বীণা,
দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ
ধ্বনিবে ইহার তার।"

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনও যেন সেই একই আশীর্বাদে নিজেকে ধন্য করে নিতে চাইছে। তাই কবি 'ভারতী'কে বলেছেন, সংগীতময় বীণার ঝংকার তুলতে হবে।

অপরপক্ষে, 'ভারতী' পত্রিকার প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাটির মাধ্যমে 'ভারতী'র মারফত দেশকে সর্বদিক্ থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য পত্রিকাটির প্রতি কবির নিবেদন হওয়াই বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু কবি যে নিজেও সেই সাধনায়, সেই প্রসাদলাভে ধন্য হয়ে দেশকে জাগাতে চেয়েছেন সে অর্থটিও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ, তিনি একদিকে ছিলেন ভারতীর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, অপরদিকে দেবী সরস্বতীর প্রসাদলাভের একান্ত প্রার্থী। কবিতাটি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দের আদর্শে রচিত।

ভারতীর পরবর্তী সংখ্যায় (১২৮৪ ভাদ্র) প্রকাশিত '**হিমালয়**' কবিতায় কবি চিরকালের গৌরবস্বরূপ ও আশ্রয়স্থল হিমালয়ের প্রশস্তি করে তাঁর কোলে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। কবিতাটিতে প্রকৃতিবর্ণনা আছে বিশ্বজীবনের পটভূমিকা হিসাবে। 'কবিকাহিনী'র কবি যেমন হতাশ হৃদয়ে শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এখানেও কবি তাঁরই কোলে চিরশান্তির আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হিমালয়ের কোলে শান্তিলাভ করার প্রার্থনা কবির ছেলেবেলার বহু কবিতায়, গল্পে, আখ্যানমূলক গাথাকাব্যে লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেই শান্তিলাভের আশা ঠিক মৃত্যু নয়। তারপরে কবি বৃহত্তর জগতের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে চেয়েছেন—

"সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নূতন জীবন লয়ে
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে স্মৃতির জলে মুছিয়া ফেলিব।"

'সে ঘুম' বলতে কবি আসলে নিভৃত সাধনার কথা বলেছেন। জীবনে নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য এই নিভৃত সাধনার প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর সময় হলে আবার ফিরে আসতে হবে কর্মজীবনে। কবির এই আদর্শের কথা স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে আরও এগারো বৎসর পরে লেখা 'গুরুগোবিন্দ' ('কথা', ১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ) কবিতাটিতে। গুরুগোবিন্দ 'দ্বাদশ বরষ' তপস্যা করেছিলেন তাঁর মানবজীবন তথা কর্মজীবনকে পূর্ণ করে পাবার জন্য, দেশের সামনে নিজেকে আদর্শ গুরু বলে দাঁড় করাবার জন্য, যেদিন তিনি 'প্রাণ খুলে' বলতে পারবেন—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"

সেই দিনটির জন্য। কবিতাটির শেষাংশে আছে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন অন্তর দিয়ে অনুভব করার বাসনা। জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে ছিন্ন করে দিয়ে বিশ্বকে কবি যেন নিজের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছেন।—

"রবি-শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে॥
গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।

তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে
ভূঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃ প্রাণ ভরিয়া ॥"

এই যে কবির বিশ্বানুভূতি বা 'সর্বানুভূতি' তার প্রথম ব্যাপক প্রকাশ প্রভাতসংগীত থেকে। 'প্রতিধ্বনি', 'অনন্ত জীবন', 'অনন্তমরণ' প্রভৃতি কবিতার সুর ও শব্দপ্রয়োগ পর্যন্ত যেন শোনা যাচ্ছে এই কবিতাটির মধ্যে। সে সুরই আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে পরবর্তী জীবনের বিপুল সাহিত্যে। প্রকৃতপক্ষে, এই যে 'আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ' তার উপলব্ধি বোধহয় কবির প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল হিমালয়ের কোলে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ার যুগে। সেই বৈজ্ঞানিক অনুভূতিই রূপে-রসে-গানে পূর্ণ হয়েছে তাঁর সাহিত্যজীবনে। সেদিক্ থেকে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে লেখা এইসব কবিতার তাৎপর্য কম নয়। তাই এইসব কবিতাকে অবজ্ঞা করলে চলবে না। প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত যদি মালা গাঁথা যায়, তবে দেখা যাবে সেগুলির মধ্যে ছন্দপতন ঘটে নি, ঘটে নি বিচ্ছিন্নতা।

'ভারতী'তে প্রকাশিত এর পরের কবিতাটিও রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য বর্জিত নয়। তবে তা পৃথক্ সুরে, পৃথক্ রঙে রঞ্জিত। এই কবিতা **'আগমনী'** (১২৮৪ আশ্বিন)।[৫৩] আগের কবিতাগুলির সঙ্গে তার মিল নেই। বরঞ্চ, আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটিতে যেন রামপ্রসাদের 'আগমনী' সংগীতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। শরতের নির্মল সৌন্দর্যে সমস্ত পৃথিবী যখন ভরপুর, তখন আগমনীর সংগীত ধ্বনিত হল। মা মেনকার অধীর প্রতীক্ষা উমা আসবেন তাঁর গৃহ আলো করতে। উমার বাল্য সঙ্গিনীরাও তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। অবশেষে উমা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'আকুল মায়ের বুকে।' তারপরে—

"হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রাণী,
চুমিয়া উমার অধরখানি,
' আয় মা জননি আয় মা কোলে
আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি মাগো না মুছাবি বল,
তবে উমা আর, কে আছে আমার
এ শূন্য আঁধার ঘরে ?"

৫৩ দ্রষ্টব্য—সুকুমার সেন: বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), পৃ ৪৪ আনুষঙ্গিক পা-টী ১

তারপরে জননীসুলভ ঔৎসুক্যেই বললেন—

"বল্ দেখি উমা পতির ঘরের
সকল কুশল কথা।"

বাহ্যদৃষ্টিতে ভাবের দিক্ থেকে কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের নূতনত্ব বা বিশেষত্ব বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় না। মনে হয়, এ কবিতা যেন রবীন্দ্রনাথের সুরে ও ভাষায় রামপ্রসাদী আগমনী গানেরই নবরূপায়ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, রামপ্রসাদের বাণী কবির উপলক্ষ মাত্র। পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে মাতৃবন্দনার যে বৃহৎ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেখা যায়, এ যেন তারই পূর্বরূপ। 'আনন্দময়ীর আগমনে' যখন 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি' তখন কবির মনও তাতে সাড়া না দিয়ে পারে নি। তাই আশ্বিন সংখ্যাতেই প্রকাশ পেল কবিতাটি।

আগমনী উৎসব আসলে বাঙালীর জাতীয় উৎসব। মেয়ের জন্য পিতা-মাতার আকুলতা বাঙালীচিত্তের বিশেষত্ব তথা মহত্ত্ব। তাই রামপ্রসাদের গানকে কবি পরবর্তী যুগে বিচার করেছেন নিজের দৃষ্টিতে।

এই উৎসবের মর্মকথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—

"আমাদের বাংলা দেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে— মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লব ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা, এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"

—লোকসাহিত্য, 'ছেলেভুলানো ছড়া' ১৩০১

'বিচিত্রপ্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'শরৎ' (১৩২২) প্রবন্ধটিতেও তিনি আগমনী গানকে আরও বৃহৎ পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের 'শরৎ' ও আমাদের সাহিত্যের 'শরতে'র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন আগমনী ও বিজয়া পরস্পর পরিপূরক।—

"আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া

আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই।"

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে তাঁর সাহিত্যে। শারদোৎসবে তিনি শারদাদেবীকে দেখেছেন তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে। তাই বলেছেন—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
··· বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।

শারদোৎসবের পূজাকে তিনি আড়ম্বরের দৃষ্টিতে বা মোহের দৃষ্টিতে দেখেন নি; মা-কে তিনি উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেবীদের কখনই অশ্রদ্ধা করেন নি। বরঞ্চ, শ্রদ্ধা করেছেন তাঁদের 'প্রতিমা'কে অর্থাৎ মায়ের প্রতিমূর্তিকে। কিন্তু সেই মা তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখা। 'হৃৎহ্রদে' যে 'কালিকা'মাতা তাঁকেও তিনি ভক্তি করেন, আবার 'পূজার ফুলের বনে' 'পূজার দিনের রবি'র দীপ্তিতে দেখা দেন যে দুর্গামাতা তাঁকেও তিনি শ্রদ্ধা করেন। শুধু স্নেহময়ী মাতারূপে নয়, তাঁর রুদ্ররূপকেও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে॥
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে॥
··· জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রু সাগর-কূলে॥

তিনি যে মহিষমর্দিনী। তিনি তামসিকতা (মহিষ যার প্রতীক) দূর করে আনেন আলোর প্রভা। 'সুপ্রভাত' (১৩১৪) কবিতাটিতেও তিনি রূপকার্থে এই কথাই বলেছেন।

এই শারদাদেবীকে, এই আনন্দময়ীকে কবি আরও ব্যাপকভাবে দেখেছেন 'দেশের মাটি'র মধ্যে দেশমাতৃকারূপে। বাংলাদেশই যেন মাতৃমূর্তি ধারণ করে দেশবাসীকে অভয়দান করেন—

ডান হাতে তোর খড়্‌গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।

··· তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী।
··· আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে বুকের মাঝে, হৃদয়হরণী।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে দেশের বিপদ্রূপ অসুরকে নাশ করার জন্য তিনি এই মাতৃমূর্তির আরাধনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হল। তবু বলব, রবীন্দ্রচিন্তায় যে মাতৃমূর্তি দর্শন তা সম্পূর্ণই তাঁর স্বকীয় কল্পনা-প্রসূত। রামপ্রসাদের গান তাতে প্রেরণা জুগিয়েছে মাত্র। তবে প্রথম জীবনে উপলক্ষকেই অনেকসময় লক্ষ্য বলে মনে হয়। সে আসলে বয়সের অপরিণতির জন্যই। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই পরবর্তী পরিণতির ইঙ্গিত দর্শিত হয়। তাই 'আগমনী' কবিতাটিকে নেহাতই রামপ্রসাদের অনুকরণ বলে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাছাড়া, তাতে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা রয়েছে তা-ও রবীন্দ্রভঙ্গিরই সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

৯

ভারতী পত্রিকায় যে যুগে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল, সে যুগেই লেখা কয়েকটি কবিতা অপ্রকাশিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল মালতীপুঁথিতে। এইরকম একটি অপ্রকাশিত কবিতা **'শৈশবসঙ্গীত'**। মালতীপুঁথির ৫৪-সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'শৈশবসঙ্গীত' নামক কবিতাটি পাওয়া গেছে। শিরোনামের পাশে লেখা আছে "বোটে লিখিয়াছি— মঙ্গলবার ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭।" এটিই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম তারিখ দেওয়া কবিতা। তারিখটি তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে মিশিয়ে লিখেছেন। তারিখটির পূর্ণরূপ হচ্ছে, ২৪ আশ্বিন ১২৮৪, ৯ অক্টোবর ১৮৭৭।

এই সময়টায় ভারতী পত্রিকার যুগ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে। কিন্তু কবিতাটি ভারতী বা অন্য কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি। প্রায় সাত বৎসর পরে 'শৈশব সংগীত' কাব্যগ্রন্থে (১৮৮৪) 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে সংকলিত হয়। কিন্তু তখন সেটি যথারীতি পরিমার্জিত ও সুসংস্কৃত রূপ পেয়েছে। এই কবিতাটিতে কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থা অতি স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতাটি সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, অতীতের সুখস্মৃতি বর্তমানের মনোবেদনা ও ভবিষ্যতের নৈরাশ্যে তাঁর হৃদয়মন তখন পীড়িত ও আচ্ছন্ন ছিল।[৫৪] একদিকে স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়েছেন, অপরদিকে, ঘরের

---

৫৪ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'মালতিপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়', রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড, পৃ ১৪৫

পড়াও বিশেষ সুফলপ্রদ হচ্ছে না। অভিভাবকরাও তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা নিরাশ; কবি নিজেও বুঝতে পারছেন, তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন— সব মিলিয়ে কবির সেই সময়ে মনের যে অবসন্ন ভাব তাই কবিতাটির মধ্যে প্রকাশিত। 'জীবন-স্মৃতি'তে নিম্নলিখিত দুটি অংশে তাঁর এই সময়কার মনোভাবের কথাই প্রকাশ পেয়েছে—

"সেণ্ট জেবিয়ার্স স্কুলে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না। দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, 'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।' আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে।"

—জী-স্মৃ, 'প্রত্যাবর্তন'

আরেকটি অংশে বলেছেন,—

"ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না।…বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি।… উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।"

—জী-স্মৃ, 'সাহিত্যের সঙ্গী'

উক্ত 'কবিতার খাতাটি'ই মালতীপুঁথি। এই খাতার কবিতাগুলিতে কবিমনের 'অশান্তি' 'ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ' ও 'অন্ধ আন্দোলন' প্রকাশ পেয়েছে। 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটি সেই অশান্তি ও আক্ষেপের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। কিন্তু কবিতাটি তিনি কোথাও ছাপতে দেননি। কারণ, শৈশব সংগীত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, তাঁর 'তেরো হইতে আঠারো' বৎসর বয়সের লেখাগুলির মধ্যে তিনি যেগুলিতে 'বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ' দেখতে পান নি, সেগুলি ছাপান নি। অর্থাৎ ওই গ্রন্থে 'তেরো হইতে আঠারো' বৎসরের সব লেখাই গৃহীত হয় নি। কোনোটি সম্পূর্ণই বর্জিত হয়েছে, কোনোটি

বা হয়েছে আংশিক ভাবে। উক্ত 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ অতি প্রকট বলে তিনি 'ভারতী' প্রভৃতিতে ছাপান নি। পরবর্তী কালের বিচারে দেখা গেল, কবির ব্যক্তিগত বেদনা বেশি প্রকট হয়েছে কবিতার শেষাংশে। কিন্তু প্রথমাংশে সে বেদনার অনেকটা 'কাব্যিক ও আলংকারিক আবরণে প্রচ্ছন্ন'। তাই তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপভোগ্য হতে পারে। সম্ভবতঃ এই বিবেচনাতেই শৈশব সংগীত গ্রন্থে কবিতাটির শেষাংশ বর্জিত ও প্রথমাংশ 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অভিভাবকদের যে সব পরিকল্পনা ছিল তা সবই তাঁর কবিপ্রকৃতির প্রতিকূল। তাই কবির মনে এর প্রতিক্রিয়া হত বড় তীব্র। শৈশবসঙ্গীত কবিতায় সেই বেদনার কথা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত—

এতদিন পরে আজ, অয়ি গো কল্পনা দেবী,
কি হল আমার দুরদশা,
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে দারুণ দুরাশা।
…যেতেছি যেখানে ভাসি, সেদিকে চাহিয়া দেখি,
কিছুই তো না পাই উদ্দেশ।
আঁধার তরঙ্গরাশি সমুদ্রদিগন্তে মিশে
উনমত্ত অকূল অশেষ।
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি একাকী যাইবে ভাসি,
যতদিনে ডুবিয়া না যায়,
হুহু করি ববে বায়ু, গর্জিবে উন্মত্ত ঊর্মি
ঝকমকি বিদ্যুতশিখায়।

সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। তাতে তাঁর কবিজীবনের অবসান ঘটবার আশঙ্কা আসন্ন হয়ে এল। শৈশবসঙ্গীতে সেই কথাই গীতিকবিতারূপে বলা হয়েছে। আর মাত্র ছয়দিন পরে লেখা 'কবিকাহিনী'তে তাই বলেছেন আখ্যানের মাধ্যমে।

মালতীপুঁথিতে 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটির (রচনাকাল ১২৮৪ আশ্বিন ২৪) ঠিক পরে এবং 'কবিকাহিনী'র (রচনারম্ভ ১২৮৪ কার্তিক ১) অব্যবহিত পূর্বে **'উপহারগীতি'** নামে একটি কবিতা আছে। এই রচনাটির নীচে লেখা আছে 'Les Poetes হইতে অনুবাদিত।' অর্থাৎ এটি অনূদিত কবিতা।

অনুমান করা যেতে পারে কবিতাটি ঐ দুই রচনার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আশ্বিনের (১২৮৪) শেষ সপ্তাহে রচিত হয়েছিল।

ভাবের দিক্ থেকে কবিতাটি 'শৈশব সংগীতে'র 'ফুলবালা' যুগেরই অন্তর্গত বলে মনে হয়। তাঁর 'কল্পনাবালা' অথবা কোনো অনির্দিষ্ট প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে তাঁর "সর্বস্বধন, কবিতার মালাগুলি" উৎসর্গ করেছেন। তবে কবিতাটি কোনো বিদেশী কবিতার অনুবাদ বলে হয় তো শৈশব সংগীত গ্রন্থের অন্তর্গত করেন নি। কারণ, ঐ গ্রন্থে কোনো অনুবাদ কবিতা স্থান পায় নি।

এই কবিতাটির বিষয়ে আর-একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। মূল পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শিরোনামের পাশে লেখা আছে 'ভগ্নহৃদয়ের উপরে'।[৫৫] মনে হয়, কবিতাটি তিনি 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের উপহার-কবিতারূপে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিতে সেই ইঙ্গিতটিও রয়ে গেছে —

"দিনু যা' মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্নহৃদয়ের এই প্রীতি উপহার"

পরে অবশ্য তার পরিবর্তে 'তোমারেই করিয়াছি' গানটিকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। একদিকে অনুবাদ, অপরদিকে ভগ্নহৃদয়ের কাজেও লাগল না — হয়তো সেই কারণেই কবিতাটি চিরদিনের জন্য পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত হয়েই রয়ে গেল।

এই পুঁথিতে 'কবিকাহিনী'র শেষাংশের ঠিক নিচেই আরও একটি ছোট কবিতা রয়েছে— **'পাষাণ হৃদয়ে কেন'**। কবিতাটির উপরে তারিখ লেখা আছে 'শনিবার— অগ্রহায়ণ ১৮৭৭'।[৫৬] এই কবিতাটিতেও 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতার মত দুঃখ ও বিষাদের ভাব লক্ষ করা যায়। তিনি গভীর অভিমানবোধ থেকে বলেছেন —

"সত্য তুমি হও সাক্ষী, ধর্ম তুমি জেনো' ইহা
ঈশ্বর! তুমিই শুন প্রতিজ্ঞা আমার।
যার তরে কেঁদে মরি, সেই যদি উপহাসে
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।"

সেদিন এই বালক কবিটির অন্তরের উপলব্ধিটিকে কেউই যথার্থ মর্যাদা দেন নি। সকলেই তাঁকে করেছেন 'উপহাস', অবজ্ঞা। তাঁর প্রতি তাঁরা হতাশা

---

৫৫ র-জী, পৃ ১৫৩ ও আনুষঙ্গিক পা-টী ২

৫৬ দ্রষ্টব্য: পরিশেষ —'পাষাণ হৃদয়ে কেন'

পোষণ করেছেন। তাই তাঁর মনে এই বিষাদের সৃষ্টি। কবিকাহিনীর পূর্বে লেখা শৈশবসঙ্গীত ও পরে লেখা এই কবিতাটি— দুটিই 'বিষাদ বেদনার পরিচায়ক'। ফলে স্বভাবতঃই কবিকাহিনীও ওই বিষাদের মনোভূমিতে রচিত হল। এই কবিতাতেও কবি হয়তো কিছু 'বিশেষ' 'গুণ' দেখতে পান নি। তাই শৈশব সংগীতের সংকলনে বর্জিত হয়।

১০

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' যুগের[৫৭] অব্যবহিত পূর্বে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনের (১৮৭৫) জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা লিখেছিলেন।—'হোক্ ভারতের জয়' ও 'হিন্দুমেলায় উপহার'। আর, 'ভারতী' পত্রিকার যুগে হিন্দু-মেলার একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭) কবি আর-একটি কবিতা পাঠ করেন, তার নাম '**দিল্লি-দরবার**'।

এই কবিতাটি রচনার পিছনে একটি ইতিহাস ছিল। কবিতাটি তদানীন্তন ভারতের বড়লাট্ লর্ড লিটনের (১৮৭৬-১৮৮০) দিল্লী-দরবারকে (১৮৭৭, জানুআরি ১) লক্ষ করে রচিত। লর্ড লিটন্ ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তাই দেশে তিনি বিবিধ কঠোর নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। তখন রাজধানী ছিল কলকাতায় এবং দিল্লী ছিল একটি নগণ্য নগর। কিন্তু তবুও শাজাহান্ প্রমুখ মোগল বাদ্‌শাদের অনুকরণে গৌরবমণ্ডিত নগরে দিল্লী-দরবার করা স্থির হল। এ সময়ে ভারতের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ চলছিল। এই মহা-শ্মশানের কোলে উৎসবের অনুষ্ঠান অনেকেরই সহ্য হল না। দেশের এই ভয়ঙ্কর দুর্দশায় ব্রিটিশ শাসকের দরবার-বিলাস সেদিন কিশোর রবীন্দ্রনাথও সহ্য করতে পারেন নি। তদুপরি, জাতিগত অভিমান ও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যে সব দেশীয় রাজন্যবর্গ এই উৎসবে যোগ দিয়ে ব্রিটিশমহিমার জয়গান করেছিলেন, তাঁদের প্রতি এই কবির মনে জাগল তীব্র ঘৃণা। এই ঘটনা তাঁর মনে অত্যন্ত আঘাত হেনেছিল। তারই প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি এই কবিতা রচনা করেন। এইসব রাজন্যবর্গের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রূপ তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে—

"ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির —

---

৫৭ দ্রষ্টব্য: র-জী, পৃ ৫৮ পা টী ২

… হারে হতভাগ্য ভারতভূমি
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে ?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি ; আমরা ধরিব আরেক তান।"

অনুমান হয়, 'আমরা যে ক-জন' হচ্ছেন হিন্দুমেলার, বিশেষতঃ, সঞ্জীবনী সভার সদস্যগণ এবং 'আরেক তান' হচ্ছে স্বদেশ সেবার ব্রত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সেবার মূল কথা আত্মশক্তির দ্বারা দেশকে জাগ্রত করা এবং চিন্তায়, কর্মে, ত্যাগে, সেবায়, প্রেমে দেশকে নূতন রূপ দেওয়া ও নূতন করে সৃষ্টি করা। দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, দেশ 'চিন্ময়'— এ কথা তিনি তাঁর সাহিত্যে বারেবারে বলেছেন। বাল্যকালে লিখিত এই কবিতার মধ্যে দেখি এই চিন্তার প্রাথমিক উদ্বোধন ঘটেছিল।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি তাঁর এই কবিতা-লেখা সম্বন্ধে বলেছেন—

"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লী-দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে— তখনকার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য এই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।"

—জী-স্মৃ, 'স্বাদেশিকতা'

'লর্ড কার্জনের সময়' তিনি 'দিল্লী-দরবার' সম্বন্ধে যে 'গদ্যপ্রবন্ধ' লিখেছিলেন, তাতেও তিনি বৈদেশিক শাসনের প্রতি ঘৃণ্য আনুগত্যকে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছেন। তার মূলে ছিল স্বজাতির আত্মশক্তির উদ্বোধন ও মুক্তিলাভের প্রচেষ্টার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। ঐ গদ্য প্রবন্ধের নাম 'অত্যুক্তি' (১৩০৯, 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ')। তাতে তিনি লর্ড কার্জনের সময়কার দিল্লি-দরবার সম্বন্ধে বলেছেন—

"আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্তমান বাদশাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে—কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কী সম্মান, কী সম্পদ্, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতি স্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শূন্যগর্ভ আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্য জাতির নিকট খর্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।...আমাদের যে উৎসব সমারোহ তাহা আহূত অনাহূত রবাহূতের আনন্দ সমাগম, তাহাতে 'এহি এহি দেহি দেহি পীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা খাঁটি, তাহা স্বাভাবিক। আর পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙিনের দ্বারা কণ্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সংকীর্ণ, দয়াহীন, দানহীন যে দরবার, যাহা কেবলমাত্র দম্ভপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি— তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়— আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্‌বেলিত হয় নাই।"

ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে কবি 'আত্মশক্তি' লাভের আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য অপরের অনুগ্রহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে বলেছেন—

"এমন জিনিস আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের স্বায়ত্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না— সেই জিনিসটা হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সেও ভালো...যেটুকু আহার করিব নিজে যেন আহরণ করিতে পারি; ...মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়; এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।...ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি।"

এখানে লক্ষণীয়, 'দিল্লী-দরবার' কবিতা রচনার পঁচিশ বৎসর পর লেখা 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে কবি যা বলেছেন, তার মর্মার্থ কবিতাটির সঙ্গে প্রায় একই। বালক হলেও সেদিন তাঁর বুকে আত্মসম্মানহীনতা ও পরনির্ভরশীলতার যে ব্যথা বেজেছিল, পঁচিশ বৎসর পরেও সেই ব্যথা তাঁকে একই ভাবে বেদনার্ত করে এবং তা তিনি বলেছিলেন আরও কঠোর ও তীব্র ভাষায়। প্রকৃতপক্ষে, দেশ সম্বন্ধে এই ভাবনা ও পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যসাধনার অন্যতম

মূল প্রেরণা এবং তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারেবারেই ধ্বনিত হয়েছে এই সুর। পরের কাছে নতিস্বীকারের যে আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন ঘৃণা করেছিলেন তা প্রথম দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলায় উপহার,' 'দিল্লি-দরবার' প্রভৃতি কবিতায়। তারপরে তা-ই আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে বললেন 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধেরই সূত্র ধরে তিনি আরও পরবর্তী কালে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেন—

> "দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্ত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক্ সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক্ সেটাকে নয়।···নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি, তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করিতে পারি নে।"

—কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' ১৩৩৬

দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বৈদেশিক দরবারের প্রতি তাঁর ধিক্কার জানিয়েছেন। জীবনের প্রথমে যে বেদনার জ্বালা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন ছিল। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত বারেবারে দেশকে জাগাতে চেয়েছেন, চেয়েছেন আত্মশক্তির উদ্বোধন।

দিল্লি-দরবার কবিতায় তাঁর বাল্যরচনার আরও কোনো কোনো প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একদিকে, 'উচ্চশির হিমালয়'কে সাক্ষী বা সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপন; অপরদিকে ভারতের বর্তমান দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে দেখি প্রায়ই রামায়ণ-মহাভারত বা কালিদাস-প্রদর্শিত প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন দেশবাসীর সম্মুখে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের সুউচ্চ ও মহান্ আদর্শের মূল্যও উপমিত হতে পারে হিমালয়েরই সঙ্গে। বাল্যকালে লেখা ভারতভূমি, অভিলাষ, হিন্দুমেলায় উপহার, হোক্ ভারতের জয়, প্রকৃতির খেদ প্রভৃতি কবিতার মত দিল্লি-দরবার কবিতাতেও আছে সেই আদর্শেরই কথা।—

> "তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
> তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
> তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্যকবি গান গায় মন প্রাণ খুলে,
> তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?"

এই যে হিমালয় তথা প্রাচীন ভারতের সুমহান্ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, তা

আসলে কবির শুধু বাল্যেরই নয়, সমস্ত জীবনেই তার পরিচয় রয়েছে। এর সঙ্গে 'ব্রিটিশ বিজয়' 'ঘোষণা' না করে 'আরেক তানে' গান ধরার উৎসাহ ও উদ্দীপনা-মিশ্রিত এই কবিতাটি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাবনা ও ভাবায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সময় লর্ড লিটনের Varnacular Press Act প্রবর্তিত হওয়ায় কবিতাটি সমকালীন কোনো পত্রিকাতে প্রকাশিত হতে পারে নি। কয়েক বৎসর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকে 'ব্রিটিশ' শব্দের স্থলে 'মোগল' শব্দ বসিয়ে কবিতাটি সন্নিবিষ্ট করা হয়। তবে সমকালীন সাপ্তাহিক 'সাধারণী'তে (১৮৭৭, মার্চ ৪) 'দিল্লী-দরবার' কবিতাটি রচনা ও পাঠের উল্লেখ আছে। ঐ পত্রিকায় এক ব্যক্তি লেখেন—

> "রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি— আয় ভাই, 'আমরা গাইব অন্য গান।' একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, 'যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"[৫৮]

এই কবি নবীনচন্দ্র সেন। এরপরে, আবার আর-একটি কবিতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেটি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের কথা।

১১

মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতা (২৪ আশ্বিন, ১৮৭৭) ও 'কবিকাহিনী' কাব্য (কার্তিক ১২৮৪)—এই দুটির অল্প কয়েকমাস পরে আমেদাবাদে লেখা কবির উক্ত কবিতাটি তাঁর বাল্যকালের রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতাটির নিচে কবি স্পষ্ট করে তারিখ দিয়েছেন—

Ahmedabad
1878 July 6th
আষাঢ় ২৩এ—শনিবার।

---

৫৮ দ্রষ্টব্য—যোগেশচন্দ্র বাগল: 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত,' পৃ ৪৯-৫০; জী-স্মৃ, গ্রন্থপরিচয় পৃ ১৯৪-৯৫; র-জী, পৃ ৫৪-৫৫

বাংলায় তারিখটি হবে ২৩এ আষাঢ়, ১২৮৫। পরে কবিতাটি **'অবসাদ'** শিরোনামে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৯২ চৈত্র) এবং উক্ত পত্রিকায় কবিতাটির শেষে 'বালক'-রচিত বলে উল্লেখ করা হয়।

মালতীপুঁথির পাঠটি না দেখে সজনীকান্ত দাস কবিতাটির রচনাকাল সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন এবং কবিতাটি 'অভিলাষ' (১৮৭৪) রচনার সমকালীন বলে যুক্তি দেখিয়েছিলেন।[৫৯] কিন্তু তাঁর যুক্তি ও অনুমান যে 'দুর্বলতামুক্ত নয়' সে সম্বন্ধে আবার প্রমাণ দেখিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন।[৬০] এ ক্ষেত্রে সেইসব মতান্তর ও মতবিরোধ নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখি না। কারণ, পাণ্ডুলিপিতে কবির স্বহস্তলিখিত তারিখসহ কবিতাটি পাওয়া গেছে। সজনীকান্ত 'অবসাদ'কে যেমন কালের দিক্ থেকে 'অভিলাষে'র সমকালীন বলেছেন, তেমনি ওই দুটি কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "রবীন্দ্র কাব্যমহীরুহের সদ্যজাত দ্বিদল অঙ্কুর—'অভিলাষ' ও 'অবসাদ'।" 'অবসাদ'কে তিনি 'অভিলাষে'র পরিপূরক রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর এই ব্যাখ্যাও মেনে নিতে পারেন নি। 'অভিলাষ' কবিতার মর্মার্থ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'অবসাদ' নামক কবিতাটি। প্রকৃতপক্ষে, পূর্বোল্লিখিত শৈশবসঙ্গীত ও কবিকাহিনী রচনা দুটির সঙ্গে কবিতাটির যেমন কালের দিক্ থেকে ব্যবধান কম, তেমনি ভাবের দিক্ থেকেও তিনটি রচনা প্রায় একই ভাবসূত্রে গ্রথিত। তিনটি রচনাতেই সম্বোধন পাত্রী 'কল্পনাবালা' বা 'কল্পনাদেবী'। তাঁর 'ঘরের পড়া' যুগের পরবর্তী সময়টাতে তাঁর সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজনের নৈরাশ্য এবং তাঁর নিজেরও নিজের প্রতি যে হতাশার কথা 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতায় শোনা গেছে, এবং বিলাতযাত্রার প্রস্তাব ওঠায় তাঁর কবিজীবনের অবসান ঘটার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেগুলি সবই 'অবসাদ' সম্বন্ধে সমভাবে অথবা অধিকতর প্রযোজ্য। তবে 'শৈশবসঙ্গীত' পরবর্তী কালে নামান্তরে ও আংশিকভাবে 'শৈশব সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কিন্তু 'অবসাদ' সম্পূর্ণরূপেই বর্জিত হয়। তার কারণ, সম্ভবতঃ এই কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত বেদনা আগাগোড়াই বড় তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৫৯ সজনীকান্ত দাস: 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ১০৬-১০৯

৬০ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়,' র-জি, পৃ ১৫৪-১৫৬

[illegible]

I have lost

[illegible]



6th July. 1878

কিন্তু 'অবসাদ' কবিতার একটি বিশেষত্বও আছে। কবিতাটিতে আগাগোড়াই বেদনার করুণসুর ধ্বনিত হয় নি। তাঁর মনের অবসন্ন ভাব, পরিণামে কঠিন সংকল্পে পরিণত হয়েছে। শৈশবসঙ্গীত বা কবিকাহিনীর সঙ্গে এখানেই এর পার্থক্য। যে কবি প্রথমে বলছেন—

হে কবিতা, হে কল্পনা,
জাগাও জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন,
ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত-অনলময় বল।
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।

সেই কবিই পরে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন—

পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব, যুঝিব দিনরাত,
কালের প্রস্তর পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম;
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠান,
অগম্য উন্নতিপথে পৃথ্বিতরে গঠিব সোপান।
তাই বলি দেবি,
সংসারের ভগ্নোদ্যম অবসন্ন দুর্বল পথিকে
কর গো জীবনদান তোমার ও অমৃতনিষেকে।

কবির এই সংকল্পবাণী কঠিন প্রতিজ্ঞার মত তাঁর সমগ্রজীবন ও সাহিত্যে বারেবারে ধ্বনিতে হয়েছে নানা কাব্যে ও রচনায়। এই সংকল্পের মধ্যেই কবির জীবনের মর্মকথা নিহিত আছে। তাই প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন, এই কবিতাটির নাম 'অবসাদ' না দিয়ে 'সংকল্প' দিলেই অধিকতর সমীচীন হত। এই বাণীর যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'কল্পনা' কাব্যের 'অশেষ' কবিতাটিতে। সেখানেও কবি কল্পনাদেবীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"হবে হবে, হবে জয়,
হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী
সফল করিব রানী
হে মহিমাময়ী।"

তাছাড়া কবিতাটির "ভাষাগত বলিষ্ঠতা ও ছন্দোগত মুক্তগতি" কবিতাটির ভাবের সঙ্গেও 'সম্পূর্ণ' সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে বলে এই সংকল্প হয়েছে দৃঢ়তর। সেদিক্ থেকেও সমকালীন রচনাগুলির সঙ্গে 'অবসাদে'র পার্থক্য লক্ষনীয়।

'কাব্যসাহিত্যে'র প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচনা করে দেখা গেল, প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ভাবের ও গভীর অর্থের কবিতা লিখেছিলেন। ভাবে ও ভাষায় কপি-বুক যুগের অন্তর্গত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুকরণের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে আপন পথে চলতে চেয়েছে। কিন্তু কবিতাগুলি কোনো গ্রন্থভুক্ত, এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পত্রিকায় পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় সর্বসাধারণের কাছে সেগুলি অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এই আলোচনায় সেই অপরিচিত ও অজ্ঞাত কবিতাগুলিরই মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা গেল। এরপর থেকে শুরু হল একে একে গ্রন্থ প্রকাশের পালা।

(২) গ্রন্থানুক্রমিক আলোচনা

রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনায় প্রকাশের কালক্রম অনুসরণ করা সমীচীন হবে বলে মনে করি না। কারণ, শৈশব সংগীত (১৩-১৮ বৎসরের রচনা), ভানুসিংহের পদাবলী (যার সূচনা ১৫।১৬ বৎসরে) প্রভৃতির রচনাকাল শুরু হয় একেবারে বাল্যেই— বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি রচনার একবারে প্রথম পর্বেই। শৈশব সংগীতের কোনো কোনো কবিতা যে তেরো বছর থেকেই লেখা হয় কবি সে কথা নিজে বলেছেন। অর্থাৎ ১৮৭৪ সালেই কাব্যটির জন্ম। সেদিক্ থেকে কাব্যগুলির মধ্যে যে কবি-মানস প্রতিফলিত তা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতভূমি, অভিলাষ প্রভৃতির পটভূমিকায় রচিত। বনফুল, কবিকাহিনী প্রভৃতিরও জন্ম সেই কালেই। মালতীপুঁথির মধ্যে শৈশবসঙ্গীত, ভানুসিংহের পদ, কবিকাহিনীর খসড়া সবেরই নিদর্শন রয়েছে—যেটি ছিল তাঁর তৃতীয় 'কাব্যগ্রন্থ'। তবে এই কাব্যগুলি সবই 'দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা'— কবে কোন্ কবিতা রচিত হয়েছিল যথার্থভাবে নির্দেশ করা যায় না। তাই যেগুলি দীর্ঘদিনব্যাপী লেখা হয়েছিল সেগুলিকে অন্ততঃ রচনারম্ভের কাল অনুযায়ী স্থাপন করা হল।

আদিপর্বের অ-নামী ও অজ্ঞাত কবিতাগুলির তুলনায় জ্ঞাত গ্রন্থগুলির আলোচনা অনেকেই অপেক্ষাকৃত বেশি করেছেন। তাই গ্রন্থান্তর্গত কবিতাগুলির আলোচনা মোটামুটি সংক্ষেপে করা গেল।

শৈশব সংগীত (১৮৮৪ মে ২৯)

এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেন—

"আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।"

আসলে শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত পাঁচ-ছয় বৎসরব্যাপী রচিত কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। তাই একে শৈশব সংগীত না বলে কৈশোরকও বলা যায়। মনে হয়, মালতীপুঁথিতে 'শৈশবসঙ্গীত' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তার প্রভাবই গ্রন্থটির নামকরণের সময় কবির মনে কাজ করেছিল। একমাত্র ভানুসিংহের কয়েকটি পদ ছাড়া এটিই কবির সর্বপ্রথম লিরিকসমষ্টি। স্বভাবতঃই, অনেকগুলি কবিতায় কবির অবাস্তব ও অপরিণত চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই বয়সে তিনি যেন ফুল, লতা, পাতা, চাঁদ প্রভৃতি নিয়ে নিজের একটা পৃথিবী গড়ে নিয়েছিলেন। তাই 'মালতী'র সঙ্গে 'অশোকে'র মিলন ঘটিয়েই (ফুলবালা) কবির আনন্দ; এই প্রেম কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রেম নয়, তা নির্বিশেষ। ফুলবালা, দিক্‌বালা, অপ্সরা প্রেম, কামিনীফুল, ফুলের ধ্যান, গোলাপবালা প্রভৃতি সবই এই জাতীয় কাব্য। তাই সুকুমার সেন এ যুগের রচনাগুলিকে বলেছেন 'ফুলবালা-র যুগে'র সৃষ্টি।[৬১] বোম্বাইএ বাসকালে আন্না তড়্‌খড় নামে যে তরুণীটির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রভাতী' (শুন নলিনী খোল গো আঁখি), 'ফুলের ধ্যান' প্রভৃতি কবিতা তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল।[৬২] তবে তা নেহাতই অনুমান। প্রকৃতপক্ষে, 'শুন নলিনী', 'সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার', 'বলি ও আমার গোলাপ-বালা' প্রভৃতি রচনাগুলির যে অতুলনীয় গীতিসম্পদ্ আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে আছে, সেগুলির মর্যাদাই এ ক্ষেত্রে বিচার্য।

তবে এ যুগের রচনা সবই জীবন-পরিচয়হীন বলে মনে হয় না। ভগ্নতরী, লীলা, প্রতিশোধ প্রভৃতি গাথাগুলিতে আছে জীবনেরই এক-একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়। 'ভগ্নতরী'র কাহিনী যেন কবির 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের একটি পূর্ব-সূত্র। অপরদিকে, 'লীলা'র সঙ্গে মিল রয়েছে 'ভিখারিণী' গল্পটির।[৬৩] 'প্রতিশোধ' গাথায় দেখা যায় যেন পরবর্তী কথা-কাহিনী যুগের পূর্বাভাস। 'প্রতিশোধ'এর সুরই যেন 'কথা' কাব্যের 'শেষশিক্ষা' (১৩০৬) কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।

৬১ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

৬২ র-জী, পৃ ৮৮

৬৩ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (১৩৭৬), পৃ ৩৫-৩৭

'প্রতিশোধে' কুমারের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রতিশোধ স্পৃহা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে। তাই বহু অন্তর্দ্বন্দ্বের পর—

"সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার,
পাগলের মত যেন।"

এবং তারপর—

"প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইল বলে।"

'শেষশিক্ষা'তেও দেখি শেষ পর্যন্ত—

"তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, 'এতদিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ'।"

এই দৃষ্টি বাস্তব জীবনবোধেরই দৃষ্টি। এই রচনাগুলিতে কবি অক্ষয় চৌধুরীর গাথাকাব্য রচনার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তবে তখনও তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় নি।

এছাড়া 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' (পূর্বরচিত 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতার রূপান্তর) কবিতায় আছে প্রকৃতির বাস্তব চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা। এর সঙ্গে 'মানসী'র 'আকাঙ্ক্ষা', 'কুহুধ্বনি', 'বধূ' এবং 'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতার সাদৃশ্য দেখা যায়।[৬৪] এছাড়া পরবর্তী কালে কবি আরও কত এঁকেছেন প্রকৃতির চিত্র, কত করেছেন গ্রামবাংলার বর্ণনা! কবিতাটির যে অন্তর্নিহিত অর্থ তা 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

এই কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'হরহৃদে কালিকা'। শিব ও কালী সম্বন্ধে কবির যে ব্যক্তিগত ধারণা তারই প্রকাশ দেখি কবিতাটিতে। কবির মতে শিব মহাকাল, কালী তাঁরই অংশ—তিনি খণ্ডকাল। মহাকালকে আশ্রয় করেই খণ্ডকালের লীলা।[৬৪ক] অর্থাৎ কালীর যে সাময়িক তাণ্ডব লীলা, মহাকাল তাকেই বুক পেতে গ্রহণ করেন। তাঁর স্বরূপ হচ্ছে—

"জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপ ছলে পাগল ভিখারি বলে,
তাই আমি চাই হতে আর কিবা চাহি রে!"

৬৪ প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (১৩৭৭), পৃ ৩৫৮
৬৪ক প্রবোধচন্দ্র সেন : 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ', দিব্যদর্শন, ১৩৭৬ আশ্বিন

যখন এই মহাকালের তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হয়, তখন—

"অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহতারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে
দিবি সেই বিশ্ব-চূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে।"

কালীও তখন তাঁর সঙ্গে উন্মত্ত হন। তারপরে তিনি আবার স্তব্ধ হলে কালীও তাঁর মধ্যে লীন হয়ে একাত্মতা লাভ করেন। কবির এই ব্যাখ্যা শিব-কালী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার অনেক উর্ধ্বে। পরবর্তী কালের বহু রচনাতেও তাঁর এই দর্শনের প্রকাশ আছে।, 'আলোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থের (১৮৮৫) 'একটি রূপক' প্রবন্ধ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'পাগল' প্রবন্ধ (১৩১১), 'পরিশেষ' কাব্য-গ্রন্থের 'মোহানা' কবিতা (১৩৩৪) প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই কাব্যের আরও একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পথিক'। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেন, এই কবিতাটি 'প্রভাতসংগীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন'।[৬৫] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন—

"সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"

—জী-স্মৃ, পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭

প্রকৃতপক্ষে, 'পথিক' কবিতাতেও কবির সমস্ত জীবনব্যাপী অনির্দিষ্ট যাত্রা-পথের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। এই দীর্ঘ কবিতায় কবি কখনও দ্রুতলয়ের ছন্দে ভবিষ্যৎ যাত্রার আনন্দে গেয়েছেন—

যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হৃদয়ের গান,— জীবনের গান,
...জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সুমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,
কুসুম কাননে, অচল শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—

এই যাত্রাপথে যদি 'কণ্টকে'র বাধাও থাকে তবু তাকে অতিক্রম করার সংকল্প রয়েছে কবির। কখনও আবার ক্লান্ত হয়ে বলেছেন—

৬৫ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, পৃ ৩৬০

"বল, বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন্‌খানে তবে ?"

এই যাত্রার শেষ কি 'নিরাশা-পুরেতে' ? শেষ পর্যন্ত কবি বলেন—

কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ মাঝে,
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে !
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীন,
সেই ছন্দে এক গান বাজিতেছে নিশি দিন।
সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হয়েছে গাঁথা মরণ কবির হাতে ;
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের পাতে পাতে !

এই দীর্ঘ কবিতার দ্রুততা-মন্থরতা, স্পষ্টতা-অস্পষ্টতা ও উত্থান-পতনের মাঝখান দিয়ে মনে হয়, কখনও কবি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন, আবার কখনও 'প্রভাতসংগীতে'র আশার বাণী, আলোর ইঙ্গিত তাঁকে উৎসাহিত করে তুলেছে। আশা-নৈরাশ্যে মেলানো ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সূচনা হিসাবে কবিতাটির মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

পরিশেষে বলতে পারি, শৈশব সংগীত শুধুমাত্র ফুলবালা-যুগের রঙিন স্বপ্নের কাব্য নয়। তাতে আছে বিচিত্র ভাবের সংকলন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের সূত্রে গাঁথা কবির চিন্তাসূত্রে কখনও এসেছে বালকোচিত প্রবণতা, কখনও বা তারই মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিচিত্রতাতেই রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্থকতা। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতে বলেছিলেন—

"যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।"

শৈশব সংগীত ও ভানুসিংহের কবিতাগুলি একদা কবি তাঁর প্রিয় বৌঠানের প্রেরণাতেই লিখেছিলেন। কিন্তু সেদিন হয়তো তার যথার্থ মর্যাদা তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলির মূল্য উপলব্ধি করে ও সংকলন করে সেই পরলোকগতা বৌঠানের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেন।



রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক চৌদ্দ বৎসর বয়সে

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪ জুলাই ১)

ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য পাঠের দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহ ছিল। এর মধ্যে বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্য অন্যতম। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক পত্রে (১৩২৮ কার্তিক ১৪) রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন—

> "বৈষ্ণবসাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শক ১৮৮০ বৈশাখ-আষাঢ়

উপনিষদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ হয়েছিল পারিবারিক প্রভাবের ফলে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী একান্তভাবেই তাঁর নিজের আবিষ্কার।[৬৬] বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের দিকে যখন তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বয়স খুবই অল্প। এই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে এক পত্রে [৬৭] তিনি লিখেছেন—

> "আমার বয়স যখন তেরো চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ, রস, ভাষা, ভাব সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করত।"

অন্যত্র তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন—

> "গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

—জী-স্মৃ, 'ভানুসিংহের কবিতা'

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ পদাবলী সাহিত্য বাংলার শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রায় অজ্ঞাত ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার স্রোতও বহুকাল পূর্ব থেকেই কমে গিয়েছিল। আধুনিক যুগের সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত অল্পস্বল্প পাওয়া যায় মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে (১৮৬১) আছে বৈষ্ণবভাবের কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্র

---

৬৬ পম্পা মজুমদার : রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পৃ ৩৫৮

৬৭ র-জী, পৃ ৭১ ও আনুষঙ্গিক পা-টী ৫

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসের তিনটি গানে ও বঙ্গদর্শনে (১৮৭৪) প্রকাশিত চারটি কবিতায় কৃত্রিম ধরণের ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেন।

এই সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ও সংকলন শুরু হয় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। রবীন্দ্রনাথ এইসব সংকলন ও সমালোচনা পড়ে কি ভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন তার ইতিহাস নানা জায়গাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি বলেন—

> "My imagination was fully occupied with the beauty of their forms and the music of their words, and their breath heavily laden with voluptuousness, passed over my mind without distracting it."

—**The Religion of an Artist**

এই পদগুলি পাঠের রীতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> "আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"

—জী·স্মৃ, 'ঘরের পড়া'

এক্ষেত্রে বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের নিকট এই পদসমুদ্র ছিল কাব্যরসসম্ভোগের সামগ্রী, সাধনার সম্পদ্ নয়। সেইজন্যই অপরিচিত ভাণ্ডার থেকে কাব্যরত্ন সংগ্রহের দিকে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল এত প্রবল। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব তাঁর জীবনে ছিল অন্যতম মূল প্রেরণা। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপীই তার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছিল। তিনি এই কবিতার সৌন্দর্য ও মাধুর্যেই প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে তার ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি তাঁর নিজের ভাবে কবিতা লেখেন।

এই পদাবলীসাহিত্য কবি এত গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, স্বভাবতঃই এর অনুকরণ করার স্পৃহা তাঁর মনে জেগেছিল। কারণ এ যুগটা প্রধানতঃ ছিল 'কপি-বুক' যুগ। তাই এরপর থেকে একদিকে কবি পদরচনা, অপরদিকে পদসংকলনে মনোনিবেশ করেন। বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে বলেন—

"আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির সহিত প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতার

প্রথম পরিচয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।...উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব পদাবলীকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যাঁহারা উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম না হইলেও সর্বপ্রধান হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ।"

—'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান', পৃ ১

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পদরচনার যে ইতিহাস লিখেছেন, তা নিম্নরূপ—

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘলা করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট্ লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।"

—জী-স্মৃ, 'ভানুসিংহের কবিতা'

এরপরে তিনি উৎসাহিত হয়ে আরও পদ রচনা করতে থাকেন এবং পদগুলি লেখেন ছদ্মনামে। এর কারণ, তিনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে ইংরেজ বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প শুনেছিলেন। চ্যাটার্টন পঞ্চদশ শতকের এক অখ্যাত কবি 'টমাস রাউলি'র নামে নিজের কবিতা প্রকাশ করতেন।[৬৮] রবীন্দ্রনাথ সেই পন্থাতেই 'ভানুসিংহ' (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) ছদ্মনামে পদগুলি রচনা করতে থাকেন। কবি এই পদগুলি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ১৫।১৬ বৎসর (দ্রষ্টব্য-'কাব্যগ্রন্থাবলী' ১৩০৩)। কবিও বলেছেন—

"ভানুসিংহের পদাবলী ছোট বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালমন্দ সমান দরের নয়।"

—সূচনা, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

রবীন্দ্রনাথের কিন্তু নিজের এই পদগুলির প্রতি কোনো মোহ বা মায়া ছিল না। তাই তিনি পঞ্চাশোর্ধ বৎসর বয়সে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছিলেন—

"ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।"

—জী-স্মৃ, 'ভানুসিংহের কবিতা'

নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্য করার বিশেষ কারণ আছে মনে হয়। পদকর্তাদের মিশ্রিত ও কৃত্রিম 'ব্রজবুলি' নকল করা সম্ভব। কিন্তু ভাবের নকল করতে গেলেই তার দুর্বলতা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ ভাবের বিচারেই

৬৮ দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়, 'বালককবি চ্যাটার্টন'

তাকে দুর্বল মনে করেছিলেন। কিন্তু ভাবের বিচারই কাব্যে একমাত্র বিচার্য বস্তু নয়। তার শিল্পসৌন্দর্য বিচার করারও প্রয়োজনীয়তা থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ভানুসিংহের পদে শিল্প বিচারের দাবিই বেশী। শিল্পাঙ্গের দিক্ থেকে পদগুলিতে কোনো 'মেকি' নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে পদকর্তা চণ্ডীদাসের কবিতাকে বিরহিণী রাধা এবং বিদ্যাপতির কবিতাকে প্রসাধনচতুরা কিশোরী রাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় বিদ্যাপতির শিল্পও বহু অলংকারভূষিত। কিন্তু বিদ্যাপতির সচেতন শিল্পপ্রয়াস চণ্ডীদাসে নেই। কিশোর রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডীদাসের পরিণত শিল্পের চেয়ে বিদ্যাপতির অলংকৃত শিল্প-সৌন্দর্যই বেশি আকর্ষণ করবে, তা অতি স্বাভাবিক। তবে একযুগের শিল্প, একযুগের ভাব অপরযুগে অবিকল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিক ও ও যুগের প্রভাব তাকে প্রভাবিত করবেই। ভানুসিংহের কবিতা বৈষ্ণব যুগকে অবলম্বন করে আপন প্রভায় আপনি আলোকিত। তার প্রকাশ তার ভাষায়, চিত্রকল্পে, ছন্দে ও সুরে। সেই বিচারে পদগুলির ভাবসম্পদের মূল্যও কিছু কম মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পদাবলীতে বৈষ্ণব পদাবলীর বাঁধাধরা রীতি অনুসরণ করেন নি। কখনও তিনি পদকর্তাদের অনুগামী, আবার কখনও বা নিজপথগামী। এই গ্রন্থে তাঁর কুড়িটি খণ্ড কবিতার মধ্যে পদাবলীর পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও বিরহের বাঁধাধরা নিয়ম তিনি মানেন নি। তাঁর প্রথমপদেই বিরহের সুর শোনা যায়—

"বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
...বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম
হৃদিবসন্ত সো মাধা?"

এ ক্ষেত্রে বরঞ্চ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র সঙ্গে মিল লক্ষ করা যায়। অনেক সময় কবি আবার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব কবিদের মত ভণিতায় নিজেকে 'দাস' বলেছেন। ভাষার মধ্যেও কোনো নির্দিষ্টতা নেই। কোথাও তিনি ব্রজবুলি ব্যবহার করেছেন, কোথাও বা বিশুদ্ধ বাংলা। কিন্তু ভাষা, ছন্দ ও ভাবের মিশ্রণে পদগুলিতে কবির স্বকীয় মাধুর্যই পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি

পদ এত উচ্চাঙ্গের হয়েছে যে, তিনি যেন বৈষ্ণব কবিদের উপরেও জয়ী হয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

'মরণ রে
তুঁহু মম শ্যাম সমান'

—এই কবিতাটিতে ভাবের যে সূক্ষ্মতা প্রকাশ পেয়েছে, তা আধুনিক মনবিশিষ্ট কোনো কবি ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের পক্ষেও বোধহয় এইজাতীয় পদ লেখা সম্ভব ছিল না। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা 'মরণমিলন' (উৎসর্গ: ৪৫) কবিতারই অঙ্কুর বহন করছে বলে তিনি মনে করেন। প্রভেদ শুধু শিল্পের পরিণতি ও প্রতীকের পরিবর্তনে। 'শ্যাম' পরে হয়েছেন 'মহাদেব'।[৬৯] কাব্যটির ষোড়শ সংখ্যক পদটিকে পদাবলী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলে মনে করা যায়। মাধব মথুরাপুরীতে চলে যাবেন শুনে রাধা প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি তাঁকে বাধা দেবেন না, কাঁদবেন না; হাসতে হাসতে তাঁকে বিদায় দেবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত,

মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জল-ধার।

ছন্দের বিলম্বিত গতি যেন রাধার ক্রমপরিবর্তনটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তারপর—

ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল—শ্যামরে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন হমার!

৬৯ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, পৃ ৪১-৪২

এই যে রাধার আকৃতি তা, "শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের লেখনীর অনুপযুক্ত হইত না।" এমন কি, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাতেও এই জাতীয় পদরচনা সম্ভব হত কি-না সন্দেহ।[৭০]

রাধা ও কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে কবির এই যে ভাবের প্রকাশ তারই পরিণত রূপ পরবর্তী সাহিত্যেও বিরল নয়।—

যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না চক্ষের জল ফেলা ॥
··· দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল।
ভেবেছিলেম, ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না যে—
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা ॥

—গীতবিতান, প্রেম (২৮২)

এই থেকেই বোঝা যায়, বৈষ্ণব কবিদের ভাব কবির হৃদয়ের অন্তরে, তাঁর রক্তের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়ে গিয়েছিল। আর, তাঁর বিশিষ্ট ছন্দের দোলায় তা সাহিত্যের অতি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

ছন্দে-ভাবে-ভাষায় নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথ কাব্যটি সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন কেন? মনে হয়, বৈষ্ণব সাধনাকে, মধুররসের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে, রাগানুগা ভজন প্রণালীকে তিনি আপন জীবনে স্বীকার করে নিতে পারেন নি বলেই বোধহয় বলেছিলেন, ভানুসিংহের পদাবলীকে "সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।"

—সূচনা, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এর বিচার করতে হবে আধুনিক দৃষ্টিসম্মত সাহিত্য তথা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভাবনার পটভূমি হিসাবে; সাধনার সম্পদরূপে নয়। সেদিক্ থেকে গ্রন্থটি সার্থক ও নিখুঁত বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

বনফুল (১৮৮০ মার্চ ৯)

গ্রন্থ হিসাবে বনফুল কবিকাহিনীর দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হলেও জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই কাব্যটিই প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বভাবতঃই বাল্যবয়সের এই কাব্যে কবির ব্যক্তিগত কল্পনাকে কেন্দ্র করে সমকালীন সাহিত্যিকদের প্রভাব 'লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে' অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে।

---

৭০ বিমানবিহারী মজুমদার: রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ ২৪-২৫

অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য এককালে বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণাস্থল। বনফুলের মধ্যে এই প্রভাব বোধহয় সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, কাব্যকল্পনার মধ্যে বহু সাদৃশ্য তো আছেই, বনফুলের মধ্যে 'উদাসিনী'র পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত উদ্‌ধৃত দেখা যায়।

এছাড়া প্রথম ও অষ্টম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনায় বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র হিমালয় বর্ণনার প্রভাব অতি স্পষ্ট।—

নির্ঝরে ঝর্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গে উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্রসূর্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন।
তুষারে আবরি শির ছেলেখেলা পৃথিবীর
ভূরুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন। —(১ম সর্গ)

এর সঙ্গে সারদামঙ্গলের—

পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে!—(৪র্থ সর্গ)

এই অংশের ভাব ও ভাষা পর্যন্ত যেন মিলে গেছে। তবে হিমালয় বর্ণনায় কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশে মানবজীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে এমন সব চিত্র আছে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। এই কাব্য রচনার মাত্র কিছুদিন পূর্বে কবি হিমালয় থেকে 'প্রত্যাবর্তন' করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা কাব্যটির কোনো কোনো স্থলে কার্যকরী হয়েছে মনে হয়। প্রথম সর্গে, "কুটীরের একপাশে শাখাদীপ ধূমশ্বাসে স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার" — এই পঙ্‌ক্তিগুলির পাদটীকায় লেখা আছে, "হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে, তথাকার লোকেরা উহা দীপের পরিবর্তে ব্যবহার করে।" প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ছাড়া এইরকম মন্তব্য করা সম্ভব নয়। বিহারীলালের হিমালয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কবির স্বকীয় অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে একাধারে কালিদাস ও শেক্সপীয়রের আদর্শের যেন মিলন ঘটেছে। বিজয়কে দেখে কমলার যে বিস্ময় তারসঙ্গে ফার্দিনান্দকে দেখে মিরান্দার বিস্ময়ের মিল আছে। মিরান্দার এ বিস্ময় প্রথম পুরুষ দেখার বিস্ময়। মিরান্দা বা কমলা কেউই পিতা ছাড়া আর কোনো পুরুষ কখনও দেখে নি। রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময়ের ভাবটি তাঁর বহু পরে রচিত 'পতিতা' (১৩০৪) কবিতাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋষ্যশৃঙ্গ মুণির দেবমহিমা উপলব্ধি করে সেদিন পতিতা নারী তার নারীর মহত্ত্ব প্রথম অনুভব করেছিল—

"জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।"

তবে বনফুলের সঙ্গে এর অপ্রত্যক্ষ মিল। এ নারীর আত্মগৌরব লাভের বিস্ময়। বনফুলে দেখি প্রথম পুরুষ দেখার বিস্ময়। এছাড়া কমলার বন থেকে বিদায়ের দৃশ্যে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে তপোবন ত্যাগের দৃশ্যের যে প্রভাব আছে, এ বিষয়ে বেশ স্পষ্ট অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই কালিদাসের ভক্ত পাঠক ছিলেন। তাই কালিদাসের কাব্যপ্রভাব আত্মস্থ করে নেওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আবার তৃতীয় সর্গে কমলা ও নীরজার কথোপকথন যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা-সরমার কথোপকথনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এরপরে বিবাহ সম্বন্ধে কমলার অনভিজ্ঞতার যে ছবি কবি এঁকেছেন, তা সম্ভবতঃ কপালকুণ্ডলার অভিজ্ঞতা-হীনতারই প্রতিফলন। বিবাহ সম্বন্ধে কমলার যে উক্তি—

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি"
কহিলা কমলা তবে বিপিনকামিনী,
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখি নি।"—(৪র্থ সর্গ)

তা যেন কপালকুণ্ডলারই উক্তির প্রতিধ্বনি। কবি-রচিত—

"সখি, ভাবনা কাহারে বলে।
সখি, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বল, দিবসরজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখি, ভালবাসা কারে কয়।"

এই গানেও যেন কমলার অন্তরে ধ্বনিত বাণী প্রতিরূপ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বনবাসিনী, সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকাকে সংসারে এনে ফেললে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই হয়েছিল। কপালকুণ্ডলা ও কমলার পরিণতিও একই রূপ। সংসারের সঙ্গে নিজেদের চরিত্রের মিলন ঘটাতে পারে নি বলে দুজনেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নেয়। ফলে দুটি চরিত্রই ট্রাজিক।

অপরপক্ষে, নীরদ কর্তৃক কমলাকে প্রত্যাখ্যানের ভাষায় ও ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যানের প্রভাব রয়েছে মনে হয়।[৭১] নীরদ কমলাকে বলেছে—

তবে যা লো দুশ্চারিণী! যেথা ইচ্ছা তোর
কর্ তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়—
কিন্তু যতদিন দেহে প্রাণ রবে মোর—
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয়!—(৪র্থ সর্গ)

নীরদ চরিত্রের মধ্যে প্রতাপের বৈশিষ্ট্য অনেকখানিই রয়েছে। সে কমলাকে ভালবাসে; কিন্তু অপরের পত্নী বলেই তাকে সে প্রত্যাখ্যান করল। এর জন্য মনে তার বেদনার অন্ত নেই। প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্কও তো এরকমই ছিল।

ষষ্ঠ সর্গে নীরদের মৃত্যু হয়েছে। ঐ সর্গে একটি আদর্শজগৎ রচনার পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রেও কালিদাস ও শেলী-রচিত আদর্শ জগতের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। কালিদাসের আদর্শ জগৎ উত্তর মেঘের 'অলকা', আর শেলীর এপিসাইকিডিয়ানের সমুদ্রপারের সেই দ্বীপ, যাকে বলা হয় 'ভূতলের স্বর্গখণ্ড'।[৭২] শেলীর এই 'Beautiful as a wreck of Paradise'— এর সঙ্গে চোদ্দবৎসরের বালকের পরিচয় ছিল কি না বলা যায় না। তবে অক্ষয় চৌধুরীর মারফত পরিচয় থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু "পৌল-বর্জিনীতে সমুদ্রতটের অরণ্যদৃশ্যবর্ণনা" এবং "বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল-বর্জিনীর মিলন ও বিচ্ছেদবেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মূর্চ্ছনা সহকারে অপূর্ব সঙ্গীতের মত বাজিয়া উঠিত"[৭৩], তার প্রভাব কি কবি সম্পূর্ণই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন? আর

৭১ চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১২৮০ শ্রাবণ-১২৮১ ভাদ্র; গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫। অপরপক্ষে, বনফুল জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮২ অগ্র-১২৮৩ আ-কা; গ্রন্থাকারে ১৮৮০।

৭২ প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, পৃ ৩২২

৭৩ আধুনিক সাহিত্য, 'বিহারীলাল' ১৩০১

সর্বোপরি আছে কবির নিজের কল্পনা। সব কিছুর মিলনেই হয়েছে তার নবরূপ। সপ্তম সর্গের শ্মশানবর্ণনায় হেমচন্দ্রের 'ছায়াময়ী' কাব্যের শ্মশান বর্ণনার মিল দেখা যায়। কিন্তু ছায়াময়ী (১৮৮০ জানুআরি) বনফুল জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হবার পরে প্রকাশিত। তবে গ্রন্থে (১৮৮০ মার্চ) কবি সেই প্রভাব গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

২

'বনফুলে' কার প্রভাব কতখানি তার বিচার করার চেয়ে তার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করাই এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কবির সেই সময়কার রচনায় অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় রচনায় অপরিণতি, চিন্তার শিথিলতা, বাস্তববোধের অভাব এবং রচনার অপারিপাট্য। স্বভাবতঃই বয়সের স্বল্পতা তার কারণ। কিন্তু তারই মধ্যে স্থানে স্থানে রয়েছে পরবর্তী জীবনের নানা রূপ, ভাব ও কল্পনার অঙ্কুর। তাই পরবর্তী জীবনের পটভূমিতে দাঁড় করালে একাধারে কাব্যটির দৌর্বল্য ও উৎকর্ষ দুইই বিচার করা সম্ভব।

বনফুল কাব্যের মর্ম হল, কমলা ছিল বনফুল। বিজয় তাকে বিবাহ করে সংসারে নিয়ে এল। কিন্তু কমলা নিজের সঙ্গে সংসারের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারল না। সে ভালবাসল নীরদকে। কিন্তু বিবাহ ও প্রেমে মিলন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই ফিরে গেল তার পুরাতন আশ্রয় বনে। কিন্তু পুরাতন বনপ্রকৃতি তাকে আর আগের মত করে গ্রহণ করল না। সে মানুষকেও হারাল, প্রকৃতিকেও হারাল। এই হতভাগ্য জীবন বহনে অসমর্থা হয়ে শেষপর্যন্ত সে হিমালয়ে গিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

এই কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের দুটি প্রধান তত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। একটি হল, বিবাহ একটি সামাজিক প্রথা। বিবাহে মানুষ সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রেম একটি মানসিক ভাব, তাই তার গতি অবাধ। এই দুই বিপরীত সত্তাকে একত্র মিলিত করা সম্ভব কি-না, এটি রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি প্রধান পরীক্ষা। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে বারেবারে এই সমস্যা নানারূপে দেখা দিয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা', 'রাজা ও রানী', 'বিদায়-অভিশাপ', 'শেষের কবিতা' — সবগুলিতেই কবির একই সমস্যা।

দ্বিতীয়টি হল, কমলা তো একসময় প্রকৃতির কোলে আনন্দেই ছিল। তবে সংসার থেকে ফিরে গিয়ে পূর্ব আনন্দ ফিরে পেল না কেন? তার কারণ হল, মাঝখানে সে মানুষের জীবনের সংস্পর্শ লাভ করেছিল। তাই পূর্বজীবনকে

পূর্বরূপে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কবির এই পরিকল্পনায় কালিদাসের শকুন্তলার আদর্শ অনেকখানি প্রযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। 'শকুন্তলা' কাব্যের গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "কালিদাস যে তাহাকে [শকুন্তলা] কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়।...এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে,... ।"
>
> —প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), 'শকুন্তলা'

তারপরে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিরহের তাপে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে মিলন হয়েছে, তা সার্থকতর, উন্নততর। তাই কবি 'শকুন্তলা' কাব্যকে একাধারে 'Paradise Lost' এবং 'Paradise Regained' বলেছেন। তিনি বলেন—

> "এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্য এবং স্বর্গ, যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।"
>
> —পূর্ববৎ

বলাবাহুল্য, শৈশব ও কৈশোরের সীমায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেদিন শকুন্তলার এই গভীর প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। কিন্তু শকুন্তলার সৌন্দর্যও তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। তাই কমলা বিবাহোত্তর জীবনে বনের পূর্বস্বাদ লাভ করতে না পেরে যখন মর্মদাহে দগ্ধ হচ্ছিল, তখন কবি বয়সোচিত সহজ সিদ্ধান্ত করে তার প্রাণত্যাগ করিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কপালকুণ্ডলাকে সেই পরিণামেই নিয়ে গেছেন। তাছাড়া, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শকুন্তলা-যুগের সেই আদর্শ জগতের পরিকল্পনা করাও কঠিন। সেই কারণেও হয়তো বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই তাঁদের কাব্যে শকুন্তলার মত পরিণতি দেখান নি।

বহু কবির সাহিত্যসাধনাকে স্বাঙ্গীকৃত করে নিজের ভাবে প্রকাশ করাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে তখন আর পৃথক্ করে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কপিবুকের যুগ তো প্রধানতঃ অনুকরণেরই যুগ। কিন্তু তখন থেকেই দেখা যায়, সকলের মিলনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথেরও একটি বিশিষ্ট মূর্তি আত্মপ্রকাশ করছে; সেখান থেকেই তাঁর পরবর্তী জীবনের অঙ্কুরোদ্গম। 'বনফুল'ও তার ব্যতিক্রম নয়।

কবিকাহিনী (১৮৭৮ নভেম্বর ৫)

'কবিকাহিনী' রচনার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রচিত (মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত) 'শৈশবসঙ্গীত' নামক কবিতাটিতে কবির মনের যে আক্ষেপ ও অশান্তি প্রকাশ পেয়েছে তার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। সেই অশান্তি ও অন্তর্বেদনাই আরও স্পষ্ট রূপ পেয়েছে কবিকাহিনীর আখ্যানের মধ্যে। সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে ব্যারিষ্টার করে আনার প্রস্তাব হয়। তাতে তাঁর কবি-জীবনের অবসান ঘটবার আশঙ্কা আরও আসন্ন হয়ে এল। এই 'অবসান-আশঙ্কা'র কথাই কাব্যটির কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে। শৈশবসঙ্গীত কবিতার সঙ্গে কবিকাহিনীর পার্থক্য হল, ঐ কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত বেদনা প্রকাশ পেয়েছে গীতিকবিতা রূপে আর কবিকাহিনীতে তারই প্রকাশ আখ্যানকাব্য রূপে।

'কবিকাহিনী' কাব্যের প্রাথমিক লিখিত রূপের আদ্যন্ত সবটুকুই পাওয়া গেছে মালতীপুঁথিতে, তবে পুঁথিটির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে আছে। তার থেকে দেখা যায়, শৈশবসঙ্গীত কবিতা ও কবিকাহিনীর রচনারম্ভের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ছয়দিনের। কাব্যটি তিনি লিখেছিলেন "বাড়িতে" মাত্র আট দিনে (১লা কার্তিক মঙ্গলবার - ১২ই কার্তিক শনিবার, মাঝে "৪ দিন লিখি নাই")। এর অল্পদিন পরেই কাব্যটি 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১২৮৪ পৌষ-চৈত্র) এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কবির বিলাতযাত্রার পর (১৮৭৮ নভেম্বর ৫)।

কবিকাহিনীর মূল বিষয় হল কবির মৃত্যু।—

> "সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে — লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই।"
>
> —জী-স্মৃ 'ভারতী'

এই নায়ক-কবির ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

> "যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।...ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে — তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ।"
>
> —পূর্ববৎ

'বনফুল' কাব্যের মাত্র দু'বৎসর পরে কবিকাহিনী রচিত। কিন্তু এই দুই বৎসরেই কবির মন ও শিল্পবোধের পরিণতি ঘটেছে অনেকখানি। গঠনরীতিও

অনেকটা সরল ও দৃঢ়বদ্ধ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে কাব্যের ভাববস্তুতে। বনফুলে নীরদকে লেখক কবি বলে বর্ণনা করেছেন বলেই সে কবি। কিন্তু কবিকাহিনীর নায়ক কবি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবি।

কবিকাহিনীর মূল অ্যাখ্যানটি হল — কাব্যের নায়ক-কবির জন্ম হয়েছিল প্রকৃতির কোলে। জন্মাবধি প্রকৃতির সঙ্গেই ছিল তাঁর আন্তরিক যোগ। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁর অন্তরে মানব-জীবনের সঙ্গলাভের জন্য আকুতি জাগল। তিনি অনুভব করলেন, "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন" (২য় সর্গ)। তাই কবি বেরোলেন ভ্রমণে মানবসঙ্গ লাভের আশায়। সেখানেই তাঁর মিলন 'নলিনী'র সঙ্গে। নলিনীও ছিল একা। ফলে উভয়ে উভয়ের সঙ্গলাভে পরিপূর্ণতার আলোক দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কবির মন যেন তাতেও তৃপ্তি পেল না। কবি চাইলেন বৃহত্তর জগতের আস্বাদ। তাই তাঁর বিশ্বভ্রমণে যাত্রা। কিন্তু এই অতি-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কবি সার্থকতা দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে এলেন নলিনীর আশ্রয়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনী বিরহে প্রাণত্যাগ করেছে। এই আঘাত পেয়ে কবি গিয়ে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নিলেন, একেবারে একা। কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায় কবি অনুভব করলেন, মৃত্যুতেই সব ফুরায় না। তাই নলিনীর দেহহীন অস্তিত্ব সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তার মাঝেই তিনি পেলেন নলিনীর সঙ্গ—

"দেহ কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।" —(৪র্থ সর্গ)

তাঁর এই মিলনের সাক্ষী হয়ে রইলেন মানব-ইতিহাসের অন্যতম ধারক হিমালয়। এঁর কোলেই শেষ পর্যন্ত কবির মৃত্যু হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এই মিলন ঘটানো— কবির জীবনে ছিল অন্যতম প্রধান ব্রত। তাই কবিকাহিনীর এই সুর পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যেও দুর্লভ নয়। প্রিয় বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রচিত 'পুষ্পাঞ্জলি' রচনাগুচ্ছে (১২৯২ বৈশাখ) এবং পরবর্তী কালে তারই পরিণত রূপ 'লিপিকা'য় (১৯২২) এই প্রিয়বিরহের গভীরতা ও বিস্তার কবি অতি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এই উপলব্ধি বোধহয় সবচেয়ে গভীর হয়েছিল কবিপত্নীর মৃত্যুর পর। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের (১৯১৪) কবিতাগুলিই তার সাক্ষী।—

"ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।

আজি তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্ব-মাঝে ডাকো মোরে সে করুণ রবে।
… আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে"। (৬)

পত্নীর সঙ্গে তিনি আরও নিবিড়তা উপলব্ধি করেছেন নিম্নলিখিত কবিতায়—

"মিলন সম্পূর্ণ হল আজি তোমা-সনে
এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।" (৮)

আরও বহু কবিতাতেই রয়েছে এই ঘনিষ্ঠভাবে, একাত্মভাবে পত্নীকে কাছে পাবার কথা। 'বলাকা'র বিখ্যাত কবিতাটিও তো সেই ভাবেরই দ্যোতক —

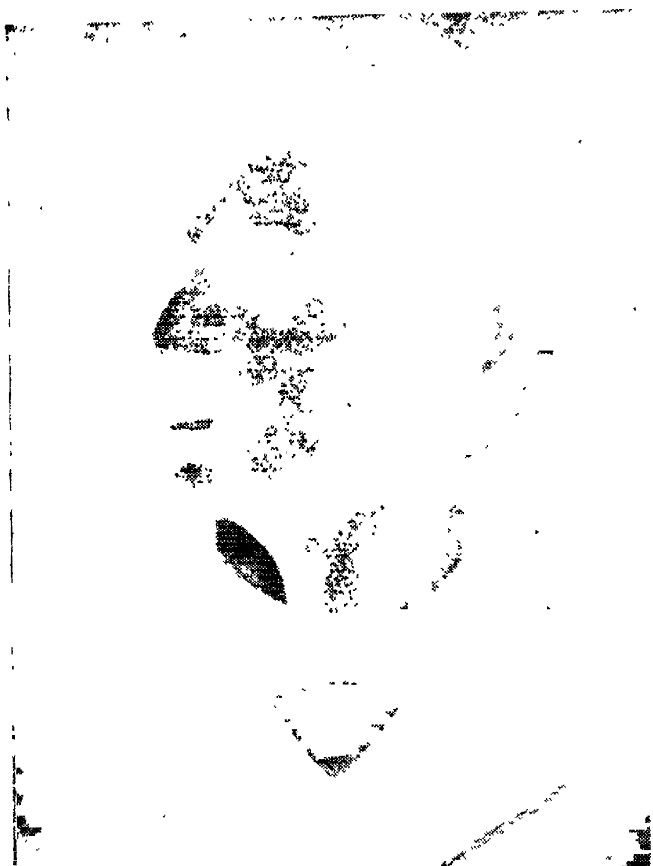
"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।"[৭৪]

—'ছবি' ১৩২১

কবির এই গভীর ভাবের অনুভূতিই অপরিণতভাবে স্থূলভঙ্গিতে, কবির প্রায় অজ্ঞাতসারেই দেখা দিয়েছিল 'কবিকাহিনী'তে। এই অপরিণতিই বয়সের প্রাজ্ঞতায়, জীবনের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ পরিণত হয়েছে পরবর্তী কালে। ক্ষুদ্র থেকেই বৃহতের জন্ম, অপূর্ণ থেকেই পূর্ণ। কবিকাহিনীর মূল্য সেই মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে। 'কবিকাহিনী'তে "ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে" তার যথার্থ বিচার করেছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বান্ধব, ৪র্থ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ১২৮৫ মাঘ)—

"যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে।…যে কবিতা, শিশিরসিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্যহৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন

৭৪ এই কবিতাটি নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ বলেন কবিপত্নীর উদ্দেশ্যে লেখা, কারো মতে কাদম্বরী দেবীকে।



রবীন্দ্রনাথ

সতেরো বৎসর বয়সে

করে,— যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবি-কাহিনীর প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করিবে।"

রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রভাতের 'নলিনী', আন্না তড়্খড় এই কাব্যটি পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে যে প্রশংসা পত্রটি লিখেছিলেন কবিকাহিনীর মূল্য নির্ধারণের পক্ষে তার মূল্যও সামান্য নয়।[৭৫]

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১ জুন ২৩)

এই কাব্যে কিন্তু বনফুল বা কবিকাহিনীর মত কল্পনাশক্তিই কবির একমাত্র অবলম্বন নয়। বিলাত যাবার আগে বোম্বাইএ এবং বিলাতে গিয়ে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ; বহু নারীর সাহচর্য লাভ করেন। বিশেষতঃ, বোম্বাইএ আন্না তড়্খড় এবং বিলাতে স্কট্ পরিবারের দুটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কতখানি হয়েছিল সে কথা তো কবি নিজেই বলেছেন। এর থেকে নারীপ্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে কবির মনে যে ছবি অঙ্কিত হয়েছিল তার প্রতিফলন দেখা যায় ভগ্নহৃদয় কাব্যে। আর, ভারতীয় প্রেমের আদর্শ ছিল তাঁর শিক্ষালব্ধ। কাজেই ভগ্নহৃদয় কাব্যটিকে নেহাতই কল্পনা-প্রসূত বলে বিবেচনা করা উচিত হবে না।

এই কাব্য রচনার গোড়াপত্তন হয়েছিল বিলাতেই। পরে দেশে ফিরবার পথে এবং দেশে ফিরে কাব্যটি রচনা সমাপ্ত হয়। কাব্যটি সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

"তখন মনে হইয়াছিল, লেখাটা খুব ভাল হইয়াছে।···তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য-সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

—জী-স্মৃ, 'ভগ্নহৃদয়'

কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই কবি পরে বলেছেন—

"আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল

৭৫ দ্রষ্টব্য—সজনীকান্ত দাস : 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ২৪৫-৪৬

ছিল। যে-যুগে পৃথিবীতে জল-স্থলের বিভাগ ভাল করিয়া হয় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখা সম্পদ্‌হীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। · অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে।"

—পূর্ববৎ

কিন্তু কাব্যের এই আয়তনহীন বৃহত্ত্বের কারণ শুধু কবির বয়সের স্বল্পতা বা অপরিণতি নয়, প্রধানতঃ, সেকালের ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব। 'শেক্‌সপীয়র-মিল্‌টন বায়রণ' প্রমুখ কবিদের কাব্যে যে 'হৃদয়াবেগের প্রবলতা' ছিল সেদিন তা তাঁরা পড়েছিলেন মহা উত্তেজনার সঙ্গে। এর শিক্ষাদাতা ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। 'ইংরেজি সাহিত্যলোচনার সেই চঞ্চলতাটা' সেদিন আমাদের দেশের শিক্ষিত বালক ও যুবকদের মনকে 'চারিদিক' থেকে 'আঘাত' করেছিল। কিন্তু ইউরোপের এই চাঞ্চল্য তাদের 'প্রকৃতিগত' আর, আমাদের দেশে সেই চাঞ্চল্যের সঙ্গে আমাদের অন্তরের মিল ছিল না। ফলে তা একটা 'অতিশয়োক্তি'র প্রকাশ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যাইহোক, এই চাঞ্চল্যের আবহাওয়াতেই কবিরও প্রথম জীবনের সূত্রপাত। তাই তাঁর সে যুগের কাব্যগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; ···ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।"

—পূর্ববৎ

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যই সে যুগে 'হৃদয়াবেগে'র এই প্রাবল্যে রচিত। তার মধ্যে ভগ্নহৃদয়ের আয়তন সবচেয়ে বড়। ভগ্নহৃদয় প্রকৃতপক্ষে নাট্যকাব্য। কিন্তু কবি নিজে একে গীতিকাব্য বলেছেন। রচনাটিতে আসলে কাব্য ও নাটক উভয়ের গুণই কিছু কিছু আছে। লোকে যাতে একে পুরো নাটক বলে মনে না করেন সেইজন্য ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক

ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।”

দীর্ঘ চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত কাব্যটিতে কাহিনী বা ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই শিথিল হয়ে পড়েছে। গান দিয়ে যেন সেই শিথিলতা পূর্ণ করার চেষ্টা রয়েছে। তবে এত বেশী গান থাকবার আরেকটি কারণও থাকতে পারে। বিলাত থেকে ফেরার পর যে গানের আবহাওয়ার মধ্যে কবি এসে পড়লেন, ভগ্নহৃদয় তারই পটভূমিকায় রচিত।[৭৬] তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটকের অন্যতম প্রধান অঙ্গ গান। নাটকের ভাবকে তিনি গানের সুরে অনেক সময়েই পূর্ণতা দিয়েছেন। সেদিক্ থেকে ভগ্নহৃদয়েও গানের আধিক্য অসমীচীন বলে মনে হয় না।

২

আঙ্গিকগত এইসব দোষ-গুণের কথা ছেড়ে দিলে কাব্যটিকে ভাবের দিক্ থেকে পরবর্তী সাহিত্যেরই একটি ক্ষীণ পূর্বরূপ বলে স্বীকার করতে হবে। প্রেমের দ্বিবিধরূপ এবং জীবনে তার সার্থকতার বিচার রবীন্দ্রসাহিত্য-তত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। এই দ্বিবিধ প্রেমের একটি, মোহময়, তৃষ্ণাময়; তা আকর্ষণ করে ধরা দেয় না। আর একটি রূপ—যাতে মোহ নেই, মাধুর্য আছে। তা বাসনাকে জাগিয়ে দিয়ে সফল শান্তির মধ্যে নিয়ে যায়। এই কাব্যে প্রথমটির দৃষ্টান্ত নলিনী আর দ্বিতীয়টির প্রকাশ মুরলার প্রেমে। কবি প্রথমে মুরলার অন্তরের কথাটি বুঝতে না পেরে ধরা দিয়েছেন নলিনীর কাছে, আত্মহারা হয়েছেন তার প্রেমে। কিন্তু নলিনীর প্রেমে গভীরতা নেই। কবি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে নিজের এই ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই শেষপর্যন্ত কবি-সত্তা ভুলে মানবসত্তার দাবি পূরণ করতে বিবাহ করেছেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত মুরলাকে। এই মিলন বড় দুঃখের। কিন্তু তবুও সুখের মোহময় প্রেমের চেয়ে এই মিলন শতগুণে শ্রেয়। যে প্রেম সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিশ্বময় তার প্রসার, তাকেই কবি শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছেন নিজের অন্তরে। পরিশেষে দেখি, নলিনী ও তার প্রণয়ীরা, ললিতা, মুরলা, অনিল, কবি—সকলেরই প্রেমে এসেছে ব্যর্থতা। তাই তারা সকলেই ‘ভগ্নহৃদয়’।

---

৭৬ র-জী, পৃ ১১১

রবীন্দ্ররচিত প্রথম উপন্যাস 'করুণা'তেও এই প্রেমদ্বন্দ্ব দেখা যায়। যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

বস্তুতঃ, পাশ্চাত্যসাহিত্যপ্রসূত 'হৃদয়াবেগের প্রবলতার' যুগে কাব্য লিখলেও ওই সাহিত্যে প্রেমের চিত্রে personal love এবং passion-এর যে আধিক্য, 'রোমিও জুলিয়েট্' প্রভৃতি যার দৃষ্টান্ত, কবি তা সমর্থন করতে পারতেন না। তাতে কোনো সার্থকতা নেই বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। বিশ্বপ্রেমের মর্যাদা তার চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর এই অনুভূতি বীজাকারে, কাহিনীর মাধ্যমে দেখা গেল 'ভগ্নহৃদয়ে', আর লিরিক কবিতার মধ্যে তার স্পষ্ট প্রকাশ 'মানসী' কাব্য থেকে। তার পূর্বে 'কড়ি ও কোমলে' তার সূচনা দেখা গিয়েছিল। 'মানসী'তে 'ভুল-ভাঙা', 'নারীর উক্তি' 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'সংশয়ের আবেগ' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবি প্রেমের এই প্রসারের কথাই বলেছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া অবান্তর হবে না; তাতে কবির প্রেম-ধর্মটিও হবে স্পষ্ট। 'ভুল-ভাঙা' (১৮৮৭) কবিতার—

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।"

এই অংশে মোহহীন বৃহত্তর প্রেমকেই কবি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। যে প্রেম দেহসর্বস্ব, মোহেই যা সংকীর্ণ সে প্রেমকে অবজ্ঞা করে তিনি বলেন—

"একেবারে ভুলে যেয়ো, শতগুণে ভালো সেও
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।"

—'বিচ্ছেদের শান্তি' ১৮৮৭

ওই বিকৃত প্রেমকে ঘৃণা করেই 'নারীর উক্তি'তে (১৮৮৭) নারী বলে—

"অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।

মনে কি করেছো বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।"

প্রকৃতপক্ষে,

"যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে" (বলাকা, 'এ কথা জানিতে তুমি')

সে প্রেমকে জীবনে তিনি চান নি। কবির জীবনের আরাধ্য সেই প্রেম, যে প্রেমে নায়ক-নায়িকার মনের কথা হবে নিম্নরূপ –

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শত গুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।

—'সংশয়ের আবেগ' ১৮৮৭

কবির এই প্রেমের আদর্শই তত্ত্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে 'মানসী'র 'নিস্ফল কামনা' (১৮৮৭) কবিতায়। তাঁর এই চিন্তারই আরও পরিণত রূপ আছে 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯) প্রভৃতি কাব্যে; আছে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র কোনো কোনো পত্রে (১৯২৪-২৫), 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' নামক প্রবন্ধে (১৩৩২)। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির এক পত্রে (১৩ ফেব্রুআরি ১৯২৫) কবি বলেন—

"পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম, সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধেও এক স্থলে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন—

"তিনের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে ভারতীয় কবির মনের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। বিবাহকে তিনি তপস্যা বলেছেন; এই তপস্যার পন্থা কিম্বা এর লক্ষ্য আত্মসুখ ভোগ নয়। এর পন্থা হচ্ছে কামনাদমন এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে কুমারসম্ভব।"

তবে এইসব চিন্তা কবির বহু পরিণত বয়সের, পরিণত মনের। কিন্তু এই চিন্তারই একটা অস্পষ্ট রূপ, একটা ক্ষীণ আভাস যে কিশোর কবির মনে জেগেছিল, তাতে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভাই প্রকাশ পায়। এই বৃহৎ প্রেমের উপলক্ষেই রবীন্দ্রসাহিত্যে আর একটি তত্ত্ব বহুক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। তা হল তাঁর 'দুই নারী' তত্ত্ব। নারীর জাত দুই প্রকারের। এক, স্বভাব-প্রিয়া, আর এক স্বভাব-জননী। ভগ্নহৃদয়ে নলিনী ও মুরলা যথাক্রমে এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই পরিকল্পনাও রবীন্দ্রনাথের মনকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেছেন—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

—বলাকা, ২৩

এই দুই নারীর মূর্তিকে তিনি পৃথক্ ভাবে বন্দনা জানিয়েছেন যথাক্রমে 'উর্বশী' (চিত্রা, ১৩০২) ও 'কল্যাণী' (ক্ষণিকা) কবিতাদ্বয়ে। 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন' প্রভৃতি উপন্যাসেও তিনি নারীর দুই রূপ, তার ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটানো সম্ভব কি-না ইত্যাদি সমস্যার কথাই উত্থাপন করেছেন। 'ভগ্নহৃদয়ে' যে সমস্যা প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল, তা-ই বৃহৎরূপে উপস্থাপিত হয়েছে এইসব রচনায়। কবি হয়তো তাকে তখন সংহত ও সংযত করে প্রকাশ করতে পারেন নি, নেহাতই অপরিণতির দোষে, কিন্তু তবুও তা তাঁর স্বকীয় চিন্তার আলোকে উজ্জ্বল। এখানেই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের সার্থকতা।

সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২ জুলাই ৫)

সন্ধ্যাসংগীত রচনার পূর্বের যুগটিকে কবি বলেছেন 'কপিবুকে'র যুগ। ঐ পর্বের সাধনা প্রধানতঃ 'মডেল লেখা নকল করবার সাধনা'। কিন্তু সেই 'নকল' করার মধ্যেও "নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে।… প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা।"

অবশেষে 'পরিণতি' এসে বাইরের সেই খোলসটাকে বিদীর্ণ করে 'স্বরূপ'টিকে প্রকাশ করে দেয়। সন্ধ্যাসংগীতে সেই 'স্বরূপে'র প্রথম প্রকাশ।[৭৭] এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটল জ্যোতিদাদারা যখন 'দূরদেশে' ভ্রমণে গেলেন। এর আগে তিনি ছিলেন প্রধানতঃ জ্যোতিদাদা ও কাদম্বরী দেবীর শাসন ও স্নেহাধীনে।

কিন্তু কাদম্বরী দেবীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য জ্যোতিদাদাদের যেতে হল। এর ইতিহাসটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি আলোচনা প্রসঙ্গে।[৭৮] তিনি মনে করেন সন্ধ্যাসংগীতের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি কাদম্বরী দেবীর সম্বন্ধে লেখা। তিনি আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর তাঁকে সুস্থ করার জন্য জ্যোতিদাদা তাঁকে বাইরে নিয়ে যান। এই 'তারকা' কাদম্বরী দেবী হওয়া খুব আশ্চর্যের নয়। কারণ, যাঁকে কবি 'জীবনের ধ্রুবতারা' বলে সম্মান ও সম্বোধন করেছিলেন, এ আত্মহত্যা হয়তো সেই তারকারই। সেই 'তারা'র ধ্যানে মগ্ন কবির হৃদয় তাই বলে ওঠে—

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধার সাগরে
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

রবীন্দ্রজবনীকার মনে করেন, এই কারণেই এই কবিতাটি সন্ধ্যাসংগীতের বিশিষ্ট ভাবের কবিতাগুলি রচনার পূর্ববর্তী। আত্মহত্যার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর তাঁরা চলে গেলে নিঃসঙ্গ কবি 'তেতলার ঘরে' তাঁদের স্থানটিতে একলা দিনযাপন করতে লাগলেন।

"এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া কাব্য রচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।

৭৭ সূচনা, সন্ধ্যাসংগীত
৭৮ র-জী, পৃ ১১৭-২০

আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধকরি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।"

—জী-স্মৃ, 'সন্ধ্যাসংগীত'

প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীদেবীর উৎসাহেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সূচনা। তাঁদের স্নেহ পাওয়াটা তাঁর যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা 'দূরদেশে' চলে গেলে তিনি যেন নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগলেন। অন্যান্য জ্যেষ্ঠভ্রাতারা কেউ বা বিদেশে আবার কেউ বা আপন-সাধনায় ব্যস্ত। এই অসহায় ও বাঁধনছেড়া অবস্থা স্বভাবতঃই তাঁর মনে মুক্তি ও কাব্যে বিপ্লব আনবার অনুকূল হয়েছিল। কবি আপন মনে কাব্য রচনা শুরু করলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—

"একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধহয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল,...কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেট জিনিসটা বলে, 'ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।'

কিন্তু এমন করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল; আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল, 'বাঁচিয়া গেলাম যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই'।"

—পূর্ববৎ

২

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি একটু নিবিষ্টভাবে পড়লেই দেখা যাবে বিচিত্র মান-অভিমান বা রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্ব থেকে যে বিষাদ সৃষ্টি হয়, তাই কবিতা-গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আগাগোড়া একটা নিরাশা ও ক্রন্দনের সুর শোনা যায়। তিনি যেন এক বেদনাময় ভাবে নিজের অন্তরের মধ্যে গুমড়ে বেড়াচ্ছেন। এই বিষাদময় অন্তর্বেদনার সুর 'পরিত্যক্ত', 'গানসমাপন,' 'অনুগ্রহ', 'দুঃখের আহ্বান' প্রভৃতি কবিতায় স্পষ্ট শোনা যায়। জ্যোতিদাদা ও বৌঠান চলে গেলে কবি মনে যে আঘাত পেয়েছিলেন তা 'পরিত্যক্ত' কবিতায় অস্পষ্ট নয়—

চলে গেল, আর কিছু নাহি কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাহি গাহিবার।
শুধু গাহিতেছি আর শুধু কাঁদিতেছি
দীনহীন হৃদয় আমার, শুধু বলিতেছে,
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো।"

'ভগ্নহৃদয়ে'র মধ্যে যে অবরুদ্ধ মনের দ্বন্দ্ব চলছিল, সন্ধ্যাসংগীতে যেন তারই রূপান্তর ঘটল।

বিলাত থেকে কিছু না করে ফিরে আসায় সকলেই তাঁর প্রতি নিরাশা পোষণ করেন। কবির মনও ব্যর্থতার গ্লানিতে পূর্ণ। 'আশা'কে তাই তাঁর 'নৈরাশ্য' বলেই মনে হয়।—

"ওরে আশা, কেন তোর হেন দীনবেশ!
নিরাশারই মত যেন বিষণ্ণ বদন কেন —
যেন অতি সংগোপনে
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস প্রবেশ।"

—'আশার নৈরাশ্য'

কবির মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে জগতে বাস করেন,

এই যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ?
…ওই-যে সমুখে সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহবিন্দু?
ওই-যে আকাশে শোভে চন্দ্র সূর্য গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ?

—'অনুগ্রহ'

এইভাবে নিরাশা, দুঃখ ও অভিমান তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই ফুটে উঠেছে।

এই কাব্যের কবিতাগুলিতে যে বিষাদ দেখা যায়, তা প্রধানতঃ কবির মনের অবরুদ্ধ ভাবের থেকেই এসেছে। তাঁর মনে ভাব এসেছে, কিন্তু তাকে ঠিক কী ভাবে প্রকাশ করতে হবে কবি যেন ভেবে পাচ্ছেন না। নিজের হৃদয়ের জটিল, অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন 'নিষ্ক্রমণে'র পথ।

এই কারণেই মোহিতচন্দ্র সেন তাঁর কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) সন্ধ্যাসংগীতের এই পর্যায়ের কবিতাগুলির নামকরণ করেন 'হৃদয়-অরণ্য'— যার মর্মকথা 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে, কাঁদিছে আপন মনে'। প্রভাতসংগীতের 'পুনর্মিলন' কবিতায় এই হৃদয়-অরণ্যের কথা কবি বলেছিলেন। তার থেকেই বোধহয় মোহিতচন্দ্র ঐ শব্দটি গ্রহণ করেন।

গ্রন্থটির অন্তর্গত 'দুর্দিন' নামক কবিতাটির বর্ণনা দেখে মনে হয়, ওতে 'লণ্ডনের চিত্রকথা'[৭৯] অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া 'বিষ ও সুধা' দীর্ঘ গাথা জাতীয় কাব্য।[৮০] এই কবিতাটি শৈশবসংগীত-পর্বের রচনা। তাই সন্ধ্যাসংগীতের সুরের সঙ্গে ঠিক মেলে না। এছাড়া অধিকাংশ কবিতাই 'হৃদয় অরণ্য' পর্যায়েরই অন্তর্গত।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কবি এই বিষাদপূর্ণ মনোভাবকেই চরম বলে স্বীকার করে নিলেন না। বারেবারে কবি তাঁর সৃষ্টিকে ভেঙেছেন, আবার ধরেছেন নূতন পথ। তাই ঐ বিষাদের মোহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য আকুলভাবে বলেছেন—

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

—'হলাহল'

যে-কোনো ভাবে বা অবস্থাতেই কবি বেশিদিন একভাবে থাকতে পারেন না। আর সন্ধ্যাসংগীতের অস্বাভাবিক জীবনধারা থেকে বাইরে আসার জন্য তীব্র আকুতি প্রকাশ পাওয়া আরও স্বাভাবিক ও সংগত। কারণ, নৈরাশ্য কবির জীবনের সহচর হতে পারে না। তাই—

"চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্তহিল্লোলময়,
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়।"

—পূর্ববৎ

শেষপর্যন্ত তিনি এই ভারাক্রান্ত হৃদয়কে বিদায় দিতে ব্যস্ত হয়ে বলেন—

"দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।"

—পূর্ববৎ

প্রভাতসংগীতের সুর ধ্বনিত হবার পূর্বে এ যেন তাঁর 'প্রথম কাকলি'। এরই টানে একদিন হৃদয়-অরণ্য থেকে বহির্জগতে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন।

৭৯ দ্রষ্টব্য: র-জী, পৃ ৯৩-৯৪, ১১৭
৮০ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড), পৃ ৩৮-৩৯

৩

রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত অক্ষয় চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই গ্রন্থ থেকেই তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশের সূচনা বলে বর্ণনা করেছেন, সে-কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। তবে বলা বাহুল্য, এই কাব্যে তিনি অনুকরণ-মুক্ত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের চিত্তের বন্ধনটি তখনও কাটাতে পারেন নি। তাই 'স্বকীয় রূপ' দেখে খুশি হলেও তার তুলনা তিনি করেছেন 'আমের বোল' বা 'শ্যামলরঙে' ভরা 'কচিআমের গুটি'র সঙ্গেই— যার দাম খুবই কম। কিন্তু তবুও কবি তাঁর 'কাব্যলেখার ইতিহাসে' এই কবিতাগুচ্ছের বিশেষ গুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন এই কারণেই যে, "সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।"—

—জী-স্মৃ, 'সন্ধ্যাসংগীত'

এই খুশির আনন্দ শুধু সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই নয়, তার শিল্পরূপ সৃষ্টির জন্যও। কারণ, এই কবিতাগুলি সেদিন যে 'ছন্দের সাজ' পরে আবির্ভূত হয়েছিল, 'সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না' (সূচনা, সন্ধ্যাসংগীত)। বলা বাহুল্য এই শিল্পরূপ সৃষ্টিতেও ভাবেরই মত পাকাহাতের স্পর্শ সেদিন লাগে নি। কিন্তু একে অবলম্বন করেই তাঁর যে যাত্রা, তার চরম সার্থকতা পেলেন 'বলাকা'তে (১৯১৬)। এইসব মিলিয়ে পরবর্তী জীবনে তিনি কবিতাগুলিকে তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করলেও তার প্রেরণাটিকে তিনি তাচ্ছিল্য করতে পারেন নি। অনুকরণ-নিরপেক্ষ স্বকীয়ভাবের প্রথম প্রকাশ বলে এই কাব্যের প্রতি তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

সন্ধ্যাসংগীত যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট আলোকে আলোকিত তার অন্যতম সমঝদার ছিলেন 'সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন। তাঁর সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

> "তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম।…তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।…এই সুযোগটি যদি

না পাইতাম তবে সেই বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।”

—জী স্মৃ, 'প্রিয়বাবু'

একদিকে 'প্রিয়বাবু'র ব্যক্তিগত প্রেরণা ও অপরদিকে এই যে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটল তাতেই হৃদয়-অরণ্যের জাল থেকে তাঁর চিত্ত মুক্তি পেল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর এই সাহচর্যই গভীর ও ব্যাপক হয়ে কবির হৃদয়কে মুক্তি দিল প্রভাতসংগীতের যুগে এবং তারই ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হল।

প্রভাতসংগীত (১৮৮৩ মে ১১)

সন্ধ্যাসংগীতের শেষ পর্যায় থেকেই প্রভাতসংগীতের পালায় মুক্তি পাবার জন্য কবির মন কি ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। শিল্পরূপের দিক্ থেকে অবশ্য সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু ভাবের দিক্ থেকে ঘটল অনেকখানি পরিবর্তন। প্রভাতসংগীতের যে কাব্যরূপ তা কবি বিশ্লেষণ করেছেন গ্রন্থটির সূচনাতেই—

> “প্রভাতসংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার কথা আজও আমার মনে আছে। তার পূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।”

কিন্তু 'কাঁচা বয়সে' মনের ভাবগুলি নূতন রূপ ধরতে চাইলেও তার যথার্থ শিল্পক্ষেত্র তখনও তৈরি হয়নি। তাই “ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি, স্নতরাং কাব্যের পদবীতে পৌছতে পারে নি।” তাই সর্বদিক বিচার করেই 'কড়ি ও কোমল' ও তার পর থেকে কবি তাঁর যথার্থ সাহিত্য-শিল্পের সীমা নির্দেশ করেছেন।

কিন্তু তবু সন্ধ্যাসংগীত থেকে কবি নিজেকে যে ভাবে নূতন করে পেলেন তার ভাবমূর্তিটির মূল্যও কিছু কম নয়। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে প্রধানতঃ তা-ই বিচার্য। প্রভাতসংগীতেও তাই যে 'ফসল' ফলল তার বিচার করেই কবির মননের ক্রমপরিণতিটির মূল্য নির্ণয় করতে হবে।

এ বিষয়ে প্রথমেই এই গ্রন্থরচনার ইতিহাসটি জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তার আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া গেল।—

"একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপর সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।...আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি।... এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময়, সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত।... এমনসময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।"

—জী-স্মৃ, 'প্রভাতসংগীত'

সেই সারাজীবনে অবিস্মৃত 'অভিজ্ঞতা' হল সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার নূতন অভিজ্ঞতা। সেদিনই কবি অনুভব করলেন—

"একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।"

—পূর্ববৎ

এইসময় থেকেই 'বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতা'কে তিনি যেন 'সমস্ত চৈতন্য' দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন। এইজন্যই লিখলেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

—'প্রভাত-উৎসব'

এরমধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের মূল সুর। প্রকৃতপক্ষে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত উৎসব প্রভৃতি কবিতা কবির জীবনের নূতন উৎস উন্মুক্ত করল। তাই কবি বোধহয় লিখেছিলেন—

"একটি অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"

—জী-স্মৃ, পাণ্ডুলিপি

এই যে জগতের সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে কবির মনে এক 'অভূতপূর্ব' অনুভূতি এল, পরবর্তী কালে তাকেই তিনি বলেছেন 'মানুষের ধর্ম।' পৃথিবীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ, মানুষই বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। তাই সেদিনকার অনুভূতি মানুষকে আশ্রয় করে সার্থক হয়েছিল। বহু বৎসর পরে 'মানবসত্য' (১৩৪০) নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে 'প্রভাতসংগীতে'র কয়েকটি কবিতাকে কেন্দ্র করে মানুষের ধর্মেরই ব্যাখ্যা করেন। শেষ বয়সে রচিত 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থেও এর বিশদ ব্যাখ্যা আছে। এ প্রসঙ্গে পূর্বে (প্রথম অধ্যায়-১) আলোচনা করা হয়েছে বলে এ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ করলাম না।

কবি সেদিন নূতন চোখে সূর্যোদয়ের যে নূতন রূপ দেখেছিলেন, তাতেই অনুভব করেন জগতের জ্যোতির্ময় রূপটিই সত্য। তারমধ্যে দিয়েই তিনি গায়ত্রীমন্ত্রের নূতন অর্থ পেয়েছিলেন এবং পরিণত জীবনে তাকেই তিনি 'সবিতৃবাদ'রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সূর্যদেবই তাঁর জীবনের অধিদেবতা এবং তাঁর জীবনেও সমস্ত কিছুর মূলে ছিল সেদিনের সূর্যোদয়। এরমধ্যে দিয়েই তিনি পেয়েছিলেন দিব্যদৃষ্টি। প্রভাতসংগীতের এই দৃষ্টিই পরবর্তী ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল থেকে শুরু করে জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত কখনও ক্ষীণ কখনও বা স্পষ্টরূপে অব্যাহত থেকেছে।

২

এই নূতন দৃষ্টি নিয়েই কবি একের পর এক কবিতা লিখতে লাগলেন। প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলি লেখা শুরু হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হলেন। এখানে তিনি লিখলেন এই গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'প্রতিধ্বনি'। এই প্রতিধ্বনি কবিতাটিতে একটি গভীরতর সুর ধ্বনিত হল। তার কথা সকলের কাছে স্পষ্টরূপ নিল না। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন—

"সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সবচেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষায় ও ভাবের অপরিণতি

পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা ··আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫

এই 'অস্ফুট উক্তিতে,' 'ঝাপসা' ভাষায় লেখা একটি কবিতা হল প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, তাঁর যে সব দুরূহ কবিতা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ হয়, প্রতিধ্বনি তার মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর অর্থটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

"আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছি প্রতিধ্বনি।···একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।"

—জী-স্মৃ, 'প্রভাতসংগীত'

তাই কবি বলেন—

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।

এর অর্থ এই যে—

"বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ

করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে।"

—সূচনা, 'প্রভাতসংগীত'

ঐ প্রসঙ্গেই কবি 'অনন্ত জীবন' ও 'অনন্ত মরণ' কবিতা দুটিতে তাঁর উপলব্ধি কি ছিল সে কথাও বলেছেন। "বিশ্বে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউএর মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা" এই ভাবনাটাই কবির 'মনকে খুব দোলা দিয়েছিল' 'অনন্ত জীবন' কবিতা রচনাকালে। কিন্তু "মৃত্যু তাহলে কী।"

"তার উত্তর এসেছিল এই যে. জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি, আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাই এর কাজ চলছে—গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান।"

—পূর্ববৎ

দৃষ্টান্ত দিলেই কবির বক্তব্য পরিষ্কার হবে—

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।
যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বল প্রাণ?
সে তো শুধু পলক, নিমেষ।

—'অনন্ত মরণ'

কবি বলেছেন—এই সব চিন্তা তাঁর "মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।"

"কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয় নি, তখনও পাই নি ভাষাভারতীর প্রসাদ। তাই বলে রাখছি, প্রভাত-সংগীতে এ-সমস্ত লেখার আর-কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো-আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।"

—সূচনা, 'প্রভাতসংগীত'

'মহাস্বপ্ন' কবিতাটিতে বিশ্বজগৎ যে অনন্ত নিয়মের অধীন হয়ে যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাকে কবি মহাকালের মহাস্বপ্ন বলেছেন।—

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন

এই অনন্ত বিশ্বচক্র যেন—

উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপনসংগীত।

এই মহাকালরূপ মহাদেবই এই বিশ্বে একমাত্র 'পুরাতন'—আর সবই নিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু এমন দিন কি আসবে, যেদিন এই মহাকালের নিদ্রাভঙ্গ হবে, 'জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিম্ববৎ?'

মহাদেব সম্বন্ধে কবির বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নানা জায়গায় দেওয়া হয়েছে।[৮১] এখানেও দেখি, কবির আর এক নতুন চিন্তা। প্রভাতসংগীতে কবির বিশ্ববোধ একেক স্থানে গভীর দর্শন-চিন্তায় পরিণত হতে দেখি। 'মহাস্বপ্ন', 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়', 'স্রোত' প্রভৃতি কবিতাগুলি তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাই প্রভাতসংগীতের কবির হৃদয়-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলে একদিকে তিনি যেমন পেলেন তাঁর অন্তরের ধর্মবোধের যথার্থ পরিচয়, অপরদিকে নিজেকে তিনি বৃহত্তর জগতের মধ্যে বিলীন করে চাইলেন সার্থকতা।—

তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে—
…জগৎ স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।"

—'স্রোত'

'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিরূপ এবং তাঁদের কর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—'মহাশূন্যে' ধ্যানরত ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে বেদগান ধ্বনিত হয়ে উঠল। জন্ম নিল আনন্দ, প্রেমময় জগৎ, 'ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে' যার ব্যাপ্তি। তা:পর বিষ্ণুর শঙ্খনাদে ধরা দিল প্রাণের উল্লাস, ছন্দিত হল সৌন্দর্য।—

বিষ্ণু আসি মহাকাশে লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
একমনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ-যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।

৮১ দ্রষ্টব্য: 'শৈশব সংগীত' গ্রন্থের (৩য় অধ্যায়) ও 'আলোচনা' গ্রন্থের (৭ম অধ্যায়) আলোচনা।

তারপর যখন— ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ—
তখন— মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু
কাননে ফুটিল ফুলরাশি—
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ চারি ভিতে,
চাহে তাঁর চরণছায়ায়
যৌবনকুসুম ফুটাইতে।
…সৌন্দর্যকুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।

এইভাবে কেটে গেল যুগযুগান্তর। কিন্তু এক নিয়মচক্রে জগৎ যেন 'শিথিল' হয়ে এল—

কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্তদেহে কাঁদে রবি
জগৎ হইল শান্তিহীন।

সকলেই আহ্বান করলেন মহারুদ্র মহাদেবকে—

গাও দেব মরণ সংগীত
পাব মোরা নূতন জীবন।

তারপরেই মহাদেবের জাগরণ, শুরু হল প্রলয় নাচন। শুরু হল—

ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহতারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল
ভেঙে গেল, টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।

সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে শেষপর্যন্ত—

মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

জগতের এই অনন্ত বিধি, অলজ্ঘ্য নিয়মকে কবি তাঁর আপন চিন্তা ভাব ও ছন্দের মাধুরীতে, দিয়েছেন নূতন ও অপূর্ব রূপ।[৮২]

৮২ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য: 'বাংলাকাব্যে শিব' (১৯৬১), পৃ ১৭৭-৭৮

'প্রভাতসংগীতে'র আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'পুনর্মিলন'। কবিতাটিতে তিনি বাল্যকাল থেকে শুরু করে প্রভাতসংগীত পর্যন্ত তাঁর স্বল্প কবিজীবনের একটি সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করেছেন। শিশুকালে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরের একটি নিবিড় যোগ ছিল। তারপরে সন্ধ্যাসংগীতে সেই যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে কবি অন্তরের অবরুদ্ধতার মধ্যে বন্দী হলেন। অবশেষে, প্রভাতসংগীতে বহির্বিশ্বকে আবার পেলেন নূতন করে। প্রভাতসংগীতের এই পাওয়া শুধু পাওয়াই নয়—

"বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায়, তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম, তখন তাহাকে বেশি পাওয়া গেল।"

—জী-স্মৃ, 'প্রভাতসংগীত'

এই স্তরগুলির ক্রমবিকাশের ধারাটি কবিতা উদ্ধৃত করে পরিস্ফুট করা যাক্।—

সেই, সেই ছেলেবেলা
আনন্দে করেছি খেলা
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তারপরে কী যে হল —কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে।
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা
তারি মাঝে হনু পথহারা।
… আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

"এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।"

—পূর্ববৎ

এই কারণেই মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে প্রভাতসংগীতের সুরটির নামকরণ হয়েছিল 'নিষ্ক্রমণ'। কারণ, তারমধ্যে 'হৃদয়ারণ্য' থেকে বহির্বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের ভাব যত সুন্দর ও মহান্ই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই কোনো ভাবকে স্থায়ী করে ধরে রাখতে চান নি। তাই শেষপর্যন্ত প্রভাতসংগীতের আনন্দময় ভাবলোক থেকেও মুক্তি পাবার আকুতি শোনা গেল। এবার আর দীর্ঘপথে যাত্রার উদ্যম নয়, এবার—

মনেতে সাধ যে দিকে চাই কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু, কথাটি নাহি কব।

—'চেয়ে থাকা'

এবার কবি এই গ্রন্থ 'সমাপন' করলেন এই বলে—

আজ আমি কথা কহিব না
আর আমি গান গাহিব না।

নিজের হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বহির্বিশ্বের দিকে তাকালেন, তখন পৃথিবীর বিচিত্র ছবি তাঁকে মুগ্ধ করল। তাঁর কাব্যে নূতন রূপ ও সুরের রস উৎসারিত হয়ে উঠল। কবি সৃষ্টি করলেন 'ছবি ও গান' কাব্য।

ছবি ও গান (১৮৮৪ ফেব্রুআরি)

প্রভাতসংগীতের পালা শেষ হবার পূর্বেই 'ছবি ও গানে'র পালা শুরু হল। কারোয়ারে বাসের পর্বে (১৮৮৩ মার্চ-জুন) তাঁর এই গ্রন্থের কবিতা রচনা শুরু হয়। কারোয়ারবাসের পর্ব সারা হলে কবি ও পরিবারস্থ সকলে কলকাতায় ফিরে সার্কুলার রোডে একটি বাগানবাড়িতে বাস করতে লাগলেন। এই বাড়ির দক্ষিণে মস্ত বড় একটা বসতি ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেকসময়েই দোতলার জানালার কাছে বসে এই লোকালয়ের দৃশ্য দেখতেন। সেই দৃশ্যই তাঁর মনের পর্দা আর এক স্তর সরিয়ে দিল। ছবি ও গানে পূর্ণ এই জগৎকে তিনি দেখলেন নূতনতর দৃষ্টিতে।—

"তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।...এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ

রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত।।···সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা।"

—জী স্মৃ, 'ছবি ও গান'

ছবি ও গানের কবিতাগুলির ধর্ম কি এবং তার মূল্য কতখানি তা কবির কথাতেই বলা যাক্।—

"নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো-একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গানে ফুটিয়াছে।···সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না।"

—পূর্ববৎ

প্রকৃতপক্ষে, ছবি ও গানের অধিকাংশ কবিতাতেই কবি বাইরে যা দেখেছেন, তাকে কথায় ধরে একটা চিত্র রচনার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় বলা যায় ছবি ও গান "কবির নবজাগ্রত চৈতন্যের প্রথম চিত্রলিপি।"[৮৩] জীবন সায়াহ্নে কবি এই কবিতাগুলির বিচার করে এর ভাল-মন্দ দু'দিক্ সম্বন্ধেই বলেছেন—

"ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো।···মোটের উপর অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়।"

—সূচনা, 'ছবি ও গান'

এই কারণে ভাষায় ও ছন্দেও এসেছিল একটা 'এলোমেলো' ভাব। সর্বত্রই তখন 'সহজ হবার' চেষ্টা দেখা দিয়েছে।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে 'নিশীথজগৎ', 'নিশীথচেতনা' প্রভৃতি তিনটি কবিতা বেশ কিছুকাল পূর্বে লেখা—এ কথা কবি বলেছেন। অন্যান্যগুলি গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে এক বৎসরের মধ্যে লেখা। মধ্যাহ্নে, নিশীথজগৎ, নিশীথচেতনা কবিতা তিনটিতে দিন ও রাত্রির ছবি গভীর আবেগভরে লিখেছেন। তাঁর কল্পনা দিবসের ব্যাপ্তিতে ও রাত্রির গভীরতার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়েছে।

৮৩ নীহাররঞ্জন রায়: রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, প্রথম খণ্ড (১৩৫১), পৃ ১২৬

২

'পূর্ণিমায়' ও 'যোগী' কবিতাদ্বয়ে কারোয়ারের দুটি স্মৃতি রয়েছে। কারোয়ারের সমুদ্র-তীরবর্তী পর্বতশ্রেণীকে তিনি বলেছেন 'যোগী'। একদিকে চন্দ্রের অস্ত যাওয়া অপরদিকে সূর্যোদয়, দেখে মনে হচ্ছে—

শিবের জটার 'পরে যথা সুরধুনী ঝরে
তারাচূর্ণ রজতের স্রোতে,
তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজুটে
পূরব-আকাশ-সীমা হতে।

অপরদিকে 'পূর্ণিমায়' কবিতায় কবি জ্যোৎস্নার আবেশে যেন 'অচেতন' হয়ে বলেছেন—

গান নাই, কথা নাই,
শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ—
কোথা কিছু নাহি জাগে
সর্বাঙ্গে জোছনা লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।

জীবনস্মৃতিতে (কারোয়ার) কবি এই কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, কোনো সদ্য-আগত আবেগ বা ভাবে লেখা ভাল হয় না। "স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভাল।" পূর্ণিমার শোভা দেখে তখনই লেখা কবিতাটি তাই কাব্যের মানদণ্ডে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। "সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া" মোহিতচন্দ্র সেন সম্ভবতঃ কবিতাটিকে তাঁর কাব্যগ্রন্থে স্থান দেন নি।

আসলে যে ছবি স্মৃতির-তুলিতে, কল্পনার রঙে আঁকা হয়, সে ছবির মর্যাদা হয় উচ্চপর্যায়ের। প্রসঙ্গক্রমে কবি Wordsworth-এর 'ড্যাফোডিল' বা রবীন্দ্রনাথের 'গগনে গরজে মেঘ' (সোনারতরী) কবিতার উল্লেখ করা যায়। Wordsworth বলেছেন—

I wander'd lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills
when all at once I saw a crowd,
A host of golden daffodils.

… For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of Solitude ;
And then my heart with pleasure fills
And dances with the daffodils.

আবার রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুন মাসে (১২৯৮) লেখা কবিতায় যখন বর্ষার ঘনঘটার ছবি এঁকেছেন তখনও তা হয়েছে অপূর্ব। তবে সগু দেখা ছবি যে সবসময় সুন্দর হয় না, তারও ব্যতিক্রম ৩০ চৈত্র (১৩০৫) তারিখের বিরাট্ ঝড়ঝঞ্ঝার চিত্রে পূর্ণ 'বর্ষশেষ' কবিতাটি। কিন্তু 'পূর্ণিমায়' কবিতাটিকে কবি সে মর্যাদা দিতে চান নি। বরঞ্চ, বলা যায় জীবনস্মৃতিতে কবি সেই পূর্ণিমা রাত্রির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কাব্যবিচারে বেশি উৎকৃষ্ট হয়েছে। কারণ ঐ চিত্র তিনি এঁকেছেন বহু বছর পরে তাঁর 'স্মরণের তুলি'তে।

'আর্তস্বর' কবিতাটিতে শ্রাবণের ঝড় ও বর্ষার যে চিত্র এঁকেছেন তাকে ঐ বর্ষশেষ কবিতারই পূর্বাভাস বলা যায়। ঝড়ের কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর আছে এবং ঐ বর্ণনা অঙ্কনে কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'আর্তস্বর' কবিতাকে তারই অগ্রদূত বলা যেতে পারে।—

জলন্ত বিদ্যুৎ-অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
অন্ধকারে করিছে দংশন।
কুম্ভকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বার বার
উঠিতেছে করিয়া গর্জন।

—এই ধরণের কল্পনা ও উপমা-প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের হাতেই সম্ভব। 'পোড়ো বাড়ি' কবিতাটিতে একটি পোড়ো বাড়ি দেখে কবির মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে— এই বাড়িতে কত আনন্দ, কত প্রেমাভিনয় হয়েছে। কিন্তু আজ সকলেরই অবসান হয়েছে। এই কবিতার কল্পনায় পরবর্তী 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকে যেন স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, 'আর্তস্বর,' 'পোড়ো বাড়ি,' 'নিশীথচেতনা' 'নিশীথজগৎ,' 'পূর্ণিমায়' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে ছবি ও গানের মূল স্বর ঠিক ফোটে নি। ছবি ও গানে বহির্বিষয়ী চিত্রের যে বৈশিষ্ট্য, তদপেক্ষা এই কবিতাগুলিতে কবির আন্তরিক দৃষ্টিই বেশি প্রকট। এইরকমই আর-একটি কবিতা 'রাহুর প্রেম'।

রাহু যেমন চন্দ্রসূর্যকে গ্রাস করেও আয়ত্ত করতে পারে না, নিরন্তর তার পিছন পিছন ঘুরে বেড়ায় সেইরকমই বুভুক্ষিত প্রেম তার প্রণয়িনীকে গ্রাস করে একেবারে আত্মসাৎ করতে চায়। নিষ্ফল প্রেমের নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে মানুষ আকুল হয়েছে, তার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে ভালবাসা তাকে সর্বত্র অনুসরণ করেছে—"অভিশাপের ন্যায়, রাহুর ন্যায়, উপচ্ছায়ার ন্যায়"[৮৪], তার থেকে মুক্তি পাবার সকল পথ বন্ধ। কারণ সেই প্রেম বলে—

"কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর।"

প্রেমের এ রকম নির্দয় বর্ণনা রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ধর্মই হল বন্ধনমুক্তি।

'ছবি ও গানে'র যে ধর্ম, চোখের সামনে যা ঘটছে আপন মনে তাকে দেখে ছবি আঁকা, তা পরিস্ফুট হয়েছে 'সুখস্বপ্ন,' 'একাকিনী,' 'খেলা,' 'ঘুম,' 'আদরিনী', 'অভিমানিনী' প্রভৃতি কবিতায়। শিল্পরূপের দিক্ থেকেও এতে আছে কবির সহজ মনের প্রকাশ। আসলে জগতের নানা বস্তু ও বিষয়কে দেখার নূতন দৃষ্টি কবি এইসময় লাভ করেছেন। "চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে" দেখতে পাবার ইচ্ছা তখন তাঁর প্রবল। তার মূলে ছিল এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র এঁকে তোলার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ভাবে ও ভাষায় মিলন তখন ঘটে নি। তাই বলেছেন—

> "তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু, কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত।"

—জী-স্মৃ, 'ছবি ও গান'

কিন্তু তবু সেই ছড়ানো-রঙে আঁকা এলোমেলো ছবিগুলির মধ্যে ছিল অদ্ভুত এক মাদকতা, যার প্রতি কবির মায়া ছিল বহুদিন। এ কাব্য নিয়ে তিনি অনেকের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। এইরকমই এক পত্রালোচনায় তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন—

৮৪ র-জী, পৃ ১৭৭-৭৮ এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রবিরশ্মি' (পূর্বভাগে, চতুর্থ সং), পৃ ১৪৭

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম।...আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল।...একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তারমধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিলনা। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।...সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোনো পুরোণো লেখায় হয় না।"

—চিঠিপত্র ৫ (২১ মে ১৮৯০)

কবির ছবি ও গানের যুগের এই মনোভাবটি যেন প্রতিফলিত হয়েছে 'পাগল' কবিতাটিতে।—

"আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে—
গান কেউ শোনে কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে—
তারে কেউ দেখে কেউ দেখে না।
সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মতো উড়ছে বাতাসেতে,
আপনারে আপনি সে জানে না,
তবু আপনাতে আপনি আছে মেতে।"

কিন্তু সেই 'বাতায়নবাসী' কবি ভাবের ঘোরে 'পাগল' হয়ে যা দেখলেন, যা বললেন, তাতে হয়তো ছিল না সংসারের অভিজ্ঞতা, ছিল না কোনো গভীরতা, তবু তা তাঁকে স্বকীয় ভাবনার আলোকেই নিয়ে চলেছিল বহির্বিশ্বের দিকে। সন্ধ্যাসংগীতের অবরুদ্ধতা থেকে নিষ্ক্রান্ত কবি প্রভাতসংগীতে পদার্পণ করলেন। আর তাকেই আরও নিবিড় করে পেলেন ছবি ও গানে। তারপর ভাব ও শিল্প ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করতে লাগল। এরপরেই জন্ম কড়ি ও কোমলের। " 'ছবি ও গান' 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকা করে দিলে।"—(সূচনা)

কড়ি ও কোমল (১৮৮৬ নভেম্বর ১৭)

'ছবি ও গানে'র আলোচনায় দেখেছি ঐ কাব্য রবীন্দ্রনাথের 'বয়ঃসন্ধি কালে'র রচনা। তখন থেকেই তাঁর মন শুধু 'গান' গেয়েই তৃপ্ত থাকে নি, 'ছবি' আঁকতেও প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু হাতের তুলি তখনও বলিষ্ঠ রেখা দিতে অভ্যস্ত হয় নি; তাই কোনো ছবিই সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারে নি। কিন্তু তবু ছবি ও গানের প্রবণতাই তাঁকে পরবর্তী কাব্যরচনার পথ সুগম করে দিল।

এরপরে কড়ি ও কোমলে কবির 'আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ' যেন আত্ম-'প্রমত্ততায়' পরিণত হল। এই 'বেআইনী প্রমত্ততা' সেদিন তাঁর মনে, গানে, বেশেভূষায় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই কবি স্বয়ং এই কাব্যটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এটি তাঁর 'নবযৌবনের রচনা'। এই কারণেই মোহিতচন্দ্র সেনও বোধহয় তাঁর কাব্যগ্রন্থে এই পর্যায়ের কবিতাগুলির নামকরণ করেন 'যৌবনস্বপ্ন'। এই আত্মসচেতনতার বশবর্তী হয়ে তিনি সেদিন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল এমন কি দ্বিজেন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের প্রভাবকেই সম্পূর্ণ অতিক্রম করেছিলেন। আপন-মনের অবাধ গতিতে তিনি লিখে চললেন অবিরাম ও অজস্রভাবের কবিতা। তাঁর এই স্বাধীন যাত্রায় সেদিন তিনি বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ তাঁর 'মিঠে ও কড়া' বইএর মাধ্যমে। 'রাহু' রূপে গ্রাস করে তিনি 'রবি'কে নিস্তেজ করতে চেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। 'কড়ি' অর্থাৎ কঠিন ও সংহত চিন্তা। এই গ্রন্থের বহু কবিতাই গভীর-সংহত ভাব থেকে উদ্ভূত। অপরদিকে, 'কোমল' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত হাল্কা ভাবের কবিতাও এই কাব্যে কিছু কম নয়। তবে কাব্যটির প্রথম সংস্করণেই লঘু ও হাল্কা ভাবের এবং সাময়িকভাবে লেখা ক্ষণিক মূল্যের কবিতা ছিল অনেক। কিন্তু ঐ ক্ষণিক-মর্যাদার কবিতাগুলি পরবর্তী সংস্করণেই বর্জিত হয়। অবশ্য যার কিছু-না-কিছু স্থায়ী মূল্য আছে সেইসব কোমল সুরের কবিতাগুলি বর্জিত হয় নি। তাই ঐ কাব্য আজও 'কড়ি' ও 'কোমল'। তবে 'কড়ি' সুরের কবিতাই বেশি, যার সার্থকতা শুধু 'মধুর খেলা'তেই নয়, 'বজ্রের বাঁশি'তেও। আলোচ্য নিবন্ধে প্রচলিত সংস্করণের কবিতাগুলি অবলম্বনেই আলোচনা করা গেল। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ প্রথম সংস্করণের ঐ হাল্কা ভাবের কবিতাগুলিকেই প্রধানতঃ ব্যঙ্গ করেছিলেন।[৮৫]

৮৫ তবে বৈষ্ণবভাবাত্মক 'মথুরায়' কবিতাটিকেও তিনি তাচ্ছিল্যভরে বিদ্রূপ করেন।

যাই হোক, 'রবি' তো রাহুর অধিকৃত হয়ে থাকার নয়। তাই 'যৌবনের তেজে' তিনি সবই অগ্রাহ্য করেন। কবির অন্যতম বন্ধু ও উৎসাহদাতা প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা 'পত্র' কবিতাটিতে তিনি সেই কথাই বলেছেন—

"সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
··· দুনিয়ার এ মজলিসেতে এসেছিলেম গান শুনতে;
আপন মনে গুনগুনিয়ে রাগ-রাগিনীর জাল বুনতে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি,
বিদ্‌ঘেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে।"

তিনি সকলকিছু অগ্রাহ্য করে যা লিখলেন তা একান্তই আন্তরিক ও নূতন। এই অভিনব ভাব ও চিন্তার যথার্থ স্বরূপ কি তা কবি স্বয়ং বিশ্লেষণ করে বলেন—

"আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা···শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ; ··· আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ। সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে,··· আর, এই শরৎকালের

রবীন্দ্রনাথের মত তথাকথিত অপারগ কবির মনে বৈষ্ণবচিন্তা তাঁর কাছে উপহাসযোগ্যই মনে হয়েছিল। প্রেম-বিষয়ক সনেটগুলিরও গূঢ়ার্থ অনুধাবন না করতে পেরে তিনি তীব্র নিন্দা করেন। এ ছাড়া, শব্দের বানানে 'ঙ' বর্ণটির ব্যবহার সে যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্তন করেন বলে অনেকে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাতে বিশ্বাসী ছিলেন। কালীপ্রসন্নও এই নিয়ে "ঙ" বন্দনা নামক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে বলেন—

"ক" বর্গে পঞ্চম বর্ণ
"ঙ" রে আমার।
··· উন্নত সাহসী কবি
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
এতদিনে করিলেন
তোমার উদ্ধার।"

কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ঙ'র ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ও মধুসূদনের কাব্যে (ব্রজাঙ্গনা) দেখা গিয়েছিল।

মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মানুষের।··· আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই ; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার।"

—জী-স্মৃ, 'বর্ষা ও শরৎ'

তাই 'কড়ি ও কোমল' 'মানুষের জীবননিকেতনের' 'সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান'। 'বিশ্বজীবনের' দরবারে আসন পাবার জন্য 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' এই সংগীত নিয়ে তিনি তাঁর 'ক্ষুদ্র জীবনের' আবেদন জানিয়েছেন।

কবির এই কবিতাসমষ্টির সবচেয়ে বড় রসগ্রাহী ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। তিনি এই কবিতাগুলির যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সমগ্র কবিতাবলীর বিচার করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, "মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে" এবং—

"জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই কবিতাগুলির মূলকথা।··· 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'— এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।"

—জী-স্মৃ, 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী'

বাল্যকালে যে দৃঢ়শাসনের মধ্যে কবি থাকতেন, তার থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বজীবনের সাহচর্য লাভের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষের সঙ্গলাভই কবির জীবনের অন্যতম মূল প্রেরণা। কারণ, "যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা-ঘরের প্রাণটা কাঁদে।"

—জী-স্মৃ, 'কড়ি ও কোমল'

প্রকৃতপক্ষে, 'মানবের মাঝে' বাঁচবার এবং 'জীবন্তহৃদয়মাঝে' স্থান পাবার আকাঙ্ক্ষা কড়ি ও কোমলের মূল কথা। আর, তাকে কেন্দ্র করেই জীবন, মৃত্যু, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন কবিতায়। এছাড়া তাঁর স্বাদেশিকতাও দীপ্ত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। 'বিদেশীফুলের গুচ্ছ' অংশে তিনি বহু বিদেশী কবির কবিতার অনুবাদ করেছেন নিজের প্রতিভার আলোকে। এই কারণেই 'ফরাসি-কাব্যসাহিত্যের রসে' বিলাস

আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কোনো কোনো কবিতায় "ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন।"— (জী-স্ম. আশুতোষ চৌধুরী)

'প্রাণ' কবিতাটিতে 'বিরহ মিলন' 'হাসি অশ্রুময়' 'সুখে দুঃখে' পূর্ণ মানব-সংসারে প্রবেশের জন্য, একটি স্থান পাবার জন্য কবির হৃদয় উদ্বেল হয়েছে। 'কাঙালিনী' কবিতাটিতেও কবির নিজেরই মনের প্রতিচ্ছবি যেন ফুটে উঠেছে—

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
·· বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।

—"এ তো আমার নিজেরই কথা।···আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী।"

—জী-স্ম. 'কড়ি ও কোমল'

২

এই মানুষকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, প্রধানতঃ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে প্রেম, মোহময়, ব্যক্তিগত প্রেম নয়। এ সেই প্রেম, যা 'গোপনে' 'ঘরে' 'রয়না', বিশ্বময় 'আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।' এ প্রেম বিশ্বমানবের প্রেম। এই প্রেমভাবের কবিতা লিখলেন অনেকগুলি।

কোনো কোনো কবিতায় হয়তো মনে হবে, কবি তাঁর 'যৌবনস্বপ্নে' আত্মহারা হয়ে নারীকে চেয়েছেন একান্ত অন্তরঙ্গ করে। কিন্তু সে-ও মোহের অন্ধতা নয়। তাছাড়া সেই নিবিড়-করে চাওয়াও আসলে কবির 'স্বপ্ন' মাত্রই, প্রেমের সঙ্গে সেই মিলন হয়েছে ক্ষণিকের তরে। নারীর বিকশিত যৌবনকে তিনি তার মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু সেই সৌন্দর্যেও আছে দুইরূপ— প্রেয়সী ও

মাতা।[৮৬] এই পর্যায়ে তিনি নারীর সৌন্দর্যকে নানা রূপে ও রসে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও তা কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে নি। 'বিবসনা'র 'শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ'কে তিনি 'লাজহীনা পবিত্রতা' বলেই আখ্যাত করেছেন। তাঁর এই অনুভূতি আরও গভীর ও রূপময় হয়েছে 'চিত্রা' কাব্যে। যে 'উর্বশী' 'ভুবনমোহিনী' তাঁকে তিনি বলেছেন—

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার —
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

—'উর্বশী' ১৩০২

আবার স্নানসিক্ত সুন্দরী রমণীর অপূর্ব নগ্ন দেহশোভা দেখে মদনদেব 'সহাস্য কটাক্ষ করি' অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন করার জন্য —

অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

কিন্তু তারপর যখন সুন্দরী এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন তখন মদন ভুলে গেলেন তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা। তখন—

"মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি' পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

—'বিজয়িনী' ১৩০২

৮৬ স্তন (১), স্তন ২

এখানেই নগ্ন, বিবসন সৌন্দর্যের জয় ও মহত্তর প্রেমের প্রতিষ্ঠা। এই প্রেমসম্ভোগের সম্পূর্ণ কথাটি বলেছেন 'দেহের মিলনে'—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন[৮৭]

এই দেহগত প্রেম সার্থক হয়েছে 'পূর্ণ মিলনে'—

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিতসূর্যালোকে লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে॥

এখান থেকেই কবির দৈহিক প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমের দিকে উত্তীর্ণ হতে চাইছে। তাই এই ক্ষুদ্র মানবপ্রেমে,— যে প্রেম মোহের বন্ধনে আচ্ছন্ন তাতে কবির এসেছে 'শ্রান্তি'। বলেছেন—

সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয়;
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।

এ প্রেম যে কবির জীবনের আদর্শগত নয়। তাই যৌবনের তেজে তিনি সে পথে পা বাড়ালেও, অল্পকালের মধ্যেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য আকুল হয়েছেন—"এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়।"—(মোহ)। তাই বলেছেন—

দাও খুলে দাও, সখী ওই বাহুপাশ —
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
··· স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধনা আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

—'বন্দী'

তাই বলতে পারি, প্রভাতসংগীতে যেমন শুধু 'নির্ঝরের' স্বপ্নই নয় তার 'স্বপ্নভঙ্গে'র কাহিনী কবির প্রধান উপজীব্য, তেমনি কড়ি ও কোমলও শুধু

৮৭ তুলনীয়: পদরত্নাবলী ৮৭ (জ্ঞানদাস); দ্রষ্টব্য: র-জী, পৃ ২৩৮

'যৌবনস্বপ্নে'র আবেশেই জড়িত নয়, তাতে যৌবনের 'স্বপ্নভঙ্গে'র কাহিনীও আছে।

কবি চান সেই 'পবিত্রপ্রেম', যে প্রেম 'জীবন'কেও করবে পবিত্র। প্রসঙ্গতঃ বলব, প্রেমের এই আদর্শ কবি বোধহয় লাভ করেছিলেন তাঁর জীবনপথের অন্যতম সঙ্গিনী কাদম্বরীদেবীর কাছ থেকে। তাই জীবনের প্রভাতকাল থেকেই তাঁকে তিনি করেছিলেন 'জীবনের ধ্রুবতারা'। আর, তাঁর কাছে যে আদর্শ পেয়েছিলেন, জীবনসমুদ্রে পদার্পণ করেও 'পথহারা' হবেন না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের আলোচনায় দেখেছি, প্রেমের এই আদর্শ সেখান থেকেই প্রথম ক্ষীণরূপ ধরে উঠতে চেয়েছে। তাই বোধহয় তিনি সেই আদর্শরূপিনী 'জীবনের ধ্রুবতারা'র প্রতি কাব্যটি উৎসর্গ করেন। 'কড়ি ও কোমলে' সেই আদর্শই হয়ে উঠেছে আরও স্পষ্ট। 'পবিত্র প্রেম' কবিতায় যেন সেই উৎসর্গীকৃত কবিতাটিরই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে এবং সেই প্রেমাদর্শকেই তিনি স্পষ্টরূপ দিলেন 'পবিত্র জীবন' কবিতায়।—

"মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।
··· নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।"

ওই 'ক্ষুধা', 'বাসনা'-ময় প্রেম তো 'মরীচিকা'—

"এস, ছেড়ে এস, সখী, কুসুম শয়ন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।"

কবির এ বিষয়ে চূড়ান্ত বাসনা— "চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমধর্মের এই যথার্থরূপ। এই রূপই পরবর্তী 'মানসী'তে হয়েছে আরও স্পষ্ট। সেখানেও তিনি এই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছেন—

"কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছো মোরে
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে— প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।"

—'সংশয়ের আবেগ'

ওই আদর্শকেই তিনি তত্ত্বাকারে বলেছেন 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়—

"ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার"
এবং, "ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।"

—প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগুলিতে। 'বলাকা' কাব্যেও তাঁর এই বাণী কোনো কোনো ক্ষেত্রে ('এ কথা জানিতে তুমি') ধ্বনিত হয়েছে। আর, প্রেম যে 'খেলা নয়', 'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নয়' এই আদর্শ ও তত্ত্ব একেবারে পরিষ্কার করে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলিত উক্তিতে বলেছেন প্রেমের কাব্য 'মহুয়া'র 'নির্ভয়' কবিতায় (১৩৩৫)।—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে ;
··· উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
··· দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
··· এ-বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—
তুমি আছ, আমি আছি।"

৩

কিন্তু শুধু মিলন বা প্রেমই নয়, আরও একটি ভাবের প্রবর্তনা এই কাব্যে প্রথম দেখা গেল। তা হল—

"জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার

কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

—কড়ি ও কোমল, 'কবির মন্তব্য'

মৃত্যু নিয়ে কবি সমস্ত জীবন নানা চিন্তা করেছেন এবং বলেছেন যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে জীবনই সত্য, মৃত্যু ক্ষণিক। জীবন আছে বলেই মৃত্যু আছে। তাই মৃত্যুর মধ্যে কোনো ভয় নেই।[৮৮] মনে রাখতে হবে, এই সময়ে মৃত্যুকে নূতন করে ও নিবিড় করে উপলব্ধি করার অন্যতম কারণ, কিছুদিন পূর্বেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু (১২৯১ বৈশাখ)। তাই মৃত্যু ও শোকের অনুভূতি 'কড়ি ও কোমলে' নূতন রূপ পেয়েছে।

"কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথি কে আছে?
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে;
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।"

—'গান-রচনা'

অথবা, আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ, নহে, এ নহে, নয় গো।"
··· আমি যদি গাঁথি গান অথির পরান
সে গান শুনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার।

—'আকাঙ্ক্ষা'

—এইসব অংশগুলিতে মনে হয়, পরলোকগত বৌঠানের উদ্দেশ্যে তাঁর মনে জেগেছে হাহাকার। কিন্তু বেদনার মধ্যে 'রুদ্ধ' হয়ে চিরকাল শোক করা কবির ধর্ম নয়। তাই তিনি 'পুরাতন'কে বিদায় দিয়ে 'নূতন'কে আহ্বান জানান।—

৮৮ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়—'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধের আলোচনা। এরই চরম পরিণতি 'ফাল্গুনী' (১৯১৫-১৬) নাটকে।

এই যে রে মরুস্থল, দাবদগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল 'পুরাতন',
একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
… নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে, নূতন, আয় সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ তোর হাসি গান।

—'নূতন'

আপাতঃদৃষ্টিতে এটি নূতনের আহ্বান-সংগীত। কিন্তু নূতন মানেই তো জীবন। জীবনকে নিত্যনূতনরূপে দেখাই কবির বাসনা। এই দর্শনবোধ থেকেই তিনি বলেন 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' 'পাষাণী মা' কবিতাটিও এই মৃত্যুদর্শনের আলোকেই লেখা বলে মনে হয়।

৪

এই কাব্যে কবির স্বদেশচেতনাও বেশ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাল্যকাল থেকেই স্বদেশপ্রেমের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন এবং তখন থেকেই স্বদেশী সংগীত ও কবিতা লিখেছেন। সেগুলি ছিল প্রধানতঃ ভারতবর্ষের প্রতি বন্দনাগান এবং অনুভূতি, উত্তেজনা ও কল্পনাপ্রসূত। এদিক্ থেকে তাকে 'কপিবুক' যুগের স্বাদেশিকতা বলা যায়। কিন্তু এই কাব্যে কবি বঙ্গদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বাংলাদেশই নিজের দেশ। তাই আগে বাংলা, পরে ভারতবর্ষ। বাংলার প্রতি এই শ্রদ্ধা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। 'বাংলা'র বন্দনা ঈশ্বরগুপ্তের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর তা অনেক বেশি প্রকট হয়েছে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে। অবশেষে এল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'। পত্রিকার নামকরণের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্যের সেবাতেই বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে এঁদের সাহিত্য পড়েও অভ্যস্ত ছিলেন। তাই একদিকে যেমন হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার প্রেরণায় ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছিল,

অপরদিকে, এঁদের প্রভাবেও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তারই প্রকাশ ঘটল কড়ি ও কোমলে— 'বঙ্গভূমির প্রতি', 'বঙ্গবাসীর প্রতি' ও 'আহ্বানগীত' কবিতায়। এই কবিতাগুলিতে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আকর্ষণের যথার্থ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এমন একসময় ছিল যখন দেশ-বন্দনার নামে কতগুলি কপট আড়ম্বরই প্রধান হয়েছিল, দেশভক্তি হয়ে উঠেছিল 'ছলনা'রই নামান্তর। তারই পটভূমিকায় কবি বলেন যে, 'যশের কাঙালি' হয়ে 'শুধু মিছে কথা ছলনা' করে 'করতালি' পেতে তিনি আসেন নি। তিনি দেখতে পাচ্ছেন—

এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা।

—'বঙ্গবাসীর প্রতি'

এই কবিতার বক্তব্যটিই আরও স্পষ্ট হয়েছে 'মানসী'র 'দেশের উন্নতি' (১৮৮৮) কবিতায়। ঐ কবিতাতেও কবি সেই সব 'বঙ্গবাসীর প্রতি' তাঁর ঘৃণা জানিয়েছেন যাদের স্বভাবই হচ্ছে—

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
দুহাতে দাও তালি।
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি।

কিন্তু কবির 'বেদনা-ভরা প্রাণ' তা মানতে পারে না। তিনি বলেন—

দূর হউক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা-ভরা প্রাণ।

অপরপক্ষে, 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাতেও বলেছেন—

তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি—
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান কর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না—
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে।

কবির এই পঙ্‌ক্তিগুলিই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘ভারতলক্ষ্মী’ (১৩০৩) কবিতায়।—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষস্তন্যবাহিনী।

তবে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ প্রযুক্ত কথাগুলি এখানে তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের প্রতি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের প্রতি কবির যে মনোভাব এই গ্রন্থে জাগ্রত হয়েছে, তা-ই পূর্ণ বিকশিত হয়েছে ‘মানসী’, ‘কল্পনা’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। কড়ি ও কোমলের এইজাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘আহ্বানগীত’।

লজ্জা, ভয়, সংশয় সমস্ত ত্যাগ করে সমবেতভাবে বিশ্বের দুয়ারে এসে দাঁড়াবার জন্য তিনি ‘বঙ্গবাসীর প্রতি’ আহ্বান জানিয়েছেন—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙালী কই।

—‘আহ্বানগীত’

যে ‘বঙ্গভূমি’ আমাদের সর্বগৌরবের আদর্শস্থল তাকে কি বাঙালী তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেবে না? তাই কবি তাঁর নিজের প্রতি নিবেদন জানিয়েছেন—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ,
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।

… বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।

—পূর্ববৎ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয় কর্মচঞ্চল জীবনের যে ঢেউ ভারতীয় জীবনের উপর আঘাত হেনেছিল, তা বাঙালার মনেও 'কোন্ ভাবী আশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিল'[৮৯] তার পরিচয় আছে কবিতাটির মধ্যে। তাই কবি আবারও বলেন—

মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবেব কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই,
বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙা বাজে—
শুনিতে পেয়েছি ভাই।

'বালক' পত্রিকায় এই কবিতাটির একই সঙ্গে প্রকাশিত (১২৯২ পৌষ) একটি গদ্যরচনাতেও কবি অনুরূপ কথাই বলেন—

"আজ বঙ্গভুমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে।…বিপুল মানবশক্তি বাংলাসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে… ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমার মনে নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে, বাঙালীর একটা কাজ আছেই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।…আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।"

৮৯ দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন: 'বাংলার জাগরণ', বাংলার ইতিহাস সাধনা (১ম সং), পৃ ১৫

বাংলা দেশের উন্নতি, বাংলার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে চিরকালই রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য ছিল। তারই প্রকাশ রয়েছে এইসব রচনায় প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙালীর' 'বাহুবল'কে জাগ্রত করার জন্য যে প্রেরণা দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেই আদর্শেই বাঙালীকে জাগাতে চাইলেন। বলাবাহুল্য, এর অল্পকাল পরেই বাংলার 'মরা গাঙে' জীবনের সেই প্রবল 'বাণ' এসেছিল।

-

মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের মূল সুর ছাড়াও 'কড়ি ও কোমলে' কিছু কিছু অন্যান্য সুরও ধ্বনিত হয়েছে। ভানুসিংহের পদাবলীর যুগ উত্তীর্ণ হয়ে কবি নূতন করে বৈষ্ণবসুরের গান গেয়েছেন কয়েকটি কবিতায়। 'মথুরায়' কবিতাতে সেই সুর সবচেয়ে স্পষ্ট।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
··· একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশী মনোসাধে
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী তায়।
··· হৃদয়ে বিরহ জ্বালা এ নিশি পোহায় হায়।
কবি যে আকুল হল, এ কি রে বিধির ভুল।

এ আকুতি বৈষ্ণবপদের রাধিকার আকুতি নয়; বৈষ্ণবীয় চিন্তায় কবির আকুতি। 'দেহের মিলন' কবিতায় দেহের মধ্যে দিয়ে দেহাতীতের জন্য যে ব্যাকুলতা, তা যেন বৈষ্ণব কবিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিও এ কথা বলেছেন—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

কিন্তু, তিনি তো এমন করে বলতে পারেন নি—

হৃদয় লুকান আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।

'বাঁশি' কবিতাতেও 'বাঁশির তানে', 'যমুনারি কলতানে', 'বনফুলের মালার গন্ধে' কবির মনে যেন একটা আকুলতা জেগে ওঠে। 'গান', 'ভুল', 'গীতোচ্ছাস' 'বিরহ', 'বিলাপ' প্রভৃতি কবিতাতেও কবি এক-একটি বৈষ্ণবীয় পটভূমিকা সৃষ্টি

করেছেন মনে হয়। এই পর্বে বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর কাছে আরও নূতন ও গভীরতর দ্যোতনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' (১২৯২ বৈশাখ) সংকলনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে পদাবলীর ভাব, রস ও ছন্দ নূতন করে তাঁর মনে আবেদন জাগাল। তারই কিছু ভাবগত ও শিল্পগত প্রকাশ ঘটেছে 'কড়ি ও কোমলে'। পদাবলীর ছন্দ বাংলায় তার যথার্থ মর্যাদা নিয়ে দেখা দিয়েছে কড়ি ও কোমলের 'বিরহ' কবিতা থেকে। আর তা-ই অজস্ররূপে সার্থক হয়েছে 'মানসী'র পর্বে। তাই কড়ি ও কোমলে বৈষ্ণবভাবের কবিতা লেখা খুব আকস্মিক বা আশ্চর্যজনক নয়।

৬

এই পর্যায়ে আর এক শ্রেণীর কবিতাও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। সেগুলি শিশুবিষয়ক ছড়া। পরিণতের দৃষ্টিতে দেখা শিশুর মন, শিশুর ছবিগুলি নিপুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'হাসিরাশি', 'আকুল আহ্বান', 'মা লক্ষ্মী', 'পুরানো বট', 'কাঙালিনী', 'সাতভাই চম্পা', 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'খেলা', 'পাখীর পালক' প্রভৃতি কবিতায়। পরে এর অনেকগুলিই স্থান পেয়েছে 'শিশু' গ্রন্থে।

'আশীর্বাদ' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে একটা প্রার্থনার ভাব। তাই দেখি এই কাব্যে প্রেম-সংগীত, নারী-সৌন্দর্য, শিশু, স্বদেশ, দেবতা এবং সর্বোপরি মানবহৃদয়ের প্রতি আকজ্ক্ষা—কবিজীবনের এই সবগুলি ভাব রূপে-রসে-গানে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রজীবনের প্রধান সুরগুলি যেন একই সঙ্গে সংহত হয়ে প্রকাশিত ও সংকলিত হয়েছে এই কাব্যটির মধ্যে। এরই সঙ্গে বিদেশী কবিতার অনুবাদ ও সনেট রচনার আদর্শ স্থাপন করে বহির্বিশ্বের আবহাওয়াটিকে বাংলাসাহিত্যে আমন্ত্রণ জানালেন। চিত্তের অসংখ্য আবেগ ও আকুতি অসংখ্যভাবেই প্রকাশিত হল 'কড়ি ও কোমলে'। কিন্তু তবুও যেন কবির 'শেষ কথা'টি বলা হল না—

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
··· সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

—'শেষ কথা'

কিন্তু কবির জীবনে 'শেষ কথা' কি আছে? 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?' কবি যদিও বলেছেন—

সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন-তরে,

কিন্তু এক ভাবপর্যায়ের সীমা শেষ হতে হতেই কবির নূতন পর্যায় শুরু হয়।

"রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই অশেষকে শেষ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টার ইতিহাস। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে, নানা বিচিত্র অনুভবের ভিতর দিয়া তিনি অসীমের, অরূপের, অশেষের বিচিত্র রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যতই তিনি বলিয়াছেন, যত চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন, শেষ কিছুতেই আর হয় নাই, হইবার নয়।"[৯০]

তাই কড়ি ও কোমলের ঘাটে এসে শুরু হয়েছে কবির নূতন ভাবপর্যায় অথবা পুরাতনকে নূতন দৃষ্টিতে দেখা; তাকে নূতন শিল্পরূপে সাজাবার প্রচেষ্টা। সেখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। এরপূর্বে—

"কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।"

—জী-স্মৃ, 'কড়ি ও কোমল'

আর তারও পরে কবি আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা পুরোপুরি লাভ করলেন 'মানসী'তে। ভাষায়, ভাবে, ছন্দে তা হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ শিল্পময়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি সেই পর্যন্তই তাঁর আত্মবিশ্লেষণের সীমা নির্দেশ করেছেন। কারণ হিসাবে বলেছেন—

"আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি ন

৯০ দ্রষ্টব্য—নীহাররঞ্জন রায়: রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পৃ ১০৬

দেখানো যায় তবে আর-যাহাকিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে।”

—পূর্ববৎ

কবি যেখানে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন, যেখানে আর আত্মরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনীয়তা দেখেন নি, সেখানে তিনি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত। এখানেই বাষ্পময় জলীয় তরলতা থেকে ক্রমশঃ তিনি ডাঙ্গার উপরে জেগে উঠেছেন। আধো আলো আধো অন্ধকারের বন্ধন থেকে যেখানে কবি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন, বর্তমান নিবন্ধেও সেই সীমাতেই সমাপ্তির রেখা টানা গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্যসাহিত্য

(১) কালানুক্রমে নাট্যগ্রন্থগুলির পরিচয়

রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষও কিছু কম নয়। তবে তাঁর এই গৌরব প্রধানতঃ নির্ভর করছে তাঁর পরিণত নাট্যরচনার উপরে। তাঁর প্রথম যুগের নাটকগুলিতে সাধারণতঃ সে যুগের গীতিকাব্যসুলভ মনোবৃত্তি তথা আখ্যানকাব্য রচনার প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতিকবি। স্বভাবতঃই তাঁর রচনায় তাঁর আত্ম-সচেতনতা প্রকাশ পাবে। তাই রবীন্দ্রনাথের নাটককে বিচার করতে হবে তাঁরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে।

প্রথম যুগের কাহিনীকাব্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিথিলবদ্ধ মানবপ্রেমের কাহিনী; তাতে গভীর ভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ নেই। এই যুগের নাটক-গুলিতেও তারই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই নাটকগুলির "মূল কথা প্রীতি, হৃদয়কে এখানে সকলের উপর স্থান দেওয়া"[১] হয়েছে। তবুও রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ-ধারার সূত্রপাত এখান থেকেই হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নাট্যজীবনের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই যুগেই। রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, নলিনী, প্রকৃতির প্রতিশোধ সবই এই পর্যায়ের নাটক। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, এই গীতিনাট্যগুলি প্রধানতঃ কাব্যজীবনে সন্ধ্যাসংগীত রচনার প্রায় সমকালে রচিত। সন্ধ্যাসংগীত থেকে রবীন্দ্রকাব্য যেমন ক্ষীণভাবে আত্মপ্রসার লাভ করেছে, তেমনি নাটকগুলিতেও ভবিষ্যৎ 'পূর্ণতর' নাট্যরচনার পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। এখানেই প্রথম যুগের নাটকগুলির বিচার-বিশ্লেষণের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যরচনার পটভূমিকাটি কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে (প্রথম অধ্যায়-২)। নবযুগের বাংলাসাহিত্যের নাট্যীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নাটক লেখা, নাট্যগোষ্ঠী গঠন ও রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে অভিনয়ের প্রবণতা শুরু হয়। সেই

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬১), পৃ ২৪-২৫

আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের মানসচক্ষু ক্রমশঃ উন্মীলিত হচ্ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসন ও 'মানময়ী' নাটকে অভিনয় করে তাঁর নাট্যাভিনয়ের হাতেখড়ি হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেন—

> "বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।"
>
> —জী-স্মৃ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'

বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১ ফেব্রুআরি ১২)

'নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে' কবির প্রথম আবির্ভাব বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষে[২] নিজের লেখা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটক নিয়ে। শুধু অভিনেতারূপে নয়, নাট্যকাররূপেও সাধারণ এই প্রথম তাঁকে জানলেন। এরপূর্বে তাঁর নাট্যপ্রতিভা প্রধানতঃ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সমাগম সভার জন্য নাটক রচনা করতে গিয়ে কবি দস্যু রত্নাকরের কবিত্বলাভের কাহিনীকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করলেন। এর মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' থেকে। ঐ কাব্যের "ক্রৌঞ্চরুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়"— এই চিত্রখানি অবলম্বন করেই তিনি ক্রৌঞ্চবধের কাহিনীটি লিখলেন। বালিকার বেশে সরস্বতীর আবির্ভাব ও তিরোধান রবীন্দ্রনাথের নিজের কল্পনা হলেও বিহারীলালের প্রভাবমুক্তও নয়। নাটকের শেষে সরস্বতী বাল্মীকির হাতে বীণা সমর্পণ করছেন এই দৃশ্যটি ম্যুরের 'আইরিশ মেলোডিজ্' কাব্যগ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে অঙ্কিত চিত্রটি স্মৃতি থেকে কল্পনা করে নিয়েছেন। কবি বলেছেন, "ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত।"

—জী-স্মৃ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'

এইভাবে গল্পের একটা প্লট্ মনের মধ্যে রূপ নেবার পর তাকে রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিক সাজে সজ্জিত করলেন প্রধানতঃ জ্যোতিদাদার সহায়তায়। 'সরোজিনী' প্রকাশের পর 'রবি'কে 'প্রমোশন' দিয়ে জ্যোতিদাদা নিজেদের দলভুক্ত করে

২ ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন, ১২৮৭

নিয়েছিলেন। আবার প্রয়োজন মতো 'রবি'কে সহায়তা করতেও তাঁর কার্পণ্য ছিল না। স্বভাবতঃ সেই দলে যোগ দিলেন অক্ষয় চৌধুরীও। কবি করতেন ভাষাদান, আর সুরের মাধুর্যে তাকেই অপরূপ করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই পদ্ধতিতে নূতন নূতন সংগীতরচনার সৃষ্টি হয়েছিল কবির আমেদাবাদ যাত্রার পূর্ব থেকেই। তারপর আমেদাবাদ হয়ে বিলাতযাত্রার পর বিভিন্ন বিষয়ের মতোই সংগীত ও সুর সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ বেড়ে গেল অনেক বেশি। বিলাতি সুরে সংগীত-রচনার দৃষ্টান্ত এরপর থেকেই পাওয়া যায়। তারই মধ্যে স্পেন্সরের একটি প্রবন্ধ পড়ে সংগীত ও অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর নবতর ভাবনার উদয় হল।[৩] সংগীত সম্বন্ধে কবির দৃষ্টি হল অনেক বিস্তৃত।—

> "বস্তুতঃ রাগ, দুঃখ আনন্দ-বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।"

—পূর্ববৎ

এই ভাবনা ছিল তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভা রচনার অন্যতম প্রেরণা। এইভাবে স্পেন্সরের প্রবন্ধের প্রভাব, বিলাতি ও দেশি সংগীতের সমন্বিত সাধনা ও জ্যোতিদাদার উৎসাহে বাল্মীকিপ্রতিভার সুরবৈচিত্র্যের জন্ম। "বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।"— (পূর্ববৎ)। অপরদিকে, সারদামঙ্গলের বাণীরূপকে আত্মস্থ করে নিয়ে কবি সৃষ্টি করলেন নূতন ভাবসম্পদ্। 'বাণী ও বীণা'র এই সংযোগ সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

> "এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই।"

—পূর্ববৎ

বলাই বাহুল্য, 'নিষ্ফল' তো হয়ই নি, বরঞ্চ গীতিনাট্যগুলির মধ্যে এটিকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

বাল্মীকিপ্রতিভার মূল ভাব হচ্ছে 'করুণা'। দস্যু রত্নাকর কি ভাবে বরপ্রাপ্ত হয়ে বাল্মীকি কবি হলেন এবং করুণায় তাঁর মন হল সিক্ত, তারই কাহিনী কবির প্রধান উপজীব্য। এ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।—

৩ দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, 'সংগীত' বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

"তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হোলো তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব। যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।"

—বাল্মীকিপ্রতিভা, 'কবির মন্তব্য'

'অভ্যাসের কঠোরতা' ভেদ করে স্বাভাবিক মানবত্বের উন্মেষ ঘটানোই রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব। তাঁর অধিকাংশ নাটকই এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বিহারীলালের ভাবের উপর ভিত্তি করে আসলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসুলভ স্বকীয় ভাবনাই নাটকটিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুরের বিচিত্রতা ও ভাবের স্বকীয়তায় বাল্মীকিপ্রতিভার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়েছে। বাল্মীকি প্রধান চরিত্র হলেও দস্যুদের সংলাপ ও হাস্যপরিহাসমুখর গানগুলি নাটকটির বৈচিত্র্যসাধনে ও উৎকর্ষসৃষ্টিতে বিশেষভাবেই কার্যকরী হয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পরিকল্পনাতেও আছে তাঁর আপন অন্তরেরই স্বতন্ত্র অনুভূতির প্রকাশ।

পরিশেষে, বাল্মীকিপ্রতিভার যথার্থ বিচারটি কি হওয়া উচিত তা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলব।—

"বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে।...ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য-বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

—জী স্মৃ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'

বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনয় দেখতে সেদিন বিদ্বজ্জন সমাগম সভার অতিথিরূপে বাংলার বহু বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন।[৪] তাঁরা সকলেই এই নাটকের রসগ্রহণ করে ও অভিনয় দেখে অতিশয় মুগ্ধ হন। এই অভিনয়ের সফলতা ও সার্থকতা অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়। মনস্বী

৪ দ্রষ্টব্য—পুলিনবিহারী সেন: রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী (১৯৭৩), পৃ ১৬

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে একটি কবিতাও রচনা করেন। তার দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ—

"উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।"

প্রথম নাটকরচনার সাফল্য তথা অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনকে উন্মুক্ত করে দিল। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সের এই সফলতা ও তদানীন্তন মনীষীদের সমবেত প্রশংসা তাঁর সমগ্র নাট্যসাহিত্য রচনার পাথেয় হয়ে রইল।

বাল্মীকিপ্রতিভার গানরচনায় একটি নূতন পন্থা প্রয়োগ করে তথা অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করার উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ **'কালমৃগয়া'** নামে ঐ জাতীয় আর একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। রামায়ণে দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিরাট মঞ্চ বেঁধে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে অভিনীত হয়েছিল (১৮৮২ ডিসেম্বর ২৩)।[৫] অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথ সেজেছিলেন।—

"ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"

—পূর্ববৎ

এই নাটক দুটি আসলে কবির সে যুগের নূতন সংগীতরচনার প্রবল উৎসাহে ও 'উত্তেজনা'য় রচিত হয়েছিল। তাই কবি 'ইংরেজি-বাংলা' 'তাল-বেতাল' কোনোটাই সেদিন গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু তাতে নাট্যরসের কমতি হয় নি, বরঞ্চ সার্থকই হয়েছে।

'কালমৃগয়া'য় বনদেবীদের যে ভূমিকা দেখা যায় তা বাংলাদেশের নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে এর পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এরা যেন নাচে-গানে নাটকের পটভূমিটি রচনা করেছে; নাটকের গতি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে রেখেছে। এদের মধ্যে যেন গ্রীক নাটকের কোরাস এবং লৌকিক যাত্রাগানের বিবেকের একটা সংস্কৃতরূপ দেখা যায়। বাল্মীকিপ্রতিভার প্রচলিত সংস্করণেও বনদেবীর ভূমিকা আছে। প্রথম সংস্করণে ছিল না। কালমৃগয়া যখন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল তখনই বোধহয় বনদেবীদের ভূমিকা সংযোজিত হয়।

৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ১২-১৩

লেখায়, গানে, অভিনয়ে— সর্ববিষয়ে 'সমস্ত শক্তিকে' 'দুর্দাম উৎসাহে দৌড়' করাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় সাথী ছিলেন জ্যোতিদাদা।—

"কোনো বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।"

—পূর্ববৎ

নাট্যসৃষ্টিতে পারিবারিক পটভূমিকা, বিশেষতঃ জ্যোতিদাদার এই সাহস ও উদ্দীপনা তথা কবির নিজের মনের প্রেরণা,—সব মিলিয়ে যে ভিত্তি রচিত হয়েছিল, তাই তাঁর নাটক রচনার অন্যতম অবলম্বন হয়েছিল।

রুদ্রচণ্ড (১৮৮১ জুন ২৫)

রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়িকামূলক গাথাকাব্য রচনার যুগেই রুদ্রচণ্ড নাটিকা রচিত। রচনাকালের দিক্ থেকে ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড সমকালবর্তী। প্রথমবার বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন ও দ্বিতীয়বার যাত্রার যে প্রস্তুতি— সেই কালব্যবধানের মধ্যেই এই গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণ হয় বলে অনুমান করেছেন রবীন্দ্রজীবনীকার।[৬] সুকুমার সেন বলেন, 'নাটিকা' ছাপ থাকলেও, 'রুদ্রচণ্ড' আসলে 'গাথাকাব্য' এবং ভাবের দিক্ থেকে এতে আছে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের 'পূর্বাভাষ'।[৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রাপথে বোলপুরে বসে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে 'বীররসাত্মক' কাব্যটি লিখেছিলেন (১৮৭৩ মার্চ), রুদ্রচণ্ড তারই নাট্যরূপ।[৮] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই নাটকের কাহিনীতে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের আংশিক পরিণতি লক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে নয়। এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন[৯], পৃথ্বীরাজের পরাজয় ছিল বীররসাত্মক কাব্য। কিন্তু রুদ্রচণ্ডের পরিণতি করুণরসের। তাছাড়া, ঐ কাব্যের কেন্দ্রস্থলে সম্ভবতঃ নায়ক ছিলেন পৃথ্বীরাজ স্বয়ং। অপরপক্ষে, এই নাটকে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পটভূমিকাতেই রুদ্রচণ্ডের নাট্যকাহিনী রচিত বটে, কিন্তু সে পরাজয়কে রাখা হয়েছে নেপথ্যে, প্রত্যক্ষ-গোচর করা হয়নি। তাই তিনি বলেন—

"মনে হয় 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের কোনো পার্শ্বকাহিনী নিয়ে ওই

৬ র-জী, ১০৭ আনুষঙ্গিক পা-টী ১

৭ সুকুমার সেন : বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪১, ৪৩

৮ র-জী, পৃ ১০৭-১০৮

৯ 'মালতীপুঁথি-পাণ্ডুলিপি পরিচয়', র-জি, পৃ ১৫৯

নাটিকাটি রচিত হয়েছিল, যেমন পরবর্তী কালে মগধের রাজবিপ্লবের নেপথ্য-ভূমিকার উপরে রচিত হয়েছিল 'নটীর পূজা' নাটিকা। আর ওই পার্শ্ব-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা হল চাঁদকবি ও অমিয়া।"

বরঞ্চ, মালতীপুঁথিতে 'প্রথমসর্গ' নামে যে একটি অসমাপ্ত রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের কাহিনীগত সাদৃশ্য কিছু দেখা যায়। ঐ 'প্রথমসর্গ' হয়তো লুপ্ত পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের একটি অংশ বিশেষ। এই অংশটির নায়ক এক কবি, তিনি ভালবাসতেন এক বালিকাকে। আর রুদ্রচণ্ডেও আছে চাঁদকবি ও অমিয়ার প্রীতির কথা। অর্থাৎ কাহিনীগত ও ভাবগত সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে অনেকখানি রয়েছে। এছাড়া ভাষা ও মিলের দিক্ থেকেও এই 'প্রথম সর্গ' ও রুদ্রচণ্ডকে সমগোত্রীয় বলা যায়। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'ও সম্ভবতঃ তৎকালীন মহাকাব্যের আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছিল।[১০] প্রথমসর্গ ও রুদ্রচণ্ডেও ওই ছন্দই অনুসৃত হয়েছে। সব মিলিয়ে পৃথীরাজের পরাজয় কাব্য, মালতীপুঁথির 'প্রথম সর্গ' ও রুদ্রচণ্ডের মধ্যে ভাব, ভাষা ও ছন্দের যে সাদৃশ্য দেখা যায় তা আকস্মিক নয়। পৃথ্বীরাজের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত 'হিন্দুমেলায় উপহার' ও 'দিল্লী-দরবার' নামক হিন্দুমেলায় পঠিত দুটি কবিতাতেই আছে। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য বীররস ও স্বদেশবোধের উত্তেজনার প্রতি তাঁর মন ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। তাই বীররসাত্মক পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম সর্গ) করতে গিয়েও তার থেকে তিনি বিরত হন। তাঁর মন ক্রমশঃ মানবহৃদয় ও করুণরসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই প্রথম সর্গ ও রুদ্রচণ্ডের মূল স্বর হয়েছে করুণরসাত্মক।

এই করুণরসের মধ্যে দিয়েই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার অবশ্য বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক রচনার প্রয়াস হিসাবেই রুদ্রচণ্ড নাটিকার যা-কিছু মূল্য। কিন্তু তার সাহিত্যিক মূল নিতান্তই সামান্য। আসলে নাটকটিতে নাটকের আঙ্গিকগত দুর্বলতা কিছু কিছু রয়ে গেছে। তৎকালীন কাব্যগুলির ভাষাগত প্রবণতা নাটকটিতে মাঝে মাঝেই দেখা যায়। অপরদিকে, তখনও রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় ভাষা পুরোপুরি জন্ম নেয় নি। কাজেই তাতে ভাষার 'ধ্বনি' বা 'রস' কোনোটিই সার্থক ভাবে প্রকাশ পেতে পারে নি। বস্তুতঃ, রুদ্রচণ্ডকে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-পরিকল্পনার 'সর্বপ্রথম উন্মেষ' ধরে নিয়েই এর ভালমন্দ যা-কিছু বিচার করা উচিত। আঙ্গিকের দিক্ থেকে তা স্বভাবতঃই 'অপরিণত' ও 'অসম্পূর্ণ'।

১০ প্রবোধচন্দ্র সেন : 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', শশিভূষণ স্মারকগ্রন্থ, পৃ ১১৩

কিন্তু ভাবের দিক্ থেকে নাটকটি তাঁর পরিণত চিন্তধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য।

রুদ্রচণ্ড ছিলেন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মত প্রতিহিংসা-পরায়ণ। প্রথম দিকে, তাঁর চরিত্রে স্নেহ, মায়া, মমতা কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণ করার জন্যই যেন তাঁর চরিত্রটি এ রকম হয়েছিল। আসলে তাঁর অন্তরে রুদ্ধ হয়ে ছিল স্নেহের ফল্গুধারা। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তি যেন অর্থহীন হয়ে গেল এবং তখনই তাঁর স্নেহ, করুণাময় মনটি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল। নিজের মর্মের কথাটি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে কন্যাকে তিনি বলেছেন—

> 'আয় মা অমিয়া মোর কাছে আয় বাছা।
> এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে
> আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।'—(১২শ দৃশ্য)

'এই অনমনীয় চিত্ত, উন্নতশির, বিশালপ্রাণ বীরের পরিণতি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।'[১১] প্রকৃতপক্ষে রুদ্রচণ্ডের অন্তরের স্নেহই এতদিন সত্যরূপে গুপ্ত হয়ে ছিল; প্রতিহিংসাবৃত্তি ছিল কৃত্রিম। তাই পরিশেষে কৃত্রিমতার বাধা ভগ্ন করে আত্মপ্রকাশ করল সত্যের স্নিগ্ধ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকেই লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত পাশবিক বৃত্তির উপর স্নেহপ্রীতিময় মানবিকতাকেই জয়ী করেছেন, তাকেই দিয়েছেন প্রতিষ্ঠা। বিসর্জন, মালিনী, নটীর পূজা প্রভৃতি কোনোটিই তার ব্যতিক্রম নয়। এটি রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি প্রধানতম সুর। রুদ্রচণ্ডে সেই সুরেরই প্রথম স্পর্শ পাওয়া গেল। অমিয়ার চরিত্রেও আগাগোড়া আছে গীতিরসময় প্রেমের পরিচয়। ভাবগত উৎকর্ষের দিক্ থেকে রুদ্রচণ্ডের মূল্য সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচারে কিছু কম নয়। তবে নাটকীয় উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সুপরিণত হতে পারে নি। প্রথম পরীক্ষা হিসাবে সেই দুর্বলতা আসা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, কবির বয়সের স্বল্পতাও ছিল এই অপরিণতির একটি কারণ। রুদ্রচণ্ডের সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ ও সাংবাদিক বলেন—

> "বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধহয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র

১১ অজিত কুমার ঘোষ: বাংলা নাটকের কথা (১৩৬৮), পৃ ৩১৮

কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে।···কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ।"[১২]

এই 'জ্যোতির নূতন আভা' তাঁর ভাবগত উৎকর্ষের আভা। পরবর্তী কালে এই ভাব যখন নাটকীয় আঙ্গিকের সার্থকতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে তখন তাঁর নাটক হয়েছে সফল ও শ্রেষ্ঠ। বাল্মীকিপ্রতিভা-কালমৃগয়া ও রুদ্রচণ্ডের পরে কবির সম্পূর্ণ নিজের ভঙ্গিতে লেখা নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪ এপ্রিল ২৯)

'ছবি ও গানে'র মতই রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি রচনা করেন তাঁর কারোয়ার বাসের পর্বে। ভাবের দিক্ থেকেও তাতে লেগেছে ছবি ও গানের স্পর্শ। প্রকৃতির প্রতিশোধের গুহাবাসী সন্ন্যাসী আসলে কবির নিজের মনেরই প্রতিরূপ। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীতের যুগে 'বদ্ধঘরে' 'নিঃসঙ্গ নির্জনতা'র মধ্যে তিনি কবিতা লিখেছেন। ঐ কাব্যগুলিতে তাঁর নিজের মনের ভাবনাই যেন "মনের প্রাচীবের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।"[১৩] তারপরে "গুহাচরের মন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে"। কবি রচনা করলেন 'ছবি ও গান'। কিন্তু সেই ভাবনা শুধুই ভাবুকতার অস্পষ্টতা বা তুলির অপরিণত রেখায় সীমাবদ্ধ থাকতে চাইল না। তাকে একটা শিল্পরূপ দেবার জন্যও তাঁর মনে আগ্রহ দেখা দিল। "এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকিপ্রতিভায়" (সূচনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ)। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের প্রাধান্য থাকলেও তার প্রকৃতি ছিল 'নাট্যীয়।' এর কিছুদিন পরে লিখলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। এই নাটকটির আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 'সূচনা'য় কবি বলেছেন—

> "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে।···এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে।"

১২ কালীপ্রসন্ন ঘোষ: বান্ধব, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ১২৮৮; দ্রষ্টব্য—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্র-বিতান (১৩৬৮)

১৩ সূচনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ

ভাবের দিক্ থেকে প্রকৃতির প্রতিশোধের মূল কথা হল, এক সন্ন্যাসী জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির উপরে জয়ী হতে চেয়েছিলেন। অবশেষে, একটি বালিকা তাঁকে স্নেহপাশে বদ্ধ করে পুনরায় সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে আনল। তখন সন্ন্যাসী দেখলেন, "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"

—জী-স্মৃ, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

পূর্বেই বলেছি, সন্ন্যাসীর জীবনের এই পরিবর্তনের মধ্যে কবি যেন নিজের জীবনকেই প্রতিফলিত করেছেন। তাই বলেছেন—

"প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

...কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

—পূর্ববৎ

এই 'পালা'টি যে তাঁর সাহিত্যসাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ তা 'আলোচনা' গ্রন্থের 'ডুবদেওয়া' প্রবন্ধটির আলোচনা প্রসঙ্গে (পরবর্তী সপ্তম অধ্যায়ে) দীর্ঘতর রূপে বলা হয়েছে। তাঁর জীবনে এই সত্যটি বারেবারে আত্মপ্রকাশ করেছে নানা রূপে, রসে, গানে, কাব্যে, প্রবন্ধে।

এই নাটকে 'অনির্বচনীয়' রসসমাগমের জন্য যে কয়টি গান সন্নিবেশিত করেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'হাদে গো নন্দরাণী।' "এই গানটি একটি ছবি। যার রস নাট্যরস।" সকালবেলা নির্মল আলোয় রাখালবালকেরা মাঠে যাচ্ছে, তার মধ্যেই তারা শ্যামকে পেতে চায়, কোনো আড়ম্বরের মধ্যে নয়। তাই "নন্দরাণীর কাছে এসেছে আব্দার করতে।" সাধারণের মধ্যে দিয়েই অসাধারণকে পাবার এই যে বাসনা, তা প্রকৃতির প্রতিশোধের মূল সুরেরই অনুকূল। এরমধ্যে দিয়ে কবি এই কথাটিই বলতে চান—

"শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম

প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়"।

—প্রকৃতির প্রতিশোধ, সূচনা

২

এই নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবটির দ্বন্দ্বে পড়ে যে চরিত্রটি আবর্তিত হয়েছে, তিনি সন্ন্যাসী। সংসারের সমস্ত স্নেহ, মায়া, বন্ধন ছিন্ন করে তিনি প্রকৃতির উপরে জয়ী হয়ে একান্তভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী।—

বসে বসে চন্দ্রসূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
·· যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।— (১ম দৃশ্য)

সন্ন্যাসী বহু বর্ষ অন্ধকার গুহায় কাটিয়েছেন। তাই অন্ধকার গুহাই তাঁর কাছে সত্য। তাই বলেন—

অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।— (২য় দৃশ্য)।

যাঁর কাছে অন্ধকারই সত্য, বহু বৎসর পরে গুহা ত্যাগ করে লোকালয়ে প্রবেশ করে তাই তাঁর মনে হয়—

আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।— (২য় দৃশ্য)

তিনি প্রকৃতির প্রেমময়, আনন্দময়, সৌন্দর্যময় অস্তিত্বটি বিলুপ্ত করে সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির উদ্দেশ্যে তাই তিনি বলেছিলেন—

তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে
এই দেখ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল;— (১ম দৃশ্য)

কিন্তু সন্ন্যাসী ভাবতে পারেন নি, তাঁর এই কঠিন সংকল্পের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রকৃতি দেবী একটি স্নেহের অঙ্কুর বপন করেছেন। অকস্মাৎ তাঁর আশ্রয়ে এসে পড়ল একটি লাঞ্ছিত, অনাথা বালিকা। বালিকা তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করল। তখনই সন্ন্যাসীর অন্তরে এল এক অভূতপূর্ব পুলক। কিন্তু তিনি জোর করে তার মায়া কাটাবার চেষ্টা করলেন। এখানে সন্ন্যাসী তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ হয়েছেন.। কিন্তু বালিকাকে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "তুমি না ত্যজিলে মোরে আমি ত্যজিব না।"— (৩য় দৃশ্য) এর মধ্যে দিয়েই কিন্তু সন্ন্যাসী নিজের অজ্ঞাতসারে স্নেহের বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়লেন। এরপূর্বে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তেও দেখেছি, বাল্মীকিকে ছলনা করার জন্য সরস্বতী স্বয়ং বালিকা সেজে এসেছিলেন। এখানেও যেন প্রকৃতিদেবী বালিকার মূর্তি ধরে সন্ন্যাসীর অন্তর জয় করতে চাইলেন। শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসী বালিকার স্নেহের সেতুপথে 'জগৎসত্য' উপলব্ধি করেছেন, অনুভব করেছেন তার প্রেম ও সৌন্দর্য। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন, ওই নাটকে 'অভ্যাসের কঠোরতার' সঙ্গে 'স্বাভাবিক মানবত্বের' দ্বন্দ্ব ঘটেছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ কথাই বলেন—

"সন্ন্যাসীর মধ্যে যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল।"

—বাল্মীকিপ্রতিভা, 'কবির মন্তব্য'

তাই সন্ন্যাসী বলেছেন—

সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী।— (৯ম দৃশ্য)

'সোনারতরী'র যথার্থ অর্থটি এখান থেকেই কবি উপলব্ধি করলেন। সন্ন্যাসী তখন আরও বুঝেছেন—

ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে তো দেখিতে পাবো স্বরূপ ইহার।— (১০ম দৃশ্য)

তখনই তো বোঝা যাবে—

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।— (১০ম দৃশ্য)

এইভাবে সন্ন্যাসীর মোহভঙ্গ হল। কিন্তু তার জন্য আরও কঠিন আঘাতের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাত এল বালিকার মৃত্যুর রূপ নিয়ে। প্রকৃতিকে অবহেলা করার এই হল চরম প্রতিশোধ। গুহার মুখে গিয়ে তিনি দেখেন

বালিকা ধূলায় পতিত, "হিম দেহ। না পড়ে নিঃশ্বাস।" তখনই সন্ন্যাসী চিৎকার করে ওঠেন—

নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
··· বাছা, বাছা, কোথা গেলি! কী করিলি রে—
হায়, হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!—(১৬শ দৃশ্য)

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা না হলে, সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবনোপলব্ধি পূর্ণ হতো না। জগতের প্রেমের আনন্দ তিনি বুঝেছিলেন, এবার প্রেমের দুঃখও বুঝলেন। সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গের জন্য এই দুইএরই প্রয়োজন ছিল।

সমালোচকেরা বলে থাকেন[১৪] সন্ন্যাসীর চরিত্র একান্তভাবে ভাবপ্রধান হওয়ার ফলে নাটকীয় ক্রমবিকাশটি ঠিকমত ফোটে নি। সন্ন্যাসীর উক্তিগুলিতে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হলেও বৈচিত্র্যের অভাবে একঘেয়ে হয়ে গেছে। তবুও বলব, নাটকীয় আদর্শ তথা কবির পরিকল্পনা অনুসারে চরিত্রটি অবাস্তব বা অস্বাভাবিক হয় নি। বরঞ্চ, প্রথমযুগের পরীক্ষা হিসেবে এটি যথেষ্ট সফলই হয়েছে। এই চরিত্রই যেন পরবর্তী 'বিসর্জনে' (১৮৯০) রঘুপতির ভূমিকায় পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে।

৩

রঘু-দুহিতা বালিকার ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ। সন্ন্যাসীর সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করার জন্যই এই চরিত্রটির অবতারণা। তার চরিত্রে কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, এমন কি, বাস্তবতারও অভাব রয়েছে। সে যেন সংসার-প্রকৃতির প্রতীকমাত্র। তাই নাট্যীয়গুণও তার মধ্যে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তী বিসর্জন নাটকে অপর্ণা চরিত্রটিও এই পরিকল্পনাতেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই চরিত্রটি একেবারে নিরর্থকও নয়। তাকে না হলে এই নাটকই হতে পারত না। তারও একটি প্রতীকমূল্য আছে। এই বালিকাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় দস্যুর মনে করুণা এনেছে, 'বিসর্জনে' (১৮৯০) অপর্ণারূপে রঘুপতির প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করেছে, 'ডাকঘরে' (১৯১১-১২) সেই সুধা, 'মুক্তধারা'র (১৩২৯) একটি স্ত্রীলোকের ভূমিকা তারই এবং 'রক্তকরবী'তে (১৯২৬) নন্দিনীরূপে রাজার কঠিন শাসন ও দর্প সেই চূর্ণ করেছে। অর্থাৎ

১৪ আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৫৫

এই বালিকাই নানারূপে বারে বারে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাট্যে। সেদিক্ থেকে চরিত্রটির সার্থকতা রয়েছে।

নাটকটিতে সংসারের জনমণ্ডলীর যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা অনেকখানি বাস্তব। তাদের মুখের সংলাপগুলিও গ্রাম্য গদ্যে দিয়ে কবি তাদের জীবন্ত করে তুলেছেন। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রথম পরিচয় এই নাটকেই প্রথম পাওয়া গেল। এরপরে 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বহু নাটকেই এ রকম জনতাচিত্র দেখা যায়। এদের চরিত্রে যে সূক্ষ্ম কৌতুকরস সঞ্চারের নিপুণতা রয়েছে তাও উপেক্ষণীয় নয়। এদের চরিত্রের অবতারণায় নাটকীয় বৈচিত্র্য জীবন্ত হয়েছে। সূচনাতে কবিও সে কথাই বলেছেন। শুধু নাটকে বৈচিত্র্য আনার জন্যই নয়, জনতার সমাবেশ ও বাংলাদেশের কোলাহলময়, সংগীতময় জীবনকে নাটকে দেখানো রবীন্দ্রনাট্যভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া তাঁর নাটকে প্রায়ই থাকে 'পথে'র দৃশ্য। এখানে তারও প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বমূলক নাটকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোনো প্রতীকের ব্যবহার। অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী কোনোটিই তার ব্যতিক্রম নয়। তারই প্রথম সূচনা এই সাঙ্কেতিক নাটকটিতে রহস্যময় গুহার অবতারণায়। এই গুহাই অচলায়তনের (১৯১২) অচলায়তন, মুক্তধারার বাঁধ এবং রক্তকরবীর জাল। এই নাটকের গুহাটি আর কিছুই নয়, সন্ন্যাসীর বিশ্ব-বিহীন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বমাত্র। এইসব মিলিয়ে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাট্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক-পদ্ধতিটিও অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রকৃতির প্রতিশোধেই। শুধু ভাবে নয়, ভাষা, ভঙ্গি সর্বদিক থেকেই প্রকৃতির প্রতিশোধে অপরিণতির মধ্যে দিয়েই পরিণতির একটি সূচনা লক্ষিত হয়।

নাটকটির সপ্তম দৃশ্যে দেখি সন্ন্যাসী পর্বতশিখরের উপর থেকে দেখছেন সংসারকে, দূর থেকে উপলব্ধি করছেন তার সৌন্দর্য। তখনও তিনি সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। তারপর চতুর্দশ দৃশ্যে হয়েছে 'প্রভাত'-এর আবির্ভাব। সন্ন্যাসী সবেগে এসে প্রবেশ করছেন সংসারজীবনে—

"দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হতে আর আমি নহি রে সন্ন্যাসী!"

এ যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রভাতের অভ্যুদয়। এতদিনকার অবরুদ্ধতা থেকে সমস্ত ছিন্ন করে তিনি বেরিয়ে এসেছেন বিশ্বের ভূমিতে এবং তারপর 'নির্বারিত স্রোতে' তাঁর কাব্য-নাটকগুলি জন্ম নিয়েছে একের পর এক।

নলিনী (১৮৮৪ মে ১০)

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'নলিনী' নাটকটির কথা কোথাও বলেন নি। একমাত্র 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) নাটকের ভূমিকায় লেখেন 'পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার' সঙ্গে মায়ার খেলার কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে, নলিনীর নাট্যকাহিনীর মধ্যে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য-কাহিনীর একটি ক্ষীণ যোগসূত্র লক্ষ করা যায় এবং নলিনীর কাহিনীই পরে পরিবর্তিত রূপে প্রতিফলিত হয় মায়ার খেলায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই নাটকটি রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে বলেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ীর সঙ্গে ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহে (১২৯০ মাঘ-ফাল্গুন) বাসরের আমোদ-উৎসবের জন্য স্বর্ণকুমারী-রচিত 'বিবাহ-উৎসব' নামে একটি গীতিনাটিকা অভিনীত হয়। এই নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারীদেবী সমবেতভাবে অনেকগুলি গান রচনা করেন। নাটকটির অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ঐ আনন্দ-উল্লাসকে আরও পরিপূর্ণ করার জন্য পরিবারস্থ সকলেই আর-একটি যৌথ নাট্যরচনার পরিকল্পনা করেন। প্রস্তাব হল, একটি প্লট্ তৈরি করে অভিনেতারা যার যার নিজের অংশ রচনা করবেন। এইভাবে একটি যৌথরচনা সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু তাকে যথার্থ সাহিত্য বলা চলে না। তাই রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিমার্জিত করে শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণ নাট্যরূপ দান করেন এবং তাঁর প্রিয় নামানুসারে নামকরণ করেন 'নলিনী'। এই নাটকের ভাষা প্রধানতঃ গদ্য। এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যনাটক এবং সেদিক্ থেকেই এর মূল্য নির্ণীত হওয়া উচিত।

কিন্তু এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, প্রথম গদ্য নাটক হলেও সমকালীন পাঠক সমাজে নাটকটি বিশেষ সমাদৃত হয় নি। কারণ, তখনকার দিনে গীতিকাব্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই গদ্য আন্তরিক প্রেরণাজাত ছিল না, তা নেহাতই বাহ্যিক। তদুপরি বিষয়সাদৃশ্যে তাঁর গীতিকাব্যেরই 'সহোদর' স্থানীয়। নীরদ, নলিনী, নবীন ও নীরজা—প্রধানতঃ এই চারিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে প্রেমদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন, তা ভগ্নহৃদয়ের পরিণতিরই অনুরূপ। তাই ভাবের দিক্ থেকেও এতে নূতনত্ব বিশেষ নেই। তবে যে প্রেম রবীন্দ্রনাথের মনে চিরদিনই প্রজ্জলিত ছিল তাকে তিনি বারেবারে তাঁর অপরিণতির দৃষ্টি নিয়েই নবতর রূপ দেবার চেষ্টা করছেন এবং এ ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেয়েছে নবতর আঙ্গিকে। সেখানেই এই নাটকটির যেটুকু সার্থকতা।

নলিনী নাটককে অভিনয়ের পূর্ব পর্যন্ত কবি বারেবারেই সংস্কার করেন। তারমধ্যে দিয়ে তাঁর সংস্কারশীল মনোভাবটির পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু যে আমোদ-উপভোগ উপলক্ষে নাটকটি রচিত হয়, এবং অভিনয়ের আয়োজনও সম্পূর্ণ হয় সে আমোদ আর পূর্ণতা পেল না। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু (১২৯১ বৈশাখ) এবং তারপর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে (১২৯১ জ্যৈষ্ঠ) সে আয়োজন চিরতরে স্থগিত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'নলিনী' নাট্যও সাধারণ পাঠকের মন থেকে লুপ্ত হল।

এর কিছুদিন পরেই নলিনীর বিষয়বস্তু 'সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ' করে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রচনা করেন। ঐ নাটক বর্তমান আলোচনার সীমা-বহির্ভূত। তবে এটুকুই বলব এই নাটক আঙ্গিকে ও ভাবে একাধারে বাল্মীকিপ্রতিভা ও নলিনীর মিলিত রূপ।—

"বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।"

—জী-স্মৃ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'

এরপরে গীতিনাট্য রচনার পর্যায় স্তিমিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার পর্যায় শুরু হল পূর্ণোদ্যমে ; তার সাফল্যও দেখা দিল অদূর ভবিষ্যতেই। 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০) থেকে সেই সার্থকতার সূচনা। কাব্যে যেমন 'মানসী' পর্যন্ত কবির মনোভূমি প্রস্তুত হয়েছে, তারপর তাতে ফলেছে 'সোনার' ফসল, তেমনি নাটকেও ঐ রাজা ও রাণী-বিসর্জনের পর্ব থেকেই ভাবে ও ভঙ্গিতে এসেছে পরিপূর্ণতা। তাই তার পূর্ব পর্যন্ত কবির নাট্যরচনার ভিত্তিভূমিটি কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল তার আলোচনা করেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা গেল।

(২) হেঁয়ালিনাট্য

'বালক' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা বালকদের উপযোগী করে লিখে পত্রিকাটিকে অলংকৃত করতেন। যথাস্থানে তার কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেছে। এই পত্রিকায় তিনি কতগুলি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনাতেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নাটিকাগুলি সাধারণ-নাটকের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। এগুলিকে তিনি বললেন 'হেঁয়ালিনাট্য'। এগুলি একাধারে ধাঁধাজাতীয় ও হাস্যরসাত্মক।

বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের শুভ্রতা প্রথম আনেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ তাকেই আরও ব্যাপকতা দান করলেন। তবে তাঁর হেঁয়ালিনাট্যগুলি ঠিক 'লোকরহস্যে'র আদর্শে গঠিত নয়। তাতে আছে একদিকে কৌতুক ও ব্যঙ্গরস, অপরদিকে নির্মল হাস্যরস। এই সবগুলির মিলনে নাট্যরস জমে উঠেছে। এই নাটিকাগুলি পরে 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হাস্যকৌতুকের 'সূচনা'য় নাট্যগুলির পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> "য়ুরোপে শারাড (charade)—নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল।… এই হেঁয়ালি নাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"[১৫]

এই নাট্যগুলি রচনাকালে তিনি সূচনায় এ কথাও বলেছেন যে—

> "সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদপ্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।…বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি— বিজ্ঞ লোকের কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা বুঝি না যে, যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।…মানুষের মত মানুষ হইতে গেলে বালক বৃদ্ধ যুবা এই তিনই হইতে হয়।… আমরা বাঙালিরা যদি যথার্থ মহৎ জাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব কাজও করিব, চিন্তা করিব।
>
> — দ্রষ্টব্য : 'বালক' ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ

প্রকৃতপক্ষে, হাস্যকৌতুকের অন্তর্গত এই কৌতুকনাট্যগুলিতে লেখক সাধারণতঃ হাস্যরসের ভিতর দিয়ে হেঁয়ালিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তবে অনেকক্ষেত্রে হেঁয়ালিকে বজায় রাখার চেষ্টা প্রাধান্য পাওয়ায় হাস্যরস বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।[১৬] তবে 'একান্নবর্তী', 'আশ্রমপীড়া', 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'রোগের চিকিৎসা', 'ভাব ও অভাব' প্রভৃতি নাট্যে প্রাণ খুলে হাসবার সুযোগ আছে।

১৫ 'শারাড' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— উজ্জ্বল মজুমদার : 'ফরাসী ও বাঙলাসাহিত্য : মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকা ১৩৮২, মাঘ-চৈত্র

১৬ সরোজকুমার বসু : রবীন্দ্ররঙ্গ, পৃ ৯৭

'রোগের চিকিৎসা' গল্পে হারাধনের হাঁস চুরি ও পিতা-মাতা-ডাক্তার সবাইকেই প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা বেশ কৌতুকজনক। স্বভাবসুলভ স্নেহপ্রবণ বাঙালী পিতামাতা পুত্রের প্রবঞ্চনা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেও অন্ধ স্নেহেরই পরিচয় দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত পুত্র হারু জব্দ হয়েছে স্বয়ং সাহেব-ডাক্তারের কাছে। এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে হাসির সঙ্গে বাঙালীস্বভাবের বৈশিষ্ট্যটিও লেখক তুলে ধরেছেন।

বাঙালী চরিত্রের অতিরিক্ত চিন্তামগ্নতা ও ভাবুকতা নিয়ে লেখক কিঞ্চিৎ ঠাট্টা করেছেন 'চিন্তাশীল' এবং 'ভাব ও অভাব' নাট্যদ্বয়ে। 'চিন্তাশীল' নাটিকার সূচনাতেই দেখি—

"চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন।" যা-ই বলা যায়, তাই সে ব্যাখ্যা করতে বসে। 'বাছা' বলে সম্বোধন করলে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উদ্ধারে নিমগ্ন হয়। 'লক্ষ্মী' বলে সস্নেহ সম্বোধনে সে ভাষাগত প্রয়োগের বিবর্তন নিয়ে চিন্তিত হয়। তার এই চিন্তামগ্নতায় দিদিমা 'ও নরু সূর্য যে অস্ত যায়' [তখনও তার খাওয়া হয় নি] বলে মৃদু তিরস্কার করলে সে সূর্য অস্ত যায়, না, পৃথিবী ঘোরে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে আরও সময় নষ্ট করে।

'ভাব ও অভাব' নাট্যেও তথাকথিত কবিচরিত্রের ভাবুকতা নিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখক দেখিয়েছেন এরাও সাংসারিক ও বাস্তবজীবনে অচল। তবে লেখকের বর্ণনার গুণে রচনাটির মধ্যে যেন হাস্য-স্রোতের বন্যা এসেছে।

'খ্যাতির বিড়ম্বনা'তেও বিনাকাজে আত্মজাহির করার যে প্রবণতা তাকে ব্যঙ্গ করে লেখক তাঁর রচনার মাধ্যমে দু'কড়ি দত্তকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। তম্বুরাযুদ্ধ ও তথাকথিত বাঙালী গায়ক সম্প্রদায়ের গীতযুদ্ধের মাধ্যমে নাটিকাটির পরিসমাপ্তি। বালকদের পক্ষে এই হেঁয়ালি নাটিকাটি অজস্র হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। অপরপক্ষে, লেখক এর মধ্যে যে ব্যঙ্গের খোঁচাটি দিয়েছেন তা 'বিজ্ঞলোকে'র কাছেও নিতান্ত অর্থহীন হয় নি।

'ছাত্রের পরীক্ষা' নাটিকাটিতে লেখক আমাদের দেশের শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ জাতীয় শিক্ষকের শিক্ষক না হয়ে মজুর হওয়াই ভাল— সে কথা তিনি শিক্ষকটির মুখেই বলিয়েছেন—

"এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যানুয়েল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।"

'পেটে ও পিঠে', 'অভ্যর্থনা' প্রভৃতি রচনাগুলিতেও লেখক এক-একটি ছোট ঘটনা বা কাহিনী উপলক্ষ করে এক-একটি বিশেষ চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'রোগীর বন্ধু' কেমন হওয়া উচিত এবং বিপরীত হলে কি সর্বনাশ হতে পারে তা নাটকটির মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে হাস্যরসের যোগে। আবার 'অন্ত্যেষ্টি সংকার' রচনায় অ-পাঙ্‌চুয়াল বাঙালি মৃত্যুর ব্যাপারে হঠাৎ 'পাংচুয়াল' হয়ে উঠেছে। তাই কৃষ্ণকিশোরের সুযোগ্য পুত্রেরা পিতার মৃত্যুর পূর্বেই 'কন্‌ডোলেন্স লেটার' ও খবরের কাগজে মৃত্যুবিবরণ প্রকাশ করে ফেলেছে। সমব্যথী অভ্যাগতরা 'শোকপ্রকাশের প্রতিযোগিতা' শুরু করেছেন— কেউ বাংলায়, কেউ ইংরেজি, কেউ বা সংস্কৃততে। কেউ আবার মেঘনাদবধ কাব্য থেকে আবৃত্তি করে শোক বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃদ্ধ আর মরে না। তাই জনৈক অভ্যাগত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়—"বাঙালি পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না। ·· মরবে তবু পাংচুয়াল হবে না।"

বাঙালির এই বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় পাই 'আশ্রমপীড়া' রচনাটিতেও। সাহিত্যে উৎসাহ নেই এমন লোককে সাহিত্য-পাগল ব্যক্তি যদি জোর করে নিজের রচনা শোনাতে চায় তবে তার দুরবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছায় তারই বর্ণনা আছে রচনাটিতে। এই বর্ণনা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কেদারের দুঃসহ দুঃখের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আর্য ও অনার্য' (১২৯২) নাট্যটির মধ্যে একটি ইতিহাস লুকানো আছে। আমাদের ইতিহাসে আর্যসভ্যতা আবিষ্কার হবার পর থেকেই 'আর্য', 'হিন্দু' প্রভৃতি আখ্যা সম্বন্ধে বাঙালীর সচেতনতা ক্রমশঃ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। একদা রবীন্দ্রনাথও নিজেকে 'আর্য' বা 'হিন্দু' বলে গর্ব অনুভব করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মূঢ় আত্মাভিমানে পরিণত হয়। সে কালে বাংলাদেশে শশধর তর্কচূড়ামণি নামক এক গোঁড়া হিন্দুপণ্ডিত ও বাগ্মীর আবির্ভাব হয়। তিনি অচিরেই তাঁর ধর্মব্যাখ্যা ও বক্তৃতার মাধ্যমে চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বহু মনীষীর মন হরণ করলেন। এঁদের কাজ ছিল আমাদের জীবনে যা-কিছু আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার সবকিছুরই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করে তাঁরা তথাকথিত আর্যধর্মসম্মত ব্যাখ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইতেন।

কিন্তু এই আজগুবি ধর্মব্যাখ্যানকে সত্যান্বেষী মনীষীরা মেনে চলবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিরা এই ধর্মবিশ্বাসীদের বিরোধিতা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে শুরু করলেন। 'আর্য ও অনার্য' হেঁয়ালিনাট্যটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। নাটকটিতে চিন্তামণি কুণ্ডু নামক

তথাকথিত আর্য সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি তাঁদের ব্যাখ্যার আর কোনো যুক্তি না দিতে পেরে বলেছেন—

"আমি চিন্তাশক্তির প্রভাবে আমাদের আর্যজাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙুল-মটকানো প্রভৃতি আচার ব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি।...আর্যশাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করতে পারি, আমি আর্যশাস্ত্র কিম্বা বিজ্ঞান কিছুই পড়ি নি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রূপমূলক ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন ও পরবর্তী কয়েকটি কবিতাতে। এ প্রসঙ্গে সেগুলি স্মরণ করা যেতে পারে।—

খুদে খুদে 'আর্য' গুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।

—'কড়ি ও কোমল', পত্র[17]

বাঙালীর পরিচয় দিতে গিয়ে 'মানসী'র একটি কবিতায় বলেছেন—

ঘরেতে বসে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের
আর্য তেজদর্প ভরে
পৃথ্বী থরথর।

—'দুরন্ত আশা' ১৮৮৮

সোনার তরী'র 'হিং টিং ছট্' (১২৯৯) কবিতায় বাঙালী ধর্মশাস্ত্রজ্ঞের প্রতি কবির বিদ্রূপবাণ কৌতুকপ্রদ হয়েছে—

কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।

১৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা 'পত্র' কবিতা (১২৯২)।

ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্।'

পরবর্তী আরেকটি কবিতায় বক্তব্যটি কবি একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন—

কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি—
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।

—কল্পনা, 'উন্নতিলক্ষণ' ১৩০৬

দেখা যাচ্ছে, এই মিথ্যা ধর্মব্যাখ্যা কবির মনে অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাতেও বেশ কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক উল্লেখ দেখা যায়। দৃষ্টান্তভারে আলোচনাকে দীর্ঘ করা অনাবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়

গীতসাহিত্য

(১) পটভূমিকা

বাংলাদেশে সাহিত্যসৃষ্টির প্রথমযুগ থেকেই গান রচনারও দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। গানের প্রাধান্য বাংলাদেশে বরাবরই ছিল। আমাদের দেশে গান এত বেশি হওয়ার কি কারণ, তা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায়।—

"কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর গান অস্পষ্ট ও সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্য কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়— সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত-সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট্‌ অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অপরূপতা লাভ করে। তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে।"[১]

বাংলাদেশে প্রথম গানরচনার দৃষ্টান্ত দেখা যায় 'চর্যাগীতি'র মধ্যে। এরপরে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিদের হাতে যে বিপুল বৈষ্ণবপদাবলী তথা গীতসাহিত্যের জন্ম, বাঙালীর জাতীয় জীবনে তার ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রভাবও কিছু কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এইসব কবিদের রচিত পদাবলী-সংগীত (অর্থাৎ কীর্তনগান) ও তার জনপ্রিয়তা আজ পর্যন্ত অক্ষুন্ন আছে। কীর্তন-গানের বৈশিষ্ট্য হল, এতে প্রেমসংগীত ও ভক্তিসংগীত দুইই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। বৈষ্ণবযুগের পরে এল রামপ্রসাদ সেন ও কবিওয়ালাদের যুগ। রামপ্রসাদ লিখেছিলেন প্রধানতঃ ধর্মসংগীত। আপনমনের দুঃখবেদনা, রাগ-অভিমান তিনি শ্যামামায়ের কাছে জানিয়েছেন। আর ওই পদগুলিকে সুরের মাধুর্যে অতুলনীয়ও করেছিলেন স্বয়ং রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের ভাব, ভাষা, ছন্দে একান্তভাবেই বাঙালির অন্তরের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল।

১ শান্তিদেব ঘোষ: 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' (১৩৫৩), পৃ ২৩; মূল উৎস অনুলিখিত।

রামপ্রসাদের পরবর্তী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গীতিকার ছিলেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯)। তিনিই ছিলেন বাংলার প্রেমসংগীতের যথার্থ প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। প্রণয়সংগীতের যে ধারা তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, তা-ই দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনায়। এই কারণে রামনিধি গুপ্তের যুগ বাংলার সংগীতসাধনার একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। নিধুবাবুর টপ্পাসংগীত উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার গীতরচনার অন্যতম আদর্শস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নিধুবাবুর প্রায় সমকালেই বাংলাসাহিত্যে কিছুদিন কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের একাধিপত্য দেখা দিল। এঁদের গানগুলি খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। তবে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এমন কি, তাঁদের কোনো কোনো সংগীত এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে, বাংলার সংগীত-ক্ষেত্রকে সেগুলি অনেকখানি প্রশস্ত করে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

> "তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।"
>
> —বিবিধ প্রবন্ধ-১, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'

রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সম্বন্ধে বলেন—

> "স্থানে স্থানে সে-সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে; কিন্তু মোটের উপর এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়ীত্ব, রসের জলীয়তা এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়— এবং সেরূপ হইবার প্রধান কারণ, এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিত মত রচিত।
>
> তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ— এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।"
>
> —লোকসাহিত্য, 'কবি সংগীত'

নিধুবাবুর পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সে-রকম প্রতিভাশালী কোনো বিশিষ্ট সংগীত-রচয়িতা আবির্ভূত হন নি। কিন্তু একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সংগীতমাধুর্য বাঙালির মনকে বহুদিন থেকেই ভরিয়ে রেখেছে। তারা বাংলার বাউল-সম্প্রদায়। বৈষ্ণবগীতি ও শাক্তগীতির মত বাউলসংগীতও

বাঙালির অন্তরের সম্পদ্। বাংলাদেশের জনচিত্তের সঙ্গে তার যোগ বড় নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলিকে বলেছেন 'বাউল পদাবলী' এবং ঐ গানগুলি বাংলার পদাবলী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে বহুদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছে।[২]

বাউলসংগীতগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি বৈষ্ণবপদাবলীর মত অত ব্যাপকতা লাভ করে নি। বাউলরা তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে অন্তরের সুর ঢেলে গানগুলিকে অনির্বচনীয় রূপদান করেছেন। তাই তাতে কোনো বাধাধরা নিয়ম দেখা যায় না। সাহিত্যের দরবারে গানগুলি তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থান পায় নি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই গানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাউলগান সংকলনে আগ্রহী হন। এই সংকলনে লালন ফকিরের গানই প্রধান স্থান লাভ করে। তিনি এই সংগীতগুলির মর্মগত গভীরতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন—

> "এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।"
>
> —মহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'হারামণি'-ভূমিকা, পৃ ২

স্বভাবতঃই এই সংগীতগুলির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীতে তার প্রভাব অলক্ষ্যেই মিশে গেছে। তিনি নিজেও তা স্বীকার করে বলেন—

> "বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"
>
> —পূর্ববৎ

তাঁর বহু গানে ও কবিতায় বাউলের ভাব ও সুর অনায়াসেই ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, বাউলগীতি ও রবীন্দ্রগীতি যেন অনেকস্থলে একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

এইভাবে বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে (অবশ্য চর্যাগীতি বাদে) রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে সংগীতরচনার যে ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষভাবে রস আহরণ করে তাঁর সংগীতসাহিত্যকে অনেকাংশেই সমৃদ্ধ করতে ও বিচিত্র রূপ দিতে পেরেছিলেন।

২ আনন্দমোহন বসু : বাংলা পদাবলীর ছন্দ (১৯৬৮), পৃ ৩৭৮, ৩৭৮ পা-টী ১

২

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানরচনার প্রবণতা স্বভাবতঃই প্রবল হয়ে উঠল। কারণ এই বাড়ির যে আবহাওয়া ছিল, তার আকাশেবাতাসে ছিল গানের সুর। আর তারই মধ্যে মানুষ হচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের রসগ্রাহিতা যেমন ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, গীতকুশলতাও ছিল তেমনিই তাঁদের প্রকৃতিগত। 'জীবনস্মৃতি'তে নিজেদের পারিবারিক পরিচয় দিয়ে কবি বলেছেন, "বেশেভূষায় কাব্যেগানে চিত্রেনাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায়" সর্ববিষয়েই তাঁদের পারদর্শিতা সেদিন দেশে ছিল আদর্শস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ সকলেই ছিলেন সংগীত সম্বন্ধে উৎসাহী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন সংগীতের একজন বিশেষ ভক্ত। তাই তাঁর গৃহে সংগীতের আসর প্রায়ই বসত। রবীন্দ্রনাথের পিতৃব্য গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথও সংগীত বিষয়ে খুবই উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন। গণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিল অল্পবয়সে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তিনি যে কয়টি গান লিখে গিয়েছিলেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "তাঁহার রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এখনও ধর্মসংগীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।
>
> গাও হে তাঁহার নাম
> রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
> দয়ার যাঁর নাহি বিরাম,
> ঝরে অবিরত ধারে—
>
> বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত।"
>
> —জী-স্মৃ, 'বাড়ির আবহাওয়া'

শুধু গণেন্দ্রনাথের গানটি নয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' প্রভৃতি স্বদেশী সংগীতগুলি

রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে স্বদেশের প্রতি উদ্বেলিত ও সংগীত রচনায় উৎসাহিত করত। ছেলেবেলা থেকে এইসব বিচিত্র গান শুনে এবং গানের আবহাওয়ায় থেকে রবীন্দ্রনাথের মনও গড়ে উঠছিল ঐ একই আদর্শে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন—

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

—জী-স্মৃ, 'গীতচর্চা'

ধর্মসংগীত ও স্বদেশীগানের চর্চা তাঁদের বাড়িতে খুব বেশি হলেও অন্যান্য ভাবও বাদ পড়ে নি। বিশেষতঃ, কৌতুকগান-রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি প্রেরণা পেয়েছিলেন 'বাড়ির আবহাওয়া' থেকেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি হলেও হাস্যরসে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁর সাহিত্য ও সংলাপে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী। তাঁর 'এমন কর্ম আর করব না' প্রভৃতি প্রহসনে হাস্যরসের প্রয়োগ খুব বেশি এবং রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রহসনে অভিনয় করায় ছেলেবেলা থেকেই ঐ রসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। 'অদ্ভুতনাট্য' রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ উভয়ে ছিলেন একাত্মা। দুই বাড়ির ভাইএরা মিলে নানা গল্প-নাটক প্রায়ই রচনা করতেন। একবার ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে কতগুলি মজার মজার কবিতা জোড়া দিয়ে একটি 'অদ্ভুতনাট্য' রচনা করা হয়। তারমধ্যে একটি গান ছিল—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।[৩]—

এই নাটকের রিহার্সাল ও এই গানটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তুলত। জীবনস্মৃতিতে এর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি অবশ্য ভুলক্রমে এ বিষয়ে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

"শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় এই 'অদ্ভুতনাট্য' বড়দাদার নামে

৩ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাশ' কাব্যের অন্তর্গত।

আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই শাস্তিহানি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

যাই হোক্, পরিবারের এইসব হাস্য-পরিহাসের পরিবেশ এবং কৌতুকনাট্য ও গানরচনার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত আছে তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি নাটকে ও পরবর্তী যুগে লেখা মজার মজার গানে। শুধু জ্যেষ্ঠভ্রাতারাই নন, এ বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও ছিলেন তাঁর অন্যতম সহায়ক বন্ধু।—

"বাংলা কত উদ্ভট-গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাইয়া যাইতেন।··· আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল।"।

—জী-স্মৃ. 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী'

বস্তুতঃ, বাংলাদেশের কবিওয়ালাদের নানা উদ্ভট-সংগীত এবং লোকসংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকে অনেকখানি প্রেরণা পেয়েছিলেন। দেশি গানের প্রতি তাঁর যে উৎসাহ ছিল, তার অন্যতম প্রেরণাদাতা ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। বাংলাগানের স্বরলিপি রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ; তার স্বীকারোক্তি আছে তাঁর স্মৃতিকথায়।[৪] ফলে সুরের নৈপুণ্য সম্বন্ধেও বালক রবীন্দ্রনাথের মন সচেতন হতে পেরেছিল। তদুপরি শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। ফলে গান গাওয়া ও গান রচনার সুযোগ মিলেছিল জীবনের একেবারে সূচনাতেই। বলা বাহুল্য, সংগীত শিক্ষা ও রচনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি পিয়ানো বাজিয়ে কি ভাবে 'নূতন নূতন সুর' তৈরি করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী কথা দিয়ে সে সুরগুলিকে পূর্ণতা দান করতেন তার সুন্দর বর্ণনা আছে জীবনস্মৃতিতে। ঐ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

—'গীতচর্চা'

ছেলেবেলাতে রবীন্দ্রনাথকে সংগীতশিক্ষা দেবার জন্য বাড়িতে গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের গীতশিক্ষক। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু। এঁর গান

৪. সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি প্রত্যহ শুনতেন উৎসবে, আনন্দে, উপাসনা মন্দিরে। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতারাও তানসেন প্রমুখ গুণীর গানের ধারা বাংলা গানে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন গানের ধারার মধ্যে থেকেও তাঁরা যে সব গান রচনা করেছিলেন তার রূপ ও বিকাশ অনেকাংশেই ছিল স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথও সেই ধারাতেই মানুষ হচ্ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিশুকালের গানের অন্যতম প্রধান সমঝদার ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। কবি তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> "আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন।...হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন্‌গুন্‌ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড বড় চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করত, গান ধরতেন— 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।' সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"
>
> —'ছেলেবেলা', অধ্যায় ৭

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের মুখে শোনাবার জন্য তিনি তাঁকে ঘরে ঘরে নিয়ে যেতেন। ব্রহ্মসংগীতও শ্রীকণ্ঠবাবু গাইতেন। হিন্দী গান থেকে ভেঙ্গে একটি ব্রহ্মসংগীত—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না রে তায়' তিনি প্রায়ই শোনাতেন দেবেন্দ্রনাথকে।

আর একটু বডবয়সে রবীন্দ্রনাথ যদুভট্টের নিকট গানের শিক্ষালাভ করেন। তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। ধনীদের গৃহে সে যুগে গানের জন্য বাঁধা ওস্তাদ থাকতেন। বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, যদুভট্ট প্রমুখ ছিলেন সে রকমই ওস্তাদ। এছাড়া ধর্মমন্দিরে উপাসনার জন্য সংগীত রচনাকার্যে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতারাও হিন্দিগান ভেঙে ও হিন্দিগান থেকে সুর আহরণ করে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ভগবৎবিষয়ক সংগীতরচনায় রবীন্দ্রনাথের সামনে এঁরা সকলে ছিলেন আদর্শ ও তাঁদের সংগীতগুলি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণাস্থল।

কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মত গানের ক্ষেত্রেও কোনো শিক্ষকের শিক্ষকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে নিয়মে-বাঁধা জীবনচর্যার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে নি। তাই বলেছেন—

> "ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই।

মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে তখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না।"

'কুড়িয়ে-বাড়িয়ে' যা পেয়েছিলেন তা হচ্ছে দেশিগান, নানালোকের মুখে শোনা, "দাসদাসী কর্মচারী ভিখারী বাউল মাঝিমাল্লার" গান।[৫] এই বিচিত্র সুরতরঙ্গ বালককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। এইসব গানের ভাব ও ভাষা স্পর্শচেতন, ভাবপ্রবণ বালকের মনে আনত প্রবল আলোড়ন এবং তা-ই তাঁর নিজের ভাবে ও সুরে সিঞ্চিত হয়ে অজস্রধারায় ঝরে পড়ত। পরবর্তী কালের বিচিত্র সংগীত রচনাতেই আছে তার যথার্থ পরিচয়। আলোচ্য কালপর্ব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক সংগীতরচনা-যুগের পূর্ববর্তী। তবুও এখান থেকেই তাঁর সংগীতরচনার বিশিষ্ট অনুভূতি ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা গিয়েছিল।

(২) রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য

আজকাল লোকে যাকে 'রবীন্দ্রসংগীত' বলে জানে, তা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু অল্পবয়সে তিনি যে সব গান রচনা করেছিলেন, সেগুলিই তাঁকে পরবর্তী জীবনে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করেছিল। প্রথমজীবনে তাঁকে অনেকক্ষেত্রেই ফরমাইসি গান রচনা করতে হয়েছে— কখনও ব্রাহ্ম-উৎসব উপলক্ষে, কখনও হিন্দুমেলার প্রয়োজনে, কখনও স্বদেশীসভার উদ্দীপনা জোগাতে, আবার কখনও বা নাটকের খাতিরে। কিন্তু ফরমাইসি হলেও তাঁর সংগীত রচনার যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা পূর্ণ আকারে প্রকাশিত না হলেও তার অরুণাভা দেখা দিয়েছিল তখনই। রবীন্দ্রনাথের গান —তা ফরমাইসি বা উদ্দেশ্যমূলকই হোক অথবা অন্তর থেকে উৎসারিতই হোক, প্রথমাবধিই তাতে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব লক্ষ করা যায়। গানরচনা প্রধানতঃ ছিল তাঁর আন্তরিক অনুভূতির বিষয়বস্তু। গানের মাধ্যমেই তিনি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভক্তি জানিয়েছেন, অন্তরের প্রেমও প্রকাশিত হয়েছে এবং জগৎ-প্রকৃতিকে অনুভব করেছেন প্রাণ ভরে। ছেলেবেলা থেকেই সংগীতের এই অনুভূতি তাঁকে বেষ্টন করে ছিল। পরিণত বয়সেও সংগীতের মাধ্যমেই তিনি তাঁর এই মনোভাবটি ব্যক্ত করেছেন—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।

---

৫ র-জী. পৃ ২৮

সংগীত রসধারায় আত্মনিমজ্জনেই ছিল কবির যথার্থ আনন্দ। তার স্বীকৃতি আছে তাঁরই উক্তিতে।—

"আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই।… একবার লিখেছিলাম—

যবে কাজ করি— প্রভু দেয় মোরে মান ;
যবে গান করি— ভালবাসে ভগবান।

…গানে যে-আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্য-বোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন করে নতুন করে।"

—'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা ৬

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি Wordsworth-এর উক্তির সঙ্গেও তাঁর অন্তরের মিল দেখা যায়—'The light that was never on sea or land'

আসলে রবীন্দ্রনাথের অন্তরই ছিল সংগীতের সুরে পরিপূর্ণ। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তাঁর গান ও কবিতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম কবিতাকে গানের পর্যায়ে ও গীতিরচনাকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এর পূর্বে বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তগীতিগুলিতে এই সমন্বয় কিছুটা সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যাপকতা দান করেন। কারণ, একাধারে গান গাইবার ও রচনা করবার প্রতিভা ছিল তাঁর জন্মগত। তাই তাঁর অনেক কবিতাই সংগীতধর্মী। আদি-পর্বে রচিত 'শৈশব সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই আছে তাঁর সংগীতানুরাগের পরিচয়। কোনো কোনো গবেষকের আলোচনায় তার অন্তর্নিহিত রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।[৬] জনৈক সমালোচক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা এবং কাব্যসংগীত একই পল্লবের যুগ্মকিশলয়।" তাঁর এই আলোচনায় প্রথম যুগের গান ও কবিতার যুগ্মমিলনের কথাও আলোচিত হয়েছে।[৭]

পরবর্তী কালে রচিত 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতালি' (১৯১৪), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও সে কথাই সূচিত হয়। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকেও কবিতার আকারে পাঠ করা সম্ভব।

৬ কালিদাস নাগ : 'রবিচ্ছায়া', মাসিক বসুমতী, ১৩৫৭ আষাঢ়

৭ অরুণ বসু : 'রবিরশ্মি ও রবিচ্ছায়া', কবি ও কবিতা, দশমবর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৮২ শারদীয়া

কারণ, রবীন্দ্রসংগীতের প্রায় সর্বত্র কথায়-ভাবে-ছন্দে ও সুরের মধ্যে একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ভাব ও ছন্দ, সুর ও তালের মধ্যে কোনো সংঘাত হয় নি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রবাহিনী' (১৩৩২ অগ্রহায়ণ) নামক সংগীত-গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বলেছেন—

> "প্রবাহিনীতে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

ঐ কথাই তিনি বলেছেন, 'গীতবিতানে'র বিজ্ঞাপনেও (১৩৪৮ মাঘ)—

> "সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

এর থেকে এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, কথা ও সুর উভয়ের প্রতিই কবির অন্তরের টান ছিল সমান। গানের ক্ষেত্রে কথা ও সুরের সম্পর্ক যেমন, কবিতার ক্ষেত্রে ভাষা ও ছন্দের সম্পর্কও তেমনি। কবিতায় ছন্দের মাধ্যমে বাক্যকে অবলম্বন করে বাক্যাতীতের প্রকাশ, বচনকে আশ্রয় করে অনির্বচনীয়ের দ্যোতনা। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় সে কথাই কবি বলেছেন—

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর—
ভাবের স্বাধীন লোকে।

গান সম্বন্ধেও বলেছেন—

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে॥

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি চমৎকার ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

> "আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এ দেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বারবার অনুভব করা গিয়াছে।"

—জী স্মৃ, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'

এর অর্থ এই যে, কবিতার ছন্দ ও গানের সুর কথাকে আশ্রয় করেই তার সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে 'অনুভবগম্য অভাবনীয়কে' প্রকাশ করে।[৮]

৮ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'বাণী ও বীণা', গীতবিতান-পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ১৬১

রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ গভীরতাটি উপলব্ধি করা যাবে রবীন্দ্রনাথেরই বাণী থেকে।—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

—উৎসর্গ : ১৭, 'ধূপ আপনারে'

এই অংশটিতেই রবীন্দ্রসংগীতের মূলকথা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের এই আলোচনা প্রসঙ্গে যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি একটু লক্ষ করা যায়, তবে দেখা যাবে কাব্যের দেবী বাণী ও সংগীতের দেবী বীণাপাণি অভিন্ন। সরস্বতীর এক হাতে বই, অপর হাতে বীণা। বাগ্‌দেবীরই অপর নাম বীণাপাণি। বৈদিকযুগ থেকেই দেবী সরস্বতীর এই পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়।

আধুনিক যুগে যাকে বলা হয় কবিতা, ঋক্‌বেদের যুগে তাকেই বলা হত 'সূক্ত' অর্থাৎ সুন্দর উক্তি। এই সূক্ত সুরসংযোগে গীত হলে তাকে বলা হত 'সাম' অর্থাৎ গান। এর থেকেই বোঝা যায়, বৈদিক যুগে কথা ও সুর, কাব্য ও সংগীত ছিল অভিন্ন এবং সরস্বতী তৎকালীন সংস্কৃতিরই প্রতিমা বা প্রতীক। রামায়ণ রচনাকালেও কাব্য ও গান যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল লবকুশের কাহিনীই তার প্রমাণ।

কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই গান ও কাব্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। মীরাবাঈএর ভজনাদিতে বাণী ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটলেও সাধারণতঃ হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে কথার প্রাধান্য নেই। কিন্তু বাংলাগান থেকে কথা কখনও বিদায় নেয় নি। চর্যাগীতির কাল থেকে গীতবিতানের যুগ পর্যন্ত 'বাণী ও বীণা'র মধ্যে কোনো প্রীতির অভাব ঘটে নি। বৈষ্ণবপদাবলী ও রামপ্রসাদের কোনো কোনো পদ যেমন শ্রেষ্ঠ কবিতা তেমনি অতি উচ্চস্তরের সংগীত। তাই এদিক্‌ থেকে বাংলাদেশকেই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ উত্তরাধিকারী বলা যায়। আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ও দেবী সরস্বতীর সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী। তাই তিনি বোধহয় বিশ্বছন্দের অধিদেবতা 'নটরাজ'— যাঁর নৃত্যের ছন্দে ও তালে ঘটে পৃথিবীর উত্থানপতন, তাঁর কাছে কামনা জানিয়েছেন—

'সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।'

এই মুক্তিলাভের প্রার্থনা হল 'সরস্বতীর মানস-সরসে' 'ঢেউ তুলে' অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর কথা ও সুরসৃষ্টির প্রার্থনা। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করে যদি রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে একাধারে ঋক্‌বেদ ও সামবেদের সমন্বয় বলে অভিহিত করা যায়, তবে তার যথার্থ মর্যাদাই দান করা হবে।

তবে স্মরণ রাখতে হবে, এই সমন্বয়ের সার্থকতা পরিপূর্ণ হয়েছিল তাঁর উত্তরকালীন সংগীতে। আদিযুগের গানগুলিতে এই সমন্বিত রূপের অপূর্বতা পরিস্ফুট হয় নি; তবে তার আভাস অস্পষ্ট নয়। এ যুগে তাঁর সাধনা হল নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলা। সেইজন্য তিনি নিজে আদিযুগের গানগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চান নি। তিনি এ যুগের গানগুলি সম্পর্কেই বলেছিলেন—

"গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা পঠিত হয়। এইজন্য সুর ছাড়া গান ছাপার অক্ষরে পড়িতে অনেকস্থলে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকে।"

—'রবিচ্ছায়া,' রচয়িতার নিবেদন

প্রথমযুগের গানে সুর অনেকক্ষেত্রেই ছন্দের ত্রুটিকে পূর্ণ করেছে। সে ক্ষেত্রে সুর ছাড়া তাকে কবিতা হিসাবে পড়া সম্ভব নয়। অপরিণতিই এর প্রধান কারণ। এসব গানে—

"সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।"

—গীতবিতান (৩য় খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়, 'চিত্রাঙ্গদা'-প্রসঙ্গে

তবুও দেখি, রবীন্দ্র সমকালীন ও অনুবর্তী গীত রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনায় আদিপর্বেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সংগীতসাধনায় 'বাণী ও বীণা'র সমন্বিত অপূর্ব শিল্পরূপটির যে পূর্বাভাসটুকু সূচিত হয়েছিল, তা-ই তাঁকে করেছিল সকলের থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে বা সমকালে যাঁরা সংগীত রচনা করতেন, তাঁদের অধিকাংশই হয় ব্রহ্মসংগীত, নয় স্বদেশী সংগীত, নয়তো বা নাট্যগীতি রচনা করেছিলেন। তাঁদের কোনো গীতিসংকলন গ্রন্থও দেখা যায় না। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০),

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ কয়েকজন তার ব্যতিক্রম। তাঁদের কোনো কোনো গানে রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গানগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। এঁদের গীতসংকলন গ্রন্থও আছে এবং আধুনিক কালে গানগুলির বহু প্রচলন ও জনপ্রিয়তাও কিছু কম নয়। কিন্তু তাঁদেরও সংগীত রচনার ক্ষেত্র রবীন্দ্রসংগীতের মত অত ব্যাপক ও প্রশস্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে যে একটি বিরাট্ স্থান অধিকার করে আছে, অন্য কেউ তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। শুধু আজকের কথাই নয়, পিছনের দিকে ফিরে তাকালেও দেখব, সেদিনও তাঁর 'রবিচ্ছায়া'র ছায়াতলে দাঁড়াবার মত কোনো সংগীত-রচয়িতার আবির্ভাব হয় নি। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থানই একক এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁর ভাষাতেই বলা যায়, তিনি ছিলেন সেদিন "বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা"। উনবিংশ শতাব্দীর সংগীতসাধনায় "নবজাগরণ-যুগ-প্রভাতের রবি"[৯] উদিত হয়ে বাংলা-সংগীতের ধারাতে এনে দিলেন অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তাঁর তৎকালীন সংগীতগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলেই এই স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা উপলব্ধি করা যাবে।

(৩) গীত রচনারম্ভ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি যে কবে গান গাইতে পারতেন না, সে কথা তাঁর মনে পড়ে না। অর্থাৎ গীতপ্রতিভা ও গানের চর্চা তাঁর জন্মগত সঙ্গী বললে ভুল হবে না। কবিতা রচনাচর্চাও তাঁর শুরু হয়েছিল অতি শৈশব থেকে এবং তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তাঁর স্মৃতিকথাগুলিতে। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম কি গান রচনা করেছিলেন এবং কবে তার সূচনা হয় সে সম্বন্ধে নিজে কিছু বলেন নি। ফলে গবেষক মহলে এ নিয়ে অনেক মতান্তর দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর গানগুলি কি 'উর্বশী'র মত কখনও 'মুকুলিকা' অবস্থায় ছিল না? কবি কি তাঁর গান নিয়ে কখনও 'শৈশবের খেলা' করেন নি? সে তো সম্ভব বলে মনে হয় না। যে বালকের গীতপ্রতিভা জন্মগত তিনি যে কবিতার মতই গানও জীবনের অতিপ্রত্যূষকাল থেকেই রচনা করতেন, এ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক হবে না। তবে তার দৃষ্টান্ত না থাকাতেই তাঁর প্রথম গীতরচনা নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর

৯ দ্রষ্টব্য—গীতবিতান : ভূমিকা, 'প্রথমযুগের উদয়দিগঙ্গনে'

গানগুলিকে আমরা মোটামুটি 'পূর্ণ প্রস্ফুটিত' অবস্থাতেই পেয়েছি। তবুও প্রথমযুগে রচিত, তাঁর শৈশব-সংগীতধারারই অন্তর্গত— এই অনুমান করে নিয়ে একটি-দুটি গান সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন তারিখ নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসংগীতের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে কোনটি প্রথম রবীন্দ্রসংগীত এই নিয়ে নূতন করে মতান্তর দেখা দিয়েছে। এই উৎসবের পুস্তক-তালিকায় 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে'— এই গানটিকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। মনে হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' গ্রন্থে এই গানটিকে সর্বাগ্র স্থান দেওয়া হয়েছে বলে অনুষ্ঠান-পরিচালকেরাও ঐ গানটিকেই সর্বপ্রথম রচনার মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু এই নিয়েও বাদানুবাদ হতে দেখা যায়।[১০]

বস্তুতঃ, গানটি আদৌ রবীন্দ্ররচিত কি-না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যদিও মনে করতেন গানটি তাঁর রচনা, কিন্তু ইন্দিরাদেবীর মতে গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত গুরু নানকের একটি গানের অনুবাদ।[১১] যেখানে গানটি রবীন্দ্ররচিত কি-না, এই সন্দেহেরই নিরসন হয় নি, সেখানে কালক্রম বিচারের প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর রবীন্দ্ররচিত হলেও তা তাঁর স্বকীয় অনুভূতিজাত নয়, অনুবাদ মাত্র। তাই তাঁর অন্যান্য সংগীতের সমপর্যায়েরও নয় এই গানটি। সব মিলিয়ে এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বপ্রথম গান হিসাবে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকা গেল।

বরঞ্চ, এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-উল্লিখিত ও বহুযুক্তি-সম্বলিত 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটিকে অগ্রবর্তিতায় সর্বপ্রথম বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) প্রথম মুদ্রিত হয়। বহুদিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সংগীত-প্রকাশিকা'য় (১৩১২ অগ্রহায়ণ/১৯০৫) রবীন্দ্র-রচিত উল্লেখে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পাঠে 'বন্দে মাতরম্' ধুয়াটি নূতন দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, ১৯০৫ সন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। তাই সেই যুগে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নূতন করে সংযোজিত হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমানে গানটি 'সংগীত প্রকাশিকা'র আকারেই প্রচলিত আছে।

জীবনস্মৃতির 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে স্বাদেশিকের সভা প্রসঙ্গে গানটির প্রথম দুই ছত্র উদ্‌ধৃত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে গানটি

১০ দ্রষ্টব্য : আনন্দবাজার পত্রিকা, জুলাই ২৩ ও অগাষ্ট ৫, ১৯৭৫

১১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' (১৩৮০), পৃ ১

আজ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নি।[১২] জীবনস্মৃতিতে গানটির রচয়িতা কে তারও উল্লেখ নেই। কিন্তু 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির প্রথম ছত্রেই এর ভাব ও ভাষার যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং গান দুটির সুরও অভিন্ন।[১৩] তাই গান দুটির রচয়িতা যে একই কবি সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ করা চলে না। এছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি।"

—রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয় ১৩৫০, পৃ ৯১

শান্তিদেব ঘোষও অনুরূপ সাক্ষ্যই দিয়েছেন।[১৪] তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সংগীত প্রকাশিকা'য় যখন স্পষ্টই এটি রবীন্দ্ররচিত বলে উল্লেখ করেছেন তখন এই বিষয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনই থাকতে পারে না। গানটি কি উপলক্ষে রচিত হয়েছিল তারও একটি পরিচয় পাওয়া যায় 'জীবনস্মৃতি' থেকে। তিনি সেখানে বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভায় রাজনারায়ণ বসু-সহ সকলে মিলে গানটি গাওয়া হত। সেদিক্ থেকে গানটিকে সঞ্জীবনী-সভার 'সমবেত সংগীত' বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, গানটি রচনা হয়েছিল কবে সেটিই এ ক্ষেত্রে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল (১২৯৬)। ঐ উপন্যাসে সঞ্জীবনী সভার মতই একটি গুপ্ত সভার বর্ণনায় নিম্নলিখিত গানটি আছে।—

একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারতমাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারী সাক্ষী ভগবান্।
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয়গান
সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।

এরমধ্যে সঞ্জীবনী সভার নিয়ম অনুসারে 'খোলা তলোয়ার' নিয়ে তার অনুষ্ঠান ও 'ভারত উদ্ধারে'র জন্য 'শপথ' গ্রহণ করার কথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে।[১৫] 'খোলা তলোয়ার'কে সেখানে বলা হয়েছে 'পদ্মবিদ্ধ খড়্গ'।

১২ বর্তমান গীতবিতানে (সমগ্র, ১৩৬৭, পৃ ৮১৬-১৭) 'জাতীয়সঙ্গীত' বিভাগে সংকলিত।

১৩ গীতবিতান (৩য় খণ্ড), গ্রন্থপরিচয় পৃ ৯৮৫-৮৬

১৪ শান্তিদেব ঘোষ: 'রবীন্দ্রনাথের একটি গান', দেশ, ১৩৬০ চৈত্র ২৬

১৫ দ্রষ্টব্য : 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫ এবং 'ভারতী ও বালক' (১২৯৬, পৃ ৩৬৫), 'স্নেহলতা' ১৮শ পরিচ্ছেদ

তাছাড়া উপন্যাসটির অন্তর্গত এই গানের রচয়িতা চারু নামে এক ষোড়শবর্ষীয় বালক। এই চারু বন্ধুজন-প্রশংসিত কবি, তাকে গুপ্তসভার 'মেম্বর' করা হয়েছে। তার রচিত এই গানটি যখন সকলে সমবেতভাবে গেয়ে উঠল, তখন চারুর নিজেকে শেক্সপীয়রের সমকক্ষ বলে বোধ হল।

এই দৃশ্যের সঙ্গে সঞ্জীবনী সভায় রবীন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণ, সদস্যকবি হিসাবে তাঁর সমাদর ও তাঁর তখনকার বয়সোচিত[১৬] উৎসাহ এবং জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ও তরুণ সভ্যদের সমবেতভাবে গান গাওয়ার দৃশ্য সবই প্রায় একরূপ। স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পচ্ছলে একটি বাস্তবচিত্রই অঙ্কন করেছেন মনে হয়।[১৭]

এছাড়া ১২৯৫ সালের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) অঘোরনাথ দত্তের 'য়ুরোপীয় গুপ্তসমাজ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই গুপ্তসমাজের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর গুপ্তসভার সাদৃশ্য খুব বেশি। তাই লেখিকা ঐ প্রবন্ধেরও অনুসরণ করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।[১৮]

সে যাই হোক, এই গানটির তারিখ নির্ণয় প্রসঙ্গে ১৮৭৫ সালে (ফেব্রুআরি) রচিত কবির 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি স্মরণ করা কর্তব্য। কারণ ঐ কবিতার একটি স্তবকে দেখি কবি বলেছেন—

ভারতকঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায় রে নূতন জীবন ;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।

এই স্তবকের 'ভারতকঙ্কাল' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সঞ্জীবনী সভায় 'মৃতভারতে প্রাণসঞ্চার'[১৯] করার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই কবিতাটি লেখার পূর্বেই সঞ্জীবনী সভার সদস্য হয়েছিলেন। আর এই অনুমান যদি সত্য বলে ধরা যায়, তাহলে 'একসূত্রে' গানটিও 'হিন্দুমেলায়

১৬ স্নেহলতায় চারুর বয়স ১৬; কিন্তু সঞ্জীবনী সভায় দীক্ষাগ্রহণ কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৬র কম ছিল (সম্ভবত: ১৩।১৪)। ভারতভূমি, অভিলাষ, প্রকৃতির খেদ প্রভৃতি কবিতা আলোচনার সময় (৩য় অধ্যায়) বলা হয়েছে বয়স-সমস্যা তখনকার দিনে গৌণ ছিল। এ ক্ষেত্রেও বয়সের অমিলটুকু গৌণ করে দেখলে চারুকে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ বলে মনে হয়।

১৭ গীতবিতান, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৯৮৫-৮৭

১৮ পশুপতি শাশমল: স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য (১৩৭৮), পৃ ২৪৯

১৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

উপহারে'র পূর্বে রচিত— অর্থাৎ ১৮৭৪ সালের একেবারে শেষাংশে ('অভিলাষে'র প্রায় সমকালে) অথবা ১৮৭৫ সালের একেবারে প্রথমদিকে, এই অনুমান করা অসমীচীন হবে না। তখন তাঁর বয়স ষোলো বৎসর নয়, তেরো বা চোদ্দ।

'অভিলাষ' ও 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র মধ্যে সময়ের যেটুকু ব্যবধান তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অবারিত গতিতে একের-পর-এক রচনা করেছেন কবিতা, গান, প্রবন্ধ। তার কোনোটার সন্ধান পাওয়া গেছে, কোনোটা বা রয়েছে অজানার অন্ধকারে। তাই 'একসূত্রে' গানটি তাঁর এই রচনা-ধারারই অন্যতম নিদর্শন বলে অনুমান করা যায়।

এই গানটির সমকালেই এবং একই প্রয়োজনে (সঞ্জীবনী সভা) 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' গানটিও রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা গেছে। এই গানটি প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪ আশ্বিন) ও পরে 'জাতীয় সংগীত' নামক সংগীতসংগ্রহ গ্রন্থে (১৮৭৮)[২০] প্রকাশিত হয়। তার পরে 'রবিচ্ছায়া'য় (১৮৮৫) সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু গানটির প্রকাশকাল ও রচনাকাল একই কি-না তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, ভারতী পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বেই গানটি রচিত বলে অনুমিত হয়েছে।

এই গানটির প্রায় প্রতিটি ছত্রে সঞ্জীবনী সভায় রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত যে সব আদর্শ ছিল তার সুর যেন শোনা যায়। সঞ্জীবনী সভার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল একদিকে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও অপরদিকে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন করে মৃত-ভারতকে জাগ্রত করে তোলা। তারই প্রতীকস্বরূপ ঐ সভায় দীক্ষাগ্রহণ কালে একদিকে থাকত 'ঋক্‌বেদের পুঁথি' ও অপরদিকে 'খোলা তলোয়ার'। তবে দীক্ষাগ্রহণের সময় প্রধানতঃ ক্ষাত্রধর্মের আদর্শই অনুসৃত হত মনে হয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে একটি 'সমিতি'র কথা উল্লেখ করেছেন, যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্তে অঙ্গীকারপত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।[২১] তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি সঞ্জীবনী সভার কথাই বলেছেন। 'তোমারি

২০ 'জাতীয়সংগীত' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬, মার্চ (১২৮২ ফাল্গুন)। ঐ সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের কোনো গান সংকলিত হয়নি। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৮) চারটি গান সংযোজিত হয়।

২১ Bipin Chandra Pal: Memories of my life and Times এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯৬৫), পৃ ৫৮

তরে মা' গানটির মধ্যে এই সবগুলি লক্ষণেরই সমাবেশ দেখা যায়। এই গানের নিম্নলিখিত অংশের—

'যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল,
তোমারি কাজ সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে॥
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা, পারি তা ঢালিতে
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা।

—এই পঙ্‌ক্তিগুলির 'অসি', 'শোণিত' প্রভৃতি শব্দ এবং গানটির অন্তর্গত 'এ বীণা তোমারি গাহিবে গান' ও 'এ বীণার কিছু নাহিক বল' পঙ্‌ক্তি দুটির 'বীণা' শব্দ সঞ্জীবনী সভারই প্রতীক-স্বরূপ। তদুপরি সমস্ত গানটির মধ্যে দেশ-মাতৃকার প্রতি আত্মনিবেদনের জন্য একটা শপথের ভাব লক্ষ করা যায়। তাই এই গানটি সঞ্জীবনী সভায় দীক্ষাগ্রহণ কালে শপথ-সংগীত হিসাবে গীত হয়েছিল বলে মনে হয়। সঞ্জীবনী সভায় দীক্ষাগ্রহণের সময় রবীন্দ্রনাথ ক্ষাত্রশক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মানবজীবনে প্রয়োজনবোধে অস্ত্রশক্তি প্রয়োগের দরকার আছে তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে তার সঙ্গে থাকা চাই জীবন প্রতিষ্ঠার মহৎ আদর্শ, চাই মনোবল ও নৈতিক শক্তি। 'সত্যে'র প্রতিষ্ঠা যেখানে, সেখানে জয় অনিবার্য। তাই তিনি পরবর্তী কালে বলেছেন "জয় জয় সত্যের জয়" এবং "যেন রসনায় মম সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গসম"।

অর্থাৎ, সঞ্জীবনী সভায় কবি ক্ষাত্রধর্মের যে দীক্ষালাভ করেছিলেন, পরবর্তী কালে তারই সঙ্গে আপন আদর্শ যুক্ত হয়ে তা ব্যাপক মর্যাদা লাভ করে।

সঞ্জীবনী সভায় গীত এই শপথ-সংগীতটির মধ্যে যে স্বাদেশিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে, তার প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। এই গানের কথা স্মরণ করেই তিনি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন—

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার—
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তার।

ধন্য হইল মানবজনম,
ধন্য তরুণ প্রাণ—
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎমাঝে
আমারো রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে,
"এই লহ, মাত, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে।"

—মানসী 'পরিত্যক্ত' ১৮৮৮

প্রকৃতপক্ষে, 'তোমারি তরে মা' এবং 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গান দুটিকে একই সময়ে এবং একই উদ্দেশ্যে রচিত বলে অনুমান করা অন্যায় হবে না। প্রথমটিতে কবি ব্যক্তিগতভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয়টি ঐ সভায় গীত হয়েছিল সমবেতভাবে। আর আশ্চর্যের বিষয় স্বর্ণলতা দেবী-রচিত পূর্বোক্ত গীতটিতে এই দুই সংগীতেরই মিলিতরূপ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ গানের—

জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারতমাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান্।

—এই অংশে আছে 'তোমারি তরে মা' গানের শপথবাক্যের প্রতিধ্বনি। অপরপক্ষে—

একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
··· প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলিতে 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' প্রভৃতি সমবেত সংগীতটিরই বাণী শোনা যাচ্ছে। তাই উক্ত দুটি গানই মোটামুটি একই কালে, অর্থাৎ ১৮৭৪ সালের শেষাংশে বা ১৮৭৫ সালের প্রথমাংশে রচিত বলে ধরে নেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশচিন্তা থেকেই রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গান 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'। এই গানটি তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী'

(১৮৭৫, নভেম্বর ৩০) নাটকের প্রয়োজনে লিখে দিয়েছিলেন, তার ইতিহাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। গানটির পাদটীকায় লেখা আছে ইংরাজি স্বুরে গেয়। এইভাবে হয় কোনো প্রয়োজনে, নয় নিতান্তই আন্তরিক আবেগে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলল।

এই ধারা আরও বেগবান্ হল 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের পর (১৮৭৭/১২৮৪ শ্রাবণ)। এই পত্রিকায় কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখার সঙ্গে গানও স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠল। 'তোমারি তরে মা' প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল এবং ঐ বৎসরেরই বিভিন্ন সংখ্যায় ভানুসিংহ ঠাকুরের বেশ কয়েকটি পদ প্রকাশিত হয়। এই পদগুলি যে গান হিসাবে গেয় তারই নির্দেশস্বরূপ সুর-তালের উল্লেখ করা ছিল। কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে এই পদগুলির সাহিত্যমূল্য বিচার করা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে ঐ পদগুলির আলোচনা থেকে নিরস্ত থাকা গেল।

ইতিমধ্যে ১৮৭৮ সালে 'জাতীয় সংগীত' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের চারটি গান সংযোজিত হয়েছিল— 'তোমারি তরে মা', 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা' এবং 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি'। এরমধ্যে প্রথম গানটির আলোচনা করা হয়েছে। বাকি তিনটি সম্পর্কে স্বদেশী-সংগীত বিভাগে আলোচনা করা যাবে। এরপরে ভারতীর প্রতি বর্ষে প্রতি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গান প্রকাশিত হয়। তার কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'পরিশেষ' বিভাগে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গানের পৃথক্ বিচার করা ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অবান্তর মনে করি। তাই গানগুলিকে বিষয় অনুযায়ী বিভক্ত করে এবং কোন্ বিষয়ে কবি কতখানি উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছিলেন, তারই আলোচনা করা সমীচীন হবে।

(৪) রবীন্দ্রসংগীতের বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ

'ভারতী' যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়ল, তখন রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাবার প্রস্তাব এল। কিন্তু তার পূর্বে আমেদাবাদে মেজদাদার নিকট ইংরেজী আদবকায়দা শিখবার পালা। এই পর্বটায় কবি সে সব রীতিনীতি কতটা শিখলেন সন্দেহ, কিন্তু কাব্যে-গানে নিজেকে পেলেন নূতন করে। প্রকাণ্ডবাড়ি

ও গভীর নীরবতায় তিনি যেন নিজের মধ্যে নূতন নূতন উপলব্ধির স্বাদ লাভ করলেন। এই সময়ই তাঁর নিজের সুরে প্রথম গান সৃষ্টি।

"শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া" তিনি স্বকীয় ভাব ও সুরে প্রথম গান রচনা করলেন—'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়'। এই আমেদাবাদ ও বোম্বাইবাসের পর্বেই তিনি 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি', 'আঁধার শাখা উজল করি', 'বলি ও আমার গোলাপবালা' প্রভৃতি গানগুলি রচনা করেন। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটিরও প্রথম খসড়া তিনি এই যুগেই করেছিলেন বলে জানা গেছে। পরে গানটিকে কিছু পরিবর্তিত করে ভগ্নহৃদয়ের উৎসর্গ-সংগীতে রূপ দেন। তারও পরে গানটি পরিবর্তিত হয় ব্রহ্মসংগীতে।

যাই হোক, 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' থেকে শুরু করে আমেদাবাদ-পর্ব পর্যন্ত প্রথম যুগের কয়েকটিমাত্র গানের মধ্যেই দেখি কবি একাধারে স্বদেশ, প্রেম ও ভগবৎবিষয়ক— সর্বপ্রকার ভাবেরই গান রচনা করেছিলেন। কাব্যে, প্রবন্ধে যেমন তিনি বিচিত্র চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, গানও সেই বিচিত্রতাতেই পরিপূর্ণ হল। তাঁর তদানীন্তন সংগীতগ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া'তে বিবিধ, ব্রহ্মসংগীত ও জাতীয়সংগীত— এই তিনভাগে গানগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই বিভাগ সম্ভবতঃ রবীন্দ্রকৃত। 'রবিচ্ছায়া'র বিষয়বিভাগ সম্পর্কে সে যুগের সঞ্জীবনী পত্রে বলা হয়েছিল, গ্রন্থটি "প্রেমসংগীত, শোকসংগীত ও ধর্মসংগীতে পরিপূর্ণ।" প্রেম, শোক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সংগীতগুলিকে আসলে রবিচ্ছায়ার 'বিবিধ' বিভাগের অন্তর্গত করে নেওয়া হয়েছে।

রবিচ্ছায়ার গানগুলির বিষয়বিভাগের সঙ্গে পরবর্তী গীতবিতানের শ্রেণীবিভাগ কিন্তু এক নয়। কারণ, তাঁর জীবনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানসিকতার বিবর্তন ঘটে গেছে অনেকখানি। প্রথম যুগে রচিত ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশীসংগীতগুলি তাঁর মনোমাধুর্যপূর্ণ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ছিল প্রয়োজনে লিখিত। অপরপক্ষে, প্রেম, শোক ইত্যাদি ভাব অনেকক্ষেত্রে তাঁর মনে স্বতঃই উৎসারিত হয়ে তাঁর কাব্যে-গানে অবারিত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাই মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি আপন মনের আন্তরিক অনুভূতিগুলিকে 'বিবিধ' বিভাগের অন্তর্গত করে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছেন।

অপরদিকে, গীতবিতান সংকলনের পূর্বে নৈবেদ্য থেকে গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের যুগে তাঁর মনে ভগবৎপ্রেমই প্রধান স্থান দখল করেছিল।

তাই বোধহয় গীতবিতানে সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে 'পূজা', তারপরে স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি।

যাই হোক, কোন্ বিভাগের স্থান কোথায় হওয়া উচিত তা আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় নয়। পরন্তু, আদিযুগের গানে কতগুলি শ্রেণীবিভাগ করা যায় অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা কতদূর, তাই এ ক্ষেত্রে বিচার্য। এই পর্যায়ের গানগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।—১. স্বদেশ, ২. ধর্ম বা ব্রহ্মসংগীত [পূজা], ৩. প্রেম, ৪. নাট্যসংগীত, ৫. হাসির গান [সেগুলির বেশির ভাগই নাটকের অন্তর্গত] ও ৬. বিবিধ।

স্বদেশ—রবীন্দ্রমানসের অন্যতম বিশেষ চিন্তা স্বদেশ। জ্ঞানে, কর্মে, চিন্তায়, কৃষ্টিতে মানুষ দেশকে বিচিত্ররূপে গড়ে তুলবে এই ছিল কবির স্বদেশ-ভাবনা। তিনি বলেছেন—

> "দেশ মানুষের সৃষ্টি··· মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।··· দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।"
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫

সৌভাগ্যক্রমে বাল্যকালে কবি একটি স্বাদেশিক পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মানুষের সাধনায় যে দেশ 'চিন্ময়' হয়ে ওঠে—কবির এই আদর্শ সেদিন ঠাকুর পরিবারের সহায়তায় তথা হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার প্রেরণায় প্রাণবন্ত হতে পেরেছিল। এই প্রেরণা কবির জীবনে কিরূপ কার্যকরী হয়েছিল তার পরিচয় আছে তাঁর সমগ্র জীবনের কর্ম ও সাহিত্য-সাধনায়। বিভিন্ন অধ্যায়ে তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে। আলোচ্য অধ্যায়েও দেখি তাঁর শৈশবের বহু গানই স্বদেশ-অনুভূতির প্রেরণাতেই রচিত হয়েছিল। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটিকে এই আলোচনায় সর্বপ্রথম সংগীত বলে গণ্য করা হয়েছে। গানটি সঞ্জীবনী সভার প্রয়োজনে লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান। সেই বিচারে এইটি তাঁর প্রথম স্বদেশ-সংগীত বলে বিবেচনা করব। এই প্রসঙ্গে 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' গানটির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সঞ্জীবনী সভার উদ্দীপনাতেই কবির সংগীত তথা জাতীয়সংগীত রচনার হাতেখড়ি হয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই সময়েই তিনি 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি স্বদেশীভাবের কবিতাগুলিও লিখেছিলেন। 'প্রকৃতির খেদ' রচনার প্রায় সমকালেই কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের নাট্যরসকে পূর্ণাঙ্গ

করার জন্য 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি রচনা করে দিয়েছিলেন। নাটকটির মধ্যে জাতীয়তার ভাবকে প্রখর ও বেগবান্ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই গান রচনা। এর থেকেই অনুমান করা যায়, শিশুকবির মনেও স্বদেশী ভাবটি সেদিন কেমন বেগ এনে দিয়েছিল। শুধু লোকের মনে উত্তেজনা সঞ্চার করাই নয়, এই রচনাগুলির মাধ্যমে কবি আত্মতৃপ্তিও পেতেন অনেকখানি।

যে যুগে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়সংগীত রচনা করছিলেন, সেই সময়ে 'জাতীয়-সংগীত' বা ন্যাশনাল সঙ্ রচনা ও সম্পাদনে একশ্রেণীর যুবকের উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে 'জাতীয় সংগীত' নামে একটি ক্ষুদ্র গীতসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের কোনো গান ছিল না। 'জাতীয় সংগীতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় অগাষ্ট ১৮৭৮ (ভাদ্র ১২৮৫) ; এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের চারটি গান সংযোজিত হয়। পূর্বোল্লিখিত 'তোমারি তরে মা' গানটি এই চারটির মধ্যে একটি। এছাড়া, 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা' ও 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি'— এই তিনটি গান ঐ গ্রন্থে সংযোজিত হয়। 'রবিচ্ছায়া'য় 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' ও 'ভারত রে তোর' এই গান দুটি সংকলিত হয় নি। বর্তমানে গীতবিতানের অন্তর্গত হয়েছে।

'ভারত রে তোর' ও 'অয়ি বিষাদিনী বীণা'য় হিন্দুমেলায় উপহার ও প্রকৃতির খেদ কবিতাদ্বয়ের প্রতিধ্বনি যেন শোনা যায়। যে ভারতে একদিন হিন্দুর বিজয়পতাকা উড়েছিল, যে ভারত একদিন স্বাধীনতার অলংকারে সজ্জিত হয়েছিল, শান্ত তপোবনে ধ্বনিত হত ঋষির সামগান, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরের শাসনে ভারতময় শান্তি বিরাজ করত সেদিন আজ আর নেই। আজ ভারতবর্ষ 'বিধবা' রূপী। তাই তার জয়গান করা বা তার 'তরে অলংকার' 'নিরমাণ' করা আজকের দিনে নিষ্প্রয়োজন। এই কথাগুলি তিনি বারেবারে একই সুরে বলেছেন উক্ত কবিতা ও সংগীতগুলিতে। 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' সংগীতটি হিন্দুমেলায় পঠিত বা গীত বলে অনুমান করা হয়েছে। এই সময়কার গানগুলিতে প্রায়ই 'বিষাদ', 'বিষাদিনী', 'বীণা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রয়োগ বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' থেকে গৃহীত বলে অনুমান করা যায়। 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা' গানটিতে কবির সংগ্রামী মনোবৃত্তি যেন জাগরিত হয়েছে। 'মৃতভারতে প্রাণসঞ্চারে'র জন্য তিনি সঞ্জীবনী সভার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বলেছেন—

'গাবে যদি গাও রে সবে, গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে—
ভীষণ প্রলয়সঙ্গীতে জাগাও, জাগাও, জাগাও রে এ ভারতে।...
আনন্দরাগিণী আজি কেন বাজিছে এত হরষে—
ছিঁড়ে ফেল্ বীণা আজি বিষাদের দিনে॥'

ধর্ম বা ব্রহ্মসংগীত—স্বদেশী-সংগীত রচনার পরে কবির ব্রহ্মসংগীত রচনায় উত্তরণ। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ব্রাহ্মপরিবারে। তাই ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় ও মাঘোৎসবের প্রয়োজনে তাঁকে ব্রহ্মসংগীত রচনা করতে হত। এ প্রসঙ্গে কবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—

"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"

—জী-স্ম, পাণ্ডুলিপি : 'সংগীতচিন্তা', আত্মকথা

ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য তাঁর ভগবৎবিশ্বাস জন্মগত হলেও কবির কাছে এ বিশ্বাস ছিল তাঁর আন্তরিক অনুভূতির বিষয়। তিনি আসলে গানের মধ্যে দিয়ে একটা পূজার আস্বাদ অনুভব করতেন। সেই কারণেই শৈশবের মাঘোৎসব-খেলায় আর সবই 'অর্থহীন' হলেও গানটি ছিল যথার্থই অন্তরের নিবেদনের বিষয়। কারণ—

"গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়ে উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে— তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যেভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।"

—সংগীতচিন্তা, 'আত্মকথা'

গানের সুরের মাঝখান দিয়ে কবি চিরদিনই 'অনির্বচনীয় আবেগ' অনুভব করতেন। তাই তাঁর গান ও ঈশ্বরচিন্তা যখন একাধারে মিলিত হত তখন স্বভাবতঃই তার মূর্ছনা কত আন্তরিক, আধ্যাত্মিক ও উচ্চস্তরের হোতো তা অনুমান করা বোধহয় আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন। এই

ঐকান্তিক অনুভূতি তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানান্তরের মধ্যে দিয়ে একেবারে উপলব্ধির উচ্চশিখরে পৌঁছেছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে তারই একটা অংশ নিয়ে সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করা গেল।

১২৮৭ সালের মাঘোৎসবের জন্য কবি সাতটি গান রচনা করেন। ঐ গানগুলিতে দেখি তিনি ভক্তহৃদয়ের পূজা নিবেদন করছেন তাঁর হৃদয়-সংগীতের মাধ্যমে—

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমার রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত ॥…
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি।
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী সেই সভা মাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত ॥

কখনও আবার জগতের 'পিতা'র নিকট প্রার্থনা করেছেন—

হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
দিবে কি বিমল করি প্রসাদসলিল দিয়া ॥

এই পিতাকেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'রূপে পূজা করেছেন এই পর্যায়ের সংগীতে। বাস্তব জীবনের গ্লানি, কালিমা যেখানে পৌঁছাতে পারে না সেখানেই কবি আশ্রয়লাভ করেন জগৎপিতার কোলে।—

জগৎপতি হে, কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ॥
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, হলাহল কিছু হেথা নাই—…
বিষয়ের মান অভিমান করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন—

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে, জগৎপিতার কাছে তাঁর এই নিবেদন একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ; কেবলমাত্র মাঘোৎসবের প্রেরণায় নিবেদিত সমবেত অর্ঘ্য নয়।

১২৮৯ সালের মাঘোৎসবের জন্য কবিকে আবার একগুচ্ছ সংগীত রচনা করতে দেখি। সংগীতগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে 'পরিশেষ' বিভাগে। এইসব গানগুলি সবই ছিল ফরমাইসি। কিন্তু পূজার গান যে পরবর্তী কালে তাঁর শ্রেষ্ঠ আরাধনার বিষয় হয়েছিল, সেকথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যেও তাঁর অন্তরের শ্রেষ্ঠ পূজা নিবেদিত হয়েছিল।

কিন্তু এগুলির সূচনা বহু পূর্বেই হল ব্রহ্মসংগীত রচনার মাধ্যমে; 'পূজা' নিবেদনের অর্ঘ্য সজ্জিত হল তাঁর কৈশোরক-পর্বেই।

প্রেম—এই পর্বে তাঁর সংগীতগুলিতে প্রাচুর্য এনেছে তাঁর প্রেমসংগীতগুলি। আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসপর্বে এই প্রেমসংগীতের প্রথম কিস্তি রচিত হয়। বোম্বাইবাসের সময় আন্না তড়্খড় নামক একটি তরুণীর সঙ্গে কবির খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে কবি 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এই তরুণীটিকে ভালবেসে কবি নাম দিয়েছিলেন 'নলিনী'। রবীন্দ্র-জীবনীকার অনুমান করেন এই পর্বে রচিত 'শুন নলিনী, খোল গো আঁখি' এবং 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না' এই গান দুটি কবি তাঁর উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন।[২২] নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে দিয়ে কবি 'শুন নলিনী' গানটিতে বলেছেন—

দেখো তোমারি দুয়ার-'পরে
সখী, এসেছি তোমারি রবি॥
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখো ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি।

সে যাই হোক, তরুণ-কিশোর বয়সে আপন মনের প্রেম-আবেগেই কবি অজস্র সংগীত রচনা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি তাঁর নিজের বা জ্যোতিদাদার নাটকে নাট্যরসকে সজীব করতে নাটকগুলির অন্তর্গত হয়। ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রকৃতির প্রতিশোধ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী (১৮৮০), স্বপ্নময়ী (১৮৮২) প্রভৃতি নাটকে কবির অসংখ্য গান অঙ্গীভূত হয়ে আছে। শৈশব সংগীত, কড়ি ও কোমল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আবার কতগুলি গান কবিতা আকারেও স্থান পেয়েছে। নাটকগুলিতে কিছু 'পূজা'র সংগীতও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের বৈশিষ্ট্যও তাঁকে পূর্ববর্তী যুগের থেকে পৃথক করে রেখেছে।

'ভগ্নহৃদয়' কাব্যনাট্যটিতে কয়েকটি প্রেমের গানে কবি পাত্রপাত্রীদের চরিত্র বিকশিত করেছেন। কবিচরিত্রটি তাঁর অন্তরের প্রেমভাবে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন—

---

২২ র-জী. পৃ ৮৮

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে একটি মধুর মুখ।...
বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে মুখানি মধুর অতি।

এই নাটকেও 'নলিনী' নামটি কবিকে মুগ্ধ করেছে—

শুনেছি-শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি-শুনেছি তাহা!
নলিনী-নলিনী-নলিনী-নলিনী
কেমন মধুর আহা!

প্রেমের গান কবি পরিণত বয়সেও লিখেছেন প্রচুর। তবে প্রেমসংগীতগুলি বেশির ভাগই তাঁর মায়ার খেলা, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা প্রভৃতি নাটকগুলিরই অন্তর্গত। গানের মধ্যে দিয়ে নাটকে প্রেমের রসকে পরিপূর্ণতা দান করার প্রবণতা তাঁর প্রথমজীবন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত দেখা যায়। শুধু গীতিনাট্য বা কাব্যনাট্যে নয়, পরবর্তী জীবনে গদ্যনাটকেও তিনি গানের সাহায্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাট্যসংগীত—নাটকের মধ্যে সংগীত রচনা করার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। রবীন্দ্রপূর্বযুগে গানের সাহায্যে নাটককে পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট করার কথা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। এমনকি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যিনি রবীন্দ্রসাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম কর্ণধার তাঁর নাটকগুলিকেও পরিপুষ্টি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যেদিন তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের জন্য 'জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' লিখে দিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' ও 'স্বপ্নময়ী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি সংগীত রচনা করেছিলেন। কালানুক্রমিক তালিকায় প্রত্যেকটি গানের উল্লেখ আছে। 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর,' 'আঁধার শাখা উজল করি' প্রভৃতি প্রথমযুগের গানগুলিও স্বপ্নময়ীর অন্তর্গত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনমত নিজের নাটকেও উক্ত গানগুলি ব্যবহার করেছেন। 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি' গানটি প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরেই লিখেছিলেন 'মানময়ী' নাটকের জন্য। পরে গানটি পৃথক্‌ভাবেও প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ নাটকে কতগুলি গান আছে তার বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন জীবনীকার প্রভাতকুমার তাঁর 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' (১৩৮০) গ্রন্থে।

এক্ষেত্রে মোটামুটি উল্লেখ করা যায় যে, 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটির প্রয়োজনে প্রথমে তিনি লিখেছিলেন এগারোটি গান (ভারতীতে)। গ্রন্থে দুটি গান বর্জিত হয়। 'রুদ্রচণ্ড' নাটকটির জন্য তিনি মাত্র দুটি গানই লিখেছেন— 'বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল' ও 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল'। দুটিই পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে কবিতা আকারে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থের 'কৈশোরক' অংশে। গানগুলির প্রথম খসড়া পাওয়া যায় মালতীপুঁথিতে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও আছে এগারোটি গান। নাটকের তত্ত্ব ও গতিটিকে প্রাণবান্ করেছে এই গানগুলি। এর অনেকগুলি আজও জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'হ্যাদে গো নন্দরানী।' এই গানটি রচনার ইতিহাস ও উপলব্ধি সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

> "কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—
>
> হ্যাদে গো নন্দরানী,···
>
> সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে— সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না ; সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায় ; সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য, পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট— কেননা, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।"

—জী-স্মৃ, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

কবির এই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় যে, এই একটি গানই যেন সমগ্র নাটকটির মূল কথাটি ব্যক্ত করে দিয়েছে। এখানেই রবীন্দ্রনাট্যে সংগীত রচনার সার্থকতা। বলা বাহুল্য, পরবর্তী প্রতীক নাটকগুলিতে গানের দ্বারা কবির ভাবনাকে স্পষ্ট করা ও নাট্যরসকে ঘনীভূত করার প্রবণতা আরো ব্যাপক হয়। তবে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য

আদর্শে রচিত, তাই গান অপেক্ষাকৃত কম। রবীন্দ্ররচিত এই 'হ্যাদে গো নন্দরানী' গানটি ও রবীন্দ্রকৃত তাঁর এই ব্যাখ্যাটি কবির অন্তরে প্রকৃতির প্রতি যে একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তারই যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান বলতে আজ আমরা যা উপলব্ধি করি তা কবি সে যুগে একটিও লেখেন নি। প্রাকৃতিক শোভার প্রতি মুগ্ধতা বা প্রকৃতির সঙ্গে যে তাঁর একটি আত্মীয়তাবোধ ছিল, তা অবশ্য ছেলেবেলায় রচিত বহু কবিতা, নাটকে, প্রবন্ধে দেখা যায়। 'বর্ষা ও শরৎ'-ঋতুর প্রতি আকর্ষণের কথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তেও বলেছেন। এমন কি গান রচনা করতেও দেখি—

আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।

এখানে প্রকৃতির শোভায় কবিমনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি নিজে যেখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, প্রাণ পেয়েছে, কবিমনের কথা ও প্রকৃতির অনুভূতি যেখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, সেখানে কবি আদিযুগের কালসীমা অতিক্রম করে গেছেন। এই ব্যাপক উপলব্ধি তাঁর পরিণত মনের প্রকাশ। তাই আদিযুগের সাহিত্যে একটা অভাব রয়ে গেছে— তা হল প্রকৃতির গান।

এই নাটকগুলিতে গান লিখে নাটকের তথ্য বা কাহিনীকে স্পষ্টতা দান করে কবি তৃপ্তি লাভ করলেন। কিন্তু শুধুমাত্র গান লেখার আনন্দে ও গানকে বাঁধনহীন করার আবেগে তিনি রচনা করেছিলেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কাল-মৃগয়া'র গানগুলি। স্পেন্‌সরের প্রবন্ধ পড়ে তিনি বাল্মীকিপ্রতিভার সংগীত-রচনার উদ্দীপনা পেয়েছিলেন, সে কথা সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যায়ে আলোচনা করা যাবে। "ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ ;" "অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া"— সব মিলিয়ে বাল্মীকিপ্রতিভা আসলে "সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা" ; কবি মনে করেছেন "সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই।"— (জীবনস্মৃতি, 'বাল্মীকিপ্রতিভা')।

এই নাটকের গান লিখে ও নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করে কবি 'কাল-মৃগয়া' নাটক রচনা করেন। তিনি বলেন—

"ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেইসময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।… গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।

এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।... কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।"

—জী-স্মৃ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'

এই খুশি হওয়ার আরো কারণ ছিল। নাটক দুটিতে সুরবৈচিত্র্যের সঙ্গে ভাববৈচিত্র্যেরও সমাবেশ ঘটেছে। ডাকাতদের মত্ততা ও তাদের জল্পনাকল্পনা নাটকটিতে প্রচুর **হাস্যরসের** সঞ্চার করেছে। গানে হাসির প্রয়োগ তিনি এইভাবেই প্রথম আনলেন। সাহিত্যে হাস্যরসেরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে—

"নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু হাস্যরসের কবিতা-গান লেখেন। কিন্তু কবিতাগুলি সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে 'নির্মল শুভ্র' ছিল না। বরঞ্চ, তাঁর গানগুলি ছিল নির্মল হাস্যরসে মণ্ডিত। তবুও পবিত্র হাস্যরসের প্রতি রবীন্দ্রমন আকৃষ্ট হয় প্রধানতঃ বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করেই। তবে গানে-নাটকে তাকে প্রয়োগ করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা বোধহয় তিনি পেয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাছ থেকে। স্মৃতিচারণ করে কবি বলেছেন—

"বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা[২৩] একবার কী-একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন,... এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত।"

—জী-স্মৃ, 'বাড়ির আবহাওয়া'

ঐ অদ্ভুত গানের পদগুলি অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গানটির

এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।

---

২৩ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে 'বড়দাদা' নন, জ্যোতিদাদা। ভ্রমক্রমে তিনি বড়দাদার নাম উল্লেখ করেছেন।

পদগুলি বোধহয় শিশুর মনকে বিশেষভাবেই উৎসাহ দিত। তাই বাল্মীকিপ্রতিভায় এ জাতীয় অট্টহাসির প্রয়োগ কবি করলেন অনায়াসেই। কালীমাতাকে স্মরণ করে দস্যুরা সুরাপানে মত্ত হয়ে গাইল—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!···
আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল।
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

দস্যুদের কথাবার্তাও বেশ কৌতুকপ্রদ। প্রথম দস্যু নেহাতই ভীরু। সে একটি বরাহের ভয়ে আত্মগোপন করে সভয়ে গাইল—

প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী।
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে, আমি চুপ করে ওই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও একটি হাসির গানের দৃষ্টান্ত দেখি।—

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে।
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা—
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে॥

হাস্যরসের গানরচনা ও অভিনয়ে জ্যোতিদাদার প্রহসনগুলি থেকেও রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বাল্মীকিপ্রতিভায় অভিনয়ের পূর্বেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে হাস্যরস প্রয়োগের অভিজ্ঞতা কিছুটা সঞ্চয় করেন। এ বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহায়তার কথাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এইসব অনুভূতি ও প্রেরণা তাঁর অন্তরে অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়েছিল। তারই প্রকাশ ঘটল ছেলেবেলাতে রচিত হেঁয়ালিনাট্য রচনায় ও গানে। এই ধরনের হাসির গান লেখার প্রবণতা পরবর্তী যুগে আরো বেশি দেখা যায় 'গোড়ায় গলদ', 'শেষরক্ষা', 'বশীকরণ', 'মুক্তির উপায়', 'চিরকুমার-সভা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনগুলিতে।[২৪]

বিবিধ—কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ আরো কিছু সংগীত রচনা করেছিলেন নানা উপলক্ষে। প্রায়ই তাঁকে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানাদির জন্য গান লিখে দিতে

২৪ দ্রষ্টব্য— সরোজকুমার বসু : রবীন্দ্ররঙ্গ, পৃ ১২৩-১২৫

হত। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে (১৫ শ্রাবণ, ১২৮৮) তিনি তিনটি গান রচনা করে দেন। আদিব্রাহ্মসমাজের বিধান অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন হয় নি। ফলে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হিসাবে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) কবির কাছে সংগীতগুলি শিক্ষা করে অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন।[২৫] এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, বিবাহ-সংগীত হলেও গানগুলি গতানুগতিক বিবাহ বর্ণনার নিয়ম-বহির্ভূত ছিল। এ বিবাহের পুরোহিত জগৎগুরু। তাঁর হাতেই যেন দুটি পুরুষ ও নারীকে তুলে দেওয়া হল।—

জগতের পুরোহিত তুমি— তোমার এ জগৎ মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।

এই গানে ইংরেজ কবি Shelleyর 'Love's philosophy' কবিতার প্রতিধ্বনি যেন শোনা যায়। ঐ কবিতাটিতে কবি লিখেছেন—

The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় কবি শেলীর এই ভাবটি আত্মস্থ করে নিয়ে তাকে প্রয়োগ করেছেন নিজের গানে, এ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক হবে না।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এই দুটি হৃদয় একত্রে সেই জগৎপিতার নিকটেই আশ্রয়-লাভ করতে চায়। তাই কবি বললেন—

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বলো, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়॥···
তোমারি অনন্তহৃদে দুটিতে মিলিতে চায়॥

প্রভুর চরণলাভে আকাঙ্ক্ষিত দুটি হৃদয় যথার্থ প্রেমের শিক্ষালাভ করতে চায়—

২৫ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন : 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ', কথাসাহিত্য, ১৩৭০ ফাল্গুন

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর ॥
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন হয় না, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, এই গানগুলি শুধুমাত্র বিবাহসংগীত হিসাবেই বিচার্য হওয়া উচিত নয়। একাধারে তা ব্রহ্মসংগীত ও প্রেমসংগীত। রবীন্দ্রনাথের পূজা ও প্রেমের যথার্থ স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেই যুগেই, একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ করে।

রবীন্দ্রনাথ আরো ২৮টি গান রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর বিবাহ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এই বিবাহের আনন্দ-উৎসবের জন্য 'বিবাহ-উৎসব' নামে একটি গীতিনাটিকা রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ— সকলেই এই নাটকের সংগীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি।[২৬] তারমধ্যে 'ওই জানালার কাছে বসে আছে', 'ভালো যদি বাস সখী', 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' প্রভৃতি গানগুলি আজও বিশেষ জনপ্রিয় ও পরিচিত হয়ে আছে। বিবাহানুষ্ঠান ছাড়া নববর্ষ ও বর্ষশেষ উপলক্ষেও কিছু কিছু গান রচনা করতে দেখা যায়।

বর্ষশেষ (১২৮৯) উপলক্ষে রচিত সংগীতগুলি ব্রহ্মসংগীতের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।—

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা করো— লহো কোলে ॥

আবার নববর্ষে তিনি গেয়েছেন—

সখা, তুমি আছ কোথা—
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা ॥
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সয়েছি আমি তোমারে কব সে কথা ॥

১২৯২ সালের নববর্ষ উপলক্ষেও কয়েকটি গান রচনা করতে দেখা যায়। এই গানগুলিতেও আছে পূজার অঞ্জলি ও শোকের সুর। মাত্র এক বৎসর পূর্বে যে

২৬ দ্রষ্টব্য— ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী : 'রবীন্দ্রস্মৃতি', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩ মাঘ-চৈত্র পৃ ১৪৫-৯৫

নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন, তার রেশ এখনো শোনা যাচ্ছে তাঁর অন্তরের সুরে। তাই তিনি শান্তির আশ্রয় পেতে চেয়েছেন জীবনের আশ্রয়দাতার কাছে।—

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখতাপ, কত শোকদহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান ॥
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবনদ্বার —
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান ॥

আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে জন্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও কবিকে গান রচনা করতে দেখি। সম্ভবতঃ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার (মাধুরীলতা) জন্মের পর (১২৯৩, কার্তিক ৯) তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে লিখলেন—

ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন ॥

রবীন্দ্রসংগীতের প্রাথমিক রচনাপর্বেই দেখি বাণী ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়। বিচিত্র ঝংকারে রবীন্দ্রনাথ সেদিনের সংগীত-আসরে একক ও সর্বোচ্চ স্থান দখল করে বসছিলেন। উত্তরকালের যে সংগীত-ঐশ্বর্য আজ সর্বজনপরিচিত, তার যথার্থ ভূমিকাটি তিনি নিজেই গঠন করলেন তাঁর আত্মানুভূতির ভিত্তিতে।

আর শুধু বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, তার সঙ্গে চলল সুর, তাল, ছন্দ, ধ্বনি নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই বিচিত্রতা সৃষ্টিতেও নানা পারিপার্শ্বিক প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই বিভিন্ন প্রভাব স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ধ্বনিতরঙ্গ ও সুরমূর্ছনা সৃষ্টি করলেন, তা নিতান্তই তাঁর নিজের। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা তা স্পষ্ট করার প্রয়াস করা গেল।

(৫) গীতসংকলন : রবিচ্ছায়া

আদিপর্বের সংগীতগুলি বিচার করতে গিয়ে কবির প্রথম গীতসংকলন-গ্রন্থ সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সেই গ্রন্থটির নাম 'রবিচ্ছায়া'। বইটির প্রকাশ ও নামকরণের মধ্যে একটা ইতিহাস আছে। তৎকালীন 'সাহিত্যামোদী' 'উৎসাহী যুবক' যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র তরুণকবির গানগুলি সংগ্রহ করে 'রবিচ্ছায়া' নামে প্রকাশ করলেন (বৈশাখ ১২৯২)। প্রকাশকালে প্রকাশক বলেন, "১২৯১ সনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।"

গানগুলি সংগ্রহ করে যোগেন্দ্রনারায়ণ রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে বইটির নামকরণ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বললেন, "নামটি একটু poetic হওয়া আবশ্যক।" রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন—

> "আলোছায়া বল্লে কেমন হয়? আর, 'রবিচ্ছায়া' যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে— যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য। আমার সঙ্গে এর আর কোনো সম্পর্ক নাই।"

প্রকৃতপক্ষে, গানগুলিকে প্রকাশ করার ইচ্ছা কবির ছিল না। 'রচয়িতার নিবেদনে' তিনি তাই বলেন—

> "ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত-স্থায়ী সুখদুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল— সেইসকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোনো আনন্দ নাই।··· অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়।··· এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।"

কবির এই উক্তি থেকে তাঁর তৎকালীন গানের স্বরূপটি বোঝা যায়। কিন্তু এ উপলব্ধি একান্তই কবির ব্যক্তিগত। তাঁর গানের বিশেষত্ব সে যুগেই কিরূপ স্বতন্ত্র ছিল এবং গানগুলি পাঠক ও শ্রোতার মন তখন থেকেই কিভাবে হরণ করেছিল তা স্বয়ং প্রকাশক ও তদানীন্তন একটি পত্রিকার মন্তব্য থেকে জানা যায়। প্রকাশক তাঁর 'বক্তব্যে' বলেছেন—

> "তাঁহার কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী, তাঁহার সঙ্গীতগুলি ততোধিক সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি তান লয় সুরযোগে যখন গীত হয় তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে সকল সঙ্গীত আকাশ ভাসাইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসার-দাব-দাহে দগ্ধ মানব-মণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার কাননে 'তমস-ঘন-ঘোরা-গহন-রজনী'র নাম শুনিয়া কোন্ পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'র উদ্দেশ পাইয়াই বা কোন্ অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব

জাগিয়া উঠে, ঘোর সংসারমুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাসভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নবভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে, তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুরভাবে হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।··· ভাল গানের অভাব,··· দূরীকরণ করা এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য।"

সমকালীন 'সঞ্জীবনী পত্রে'র সমালোচনাতেও (১২৯২ বৈশাখ ২০) বলা হয়—

"রবীন্দ্রবাবু ২৫ বৎসর বয়স পার না হইতেই একজন বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। সঙ্গীত প্রণয়নে তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাহা "রবিচ্ছায়া" পাঠে বিশেষরূপে অবগত হইলাম।··· সঙ্গীতগুলি যেমন সরল, সুমিষ্ট ও কবিত্বে পূর্ণ, তেমনই মনোহারিণী রাগিণীতে সংবদ্ধ। এমন হৃদয় মুগ্ধকর সঙ্গীত বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন কিনা আমরা জানি না।"

এই দুই উক্তি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তৎকালেই বাঙালী সমাজে বিশিষ্ট সংগীতরচয়িতারূপে কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত বিষয়গুলি যে পাঠকের অন্তর পর্যন্ত মথিত করতে পারত, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সে যুগ থেকেই। পূর্বেই তাঁর সংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার সমর্থন পাওয়া গেল এই উক্তিগুলি থেকে। 'মানসী'র কবিকে জানতে গেলে 'সন্ধ্যাসংগীত' বা তৎপূর্বযুগের কাব্যইতিহাস যেমন জানা দরকার, তেমনি পরবর্তী কালে গভীরতর ও নিবিড়তর ভাবনার দ্যোতক যে সংগীতগুলি, সেগুলি রচনার মানসিক ভিত্তিটি জানার জন্য 'রবিচ্ছায়া'র রচয়িতার পরিচয়টিও জানা প্রয়োজন।

এই আলোচনা তথা রবিচ্ছায়ার জনপ্রিয়তা থেকেই অনুমান করা সহজ, রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের গানগুলি সেদিন কেমন ব্যাপকভাবে জনচিত্তকে অধিকার করতে শুরু করেছিল। আর এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) মত অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী ও সুকণ্ঠ গায়ক অনুষ্ঠানে, ধর্মমন্দিরে, এমন কি, রামকৃষ্ণদেবকে সংগীত শোনাতে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ও অনির্বচনীয় মহিমোদ্দীপক গানগুলিকেই বেছে নিতেন। সেদিক্ থেকেও রবীন্দ্রনাথের ঐ-সব গান অমরতা লাভের যোগ্য হয়ে আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কথাসাহিত্য

(১) উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার ভিত্তিভূমিটি কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে, ('রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা-২' অংশে)। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে সবচেয়ে বড় আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম প্রমুখ লেখকগণ তখনকার সমাজ-জীবন থেকে উপন্যাসের উপাদান বিশেষ সংগ্রহ করতে পারেন নি। সমাজের নানা বাধা ও সংস্কার তাঁদের সামাজিক জীবনচিত্র অঙ্কনের প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তবে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪), 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এইসব উপন্যাসের চরিত্রগুলি ছিল প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীভুক্ত, ঘরোয়া মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্গত নয়। বরঞ্চ, 'স্বর্ণলতা'র জীবন ও চরিত্র হয়েছিল বাস্তবতর। অপরপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র এই যুগে প্রধানতঃ লিখেছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রোমান্স। সর্ববিষয়ে উৎসুক বালক রবীন্দ্রনাথ এঁদের রচনাগুলি পাঠ করেছিলেন মহা আগ্রহে।

কিন্তু এঁদের সকলেরই প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এবং প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ছত্রছায়ায় বসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই দেখালেন তাঁর স্বকীয়তা। বঙ্কিমযুগে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন— 'করুণা', 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'। এ ছাড়া আছে ক্ষুদ্র উপন্যাস 'মুকুট'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রথম উপন্যাসটি থেকেই তাঁকে গতানুগতিক রীতি লঙ্ঘন করতে দেখা যায়। সাধারণ সমাজজীবনের কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি উপন্যাস সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। আর প্রথম রচনা 'করুণা'তেই চরিত্রগুলিকে ঘরোয়া জীবন থেকে বেছে নিয়ে আরো স্বাভাবিক, আরো বাস্তব করে তুললেন। এ পর্বের ছোটো-বড়ো মিলে অন্য তিনটি উপন্যাস অবশ্য ইতিহাসের কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে

বঙ্কিমানুসারী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শে একান্তই স্বকীয়। একে একে উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই এ কথার তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে।

করুণা (১২৮৪ আশ্বিন-১২৮৫ ভাদ্র)

'ভারতী' পত্রিকার প্রথমবর্ষ থেকেই তাতে কাব্য-প্রবন্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের গল্পও প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম গল্প 'ভিখারিনী।' রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন—

"ছোটগল্প লিখিয়া বোধহয় একটু সাহস হয়, তাই 'করুণা' নামে উপন্যাস শুরু করিলেন।"

—র-জী, পৃ ৭০

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নি; তবে জীবনস্মৃতির খসড়ায় বলেছেন 'প্রথম বৎসরের ভারতী'তে 'করুণা' নামে তাঁর এক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পরিণত বয়সে এই রচনাটিকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতে চান নি। এইসব রচনাকে তিনি বলেছেন বাল্যলীলার অনেক লজ্জা'। কিন্তু ভারতীতে প্রকাশের পরেও দীর্ঘকাল করুণা উপন্যাসটির প্রতি যে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই ভারতীতে প্রকাশিত হবার সাত বৎসর পর চন্দ্রনাথ বসুর কাছে ভারতীর লেখাটি পাঠিয়ে সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। চন্দ্রনাথ বসু তার যে সমালোচনা করেন, তা করুণার সাহিত্যমূল্য বিচারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বর্তমানে করুণা উপন্যাসটি নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। উপন্যাসটির সর্বাঙ্গীণ বিচারের ক্ষেত্রে এইসব গবেষণার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার বলেছেন, 'করুণা' ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ ভাদ্রমাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। আশ্বিন মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইটি সম্পূর্ণ হতে পারে নি বলে তিনি মনে করেন।

ডাঃ সুকুমার সেনও বলেছেন—

"কাহিনী অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয় যেন কিশোর লেখক কাহিনীকে পূর্ণ পরিণতির দিকে আগাইয়া লইবার ধৈর্য, অথবা বিলাত যাইবার মুখে লিখিবার প্রেরণা হারাইয়াছিলেন। সাতাশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত আছে।"

—বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ), পৃ ৩৬৬

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ আরো অনেকেই 'করুণা'র অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন।[১]

কিন্তু কেউ কেউ আবার উপন্যাসটির সম্পূর্ণতার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ হইলেও ঘটনা-পরিণতির দিক দিয়া করুণার মৃত্যুতে ও স্বামীপ্রেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একটি স্বাভাবিক উপসংহারে পৌঁছিয়াছে মনে হয়।"

—রবীন্দ্র সৃষ্টিসমীক্ষা, ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৯

কিছুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও এ কথা বলা হয় যে,

"উপন্যাসখানিকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না।··· করুণা নামে একটি সরলা বালিকার জীবন ট্র্যাজেডিই উপন্যাসখানির কথাবস্তু। শেষ পরিচ্ছেদে করুণার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এ ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়েছে।"

—স্মরণকুমার আচার্য : 'রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস', দেশ ১৩৬৯ শ্রাবণ ১৯ পৃ ২১-২৪

বোধকরি এই মতদ্বৈধের নিরসন করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুর পত্রের আলোকে। তিনি বলেছেন—

"প্রকৃতপক্ষে, গল্প দুইটি, একটি নয়— নরেন্দ্র এবং করুণার একটি গল্প, মহেন্দ্র ও রজনীর একটি গল্প। অনেকদূর পর্যন্ত দুইটি গল্প পৃথক্ আছে,— শেষে মিলিয়াছে। আমার বোধ হয় যে দুইটি গল্প আরও গোড়ার দিকে মিলিলে ভাল হইত।"[২]

লক্ষ রাখতে হবে, তিনি 'শেষে মিলিয়াছে' বলার অর্থ, তিনি মনে করেন কাহিনীটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি এই রচনাটি সম্পর্কে নানা আলোচনা করে শেষে বলেছেন, 'গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপান আবশ্যক'। মনে হয়, গল্পটি যদি তিনি কোনো অংশেও অসম্পূর্ণ মনে করতেন তবে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন এবং সম্পূর্ণ লিখে ছাপাবার প্রস্তাবও করতেন। 'করুণা' সম্পর্কে একমাত্র চন্দ্রনাথ বসুই প্রায় সর্বাঙ্গীণ সমালোচনা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সমালোচনার জন্যই তাঁর কাছে লেখাটি প্রেরণ করেছিলেন। তাই চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনাটি পেয়ে তিনিও হয়তো এ বিষয়ে কিছু আগ্রহী হয়েছিলেন, এমন মনে করা

১ জ্যোতির্ময় ঘোষ : রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ৪২০-২৩

বোধকরি অসংগত নয়। তবে সমকালীন পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির জন্যই[৩] হয়তো পরিমার্জনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্ভব হয় নি।

এবার স্বল্প পরিসরের মধ্যে চরিত্রগুলির বিচার করে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটির মূল সমস্যাটির সমাধান করতে চেষ্টিত হব।

রবীন্দ্রনাথ 'করুণা'য় পাশাপাশি যে দুটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে প্রধান চরিত্র একদিকে নরেন্দ্র ও করুণা, অপর দিকে মহেন্দ্র ও রজনী। এ ছাড়া আছেন স্বরূপ, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি। এই চরিত্রগুলি তথা কাহিনী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ সে যুগের গতানুগতিক রীতি পরিহার করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পন্থা গ্রহণ করলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা এখানে তাঁর উপজীব্য হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল। তার একটি কারণ তাঁদের পরিবারের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। অপরদিকে কেউ কেউ অনুমান করেন, ছেলেবেলায় পৌলবর্জিনীর কাহিনী পড়ে তিনি যে সাধারণ মানুষের কথা জেনেছিলেন, তাতে তাঁর মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।[৪] তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর বহু রচনায়। সে যাই হোক, কাহিনী ও চরিত্রের এই সহজতা সে যুগের বাংলা উপন্যাস-রচনার একটি নূতন দিক্ নির্দিষ্ট করল। অন্ততঃ করুণা উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমনির্দিষ্ট গতানুগতিক পথ অনুসরণ করলেন না। 'চোখের বালি'র সূচনায় তিনি বলেছেন—

> "আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ করুণাতেই সেই 'পালার পুনরাবৃত্তি' হতে দিলেন না। অপরপক্ষে, ইংরেজি উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মনে যে ধারণা ছিল,[৫] সে পথও অনুসরণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই সব মিলিয়ে 'করুণা' থেকেই তাঁর নূতন যাত্রাপথের সূচনা।

চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যাপারে চন্দ্রনাথবাবু মহেন্দ্র চরিত্রটির দু-একটি দুর্বলতা ছাড়া চরিত্রটিকে বেশ স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন। স্বরূপ চরিত্রের অবতারণায়

৩ চন্দ্রনাথ বসু পত্র লেখেন ১৭ আশ্বিন ১২৯১ ; ঐ বৎসরেই ৮ বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু।

৪ দ্রষ্টব্য— জ্যোতির্ময় ঘোষ : রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়

৫ দ্রষ্টব্য— ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৪২

কোনো কোনো স্থানে তিনি দুর্বলতা লক্ষ করেছেন, ফলে গল্পের জমাট ভাবও কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছে। পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত বলেছেন পণ্ডিতমশাইকে। তিনি বলেছেন—

> "পণ্ডিত মহাশয়ের কথা অতি উত্তম হইয়াছে। এমন হাস্যরসময় কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বিরল।··· আর পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং? আহা এমন উন্নত চরিত্র বাঙ্গালাসাহিত্যে বড়ই বিরল। সে চরিত্র যথার্থ দেব-চরিত্র। সে চরিত্রে বাঙালী যথার্থই একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইয়াছে। সে চরিত্রের চিত্রে চিত্রকরের বড়ই মহত্ত্ব এবং গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে।··· আমার দুঃখ হয় যে, কি মহেন্দ্রের কি নরেন্দ্রের গল্প কোনোটিরই সহিত তাহা বিশিষ্টরূপে জড়িত নয়।"

নারীচরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রজনী একটি সরল, ভীরু-স্বভাবের মেয়ে। বঙ্কিম-মধুসূদনের নারীচরিত্রগুলিতে যে প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে, রজনী ঠিক সে-রকম নয়। চন্দ্রনাথ বসুও বলেছেন—

> "রজনী বড়ই চমৎকার মেয়ে। যখন মহেন্দ্র চলিয়া গেল আর রজনী 'আমি কাছে আসিয়াছিলাম বলিয়া বুঝি তিনি চলিয়া গেলেন' এই ভাবিয়া জানালায় বসিয়া··· কাঁদিতে লাগিল তখন, রবীন্দ্রনাথ, আমি যথার্থ ই ঝরঝর ধারায় কাঁদিয়াছি।"

প্রকৃতপক্ষে, রজনীকে করুণায় যেমন সরল ও সহিষ্ণুতার প্রতীক হিসাবে লেখক দেখিয়েছেন, তাতে তাকে পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির পূর্বরূপ বলে গণ্য করা যায়। 'চোখের বালি'র আশা, 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী প্রভৃতির চরিত্রে এই সহিষ্ণুতার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিত্ববোধ।

করুণা চরিত্রটিও রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ আদর্শের প্রতীক। সে-ও সহনশীল। লেখক বোধহয় নরেন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করার জন্যই করুণাকে বিপরীত করে গড়েছেন। তাই প্রথমেই বলেছেন—

> "নরেন্দ্র ও করুণায় কখনই বনিতে পারে না, দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত।"

দু-একটি স্থানে মাত্র তার ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু করুণার বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে চরিত্রটিকে পরিপূর্ণ ও জীবন্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন—

> "তোমার করুণা খুব ভাল— কিন্তু অসম্পূর্ণ— একটি ফুল মাত্র, ফল নয়— কল্পনামাত্র, কাব্য নয়— স্বপ্নমাত্র— জীবন নয়— দৃশ্যমাত্র, আদর্শ নয়।

তোমার (রুদ্রচণ্ডের) অমিয়াও তাই। আমি অমিয়াকে ভাল বলিতে পারি নাই, তাই করুণাকেও ভাল বলিতে পারিলাম না।"

এমনও মনে হতে পারে, করুণা চরিত্রটি যেন শকুন্তলার আদর্শে গঠিত। মাত্র দু-একটি স্থানে তার ক্ষীণ ব্যক্তিত্ব দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া সে 'অপরিণত', 'স্পর্শকাতর' একটি নিরীহ বালিকা মাত্র। করুণাচরিত্রের অধিকতর বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। চন্দ্রনাথ বসুর একটি উক্তি দিয়ে এ প্রসঙ্গ সমাপন করব। তিনি বলেছেন—

"করুণা কেবল কল্পনা মাত্র— মানবচরিত্র নয়, রজনী প্রকৃত মানবচরিত্র।" চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে তিনি মোহিনী-চরিত্রটির বিশেষ প্রশংসা করে বলেন—

"মোহিনী যথার্থই মহৎ এবং প্রেমময়ী। মোহিনী চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে একটি রত্ন।"

পরিশেষে তিনি একটি সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধান্ত করে বলেছেন, উপন্যাসটি কিছুটা 'analytic' হয়েছে। এর সঙ্গে অংশতঃ 'dramatic' হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। তবে স্বীকার করতে হবে বালক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এ ক্ষেত্রে ত্রুটি অপেক্ষা কৃতিত্বই বেশি। প্রথম রচনায় কিছু ত্রুটি থাকা প্রায় অনিবার্য। তবু চন্দ্রনাথ বসুর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়।—

"সাহিত্য, লোকচরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি সুগভীর এবং সুচতুর কথা দেখিলাম। সেগুলি বড় ভাল লাগিল এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-প্রণেতার যোগ্য বলিয়া বোধ হইল।"

অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, যে নূতনত্বের সূচনা করেছেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে 'করুণা'তেও সেই প্রতিভারই উদ্বোধন ঘটল। তাই করুণাকে প্রথম উপন্যাস বলে অবহেলা করা, অসম্পূর্ণ বলা বা অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য করা সংগত মনে হয় না। এই কাহিনী, এই চরিত্রগুলিই পরিপূর্ণরূপে পরিণতভাবে প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে। করুণা যেন সেগুলিরই প্রথম অঙ্কুর। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই এ কথা স্পষ্ট করে বোঝানো যায়—

"প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছোয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে।"

—রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা

এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্যও স্মরণীয়—

"ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য… সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষমাত্র সে কথা গোপনে থাকে।… কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই— অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।… কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র— তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ১ (১৩১১)

'করুণা' উপন্যাসেও লেখকের না-জানার মধ্যে দিয়ে 'অনাগতে'র সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসে লেখকের যে হাতেখড়ি হল, তা-ই তাঁকে পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়েছিল।

বউঠাকুরানীর হাট (১২৮৮-৮৯)

রবীন্দ্রনাথ যখন বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি— এই দুটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লিখছিলেন তখন বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রতিভা মধ্যগগনে। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক রোমান্স এবং যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' [তখন বঙ্গদর্শনে অংশতঃ প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮৪-৮৫), 'ক্ষুদ্রকথা' নামে] রবীন্দ্রনাথের সামনে আদর্শস্বরূপ ছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি ইতিহাস-মিশ্রিত উপন্যাস দুটি যখন লিখেছেন তখন স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি বঙ্কিমের আদর্শ অনুসরণেই এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিচার করে দেখা প্রয়োজন, তিনি আসলে কতখানি প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এবং কতখানি ছিল তাঁর স্বকীয় সম্পদ্। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের প্রয়োগ করেছেন ঐতিহাসিকের মত। অর্থাৎ ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তিনি প্রায়ই সচেতন থাকতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-আগ্রহী পাঠকমাত্র। তাই তাঁর ইতিহাস-প্রয়োগ তত নিপুণ বা নিখুঁত নয়, বরঞ্চ নিজের কল্পনামিশ্রিত।

'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের একটি প্রশংসা-পত্রের উল্লেখ করে বলেছেন—

"গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ

করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটি চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"

এই উপন্যাসে 'পরিণতি'র 'আশ্বাস' কতটুকু ছিল সেইটেই এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচার্য। এ প্রসঙ্গে কবির নিজের মন্তব্যটিও লক্ষণীয়। তাঁর এই সময়কার মানসিকতা সম্বন্ধে বলেছেন—

"প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এইসময়টাতে তার লেখনী গল্পরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউঠাকুরানীর হাট গল্পে— একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। ··· এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি ; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।"

কিশোর ঔপন্যাসিকের এই বিশিষ্ট 'কারিগরি' কোন্ নূতন পথের উদ্বোধন করল তা দেখা দরকার। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে।—

"সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে।··· বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয়-ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।··· ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা-বহুলতা এবং উপন্যাসের

হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে ; কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়।”

—আধুনিক সাহিত্য, 'রাজসিংহ' ১৩০০

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তখন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রই ছিলেন আদর্শ-স্থানীয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি প্রায় সব উপন্যাসেই বাংলাদেশের ইতিহাসের পটভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু রাজসিংহের ইতিহাস বাংলার বাইরের। অপরপক্ষে রমেশচন্দ্র প্রধানতঃ বাংলাদেশের বহির্ভূত ইতিহাসকেই উপজীব্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রধানতঃ বঙ্কিমের অনুবর্তী। কারণ তাঁর মূল অবলম্বন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস। বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী এই গ্রন্থে তাঁর প্রধান উপজীব্য। এ বিষয়ে তিনি দুটি গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। একটি রামরাম বসু- রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং অপরটি প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' (১ম খণ্ড ১৮৬৯, ২য় খণ্ড ১৮৮৪)। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থ থেকেই [১ম খণ্ড, তখনো ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় নি] মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র ও নূতন। গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বলেছেন—

“স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।”

দেখা যাচ্ছে, ঐতিহাসিক তথ্যটি সম্বন্ধেই তিনি প্রথম তাঁর স্বকীয়তা দেখালেন। তাছাড়া, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মতই নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৩০৫) প্রবন্ধে বলেছেন যে, উপন্যাসের চরিত্রগুলি এমন হবে—

“রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তি-গত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে।”

প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের অনুভূতি মিশে গিয়ে যে রসের সৃষ্টি হয়, তাই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বউঠাকুরানীর হাট রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের সেই রস সৃষ্টির সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি আসলে জীবনরসের কবি। তাঁর বিশিষ্ট জীবনভাবনা তাঁর সকল সাহিত্যসৃষ্টিতেই বর্তমান। মানুষের অন্তরের সুখ-দুঃখ-বেদনার প্রতি সহানুভূতি এবং কয়েকটি বিশিষ্ট আদর্শ ও ভাবধারা তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বউঠাকুরানীর হাটও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে ইতিহাস আশ্রয় করে উপন্যাস রচনার আদর্শটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস অতিক্রম করে মানবজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি তাতে প্রাধান্যলাভ করেছে। তাই বউঠাকুরানীর হাটে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্মটি রক্ষিত হয় নি, অপরদিকে তেমনি তা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট লেখনীর স্পর্শে বঙ্কিম-প্রভাবিত যুগেও নববৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে; সৃষ্টি করেছে উপন্যাস রচনার এক নূতন আদর্শ। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে পরিণততররূপে দেখা দিয়েছিল। সেই 'আশ্বাস'-টুকুই তাঁর প্রথম তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে অঙ্কুরিত হয়ে তাঁকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদায় স্থাপিত করেছিল।

চরিত্রবিচারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ আসলে তাঁর স্বকীয় সহানুভূতির দ্বারা চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্রগুলি ইতিহাসের ঘটনাজালের মধ্যে জড়িত হয়ে, অনেকক্ষেত্রেই ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরার উপর নির্ভরশীল হয়েছে। কিন্তু বউঠাকুরানীর হাটে ইতিহাসকে বাদ দিলেও চরিত্রগুলি আপন মহিমায় উজ্জ্বল। কারণ তারা লেখকের মানসিকতার দ্বারা সৃষ্ট। প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব তা আসলে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট সুর। কবির ভাষাতেই বলা চলে, সে দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে 'প্রেম ও প্রতাপে'র দ্বন্দ্ব, 'প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।' 'রাজা ও রানী', 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন,' 'রক্তকরবী', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি নাটক-উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বটি প্রকটিত হয়েছে। উভয় ভাবের ধারক যথাক্রমে রাজা ও রানীতে বিক্রমদেব ও সুমিত্রা, রাজর্ষি ও বিসর্জনে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য, রক্তকরবীতে রাজা ও নন্দিনী এবং যোগাযোগে মধুসূদন ও কুমুদিনী।

বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং লেখকের আকাঙ্ক্ষিত চরিত্র বসন্ত রায়। লেখকের পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন কবির জীবনের একটি প্রধান প্রেরণাস্থল। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে বলেছেন—

> "আমার এই বাল্যকালের বৃদ্ধ বন্ধুটির আদর্শেই বসন্তরায়কে [বউঠাকুরানীর হাট] আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

এছাড়া প্রাচীন পদকর্তা বসন্তরায়ের চারিত্রিক প্রতিফলনও চরিত্রটির মধ্যে আছে বলে মনে করা হয়।[৬] বসন্তরায় সংগীতে অনুরক্ত, সংসারে নিরাসক্ত, সকলের প্রতি তাঁর সমবেদনা এবং দুঃখেসুখে পরম সহিষ্ণু। এক কথায়, যে ভাবাদর্শ নিয়ে লেখক কাহিনীটি রচনা করেছেন, বসন্তরায় তারই ধারক। তাঁকে উপন্যাসের কাহিনী-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। আসলে পরবর্তী কালের অনেকগুলি নাটকে (শারদোৎসব, ফাল্গুনী প্রভৃতি) ঠাকুরদা চরিত্রের যে ভূমিকা, বউঠাকুরানীর হাটে বসন্তরায়ের ভূমিকাও অনুরূপ। এ সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

> "আমাদের দেশের যাত্রাগানে জুড়ি এবং গ্রীক নাটকের কোরাস যে কাজ করে, ঠাকুরদার কাজ অনেকটা সেইরূপ।"
>
> —বাংলাসাহিত্যের নরনারী, 'বসন্তরায়'

বসন্তরায়ের চরিত্রটি ঐরূপে অঙ্কিত হওয়ার ফলে, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের বৈপরীত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হতে পেরেছে। এক-কথায় বলা যায়, বসন্তরায় বন্ধনহীন বিশ্বপ্রেমের ধারক। একাধারে কবি ও আদর্শরাজা বসন্ত রায় কিশোর রবীন্দ্রের মনে এক মহান্ উদ্দীপনা জাগিয়েছিলেন।

অপরপক্ষে, প্রতাপাদিত্য স্বার্থপর, সংকীর্ণ আত্মপ্রীতিই তাঁর একমাত্র কাম্য। তাঁর মনে স্নেহ, প্রেম, প্রীতির কোনো স্থান নেই। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি নির্বিবাদে যে কোনো কাজ করতে পারেন। কেউ কেউ তাঁকে শেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭] রবীন্দ্রনাথ বাল্যে যে ম্যাক্‌বেথ পাঠ ও তার অনুবাদ করেছিলেন, তার প্রতিফলন প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে দেখা যায় এ অনুমান হয়তো একেবারে অযৌক্তিক নয়। কারণ, ম্যাক্‌বেথ অনুবাদের প্রতিফলন কবিরচিত অন্যান্য কোনো কোনো স্থানেও লক্ষ করা যায়,

৬ দ্রষ্টব্য : র-জী, 'বউঠাকুরানীর হাট', পৃ ১৫৫ পা-টী ২

৭ জ্যোতির্ময় ঘোষ : রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়, পৃ ১২০-২২

এ কথা 'অভিলাষ' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে (তৃতীয় অধ্যায়) উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া 'রাজা ও রানী' নাটকে রেবতীচরিত্রের যে ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আছে তা-ও লেডি ম্যাক্‌বেথের চরিত্রের প্রতিফলন বললে বোধহয় ভুল হবে না। তবে চরিত্রটি কুটিলতা বা জটিলতার প্রতিমূর্তি হলেও নির্দ্বন্দ্ব। তাই যথার্থ উপন্যাসসুলভ নয়। 'করুণা'তে নরেন্দ্র ও 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্য প্রায় একই রকম। তফাৎ শুধু একজন কল্পনাপ্রসূত, অপরজন ইতিহাস থেকে গৃহীত। এই দ্বন্দ্বহীন চরিত্রগুলি উপন্যাসের আঙ্গিকগত বিচারে যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। এখানেই বালক ঔপন্যাসিকের দুর্বলতা। এই দুর্বলতাটুকু বাদ দিলে বলা যায়, ভাব ও আদর্শের দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে নূতন পথের যাত্রীরূপে আবির্ভূত হলেন।

উদয়াদিত্য চরিত্রটির প্রতি লেখকের বিশেষ সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার চরিত্রটির প্রতি এই দৌর্বল্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, লেখকের বালকবয়সের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলিই যেন উদয়াদিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।[৮] উদয়াদিত্যের মন আসলে স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম অনুভূতি-শীল। প্রতাপাদিত্যের রুক্ষ-চরিত্র ও সংকীর্ণ মানসিকতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর হৃদয় ছিল উদার সংকীর্ণতাহীন; তাঁর প্রেম বন্ধনহীন। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তাঁর নিবিড় একাত্মতা। তাই তিনি ক্ষোভ করে বলেছেন, "রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না।"

জন্মজন্মান্তর ধরে "প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ" করার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। এই উক্তিগুলির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে উদয়াদিত্যের অন্তরধর্ম। প্রকৃতপক্ষে, উদয়াদিত্যের উক্তিগুলি যেন কবিমনেরই প্রতিধ্বনি— যার প্রকাশ বারেবারে ঘটেছে 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'রক্তকরবী' এবং আরও অনেক রচনায়।

প্রকৃতির প্রতি মনের গভীর আকর্ষণ বিভা চরিত্রটির মধ্যেও দেখা যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলির তুলনায় বিভার চরিত্রে বিবর্তনও দেখানো হয়েছে বেশি। সেইদিক্ থেকে সে অধিক জীবন্ত। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ও ঘন অন্ধকারে বিভা যেন নিজেকে বিশেষভাবে আবিষ্কার করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে চরিত্রগুলির মানসিকতা বিশ্লেষণ— এ রবীন্দ্রপূর্বযুগে বিশেষ ছিল না। এর সূচনা দেখা গিয়েছিল 'করুণা' উপন্যাসে। 'বউঠাকুরানীর হাটে' তা আরও

৮ দ্রষ্টব্য: র-জী, পৃ ১৫৫-৫৬

সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করল। এই নবপদ্ধতি প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মতই উপন্যাসসাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন দখল করলেন।

বউঠাকুরানীর হাটের যেটুকু অপরিণতি কবি অনুভব করেছিলেন তাকেই খণ্ডন করার জন্য পরে দু-বার কাহিনীটির সংস্কার করেন ও নাট্যরূপ দেন—প্রথমে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) ও পরে তাকে ভেঙে 'পরিত্রাণ' (১৩৩৬) নাটকে। এই প্রসঙ্গে বলা অবান্তর হবে না যে, বিভা চরিত্রটি এই নাটকগুলিতে পূর্ণ ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে দেখা দিয়েছে। বউঠাকুরানীর হাটে মৌনতার মধ্যে যার সূচনা, প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণে তারই পরিণতি তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কঠিন উক্তির মধ্যে।—

"The shy and silent Bibha of 1881-82 has become a dignified lady of iron-will, strong determination and forceful speech in 1929."

—**Biman behari Majumdar :**
Heroines of Tagore (1st Ed 1968), p 9

মুকুট (১২৯২) ও রাজর্ষি (১২৯২)

বউঠাকুরানীর হাটের মতই ইতিহাসের রস আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস দুটি রচনা করেন। কিন্তু এখানেও ইতিহাস হয়েছে গৌণ, লেখকের মনের একটি শ্রেষ্ঠ অনুভূতিই তাতে প্রাধান্য লাভ করেছে।

এই উপন্যাস দুটি রচনার প্রেরণা ও ইতিহাসটি সংক্ষেপে জানা দরকার। ১২৯২ সালে ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে এক মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের উপর এর প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হল। রবীন্দ্রনাথও মহা উৎসাহে 'বিচিত্র রচনাসম্ভারে' পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করতে লাগলেন। মাসিকপত্রের পাঠকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ গল্প ও উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথকে সেই চাহিদাও পূরণ করতে হল। তিনি প্রথমে লিখলেন 'মুকুট' ও পরে 'রাজর্ষি'।

প্রথমে 'মুকুট' গল্পটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মুকুট ও রাজর্ষি উভয়েরই বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে ত্রিপুরা-রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থের সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহসম্পাদক ও ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি কৈলাসচন্দ্রের 'ত্রিপুরার রাজমালা' গ্রন্থ থেকেই মুকুট ও রাজর্ষি গ্রন্থের কাহিনী সংগ্রহ করেন।

মুকুট গ্রন্থের মূল বিষয় হল ত্রিপুরার তিন রাজকুমারের মধ্যে বিরোধ।[৯] জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ, তিনি স্নেহশীল ও ধৈর্যবান্। গল্পের মধ্যে তাঁর চরিত্রই সর্বাপেক্ষা আদর্শবাদী। কনিষ্ঠভ্রাতা রাজধরের চক্রান্তে তাঁর মৃত্যু হয় ও কনিষ্ঠ হন যুবরাজ। এই দ্বন্দ্বটিই গল্পটিকে ঔপন্যাসিক মর্যাদা দান করেছে। কর্তব্য-পরায়ণ সেনাপতি ঈশা খাঁর চরিত্রটিও বেশ জীবন্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাটিকে 'ক্ষুদ্র-উপন্যাস' বলেছেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যা-শ্রমের বালকদের অভিনয়ের উপযোগী করে তার নাট্যরূপ দেন, যথাস্থানে (দ্বিতীয় অধ্যায়) তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুকুমার সেন বলেন, 'সৌভ্রাত্র্য' ও 'ভ্রাতৃবিদ্বেষে'র এই কাহিনী আসলে "উপন্যাস নয়, বড় গল্প"।[১০] এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও ভ্রাতৃস্নেহের ধারাই পৃথক্ পরিবেশে ও পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রসারিত হয়েছে 'রাজর্ষি'তে।

'বালক' পত্রিকার 'উদরপূর্তির' জন্য রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কাহিনীর প্রথমাংশ 'স্বপ্নলব্ধ'। কি ভাবে স্বপ্নে তিনি এই প্লট্ পেয়েছিলেন তার বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'র 'বালক' পরিচ্ছেদে। এই কাহিনী-টির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালের ইতিহাস মিশিয়ে তিনি কাহিনীটিকে নবরূপে রূপায়িত করলেন। কাহিনীটির মধ্যে ইতিহাস যেটুকু আছে, তা লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থ ও ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র-মাণিক্যের কাছ থেকে কি ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে রবীন্দ্রজীবনী ও জীবনস্মৃতিতে।[১১] রাজর্ষির কাহিনী এক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও উপন্যাস সৃষ্টিতে লেখকের স্বকীয়তা বিচার করাই বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। উপন্যাসটির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।
>
> বস্তুতঃ উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়ে নি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে।

৯ দ্র: র-জী, পৃ ২২১ পা-টী ২

১০ বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (১৩৭৬), পৃ ৩৬৮

১১ র-জী, পৃ ২২২ ও জী-স্মৃ, পৃ ২০৬, ২২১-২২

সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়।... সাহিত্য-রচনায় গুণী-লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে, তবে সেটা অস্বাস্থ্যকর হবেই।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য উপন্যাসটির নামকরণ ও প্রধান চরিত্রের রূপায়ণে কতখানি প্রযোজ্য, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জয়সিংহের আত্মদানের ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাতে তো 'প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ' মিটে যায় নি। বরঞ্চ, জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতিকে যেন আরো হিংস্র করে তুলেছে এবং তাঁরই চক্রান্তে গোবিন্দমাণিক্যের অন্তর অধিকতর আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের বিশ্বপ্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করে গেছেন। অর্থাৎ 'রাজর্ষি' নামকরণের পটভূমিকায় আমরা যে চরিত্রকে রাজর্ষি বলে গ্রহণ করেছি, তাঁর চরিত্র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদেই পূর্ণাঙ্গ হয় নি। তাঁর মানবপ্রীতির ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ উপন্যাসটিরই প্রয়োজন ছিল। তা নেহাতই 'অকিঞ্চিৎকর' বা 'আগাছায়' পরিপূর্ণও নয়। রঘুপতি যখন এসে আত্মসমর্পণ করলেন, তখনই হল প্রেমের কাছে শক্তির পরাজয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রেমের এই ব্যাপক, মহান্‌ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই কবি এখানে লেখনী ধারণ করেছিলেন। ফলে মাসিকপত্রের দাবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবের গতিও প্রবাহিত হতে পেরেছে। তাই কবির নিজের মন্তব্যটি এখানে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়েই লেখক ধ্রুব, হাসি প্রভৃতি চরিত্রগুলির অবতারণা করেছেন। শিশুর আঁচলে ফুল ভরে দিয়েই তাঁর "দেবপূজার কাজ হইল"। এর মধ্যে দিয়েই তাঁর চরিত্রে কোমল জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আর যেখানে একটি শিশুপ্রাণ রক্তের বিভীষিকায় তাঁর কোলে শীতল হয়ে গেল, সেখানেই শুরু প্রেম ও শক্তির দ্বন্দ্ব। জয়সিংহ যখন তাঁর কাছে বলির স্বপক্ষে শাস্ত্রবিধি জানতে চেয়েছে, তখন তিনি বলেছেন, "হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।" এইভাবে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের আদর্শ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রসাহিত্যে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বারেবারে নানা নামে, নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে।—

"ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আদর্শ চরিত্র, যিনি ভোগের মধ্যেও ত্যাগকে বরণ করিয়াছেন, যিনি 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই ঋষি-

বাক্যকে জীবনে সার্থক করিয়াছেন।··· গোবিন্দমাণিক্যর শান্ত সর্বসহা চরিত্র 'গোরা'র পরেশবাবু, 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ প্রভৃতির মধ্যে নানা ভাবে দেখা দিয়াছে।"

—র-জী, পৃ ২২২-২৩

গোবিন্দমাণিক্যের এই মহান্ ভাবের সঙ্গে যে শক্তিপূজার বিরোধ তার উপাসক রঘুপতি। উপন্যাসে এই চরিত্রটি একদিক্ থেকে সবচেয়ে জীবন্ত। তাঁর চরিত্রেই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। তিনি শাস্ত্রবিধির কাছে স্নেহ, প্রেম, মায়া কোনো কিছুরই মূল্য স্বীকার করতেন না। তাঁর চরিত্রে যে বিবেকহীন শক্তি ও সংস্কারের আধার ছিল, তা যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তখনই তা প্রতিশোধস্পৃহায় দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। পুত্রাধিক প্রিয় জয়সিংহের আত্ম-বলিদানের পর রঘুপতির হিংসাবৃত্তি সবচেয়ে বেশি জলে উঠল। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ রঘুপতিকে বউঠাকুরানীর হাটের প্রতাপাদিত্যের মত শুধু হিংসার প্রতিমূর্তি-রূপে দেখিয়েই শেষ করেন নি। জয়সিংহের মৃত্যুর পর আসলে তাঁর মনে ক্রমে-ক্রমে প্রেমের উপলব্ধিও আত্মপ্রসার ঘটিয়েছে। নানা ঘটনার জটিলতার মধ্যে দিয়ে রঘুপতি বিশ্বপ্রেমের অনুভূতিতে শান্তিলাভ করেছেন; তাই ফিরে এসেছেন গোবিন্দমাণিক্যের আশ্রয়ে। নানা দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে দিয়ে রঘুপতির এই যে পরিবর্তন— তা-ই চরিত্রটিকে নাটকীয় মর্যাদা দান করেছে। জয়সিংহের চরিত্রেও যে প্রেম ও শক্তিপূজার মধ্যে দ্বন্দ্ব তা চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছে এবং তাঁর আত্মহত্যা উপন্যাসটির গতি পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। তাই জয়সিংহ এই উপন্যাসে উভয় ভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি উজ্জ্বল চরিত্র বলেই স্বীকার্য।

উপন্যাসের শেষ কয়টি পরিচ্ছেদে লেখক বিল্বন নামে একটি চরিত্রের অবতারণা করেছেন। তিনি বিশেষভাবে মানবপ্রেমিক, বিশেষতঃ শিশুদের তিনি বিশেষ প্রিয়। এছাড়া 'রাজ্যসেবা' তাঁর একটি বিশেষ ব্রত। রাজ্যের নির্বিঘ্নতার জন্য, প্রজাদের সেবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সৃষ্টি। কর্মসাধনার মধ্যেই তাঁর তৃপ্তি।—

"'শারদোৎসবে'র রাজা, 'রাজা'র ঠাকুর্দা, 'অচলায়তনে'র গুরু, এমন-কি 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশায় প্রভৃতি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এই তেইশ বৎসর বয়সের সৃষ্টি বিল্বনেরই রূপান্তর বলিলে দুঃসাহসিকতা হইবে না।"

—র-জী, পৃ ২২৩

রবীন্দ্রজীবনীকার মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই জাতীয় আদর্শচরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি আরও

বলেন, দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, চন্দ্রশেখরের রমানন্দ স্বামী প্রভৃতি 'স্বামীজী'দের আদর্শও হয়তো বিল্বনের চরিত্রসৃষ্টিতে কার্যকরী হয়েছে। তবে বিল্বনকে মহৎ করে গড়তে গিয়ে তিনি কিছুটা 'রক্তমাংসবর্জিত' 'অতিশয় মহৎ' করে গড়ে ফেলেছেন। তাই বিল্বনকে পরে আর দেখা যায় নি, "রাজর্ষির মধ্যেই তাহার প্রথম ও শেষ কৃত্য সম্পন্ন করিয়া দেন।"

—র-জী, পৃ ২২৪

আসলে 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উভয় উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ 'একটি বৃহৎ ভাবে'র অবতারণা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস মনে হলেও, ইতিহাসের রস বা উপন্যাসের প্রকৃতি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। বরঞ্চ, 'ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন মানবরস ও জীবনদৃষ্টিই' উপন্যাস দুটির প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এইখানেই বঙ্কিমউপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও তাঁর স্বকীয়তার প্রকাশ। পরবর্তী প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে এক-একটি বিশেষভাব ও আদর্শ রূপায়িত হয়েছে। প্রথম দুটি উপন্যাস সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই ভূমিকা গঠন করল।

(২) ছোটগল্প

রবীন্দ্রকথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ছোটগল্পগুলি বিশেষ বিচারের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির আলোচনা করতে গিয়ে দেখি, সাহিত্যের ছোটগল্প শাখাটি নিতান্তই আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানাদেশে নানাভাষায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প লেখার প্রচলন ছিল। আমাদের দেশেও সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বিদেশী ঈশপের গল্প বা প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি অংশতঃ কথাসাহিত্যের সমগোত্রীয়।

কিন্তু ছোটগল্প একটি নূতন ধরনের শিল্প। মানুষের জীবনের কোনো একটি বিশিষ্ট সুর ছোটগল্পে ফুটে ওঠে। গীতিকবিতা ও ছোটগল্প এদিক্ থেকে সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ছোটগল্পের যথার্থ ধর্মটি পরিস্ফুট হবে।—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

—সোনারতরী, 'বর্ষা-যাপন' ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ

এই বিশিষ্ট লক্ষণজাত এবং শিল্পসম্মত যথার্থ ছোটগল্পের জন্মদাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে (১৮৪৭-১৯১৯) কেউ কেউ বাংলা ছোটগল্পের জন্মদাতা বলে থাকেন—'নিজের অজ্ঞাতে তিনি বাংলা ছোটগল্পরূপের গোড়াপত্তন করেছিলেন'। কিন্তু তাঁর সকল রচনাই 'উৎকৃষ্ট বা পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প' হতে পারে নি।[১২] এছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯) রচনায় ছোটগল্পের আংশিক পরিচয় পাওয়া গেছে। আর রবীন্দ্র সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) প্রধানতঃ ছোটগল্প-রচয়িতা হিসাবেই খ্যাত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো রচনাতেও ছোটগল্পের আভাস পাওয়া যায় বলে কারো কারো ধারণা। কিন্তু মানবজীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা এবং নানা ঘটনাবলী নিয়ে অসংখ্য ছোটগল্প প্রথম রবীন্দ্রনাথই লেখেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁকেই এই শাখার স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা যায়। বলাবাহুল্য, শ্রেষ্ঠ গীতিকবির হাতে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। পদ্মাতীরে জমিদারির কার্য পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। সাধারণ মানুষের বাস্তবজীবনকে তিনি উপলব্ধি করলেন অন্তরের মধ্যে। বিচিত্র মানবজীবনের সুখদুঃখ, দ্বন্দ্ব-কলহ, মামলামোকদ্দমা, ত্যাগ-ভোগ, স্নেহ-ভালবাসায় গড়া যে বাংলার সাধারণ জীবন, তারই ছবি একটার পর একটা ফুটে উঠতে লাগল তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসগুলিতেও দেখেছি, কাহিনী যাই হোক, মানবজীবন সম্পর্কে কবির ছিল অপরিসীম কৌতূহল। তাঁর ছোটগল্পগুলিও সেই মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাঁর নিজের মতেও, সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ যাকে বলা যায়, অর্থাৎ 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার যুগ বর্তমান আলোচ্যপর্বের বহির্ভূত। প্রথমে হিতবাদী (১২৯৮) ও পরে সাধনা (১২৯৮), এই দুই পত্রিকাই হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম

১২ দ্রষ্টব্য—ভূদেব চৌধুরী: বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার (১৯৬২), পৃ ৮৩-৯৩

ছোটগল্প রচনার প্রধান মাধ্যম। এই সময় থেকে "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছোটগল্পের পদ্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছিল।"

—সুকুমার সেন : বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩২৩

তাঁর এই প্রেরণা কার্যকরী হয়েছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে এত গল্প তিনি কেন লিখলেন, তার প্রেরণা পেলেন কি ভাবে, তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থে।

কিন্তু এর শুরু কোথায়, তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প **'ভিখারিনী'** প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র)। শরৎকুমারী চৌধুরানী তাঁর 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে বলেছেন—

"ছোটগল্প প্রথম যেটি প্রকাশিত হয় তাহা রবিবাবুর।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতেও 'ভিখারিনী' গল্পটিতে ছোটগল্পের ঠাঁট বজায় আছে।[১৩] অর্থাৎ গল্পটিকে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প হিসাবে বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য গল্পটিকে তাঁর রচনাবলী থেকে বর্জন করেছিলেন। তাঁর মতে, 'ভারতী' সূচনাতেই—

"আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল,··· আমি লিখে বসলুম এক গল্প— সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।"

—'ছেলেবেলা', অধ্যায় ১৩

ভিখারিনী গল্পটি বর্তমানে গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। সুকুমার সেন গল্পটিকে ভাব ও বিষয়ের দিক্ থেকে সমকালীন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' প্রভৃতি কাব্যগুলির সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। এই পর্বের আর দুটি গল্প **'ঘাটের কথা'** (১২৯১, কার্তিক) ও **'রাজপথের কথা'** (১২৯১, অগ্রহায়ণ) ছোটগল্প রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। সুকুমার সেনের মতে—

"বাংলাদেশের নিভৃত অন্তরটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের তুলনা হয় ভগীরথের গঙ্গাবতরণের সঙ্গে। দাদাদের সঙ্গে বোটে ও স্টীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ও শান্তিপুরের মধবর্তী ভাগীরথী

---

১৩ র-জী, পৃ ৭০

তীরে যে পল্লীদৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে গল্পরচনার প্রথম প্রেরণা দেয় এবং তাহাতে তাঁহার প্রথম গল্প দুইটি··· লেখা হয়। 'সরোজিনী প্রয়াণ' প্রবন্ধে গল্প দুইটির বাস্তব ভূমিকা রহিয়াছে।"

—বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩২০

এই অনুভূতিই পরে তাঁকে গভীরতর প্রেরণা জুগিয়েছিল।

যাই হোক, প্রথম রচিত তিনটি গল্প সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও প্রমথনাথ বিশী কেউই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন নি। প্রমথনাথ বিশী 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' প্রসঙ্গে বলেছেন—

"রাজপথের কথায় গল্প নাই বলিলেই হয়, উহাকে বিচিত্রপ্রবন্ধের অন্তর্গত করিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।"

—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৩৬১), পৃ ৭

এ প্রসঙ্গে অবশ্য একদিক্ থেকে বিচিত্রপ্রবন্ধের 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধটিকে স্মরণ করা যায়। তবে এ বিষয়ে বিস্তৃত তুলনার ক্ষেত্র এটি নয়। বর্তমানে প্রধান বিচার্য বিষয়, গল্পগুলিতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ও রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় কতখানি রক্ষিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর মতে—

"'ঘাটের কথা'য় গল্প আছে ঠিকই, কিন্তু তা রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্যে পূর্ণ নয়। তাতে আছে বঙ্কিমীরীতির অনুসরণ। সন্ন্যাসের মাহাত্ম্যকীর্তন বঙ্কিম-চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের নয়; ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করিয়াছেন। 'ঘাটের কথা'য় সন্ন্যাসী যেন চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের একটা মিশ্ররূপ। আবার পাঠককে সম্বোধন করিয়া গল্প জমানো বঙ্কিমীরীতি, রবীন্দ্ররীতি নয়।"

—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' পৃ ৭

তাঁর মতে ছোটগল্পের লক্ষণ ঘাটের কথায় থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প বলতে যা বুঝতেন, এটি ঠিক তা নয়। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, কিন্তু অন্য কোনো দিক্ থেকে রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য আছে কিনা তাও দেখা দরকার।

সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই আকৃষ্ট করেছে। তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাসে তারই চিহ্ন লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিতেও মানুষের সেই আশাআকাঙ্ক্ষার কাহিনী কতখানি রূপলাভ করেছে, এখানে সেটিই বিচার করা দরকার।

২

তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিনী' করুণা উপন্যাসের সমকালেই রচিত। 'ভিখারিনী'র কমল ও 'করুণা'র করুণা দুটি বালিকাই সরলহৃদয়া ও নিজেদের হৃদয়ের বেদনা আপন অন্তর দিয়েই অনুভব করতে চেয়েছে। কমল একান্ত ভাবেই তার বাল্যসহচর অমরসিংহের প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল। কিন্তু বাস্তবের কঠোর আঘাতে তার সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার বিবাহ হল মোহনলালের সঙ্গে। অমরসিংহ ফিরে এসে সে বার্তা শুনে বিবাহিতা নারীর কর্তব্যকর্মে বাধা না দিয়ে কোথায় যে চলে গেল তা কেউ জানতেও পারল না। কমল এই মর্মজ্বালা আপন অন্তরে গোপন করে দিনদিন নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমজীবনের রচনাগুলিতে এই সরলহৃদয় বালিকা-চরিত্রগুলি নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। হৃদয়ের অন্তর্দাহকে তারা গভীর বেদনার সঙ্গে নিঃশব্দে নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করেছে। এই বেদনার প্রতিমূর্তি কমল, করুণা ও বৌঠাকুরানীর হাটের বিভা।

কিন্তু পরবর্তী 'ঘাটের কথা' গল্পে এই বেদনাকে প্রকাশ করার সুযোগ লেখক দিয়েছেন তাঁর নায়িকাকে। ছোট বালিকা কুসুম কিভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠল এবং তার জীবনে কি বিপর্যয় ঘটে গেল, তা লেখক একটি বাঁধানো ঘাটের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে নিপুণভাবে এঁকেছেন। কিন্তু এই কুসুম কমল বা করুণার মত সম্পূর্ণ মৌন নয়। আপনাকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে সন্ন্যাসীর কাছে সে তার অশান্ত হৃদয়ের জ্বালা অকপটে ব্যক্ত করেছে। সে বলেছে—

> "আমি একজনকে দেবতার মত ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন।··· সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না।"

কুসুমের মত এত স্পষ্ট করে এর পূর্বে রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে কোনো নারী কথা বলে নি। নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে সে স্পষ্ট, অবিচলিত ভাষায় তুলে ধরেছে। অর্থাৎ আন্তরিক অনুভূতি এবার ক্রমশঃ বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে এবং তার প্রথম সূচনা হয়েছে এই ছোটগল্পটিতেই। একদিকে সহিষ্ণুতা

অপরদিকে আত্মপ্রকাশের উদ্যম রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস-ছোটগল্পে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কুসুম যেন তারই পূর্বরূপ।

'রাজপথের কথা' গল্পটি প্রকাশের দিক্ থেকে সামান্য পরবর্তী হলেও তাতে আবার তিনি মৌনব্যথার চিত্রই অঙ্কন করেছেন। একটি বালিকা, সে মৌনতার প্রতিমূর্তি।—

> "তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত— ছোটো দুটি নূপুর রুনু ঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।"

অপর একজনের পথ চেয়ে তার স্তব্ধ প্রতীক্ষা। সে চলে গেলে বালিকাও শ্রান্তপদে ফিরত। কিন্তু একদিন সেই প্রতীক্ষায় ছেদ পড়ল। তার আকাঙ্ক্ষিত সেদিন আর সে পথে এল না। বালিকা গৃহে ফিরল—

> "যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল।"

পরদিবসেও এই বিফল প্রতীক্ষার পর—

> "আমার উপরে, ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

তারপর—

> "বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল— পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শান্ত মুখে গৃহের কাজ করে— হয়তো সে কাহাকেও কোনো দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়।"

এই চরিত্রটি তাঁর রচিত সমকালীন অন্যান্য চরিত্রগুলিরই অনুরূপ। কখনও নীরব, কখনও ব্যক্ত, এইভাবেই চরিত্রগুলি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

লক্ষ রাখতে হবে, কি উপন্যাসে, কি গল্পে মানবচরিত্রের আন্তরিক বার্তা ও তার হৃদয়ের বেদনার সন্ধানেই রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সচেতনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কিঞ্চিৎ অনুসরণ করলেও তাঁর

কবিমনের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতাই তাঁর উপন্যাসগুলিতেও রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানবহৃদয়ের নিত্যনূতন অনুভূতি, তাদের অন্তরের বার্তাই তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হয়েছে। তার সূচনা হয়েছিল প্রথমযুগের এই লেখাগুলিতেই। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকেই বাইরের ঘটনাবর্তের চেয়ে হৃদয়ের আলোড়নের প্রতিই কবির বেশি আকর্ষণ দেখা যায়। কথা-সাহিত্যিক হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবকল্পনার ব্যতিক্রম হয় নি। তাই সংখ্যায় স্বল্প হলেও এ যুগের রচনাগুলি পরিণত কথাসাহিত্যিককে পাঠকসমাজে পরিচিত করে দিতে বিশেষ সাহায্য করে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রবন্ধসাহিত্য

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি বিশ্বকবি হলেও গদ্যসাহিত্য ও গদ্যরচনায় তাঁর দান কিছুমাত্র কম ছিল না। সমগ্র রচনাবলীতে তাঁর গদ্যরচনার পরিমাণই অপেক্ষাকৃত বেশি। এই গদ্য-সাধনার সূচনা হয়েছিল অতি অল্পবয়সেই, যখন থেকে তাঁর কাব্যধারার সূত্রপাত। তাঁর গদ্যসৃষ্টির সুদীর্ঘ ও বিচিত্র যাত্রাপথের যথার্থ সূচনা হয়েছিল জীবনের অতিপ্রত্যূষকালে। তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও সুগভীর বিচারবুদ্ধির বলে পরিণত বয়সে তিনি বাংলাগদ্য ও প্রবন্ধসাহিত্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিনায়কত্ব লাভ করেছেন, তার প্রথম রূপটি অঙ্কুরিত হয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'ভারতী' পত্রিকার যুগ থেকেই। তারপর থেকে লেখনী এগিয়ে চলল অবিরাম গতিতে। সেই গদ্যরচনার সংখ্যা যেমন বিপুল, তার ভাষা এবং বিষয়বিন্যাসও তেমনি প্রখর বিচারবুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

তাঁর 'মানসী' পর্বের (১৮৯০) পূর্বেই মোট ছয়টি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কালক্রম অনুসারে সেগুলি যথাক্রমে, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'বিবিধ-প্রসঙ্গ,' 'রামমোহন রায়' (প্রবন্ধপুস্তিকা), 'আলোচনা', 'চিঠিপত্র' (পত্রপ্রবন্ধ) ও 'সমালোচনা'। আর 'ছিন্নপত্রে'র কতগুলি পত্রের সন্ধানও মিলছে এই যুগেই। এই যুগকে তিনি পরবর্তী জীবনে আর স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু দেখা গেছে, এই যুগেই তিনি চিন্তাধারার যে বিচিত্রতা দেখিয়েছেন, তাকে বাদ দিলে পরিণত রবীন্দ্রনাথই হয়তো অনেকক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ থেকে যেতেন। এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও তিনি আরো অন্ততঃ ষাটটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। সেগুলির কয়েকটি বাদে বেশিরভাগই কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। তাই আজ সাধারণ পাঠকের কাছে সেগুলি প্রায় অজ্ঞাতই হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে যুগের সাময়িক পত্রিকার পাতা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বালক রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারা কত বিচিত্রপথেই না গিয়েছিল! সমকালীন সাহিত্যিকদের রচনা তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করতেন, প্রয়োজনবোধে তাঁদের রচনার তিনি অনুসরণ করতেন, আবার কখনও বা তাঁদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বাদ-প্রতিবাদে

অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করতেন না। সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকবৃন্দ ও তাঁদের রচনা, ছন্দ, সংগীত কোনো বিষয়ই প্রায় তিনি বাদ দেন নি। প্রবন্ধগুলি তিনি কখনও স্বনামে, কখনও অ-নামে আবার কখনও বা ছদ্মনামে লিখেছেন। কিন্তু সেগুলি যে তাঁরই রচিত তা নানা প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে।[১] কিন্তু তার অধিকাংশই প্রকাশিত না হওয়ায় সাধারণ পাঠকের কাছে অজানার অন্ধকারেই রয়ে গেল, তা আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেই অজানা প্রবন্ধগুলির নাম ও পরিচয় যথাসম্ভব উদ্ধার করে এই নিবন্ধের 'পরিশেষ' বিভাগে প্রকাশ করা গেল। কিন্তু প্রবন্ধগুলির বিশদ পরিচয় দেবার স্থান এটি নয়। তাই সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হতে হয়েছে।

২

প্রথমযুগে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধগ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি নানা প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম গ্রন্থ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' মূলতঃ ভ্রমণকাহিনী এবং তেরোটি পত্র-প্রবন্ধের সংকলন। 'বিবিধপ্রসঙ্গে' নানাবিষয় নিয়ে লেখা ছোট ছোট আটত্রিশটি রচনা সংকলিত হয়েছে। 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে একটি পৃথক্ গ্রন্থের মর্যাদালাভের উপযুক্ত নয়। এটি পুস্তিকা আকারে প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'চারিত্রপূজা' এবং তারও পরে 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। এটি রাজা রামমোহন সম্পর্কে কবির একটি লিখিত ভাষণের প্রতিলিপি। এর পরবর্তী প্রবন্ধগ্রন্থ 'আলোচনা'। গ্রন্থটি ছয়ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বিভাগে আছে কতগুলি ছোট ছোট শিরোনাম-সংবলিত অনুচ্ছেদ বা নিবন্ধ। 'চিঠিপত্র' গ্রন্থটিতে নয়টি পত্রপ্রবন্ধের মাধ্যমে কবি সামাজিক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। একসময়ে এটি 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে রচনাবলীতে পুনরায় স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদালাভ করেছে। এই সময়কার শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সমালোচনা'য় নানা বিষয়ে লেখা ষোলোটি প্রবন্ধের সংকলন করা হয়েছে।

১ বেশির ভাগ প্রবন্ধের নামই প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ও রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী' প্রবন্ধটি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্ররচিত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচিত বলে আনুমানিক প্রমাণ দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। সেগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

গ্রন্থান্তর্গত আলোচনার বিষয়গুলি বিভিন্ন হলেও গ্রন্থ হিসাবেই সেগুলির বিচার করার চেষ্টা করা যাবে। আর পূর্বোল্লিখিত ষাটটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের পৃথক্ আলোচনা না করে বিষয়ানুযায়ী বিভক্ত করে শ্রেণীগতভাবে সেগুলির তাৎপর্য ও উৎকর্ষ বিচার করা হবে। তবে বিষয়বিচারে যে প্রবন্ধগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলির কিঞ্চিৎ দীর্ঘ আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, এমন কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি সে যুগের পাঠকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। অপরপক্ষে, কম গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই সমীচীন বলে মনে হয়। তার ফলে, বালক প্রাবন্ধিকের মনের বিচিত্রতা এবং এক-একটি বিষয়ে তিনি কত গভীর চিন্তা করেছেন, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া সমকালীন লেখকদের তুলনায় তিনি কি কি ভিন্নতা দেখিয়েছেন অথবা তাঁদের কতখানি অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের লেখাই তাঁর পরবর্তী চিন্তাধারাকে পুষ্ট করতে কতখানি সহায়তা করেছিল, সে সম্বন্ধেও পাঠকের দৃষ্টি হবে সচেতন।

এই যুগের প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, লেখক কি অপরিসীম পরিশ্রম করে নিজের প্রতিভাকে ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছিলেন। শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে ঔৎসুক্য ও তার চর্চা এবং তারই মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করলে তবেই মনস্বীর যথার্থ মনীষা প্রকাশ পায়। সেই কালটা ছিল রবীন্দ্রনাথের শুধু কাব্য বা গান নয়, তার সমগ্র প্রতিভাটিকে বিকশিত করে তোলার জন্য কঠিন সাধনার পর্ব। তারই পরিচয় পাওয়া যায় ভারতী-পূর্ব ও ভারতীর যুগে, আমেদাবাদে, বোম্বাই-এ, বিলাতে এবং তারপর আরো কয়েকটি স্তরে নানা শিক্ষা, নানা উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞানচর্চামূলক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। বলা বাহুল্য, তারমধ্যে প্রবন্ধগুলিই প্রধান। সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি সামগ্রিক পরিচয় বা মূল্যবিচার করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান আলোচনায়। প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতেও এই সামগ্রিক পরিচয় দুর্লভ বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের যথার্থ জন্ম কি ভাবে হল, তা প্রথমযুগের প্রবন্ধগুলির মাধ্যমেই পাঠকের নিকট স্পষ্ট হবে। সেদিক্ থেকেও এই প্রবন্ধগুলি পৃথক্ আলোচনা ও মর্যাদালাভের অপেক্ষা রাখে।

এ ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সাহিত্যিক হিসাবে বালক রবীন্দ্রনাথকে বিচার করাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। তাই প্রথম যুগের প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু যাই হোক এ ক্ষেত্রে সেগুলির সাহিত্যিক মূল্যবিচার

করাই প্রধান লক্ষ্য, বিষয়গুলি উপলক্ষ্য মাত্র। আর যেগুলি নিতান্তই সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে লিখিত সেগুলির সর্বাঙ্গীণ বিচার করাই সমীচীন। তাই সাহিত্য-বিভাগের আলোচনাটি স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হবে। প্রবন্ধগুলি আলোচনা-কালে সেগুলির বিষয়বস্তুর দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ রাখা হবে, কালক্রমের দিকে নয়। ফলে শ্রেণীগতভাবে আলোচনা করলে কালানুক্রমিক ধারাটি সর্বত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এর যথার্থ ক্রমটি পাওয়া যাবে 'পরিশেষে' কালানুক্রমিক সূচীতে। তবে প্রত্যেকটি শ্রেণী বা বিভাগের আলোচনায় যথাসম্ভব কালক্রম রক্ষা করে আলোচনা করার প্রয়াস করা যাবে।

(১) প্রবন্ধাবলীর চিন্তা ও রচনাগত বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় (৩য় অধ্যায়) দেখানো হয়েছে, তাঁর বালক বয়সের লেখা কবিতা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প হলেও (যেগুলি সাধারণ পাঠক-সমাজে একদা ছিল অজ্ঞাত এবং বহুক্ষেত্রেই যেগুলি অ-নামে প্রকাশিত) সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য কিছু কম নয়। উপরন্তু, কবির সমগ্র জীবনের কোনো কোনো চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল ঐ কবিতাগুলিতেই। ঠিক সেইরকমই রবীন্দ্ররচিত প্রথম গদ্যরচনাগুলির গুরুত্বও কিছু কম নয়। তাঁর প্রথম জীবনে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধে এমন সব ভাবধারার নিদর্শন পাওয়া যায়, যেগুলি লেখকের সমগ্র জীবনেই বারেবারে ধ্বনিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সেইসব প্রবন্ধগুলির পৃথক্ আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এইযুগের এই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা গেল।—

১. সাহিত্য সমালোচনা (১, ২, ৩,); ২. সমাজ ও রাষ্ট্র; ৩. ইতিহাস; ৪. সংগীত; ৫. বিচিত্র-রচনা (১, ২)।

এই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির আলোচনা শুরু করার পূর্বে প্রথম অনুসন্ধান করে দেখা দরকার, তাঁর **প্রথম গদ্যরচনা** কোন্‌টি। বাল্যকালে পিতার সঙ্গে হিমালয়-বাসের স্মৃতি প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; তাহা আমি বাংলায় লিখিতাম।"

—জী-স্মৃ, 'হিমালয়যাত্রা'

এ বিষয়ে বেশ কিছুকাল পরে লেখা 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকাতেও (১৩৪৪) কবি বলেন—

"তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম— জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।"

তাঁর এই দুই উক্তি থেকে বোঝা যায়, হিমালয় বাসকালেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা শুরু হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বৎসর (১৮৭৩ বৈশাখ)। কিন্তু সেই 'ধারাবাহিক রচনা'টির নাম কি, এই নিয়ে গবেষক-মহলে মতান্তর দেখা যায়।

কবির হিমালয় বাসকালের মাত্র একমাস পর থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে (শক ১৭৯৫ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ)। তৎপরেও প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থাকে। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৬৭) উল্লেখ করেছেন,[১ক] 'শনিবারের চিঠি'র (১৩৪৬ কার্তিক) 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী'তে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিষবিষয়ক রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত বড় প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে তত্ত্ববোধিনী থেকে ওই প্রবন্ধটি পড়ে তাঁর মনে হয়, "উহা ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোনও বিচক্ষণ লোকের লেখা।" তাই তিনি প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি এবং তখন তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন শনিবারের চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ সন্দেহমূলক মন্তব্য পড়ে লেখেন—

"পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল।"[১খ]

তিনি আরও মনে করেছেন যে, ঐ প্রবন্ধটি কোনো 'যোগ্য লেখক' 'প্রকাশযোগ্য' রূপ দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবুও 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের রচিত এ তথ্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রজীবনী),

১ক রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ১৯৬

১খ পূর্ববৎ প ১৯৬-৯৭

অমিয়কুমার মজুমদার (রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস) প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের (১৯০৪) সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ও বলেন, প্রক্টরের ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ যে অংশগুলি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করতেন, সেটিই তাঁর প্রথম গদ্যরচনার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর ঐ প্রবন্ধটি রবীন্দ্ররচিত কিনা, সে বিষয়ে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে। পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথ যে জ্যোতিষবিদ্যা শিখেছিলেন তা প্রক্টর-রচিত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষবিদ্যা। ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা তাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। তাই ইংরেজি জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ে তিনি ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র লিখবেন— এ কথা একেবারেই অসঙ্গত মনে হয়। সেইজন্যই বোধহয়, এ বিষয়ে জীবনস্মৃতির তথ্যপঞ্জীতে (১৯৬২, পৃ ৫১, টীকা ২) জীবনস্মৃতির সম্পাদক মহাশয়ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। ঐ গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' (শক ১৭৯৬ পৌষ, পৃ ১৬১-৬৩) নামে একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের নাম (জিজ্ঞাসাচিহ্নসহ) উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে শ্রীসুশান্তকুমার মিত্রও তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা'[১গ] প্রবন্ধে জীবনস্মৃতির তথ্যপঞ্জীতে উল্লিখিত উক্ত প্রবন্ধটিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই প্রবন্ধটিতেই আছে প্রক্টর-বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় এবং তাঁর দুটি গ্রন্থের[১ঘ] প্রভাবও তাতে লক্ষ করা যায়। অপরপক্ষে, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে' প্রক্টরের গ্রন্থের প্রভাব বা ঐ জাতীয় বর্ণনা নেই। তাই সুশান্তবাবু বহু যুক্তিতর্কসহ উক্ত প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্ররচিত বলে অস্বীকার করে জীবনস্মৃতির সম্পাদকীয় মন্তব্যটিকেই নিঃসংশয়রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।

'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে 'কাঁচাহাতের ধারাবাহিক' রচনার কথা বলেছিলেন, সুশান্তবাবু বলেন, 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধেই আছে সেই কাঁচা হাতের চিহ্ন এবং রচনাটি 'ধারাবাহিক'ভাবে প্রকাশিত হবার সংকল্পেই রচিত হয়েছিল। 'কাঁচা' বলতে তিনি কাঁচা ভাষার কথাই মনে করেছেন এবং সেই কারণেই হয়তো তত্ত্ববোধিনীতে শেষ পর্যন্ত অপ্রকাশযোগ্য বিবেচনায় আর প্রকাশিত হয় নি, এ অনুমানও তিনি করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রবন্ধটির মধ্যে 'মেঘ-বিনির্মুক্তা', 'তারকাসমুজ্জ্বলা' প্রভৃতি

১গ অমৃত, জুলাই ২. ৯. ১৯৭৬

১ঘ 'হাফ্-আওয়ার্স উইথ দ্য টেলিস্কোপ' (১৮৬৮) এবং 'দ্য অর্ব্ অ্যারাউণ্ড আস্' (১৮৭২)।

শব্দযোগে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাকে কাঁচা বলা যায় না। পরন্তু তাতে আছে কোনো সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিতের হাতের স্পর্শ। কবি নিজেও তো এ বিষয়ে বলেছেন, কোনো 'যোগ্যলেখক' তাকে 'প্রকাশযোগ্য' রূপ দিয়েছিলেন। এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি সম্ভবতঃ তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয়। কারণ, তত্ত্ববোধিনীতে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে বলে তিনিই বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আর, এই আশ্বাস থেকেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে কবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল।

বরঞ্চ, 'কাঁচা' বলতে এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর দিক্‌টিই বিচার করা অধিক সমুচিত হবে। বিষয়ের দিক্ থেকে এতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। সুশান্তবাবু যে 'কবিকল্পনা' বা 'ঐশ্বরিক চিন্তা'র বৈশিষ্ট্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথের বলে উল্লেখ করেছেন, বস্তুতঃ তা দেবেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বলাই বেশি সংগত হবে।

দেবেন্দ্রনাথের রচনার স্থানে স্থানেই দেখা যেত ঐশ্বরিক চিন্তার প্রকাশ এবং ভাষায় প্রকাশ পেত তাঁর কল্পনাময় ভাবনার ছাপ। আর যে বালক পিতার কাছেই তাঁর রচনার প্রথম শিক্ষা পাচ্ছেন, তাঁর ভাবে ও ভাষায় যে পিতার অনুসরণ বা অনুকরণ থাকবেই তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। পিতার কাছে শোনা বিষয়েরই তিনি পুনরুল্লেখ করেছেন মাত্র। কবির স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের পরিচয় তাতে বিশেষ নেই। এর প্রায় একবছর পূর্বে লেখা 'ভারতভূমি' কবিতায় কবিকে আমরা যে রূপে পেয়েছিলাম, এখানে তার পরিচয় নেই। ভারতভূমিতে বহুকবির প্রেরণার মধ্যে থেকেও তাঁর স্বকীয় অনুভূতি উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথকে সে ভাবে পাওয়া গেল না। অথচ, তার অল্প কিছুকাল পরে লেখা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধে (১২৮৩ কার্তিক) রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি পরিপূর্ণরূপে— তাঁর বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ভাবে ও ভাষায়। যে গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, সেগুলি 'জীবের আবাসভূমি' কি-না, তা নিয়ে বহু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা হয়তো তত্ত্ববোধিনীর পাঠকবর্গ অথবা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা (সম্পাদক মহাশয় নিজে অবশ্য বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন) সমর্থন করেন নি। তাই প্রবন্ধটি ছিল অসম্পূর্ণ— এ অনুমানও করা যেতে পারে।

তবে যে প্রবন্ধ একটিমাত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেল, তাকে 'ধারাবাহিক' বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে মনে হয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এমন কোনো রচনার কথাই তিনি উল্লেখ করেছিলেন;

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার ভবিষ্যৎ সংকল্পের ইঙ্গিত এটি নয়। এমন হতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ঠিক ছিল না। আর সেই কারণেই হয়তো জীবনস্মৃতির সম্পাদকের তথ্যেও প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল।

তবুও বলব, 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধের সঙ্গেই জীবনস্মৃতি ও বিশ্বপরিচয়ে কবি-উল্লিখিত তথ্যের মিল দেখা যায়, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে'র সঙ্গে নয়। এই প্রবন্ধে গ্রহাদি সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন উত্তরকালে লিখিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থেও স্থানে স্থানে সেই বিষয়েরই পরিণত রূপ লক্ষ করা যায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য বোঝা সহজ হবে। 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'তে লেখকের প্রশ্ন—

> "যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীবদ্বারা পূর্ণ? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোনো স্থান থাকিতে পারে যেখানে প্রাণের চিহ্ন নাই?"

তাঁর এই প্রশ্নই পরিণতরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে বিশ্বপরিচয়ের 'গ্রহলোক', 'ভূলোক' প্রভৃতি প্রবন্ধে। তিনি শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে পরিশেষে বলেন—

> "একদিন হয়তো কোনো ফাঁকে উদ্ভিদ দেখা দেবে,··· তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু।"
>
> —'গ্রহলোক'

এরপরে ঐ প্রবন্ধেই মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বলেন—

> "মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলেছে অনেক দিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পেলেন; বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দারা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্যে খাল কেটেছে।··· ওগুলো যে কৃত্রিম খাল আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি, সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য, এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এখানে হাওয়া জল আছে।"

গ্রহগুলিতে জীবন আছে কিনা এবং না থাকলেও একদিন তার আবির্ভাব হবে এ কথা জীবনরসের কবির মনে চিরদিনই গাঁথা হয়ে ছিল। অবশেষে, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, কিন্তু অন্যান্য অসংখ্য গ্রহে প্রাণ নেই— এ ভাবনা কবির হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রহ 'পৃথিবী'তে 'প্রাণে'র আবির্ভাব হয়েছে এবং তার সঙ্গে 'তার সহচর'

'মনে'রও আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, 'জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি।' কিন্তু তবু বলেন—

"যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব, তবু এ কথা মানতে মন যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে— যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।"

—'ভূলোক'

অর্থাৎ দেখা গেল, জীবনের শেষ পর্যন্ত কবি বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের কথাই বলেছেন, ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা নয়। বালককালে পিতার কাছে লব্ধ এই শিক্ষার প্রভাব তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আর এই ধরনের ভাবের মধ্যে দিয়ে বলার প্রেরণাটিও তিনি পেয়েছিলেন পিতারই কাছে।

সুশান্তবাবুর প্রবন্ধটি থেকে এটুকুই লাভ হল, জীবনস্মৃতির সংশয়পূর্ণ তথ্যটিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি তাকে প্রতিষ্ঠা করার পথে এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। তবে প্রবন্ধটি যদি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের লেখা হয়, তবুও বলব, তার ভাবে আছে দেবেন্দ্রনাথেরই জ্ঞানবুদ্ধি ও ভাবময় কল্পনার পরিচয় এবং ভাষায় আছে কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, 'যোগ্য লেখকে'র হাতের স্পর্শ। ভাবে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে এরমধ্যে ঠিক পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, তার তুলনায় মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত 'ঝান্সীর রাণী' প্রভৃতি প্রথম যুগের প্রবন্ধে তাঁর কাঁচা ভাষার পরিচয় আছে অনেক বেশি। তাই বোধহয় তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল এরূপ 'দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার' তাঁর মনে থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনস্মৃতি বা অন্য কোথাও প্রবন্ধটির নাম উল্লেখ করেন নি এবং পত্রিকায় 'কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে' বলেন, তাতে 'কোনো অন্যায়' হয় নি। বরঞ্চ, তিনি 'ভুবনমোহিনী' ইত্যাদি প্রবন্ধটির কথা বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছেন জীবনস্মৃতিতে। কারণ সেখানেই আছে তাঁর নিজের মনের কথা।

তবুও বলব, হিমালয়ের কোলে বসে পিতার কাছে শোনা জ্যোতিষশাস্ত্রের যে বাংলা অনুবাদ তিনি করতেন, তা কবির প্রথমযুগের গদ্যচর্চার ইতিহাসে বিশেষ মূল্য লাভের উপযোগী। তাঁর গদ্যচর্চার এই যুগ ছিল 'হাতের অক্ষর পাকাবার যুগ', প্রভাতের পূর্বে প্রত্যুষের প্রথম আবির্ভাবের রক্তিম আভার মতো।

সুশান্তবাবু তাঁর প্রবন্ধের শেষে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, পরিশেষে তারই একটু উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাবে। সুশান্তবাবুর সিদ্ধান্তে কালগত

একটু ত্রুটি লক্ষ করা যায়। তিনি সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এই ত্রুটির দিকে লক্ষ করেন নি। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনার তালিকায় 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'র স্থান তৃতীয়। প্রথম রচনা 'ভারতভূমি' কবিতা প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে (১২৮০ মাঘ/১৮৭৪ জানুআরি)। তার দশমাস পরে দ্বিতীয় রচনা 'অভিলাষ' কবিতা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয় (১২৮০ অগ্রহায়ণ/১৮৭৪ নভেম্বর)। তিনি বোধহয় খেয়াল করেন নি, ১২৮০ মাঘের দশমাস পরে ১২৮০ অগ্রহায়ণ হতে পারে না। ঐ তারিখ ছিল আসলে ১২৮১ অগ্রহায়ণ/১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর। এর ঠিক পরের মাসেই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয় 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। সুশান্তবাবু ভ্রমবশতঃ বলেছেন, ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের তারিখ ১৭৯৬ শক, পৌষ=১২৮০ বঙ্গাব্দ, পৌষ=১৮৭৪ ডিসেম্বর। প্রকৃতপক্ষে ঐ তারিখও যথার্থতঃ হবে, ১২৮১ বঙ্গাব্দ, পৌষ=১৮৭৪ ডিসেম্বর/১৮৭৫ জানুআরি।[২]

এই পর্বের গদ্যরচনা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত 'ঝান্সীর রাণী' প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। এর প্রাথমিক রূপটি পাওয়া গেছে মালতীপুঁথিতে। এটিতে কবির 'হৃদয়ভাবের' আভাস কিঞ্চিৎ ফুটে উঠেছে। তবুও এটি মুখ্যতঃ ইংরেজি রচনার অনুবাদ হিসাবেই পরিচিত। ভাষার মধ্যে ইংরেজির ছাপ রয়েছে প্রচুর এবং ভাবনাতেও রবীন্দ্রচিন্তার স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশের সুযোগ হয় নি। তবে প্রবন্ধটির মূল্য আছে অন্যক্ষেত্রে। তাই প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসে এর একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে; যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

সাহিত্য সমালোচনা - ১

চিন্তা ও রচনার স্বকীয়তা, বিশিষ্টতা ও রচনাকালের অগ্রবর্তিতার বিচারে রবীন্দ্রনাথের '**ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী**' প্রবন্ধটি সর্বাগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮৩ কার্তিক)। এ প্রসঙ্গে কবির নিজের স্বীকৃতি আছে—

> "আমি তখন ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

২ শতবর্ষপঞ্জিকা দেখেছি। তাতে আছে, ১২৮১, ১-১৭ পৌষ=১৮৭৪ ডিসেম্বর এবং ১৮-২৯ পৌষ=১৮৭৫ জানুআরি।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম, খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম।"

—জী·স্ম, 'রচনাপ্রকাশ'

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, ভুবনমোহিনীর রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবসর সরোজিনীর লেখক রাজকৃষ্ণ রায় এবং দুঃখসঙ্গিনী-প্রণেতা হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী— এই তিনজনের বাংলাসাহিত্যে কি দান এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কই বা কতটুকু ছিল তা পূর্বেই (প্রথম অধ্যায়-২) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকুই বলব যে, রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা-প্রবন্ধটিই বাংলাসাহিত্যে তাঁদের নাম বাঁচিয়ে রেখেছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না।

এবার দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি রচনার প্রেরণা কোথা থেকে পেলেন এবং তারই মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বকীয়তা কি ভাবে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর একেবারে প্রথম দিকের কবিতা 'অভিলাষ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে, ঐ কবিতাটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালীর বাহুবল' (বঙ্গদর্শন ১২৮১ শ্রাবণ) প্রবন্ধটির প্রতিবাদস্বরূপ। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধটিই ছিল অভিলাষ কবিতা রচনার অন্যতম প্রেরণাস্থল। অপরপক্ষে, 'ভুবনমোহিনী' ইত্যাদি প্রবন্ধটিতেও বঙ্কিমের 'বাঙালীর বাহুবলে'র সুস্পষ্ট ছায়া লক্ষ করা যায়। কিন্তু এবার প্রতিবাদ নয়, এবার তার সমর্থনসূচক। অর্থাৎ সবদিক্ থেকেই বলা যায়, রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে 'অভিলাষ'-এর যে স্থান, প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ভুবনমোহিনী'রও সেই স্থান। প্রবীণ বঙ্কিম ও নবীন রবীন্দ্র উভয়েই প্রবন্ধ দুটিতে বলেছেন, বাঙালী ঐতিহাসিক গৌরবে বঞ্চিত, কর্মকীর্তিহীন দুর্বল জাতি এবং এই নির্বীর্যতার কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব। বাঙালীর বাহুবলের কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর এই গৌরবহীনতাকে ধিক্কার দিয়ে আবার লিখলেন 'ভাই ভাই' কবিতা (১২৮১ চৈত্র)। জলবায়ুর প্রভাবে বাঙালী অলস এবং তারই ফলে বাংলাসাহিত্যে মহাকাব্যের স্বল্পতা ও প্রেমবিষয়ক গীতিকাব্যের প্রাধান্য ঘটে, এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এর পূর্বে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধেও (১২৮০ চৈত্র) দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধাবলীতে উল্লিখিত এই অভিমত যে বালক প্রাবন্ধিকের অন্তরে 'লক্ষ্যে অলক্ষ্যে' বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ও তার বিচিত্র আলোকরশ্মি কবির সদ্য উন্মেষোন্মুখ হৃদয়কে এক অপূর্ব বিস্ময়ের মধ্যে

বিকশিত করে তুলেছিল, সে কথা তিনি কতবার কত প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন! কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার এই যে প্রভাব, তা সহজে মুছে যায় নি; বরঞ্চ তাঁর জীবনে স্পষ্ট দুটি চিন্তা হয়ে শেষ বয়স পর্যন্ত অবিচলিত ছিল। এক, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র গঠনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক এবং দুই, বাঙালীর 'নির্বীর্যতা' ও 'ঐতিহ্যগৌরবহীনতা' বাঙালীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পরবর্তী কালে তাঁর এই মনোভাবই বারেবারে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'মানসী' কাব্যের 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি' ও 'বঙ্গবীর', 'সোনারতরী' কাব্যের 'হিং টিং ছট্‌', 'চৈতালি' কাব্যের 'বঙ্গমাতা' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে।—

অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি গৃহের প্রতি টান …
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।

—মানসী, 'দুরন্ত আশা' ১৮৮৮

এ যেন বঙ্কিমের 'গৃহসুখপরায়ণ' অলস বাঙালীচরিত্রেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। বাঙালীর এই অগৌরবের প্রতিকার কামনাতেই তিনি 'বঙ্গমাতা' প্রভৃতি কবিতা (১৮৯৬) এবং 'রুদ্ধদ্বার' (১২৯২), 'মা ভৈঃ' (১৩০৯) প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এর বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে। পরবর্তী কালের এই বেদনাময় অনুভূতির প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হয় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধে। আর তিনি এই মনোভাব উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করলেন বঙ্কিম-চন্দ্রের কাছ থেকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রচিন্তা তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধটির গুরুত্ব কিছু কম নয়।

এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে আরও একটি বিষয়ে বিস্মিত হতে হয়। তা হল, এই বয়সেই লেখকের জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যাপকতা এবং চিন্তার গভীরতা। আমেদাবাদে যাবার পূর্বেই রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় চৌধুরীর কৃপায় ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটেছিল তার প্রমাণ আছে এই প্রবন্ধে। শুধু ইংরেজি নয়, সংস্কৃত সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসও তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না। অর্থাৎ সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে বিপুল ভূমিকার উপর রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা তার প্রথম অঙ্কুর দেখা যায় এই প্রবন্ধটিতে।

শুধু সাহিত্য নয়, যে ইতিহাসজিজ্ঞাসা কবিচিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তারও প্রথম আবির্ভাব এই প্রবন্ধে। একদিকে ফরাসীবিপ্লব অন্যদিকে বাংলাদেশে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাব উভয়ই বালক রবীন্দ্রনাথের মনকে আকৃষ্ট

করেছে। কি কারণে 'প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে' কিশোর-ভাবুক তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মূল্যও অগ্রাহ্য করা যায় না। বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম প্রেরণা, তারও প্রথম প্রকাশ এই প্রবন্ধটিতেই।

গীতিকাব্যের প্রতি একদিকে বিশেষ আকর্ষণ, অপরদিকে মহাকাব্য রচনার রীতি পরিহারের যুক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। আধুনিক কালের কৃত্রিমতার মধ্যে মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়।—

> "এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না।"

রবীন্দ্রনাথের এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় সমকালীন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) রচনাতেও। সেকালে বাংলাদেশে মহাকাব্য রচনার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তিনি ঐ উক্তি করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার ইত্যাদি কাব্যের মহাকাব্য হিসাবে বিফলতারও ইঙ্গিত দেন। লক্ষ করবার বিষয়, ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের যে তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন, তারও প্রথম বীজ পাওয়া যাচ্ছে এই প্রবন্ধটিতেই।

পক্ষান্তরে, সে কালে কৃত্রিম মহাকাব্যের পাশে পাশে গীতিকাব্যের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে কিশোর কবির হৃদয় মুগ্ধ হয়েছিল। আর গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য যে প্রেম, সে কথাও তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'দুঃখসঙ্গিনী' কাব্যটির তিনি প্রশংসা করেছেন।

কোনো একটি রস বা বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও তাই নিয়ে আতিশয্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিচিত্র চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাই হচ্ছে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্টতা। তাঁর এই বিশিষ্টতার পরিচয় এই অল্পবয়সের প্রবন্ধটিতেই পাওয়া যায়। তখনকার দিনে যাঁরা স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনায় দেশকে মাতিয়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের কাছে প্রেমের কবিতার কোনো মূল্য ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতার সমর্থন করতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করলেন না। 'প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে' আলোচ্যমান প্রবন্ধে তিনি এই অভিমতের প্রতিবাদও করলেন। কিন্তু তা বলে তিনি দুঃখসঙ্গিনীর কবির মত প্রেমকেই একমাত্র উপজীব্য করলেন না। তাঁর বাল্যরচনায় স্বদেশ-প্রীতির দৃষ্টান্তও কম নয়। এই প্রবন্ধেও স্বদেশপ্রীতির উল্লেখ দেখা যায়।

"'মিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত" এ প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তিটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু কোনো কিছুরই আধিক্য কবি পছন্দ করেন নি। তিনি চেয়েছেন সর্বপ্রকার অনুভূতির মধ্যে সুসামঞ্জস্য স্থাপন করতে। প্রসঙ্গক্রমে, আরও কয়েক বৎসর পরে লেখা অক্ষয় চৌধুরীর 'দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধের উত্তরেও (১২৮৯) রবীন্দ্রনাথ এ কথাই বলেছেন। এইরকম উক্তি তাঁর সাহিত্যে বিরল নয়। কিন্তু সেদিন বালক-সমালোচকের এই উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করেন নি। তাই পরে কবি এই কৃত্রিম উত্তেজনাকে নিরস্ত করার জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'মানসী'র 'দেশের উন্নতি' প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রবন্ধটিতে লেখক বৈদিক ঋষি, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যদেব— প্রভৃতি বিভিন্ন নামের একত্র সমাবেশ যে ভাবে করেছেন তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিকতা যেন স্বতঃই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বৈদিক ঋষিগণ ও তপোবনের আদর্শ রবীন্দ্রচিত্তে চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার প্রথম পদধ্বনি শোনা গেছে এই প্রবন্ধটিতে।

সর্বশেষে প্রবন্ধটির ভাষাগত উৎকর্ষের কথা বলা প্রয়োজন। ভাবের দিক্ থেকে দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। ভাষার সম্বন্ধে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় 'বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।' প্রকৃতপক্ষে, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন পূর্ণতেজে আবির্ভাব তখন কিশোর রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-কোরকের উন্মেষকাল'। তাই স্বভাবতঃই মনে হয়, ভাবের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বঙ্কিমের অনুসারী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভুবন-মোহিনী ইত্যাদি রচনার সময় থেকেই রবীন্দ্রগদ্যে দেখা গেল স্বাতন্ত্র্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের গদ্য যুক্তিপূর্ণ, সংস্কৃত শব্দের তাতে আধিক্য ও অলংকার প্রয়োগের বিরলতা। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রগদ্যের বিশেষত্ব কবিসুলভ আলংকারিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পাঠকের মনোহরণ করা। ভাষার মধ্যে ধ্বনিঝংকার, ছন্দস্পন্দন, ভাবসামঞ্জস্য ইত্যাদির একত্র সমাবেশ বঙ্কিমের রচনায় দুর্লভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্টতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাঁর এই প্রথম রচনাটি থেকেই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন, বালকবয়সে তাঁর হাতে যে নূতন গদ্যরীতির উদ্ভব হল, তার প্রেরণাস্থল ছিলেন বঙ্কিম ও তাঁর বঙ্গদর্শন। তার ফলেই সেদিন বাংলাভাষা

'নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে' চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলাগদ্য যে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হল, তার প্রেরণা এসেছিল বঙ্কিমের কাছ থেকেই। তার সঙ্গে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত হয়ে স্বকীয়রূপ প্রাপ্ত হল। ভাষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসচেতনতারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া দরকার। রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা সম্বন্ধে তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন, তাঁর কবিতায় ছন্দ আছে, কিন্তু ভাব নেই। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন— এতে তাঁর অভ্রান্ত ও তীক্ষ্ণ সাহিত্যদৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, ভাবের দীনতা সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণ অভিনব ছন্দের স্রষ্টা হিসাবে বাংলাসাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র রচয়িতা কোনো নারী বলে সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধিতে অনুমান করলেন, এটি কোনো নারীর লেখা নয়। তারপরেই তিনি সমালোচনাটি লেখেন।

সর্বদিক্ থেকে বিচার করে বলতে হবে, 'জীবনস্মৃতি'তে বহুযুগ পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অল্পবয়সের রচনাটিকে পরিহাসের সঙ্গে উপেক্ষা করেছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটি উপেক্ষার যোগ্য নয়। প্রবন্ধটি যে যথোচিত স্বীকৃতি লাভ করে নি তার প্রথম কারণ, রবীন্দ্রনাথের পরিহাস ও অবজ্ঞা এবং দ্বিতীয় কারণ, প্রবন্ধ রচনাকালে লেখকের বয়সের স্বল্পতা। তাঁর চিন্তার গভীরতা বা প্রসার থাকা সত্ত্বেও অল্পবয়সের জন্যই প্রবীণদের কাছে প্রবন্ধটি যথোচিত মর্যাদা পায় নি।

কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রবন্ধটির চিন্তামূল্য বা রচনামূল্য কোনোটাই কম নয়। বরঞ্চ, তৎকালীন কবিতাগুলির চেয়ে এই গদ্যরচনাটির সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তার উৎসস্থল এই প্রবন্ধটি। তাই একদিক্ থেকে এটিকে বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যায়।—

> "বস্তুতঃ, চিন্তামুক্তির যে বিশিষ্টতা ও বলিষ্ঠতা উত্তরকালীন রবীন্দ্র-সাহিত্যের যোগে আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছে, এই প্রবন্ধটিকে বলা যায় তারই অগ্রদূত।"[৩]

৩ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'অগ্রদূত'— ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়।

২

'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধটি প্রকাশের পর বালকের সাহস গেল আরো বেড়ে। তিনি এবার আক্রমণ করলেন মধুসূদনের **মেঘনাদবধ কাব্যটিকে**। আর তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম হল 'ভারতী' পত্রিকা (১২৮৪)। দুই বৎসর পূর্বে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের পৃষ্ঠায় কবির গদ্য ও 'পদ্যপ্রলাপ' নির্বিচারে প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল; ভারতীতে সেই সুযোগ দেখা দিল শতগুণে। ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক, সংগীত, ছন্দ এবং আরো নানাবিষয়ে কবির লেখনী শতধারায় উৎসারিত হয়ে উঠল। 'ভারতী' নিজেদের পারিবারিক পত্রিকা বলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিচিত্র রচনা নির্বিচারে প্রকাশের বাধাও দূর হল।

ভারতীর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের একটি সুদীর্ঘ ও কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হতে লাগল (১২৮৪ শ্রাবণ-ফাল্গুন)। প্রবন্ধটিতে অবশ্য লেখকের নাম ছিল না, ছিল 'ভানুসিংহ' নামের আদ্যক্ষর 'ভং'।

প্রবন্ধটিতে তিনি হোমারের মহাকাব্য ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন-অনূদিত রামায়ণ[৪] এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বহু কাব্যনাটকাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন মহাকাব্য হিসাবে মেঘনাদবধকাব্য বিফল। বরঞ্চ, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' তুলনায় অনেক বেশি উচ্চ পর্যায়ের। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ড প্রকাশের (১৮৭৫) সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের দুই সংখ্যায় এক সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখে কাব্যটির বিশেষ প্রশংসা করেন।[৫] কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধুসূদনের অপেক্ষা তাঁর কাব্যপ্রতিভা উৎকৃষ্ট হয়েছে— এ কথাও তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধটি পড়েছিলেন বলেই অনুমান করা যায়। কারণ তিনি ছিলেন বঙ্গদর্শনের নিয়মিত পাঠক। ফলে বঙ্কিমের প্রভাব যে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রতিফলিত হয় নি, সে কথাও বলা যায় না এবং বঙ্কিমের প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে বৃত্রসংহারের উৎকর্ষের কথা বলেছেন, এ অনুমানও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। চরিত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই।"

---

৪ নূতন সংস্করণ— ভারবি; প্রথম খণ্ড বৈশাখ ১৩৮২ / এপ্রিল ১৯৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড মাঘ। ১৩৮২ ফেব্রুআরি ১৯৭৬

৫ দ্রষ্টব্য— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য: 'বঙ্কিমকৃত সাহিত্যসমালোচনা— দুষ্প্রাপ্য রচনাসংগ্রহ', পৃ ৭০-১০৫

বিশেষতঃ রাবণচরিত্র ও রাবণের রাজসভার বর্ণনায় তিনি হতাশ হয়েছেন। বরঞ্চ, "রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে।" তবে কোনো কোনো চরিত্রে বা চিত্রে যে তিনি একেবারে সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব পান নি, তাও নয়। তিনি বলেছেন—

> "মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে··· ইন্দ্রজিতের চরিত্র সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।"

অপরপক্ষে, রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণকে হীনবলরূপে অঙ্কিত করায় কবি অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করে কবি কাব্যটির সঙ্গে কোনরূপ আন্তরিকতা অনুভব করতে পারেন নি। তাই তিনি আবার বলেছেন—

> "মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধের দ্বিতীয় বিরূপ সমালোচনা- প্রবন্ধটির কথাও আলোচনা করা দরকার, যদিও দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচিত হয় প্রথমটির পাঁচ বৎসর পরে (ভারতী, ১২৮৯ ভাদ্র)। এই প্রবন্ধেও তিনি মেঘনাদের তীব্র নিন্দাই করেছেন। তাঁর মতে, "রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লেখা যায় না।" "হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করা" কোনোটাই মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হতে পারে না। তাঁর মতে—

> "মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।"

তাই কাব্যটির মধ্যে কোনো 'অনন্য সাধারণতা' বা 'অমরতা'ও নেই। এরচেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র চরিত্রগুলিও অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। তাই—

> "যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধিভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি অতি কঠোরভাবে বলেছেন—

> "একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহার বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই।···

মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ?”

তাই কবির মুখে “I despise Ram and his rabble” মহাকবির উপযুক্ত কথা হয় নি।

চরিত্রগুলিকে লেখকের যেমন মহাকাব্যের অনুপযুক্ত মনে হয়েছে, তাঁর ভাষাকেও তিনি তেমনি দুর্বল মনে করেছেন। সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

“একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে ?··· যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হন— তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশত পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন ? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।”

তাই সিদ্ধান্তে কবি সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, মেঘনাদবধে “প্রাণ নাই··· তাহা মহাকাব্য নয়।”

এখন প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ ভারতীর প্রথম সংখ্যা থেকে হঠাৎ মেঘনাদবধ কাব্যটি বেছে নিয়ে সমালোচনা করলেন কেন এবং যদি করলেনই তবে এত বিরূপ হলেন কেন ? আসলে, নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁকে যে সব গ্রন্থ ‘পাঠ্যপুস্তক’-রূপে পড়তে হত, তার মধ্যে একটি ছিল মেঘনাদবধ কাব্য। কল্পনাপ্রিয় বালককে কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থ কখনও আকর্ষণ করে নি। অনিচ্ছায়, শাসনের দায়ে ভাষা-শিক্ষার অজুহাতে কাব্য পাঠ করার মত এতবড় বিড়ম্বনা আর নেই। ‘জীবনস্মৃতি’তে ‘বাংলাশিক্ষার অবসান’ অংশে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন, তা তাঁর পক্ষে ছিল অতি সত্য—

“যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে।··· কাব্য-জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান-ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।”

কাব্যটিকে ভাষাশিক্ষার গ্রন্থ হিসাবে পড়ানোয় কবির মন হয়ে উঠেছিল

বিরূপ। সেইজন্যই তিনি বোধহয় মেঘনাদের এত 'তীব্র সমালোচনা' করেছিলেন। পরবর্তী কালে নিজের এই লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।"

—জী-স্মৃ, 'ভারতী'

এই 'দাম্ভিক সমালোচনা'র জন্য ঐ প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন—

"ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালীর কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"

কিন্তু সমালোচনা 'উদ্ধত' হলেও বা ওটির সাহিত্যমূল্য সামান্য হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ইতিপূর্বে এমন নির্ভীক, বিস্তারিত সাহিত্য-সমালোচনা বাংলাসাহিত্যে আর হয় নি। মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে একটি কাব্যের চরিত্র, কাহিনী, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতির সার্বিক আলোচনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল— এ-ও অতি বিস্ময়ের বিষয়। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য-সমালোচক রূপটির প্রথম মুকুল দেখা গিয়েছিল। সেই সমালোচকটিই পরিণত বয়সে বারেবারে মেঘনাদবধের বিশেষত্ব, নূতনত্ব ও ছন্দ-অলংকার-ভাষার প্রশংসা করে নানা জায়গায় আলোচনা করেছিলেন। এই কাব্যটিই ধ্বনি ও ছন্দের ঐশ্বর্যে বাংলাকাব্যকে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত করল এবং নূতন পথে চালনা করল, সে ঋণ তিনি বারেবারেই স্বীকার করেছেন নানা প্রবন্ধে।[৬] তবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি মেঘনাদের যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়েছেন, পরবর্তী কালে সর্বত্রই তাকে তিনি খণ্ডন করেছেন— এ কথা ভাবাও অনুচিত হবে। আসলে মেঘনাদের যে অভিনবত্ব তা বাংলাসাহিত্যে ছিল নিতান্তই আকস্মিক। এই আকস্মিকতা সেদিন অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি; তাই তাঁর যথার্থ শিষ্যকবির আবির্ভাবও সম্ভব হয় নি। কবি নিজেও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অল্পবয়সের ঔদ্ধত্যে তিনি তাঁর বিরূপতা বড় কঠিনভাবে করেছিলেন। আর

৬ দ্রষ্টব্য : আধুনিক সাহিত্য, 'বিহারীলাল' ১৩০১ ; সাহিত্য, 'সাহিত্যসৃষ্টি' ১৩১৪, 'ছন্দের অর্থ' ১৩২৪ প্রথম প্রকাশ— সবুজপত্র, প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনা (১৩৩৮)। দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন : 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং, পৃ ১৮৫

পরিণত বয়সের স্নিগ্ধ বিচারশক্তির বলে সেই কথাই কোনো কোনো স্থলে বলেছেন নম্র, বিনয়ী ভাষায়।—

> "একথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাঁড়ুজ্জে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন। এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র।··· মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন।"
>
> —সাহিত্যের পথে, 'সাহিত্যরূপ' ১৩৩৫

প্রথম দুটি সমালোচনা অনুকূলই হোক বা প্রতিকূলই হোক, তাঁর ব্যক্তিগত লাভ হল এই যে, তিনি নিজে পেলেন তাঁর সাহিত্যসমালোচনা ও প্রবন্ধ রচনার উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর এই অবিনয়ী প্রবন্ধটি সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার পুনরুল্লেখ অনুচিত হবে না।—

> "সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনো ব্যর্থ হইবে না।"
>
> —জী-স্মৃ, 'ভারতী'

এই 'অগ্নি'র প্রখরতার ফলেই তিনি পরবর্তী আলোচনাগুলি করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। আসলে, মেঘনাদবধের সবগুলি আলোচনা একত্রিত করলে তার একটি সামগ্রিক রূপ দেখা যায়। এক মহাকবিকে নানাদিক্ থেকে বিচার করেছেন আরেক মহাকবি। আর, বাংলার পাঠকবর্গ তারই আলোকে মেঘনাদবধ পাঠের সুযোগ পেলেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম প্রবন্ধ দুটিতে তিনি যা বলেছেন এবং পরবর্তী কালেও যখন তিনি বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্য 'তার দোহার পেল না' তখন আসলে তিনি কাব্যটিকে বিচার করেছেন বাঙালীর সমাজ-বিশ্বাসের দিক্ থেকে। মূল রামায়ণের সম্বন্ধে আমাদের যে বিশ্বাস তা বাঙালীর চিরন্তন বিশ্বাস। সাহিত্যিক রসের বিচারে তাকে বলতে হয় সিদ্ধরস। মেঘনাদবধে এই সিদ্ধরসকে ক্ষুণ্ণ করা

হয়েছে— রাম-লক্ষ্মণকে হীন করা হয়েছে। তাই বহু সাহিত্যসমালোচকই সেদিন কাব্যটিকে মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথও সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই 'মহৎ চরিত্র বিনাশ' করার অভিযোগ করেছেন, মেঘনাদের আইডিয়াকে নিন্দা করেছেন। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও 'ভারতী'র একটি সংখ্যায় লেখেন—

> "যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি, তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চিরআরাধ্য দেবতা— সেই রামলক্ষ্মণকে হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত?"
>
> —ভারতী ১২৮৯ আশ্বিন; প্রবন্ধমঞ্জরী ১৯১২

'ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী' বলতে তিনিও চিরকালীন সিদ্ধরসের কথাই চিন্তা করেছিলেন মনে হয়। তবে সমকালীন মন্মথনাথ ঘোষ প্রমুখ আরো কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে সমর্থনও করেছিলেন।

কিন্তু পরিণত বয়সে মেঘনাদের বিচার করতে বসে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যিক মর্যাদা উপলব্ধি করেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সমালোচনা করেন। রামায়ণের মূল গল্পটি যদি যথার্থ সাহিত্যিক মানদণ্ডে যাচাই করা যায়, তবে দেখা যাবে তাতে মানবিক রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একমাত্র অযোধ্যাকাণ্ড বাদ দিলে সমগ্র কাব্যটিতেই মানুষের সঙ্গে অ-মানুষের দ্বন্দ্ব। রাম-লক্ষ্মণের বাহিনী বানরকুল এবং তাদের সংঘাত রাক্ষসদের সঙ্গে। রামায়ণের সঙ্গে তুলনায় মহাভারত কি অনেক বেশি মানবীয় নয়?—যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব, সংঘাত; যেখানে দোষেগুণে প্রত্যেকটি চরিত্রই এক একটা যথার্থ মানুষ হয়েছে?

আধুনিক যুগের কবি মধুসূদন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাব্য লিখতে গিয়ে রামায়ণের এই দুর্বলতাটাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই কারণেই বোধহয় তিনি বলেন, 'I despise Ram and his rabble'. উনবিংশ শতাব্দীতে 'য়ুরোপের শক্তি' আমাদের সাহিত্যে, সমাজে যে বিচিত্র সুরের অনুরণন তুলেছিল—

> "দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি— তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।"
>
> —সাহিত্য, 'সাহিত্যসৃষ্টি' ১৩১৪

ইউরোপের এই বাণী ছিল মানবিক রসের বাণী। মধুসূদন এই নূতন দৃষ্টি

নিয়ে রামায়ণের বিচার করতে গিয়ে দেখলেন, রাম-লক্ষ্মণ তো ভিখারী, বনবাসী ; তাঁদের অনুচর বানরবাহিনী। অপরপক্ষে, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস হলেও বিরাট্ সেনাবাহিনী ও বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। তাদের হৃদয়ে আছে উদার মানবিকতা। তাই তাদেরই কবি মহৎ করে এঁকেছেন। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে উপলব্ধি করেছিলেন, প্রথমে বুঝতে পারেন নি। মেঘনাদের রাবণ শুধু মানবিক নয়, এক অনন্ত-প্রসারি বিরাট্ শক্তির আধার, সে শক্তিকে কোনো সংস্কার, কোনো শোক কোনো ধর্মভয় স্পর্শ করতে পারে না। তাই তারই জয়গান করে রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে আবার বলেছেন—

> "যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

তবে কাব্যটির আইডিয়া মহৎ হলেও মহাকাব্যের রূপ বাংলার অন্তরের রূপ নয়। সেইজন্যই মধুসূদনের রচিত নূতনপথে 'একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল।' এই ত্রুটিটি রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলাতেও মানতে পারেন নি, পরিণতিতেও নয়।

মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্য হিসাবে সার্থক না হলেও এর মধ্যে দিয়ে মধুসূদন ভাষা, ছন্দ ও ধ্বনিসৃষ্টিতে পরবর্তী সাহিত্যিকদের যে 'সাহস' ও 'উৎসাহ' দিয়ে গেলেন, তা বাংলাকাব্যের রূপকে দিল সম্পূর্ণ বদলে। তাঁর এই উত্তরসূরীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতনত্ব ও ধ্বনিঐশ্বর্যকে কবি তাঁর প্রথম প্রবন্ধেও স্বীকার করেছিলেন এবং তারই সার্থক বিচার করেছেন পরবর্তী বহু প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন—

> "বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন স্থুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে।··· মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"
>
> —ছন্দ, 'বিহারীলালের ছন্দ', পৃ ১২-১৩

"তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই··· অল্পবয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম পরবর্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলাভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।"

—ছন্দ, 'ছন্দবিচার'-১, পৃ ১২৪-২৫

পরিণত বয়সের পরিপক্কতায়, চিন্তার বিস্তৃতি ও গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে তাঁর প্রথম প্রবন্ধগুলি রচনার অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং নিজের 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই আলোচনা থেকে দেখা গেল, প্রথম প্রবন্ধ দুটিও কোনো কোনো দিক্ থেকে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

৩

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত) '**কবিতা পুস্তক**' নামক কবিতা-সংকলন গ্রন্থটির সমালোচনা (১২৮৫ ভাদ্র)। লেখক বলেছেন—

"বঙ্কিমবাবুর কবিতাপুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না— জ্ঞানের কথা এ স্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোনো স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন—কিছুই না—হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

তিনি পরপর কয়েকটি কবিতা ধরে আলোচনা করে তাঁর ভাল না লাগার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম কবিতা পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তার বিষয়। তাঁর চরিত্র মোটে রানীসুলভ হয় নি। পৃথ্বীরাজের চরিত্রও দুর্বল। এই কবিতায় তিনি জুলিয়স সিজারের সঙ্গে তুলনা করে সিজার চরিত্রের বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখিয়েছেন।

পরবর্তী 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটি রাধাকৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা। এটিও যথার্থ হৃদয়গ্রাহী কবিতা হয় নি। কারণ—

"উত্তর-প্রত্যুত্তর কবিতাতে প্রায়ই বড় একটা প্রকৃত কবিতা থাকিতে পারে না; কারণ উত্তরগুলি প্রায়ই হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধিসাপেক্ষ।"

এই প্রসঙ্গে তিনি রামবসু, হরুঠাকুর ইত্যাদি কবিওয়ালাদের নাম করেছেন। অতঃপর বলেন—

"'অধঃপতন' সংগীতটিতে··· বিষয়ের দোষে রস মারা পড়িয়াছে।" তাঁর মতে 'সাবিত্রী' কবিতাটিতে—

> "স্থানে স্থানে দু'একটি সুন্দর বর্ণনা আছে।··· কিন্তু গ্রন্থকার যে সত্যবান্‌কে জীবন দান না করিয়া সাবিত্রীকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিলেন কেন— তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না।"

এ প্রসঙ্গে তিনি শেক্সপীয়রের অ্যান্টনী-ক্লিওপেট্রা চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা তুলনা-মূলক আলোচনা করেছেন। পুরাণে সাবিত্রী-সত্যবানের যে কাহিনী ভারত-বাসীর হৃদয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে—

> "বঙ্কিমবাবু স্বেচ্ছামত পুরাণের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া দেশীয় একটি অতি সুন্দর কাহিনীর সুন্দরতর অংশটুকু একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মেঘনাদবধের সমালোচনা করতে গিয়ে ভারতবাসীর চিরকালীন সংস্কারে আঘাত করার জন্য যেমন লেখককে আক্রমণ করেছিলেন, এখানেও সে আক্রমণ তেমন কঠোর না হলেও তার ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন।

বরঞ্চ 'আদর' কবিতাটি সম্বন্ধে বলেছেন— এ কবিতাটি মন্দ নহে—"ইহার প্রথম কথাগুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে।"

> ""বায়ু"— কবিতাটি একটি প্রহেলিকাস্বরূপ। ইহার শীর্ষে "বায়ু" শব্দটি না থাকিলে ইহা একটি সুন্দর হেঁয়ালী হইতে পারিত।"

"আকবর সাহের খোষ রোজ" কবিতাটি সম্বন্ধে বলেছেন—

> "এ কবিতাটি কতক সুশ্রাব্য হইয়াছে—কিন্তু ইহাতে আবার কল্পনার যতদূর ব্যভিচার হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি হয় নাই।"

এছাড়া আরও কতগুলি কবিতার নাম করেছেন (মন এবং সুখ, ললিতা, মানস) যেগুলি বঙ্কিমের অল্পবয়সের লেখা এবং কোনো বিশেষত্বপূর্ণ নয়।

তবে গ্রন্থটি বঙ্কিমের যথার্থ প্রতিভার পরিচায়ক না হলেও, সেটি তাঁর 'যশ'কে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেছে বলে লেখক মনে করেন না। কারণ, তাঁর যথার্থ প্রতিভা নির্ভর করছে তাঁর উপন্যাসগুলির উপর। ঔপন্যাসিক ও কবির প্রতিভা দুই জাতের। এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "স্কটের লেডী অফ্ দি লেকের সহিত বাইরণের 'জওয়ারের' তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।"

কবির এই সমালোচনা প্রবন্ধটি পড়ে এ কথাই জানা যায়, মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে প্রায় সকল সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন। তা না হলে তিনি বারেবারে এমন তুলনামূলক আলোচনা করতে পারতেন না। অপরপক্ষে, জ্ঞানাঙ্কুর ও ভারতীতে দুটি সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখার পর তাঁর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিটিও অনেক প্রসারিত হয় এবং সেই নির্ভীক বালক সে যুগের খ্যাত-অখ্যাত কোনো সাহিত্যিককেই প্রয়োজন মত সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তাই যে বঙ্গদর্শনের প্রভায় তাঁর 'হৃদ্‌পদ্ম' প্রথম বিকশিত হয়েছিল, তারই সম্পাদককে তাঁর নিকৃষ্ট রচনার জন্য নিন্দা করার সৎসাহস তিনি রাখতেন এবং যুক্তিতর্ক সহযোগে তাঁর মত প্রমাণ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এইভাবেই বালক রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার সাহিত্যিকদের আসরে একটি আসন ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেবার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

৪

সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার মধুসূদন এবং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন আরো একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। **'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'** (১২৮৮মাঘ) নামে এক প্রবন্ধে তিনি গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও অভিমন্যুবধ' নাটক দুটির সমালোচনা করেছেন। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন বাঙালীর চিরন্তন বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে, 'আমাদের বুকে কি আঘাত'ই দিয়েছেন। কিন্তু—

> "সুখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যুবধ আর কি তাঁহার রাবণবধ— এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে।··· তাঁহার অভিমন্যুবধ ও রাবণবধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ।"

মহাভারতের অভিমন্যুকে 'চন্দ্রসূর্যমিশ্রিত' একটি আভার প্রতীক বলে মনে হয় এবং নাটকটিতে তিনি সেইরূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। তাছাড়া—

> "মহাভারতের সকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের হস্তে কষ্টকর

মৃত্যুতে, জীবন না ফুরাইলেও অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ ত্যাগ করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে যাহার যখন মৃত্যু আবশ্যক, গিরিশবাবু তাহাই করিয়াছেন। মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন গিরিশবাবু অভিমন্যুকে কি অর্জুনকে কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই— ইহা তাহার বিশেষ গৌরব।··· তাঁহার কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি··· গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি— একজন প্রকৃত ভাবুক।"

রাবণবধে রাম-লক্ষ্মণ চরিত্র বিশেষরূপে পরিস্ফুট না হলেও রাবণ ও মন্দোদরীর চরিত্রপাঠে লেখক মুগ্ধ হয়েছেন। চরিত্রগুলি খুবই জীবন্ত। তাছাড়া দেবী-আরাধনা ও দেবীস্তোত্রগুলির তিনি প্রশংসা করেছেন। একমাত্র অপছন্দের বিষয় হয়েছে 'মৃত্যুবাণ আনয়ন' ও 'সেই স্থানের বর্ণনাটি'।

সর্বশেষে তিনি নাটক দুটিতে গিরিশচন্দ্র ব্যবহৃত ছন্দের বিশেষ প্রশংসা করে বলেছেন, "ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে।"

সে যুগে লিখিত বহু প্রবন্ধের মতই এই সমালোচনাটিতে লেখকের নাম ছিল না। তবে সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গি থেকে মনে হয়, সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা এবং এর স্বপক্ষে কতগুলি অনুমেয় প্রমাণও দেখানো যায়।

প্রথমতঃ প্রবন্ধটির প্রথমেই দেখি, মেঘনাদবধের লক্ষ্মণকে নিয়ে লেখক বিরূপ সমালোচনা করেছেন—

"মাইকেলও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শূরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণদেবকে কি বেরঙ্গে আঁকিয়াছেন। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, যে লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্যের আদর্শস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম,— যে লক্ষ্মণকে আমরা কেবলমাত্র মূর্তিমান ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিক্রম বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধ কাব্যে একজন ভীরু স্বার্থপূর্ণ —"গোঁয়ার" মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কি আঘাতই লাগে।"

উদ্ধৃত এই অংশটি ১২৮৪ ও ১২৮৯ সালে ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনাগুলির প্রায় অনুরূপ। মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে প্রথম প্রবন্ধটিতে দেখি, লক্ষ্মণের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধবর্ণনাকালে লক্ষ্মণকে নীচ, কাপুরুষ, অক্ষত্রোচিতরূপে অঙ্কন করা হয়েছে। আবার দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে "রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন" বলেছেন।

চরিত্র সমালোচনা ও বক্তব্য বিষয়ের সাদৃশ্য থেকে মনে হয়, প্রবন্ধত্রয় একই লেখকের রচনা।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষা ও উপমা প্রয়োগের দিক্ থেকেও লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্র-রচনার যথেষ্ট মিল। সূর্যকিরণ বা সূর্যের সঙ্গে তুলনা করার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন বা পরবর্তী বহু কাব্য-প্রবন্ধেই দেখা যায়। অর্থাৎ 'সূর্য' রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বহু-ব্যবহৃত উপমা। আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতেও লেখক অভিমন্যুর চরিত্রবর্ণনা প্রসঙ্গে সূর্যের আলোকরশ্মির সঙ্গে চরিত্রটির তুলনা করেছেন, 'প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ' শব্দটিতেই তার প্রকাশ। ১২৮৯ সালের মেঘনাদবধ দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেও মহাকাব্যের গুণাগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে সূর্যের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, আরো একটি বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কোনো কোনো রচনার সঙ্গে এই সমালোচনাটির সাদৃশ্য দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে ছন্দের সমালোচনা করিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—"তাঁর নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ", 'হৃদয়ের ছন্দ'। এই 'হৃদয়' শব্দটির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের লেখায় বহুল পরিমাণে দেখা যায়। মেঘনাদবধের প্রথম সমালোচনায় **হৃদয়ের কথা, হৃদয়ের কবিতা, হৃদয়ের গীতি** ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সমালোচনাটিতেও যথার্থ মহাকাব্যের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "একটি মহৎ চরিত্র **হৃদয়ে** আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহার বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই।"

আরেক জায়গায় বলেছেন—

"বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ··· **হৃদয়ের** সহজভাষা কাহাকে বলে?" অর্থাৎ অন্তর থেকে যে ভাষা, যে চরিত্র, যে সাহিত্য উৎসারিত হয় তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন '**হৃদয়ের**'। ছন্দ প্রসঙ্গে তিনি বহুবার 'ভাবের ছন্দ'[৭] (অর্থাৎ হৃদয়ের ছন্দ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই ভাবের ছন্দ শব্দটিই বহু পূর্বে 'হৃদয়ের ছন্দ'রূপে ঐ প্রবন্ধটিতে লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এছাড়া প্রবন্ধটিতে লেখক ছন্দ সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনারই সমগোত্রীয়। এই জাতীয় বিভিন্ন অনুকূল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে

৭ ছন্দ, 'গদ্যছন্দ', পৃ ২২২-২৪

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রায় সপ্রমাণ করেছেন যে, এটি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা।[৮]

৫

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধে'র সমালোচনা করার পর লেখক নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। এবারেও '**সংক্ষিপ্ত সমালোচনা**' নামেই আলোচনা করা হয়। নবীন মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু—

"জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ জনৈক নির্ব্বাসিত ফরাসীস্ সাধারণ তান্ত্রিক বীরবর কর্ত্তৃক স্বদেশ সমীপে সাগরদূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ"।

সমালোচক বলেছেন, এই গ্রন্থটি

"সচরাচর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভাল। তবে সত্য কথা বলিতে কি ইহাতে ভাষার অবিরাম প্রবাহ যেমন দেখিলাম কবিতার উচ্ছ্বাস তেমন দেখা গেল না।"

প্রকৃতপক্ষে, বিষয়বস্তু বা কাব্যমূল্য অপেক্ষা লেখক এই গ্রন্থটির ছন্দ বিষয়েই বিশেষ চিন্তা করেছেন এবং ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'সিন্ধুদূত' এর প্রকাশক কাব্যটির ছন্দ সম্বন্ধে বলেছেন—

"সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃসকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্বহেতু অনেকেরই প্রথম প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।··· বাঙ্গালা ছন্দের প্রাণগত ভাব কি ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে এবং কি প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্যসাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

সমালোচক বলেছেন, গ্রন্থটি প্রথমে পড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তা ছন্দের নূতনত্বের জন্য নয়, ছত্রবিভাগের ব্যতিক্রমের জন্য। তিনি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করে তা প্রমাণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের—

এ কি এ আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে
[সাগরের তীরে ?
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে র'য়েছি এখানে বাহ্য
[জগৎ পাশরে

৮ দ্রষ্টব্য : ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, 'মুক্তকবন্ধের বিবর্তন', পৃ ১২৩-২৪ এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' পৃ ২৯৫-৯৮

ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর ;
[সব ত্যেজেছে আমারে।

এই অংশটির যথার্থ ছত্রবিভাগ করলে দাঁড়াবে—

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে
সাগরের তীরে ?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাই মোর ; সব
ত্যেজেছে আমারে।

এর সঙ্গে মধুসূদনের—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে ধায়
ফিরাব কেমনে ?

—এই অংশটি প্রায় অভিন্ন। এই জন্যই লেখক বলেছেন, "সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।" এছাড়া প্রকাশক যে বলেছেন, 'বাংলাছন্দের প্রাণগত ভাব' কি ও তার 'স্বাভাবিক গতি' কোন্ দিকে তা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করলে উপলব্ধ হতে পারে—সে সম্বন্ধেও সমালোচক তাঁর দ্বিমত দেখিয়েছেন। তাঁর মতে—

"ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই। আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই।"

রামপ্রসাদের কবিতার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন—

"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাঙ্গালা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"

'ভারতী'তে প্রকাশিত এই সমালোচনাটিতেও লেখকের নাম ছিল না। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"লেখক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। এই প্রবন্ধে বাংলা লৌকিক ছন্দের বিশ্লেষণ যেভাবে করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন বিশ্লেষণ-প্রণালীর সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও বিশ্লেষণের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য দেখা যায় না।"[৯]

সাহিত্য সমালোচনা-২

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর প্রধান অবলম্বন ছিল পাশ্চাত্ত্য -সাহিত্যিকবৃন্দ ও তাঁদের রচিত সাহিত্যসম্পদের সমালোচনা। ভারতী পত্র যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়ল, সেইসময় রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিষ্টার করে আনা হোক। বিলাত যাত্রার জন্য যে প্রাথমিক শিক্ষালাভের প্রয়োজন তারই জন্য সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আমেদাবাদে নিয়ে যান, একথা নানা উপলক্ষেই বলা হয়েছে। আমেদাবাদে মেজদাদার সুবৃহৎ লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছেমত বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে একদিকে পড়লেন অসংখ্য সংস্কৃত পুস্তক, অপরদিকে বহু ইংরেজি গ্রন্থ। তখনও ওই ভাষা দুটির উপরে তাঁর দখল খুব বেশি ছিল না। এবার সে অধিকার লাভের সুযোগ হল। তবে ভাষার ধ্বনি-সৌন্দর্যই তাঁকে মুগ্ধ করত বেশি। এর পূর্বেও কবি অক্ষয় চৌধুরীর কাছে ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার 'তীব্র উত্তেজনা' উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তখন থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। আমেদাবাদে সে সুযোগ হল আরো প্রশস্ত। যা পড়তেন, সেগুলি যেখানে বুঝতেন না সেখানে অভিধানের সাহায্যে অর্থোদ্ধার করতেন, কখনও বা কল্পনার দ্বারা পূরণ করে নিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—

"বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা-কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ-একরকম

৯ দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন: 'রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ শ্রাবণ এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ', পৃ ২৬৫-৬৮

চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভালো মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।”

—জী-স্মৃ. 'আমেদাবাদ'

আমেদাবাদে পাশ্চাত্ত্যসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কবির লেখাও চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। বহু বিদেশী কবিতার অনুবাদ ও বহু বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হতে লাগল। বিলাত যেতে হবে বলেও তাঁকে বিচিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। অনেকগুলি রচনা ছিল এই অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ ফল। তাঁর জাপান, চীন, ফ্রান্স-নির্বিশেষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও তাদের সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ ও তার প্রকাশ শুরু হয়েছিল সে যুগে রচিত কাব্যে, প্রবন্ধে। পরবর্তী কালে তাই আরও বিস্তৃত রূপ লাভ করে।[১০] বিলাত যাবেন, তাই সেখানকার শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোনো ইংরাজি বই পড়েছিলেন এবং তারই উপর লিখলেন **'ইংরেজদিগের আদবকায়দা'** শীর্ষক প্রবন্ধ (১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ)। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসও তাঁকে পড়তে হয়েছিল। তিনি নিজেও মেজদাদাকে বলেছিলেন, “আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।” মেজদাদাও 'টেন্' প্রমুখ বিখ্যাত গ্রন্থকারদের লেখা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-সংক্রান্ত 'রাশিরাশি' বই এনে দিলেন। কবি অভিধানের সাহায্যে বইগুলি পড়ে নিজের লেখা শুরু করে দিলেন।[১১] এই বিষয়ে তিনি **'স্যাক্সন্ জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন্ সাহিত্য'** (১২৮৫ শ্রাবণ) এবং **'নর্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্মান সাহিত্য'** (২ প্রস্তাব, ১২৮৫ ফাল্গুন ও ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ) দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধটির সূচনাতেই বলেছেন—

“এই প্রবন্ধে স্যাক্সন্ জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন্ ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত সেই স্যাক্সন্‌দের রীতিনীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিড্‌মন্,

---

১০ উজ্জ্বল মজুমদার: 'ফরাসী ও বাংলা সাহিত্য: মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৮২ মাঘ-চৈত্র

১১ দ্রষ্টব্য: জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ ২য় বর্ষ, কার্তিক-পৌষ, পৃ ১২১: র-জী, পৃ ৮৩-৮৪

বিউল্‌গ্‌, মাস, টেন্‌ প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।"

স্যাক্‌সন্‌জাতি কি ভাবে 'ব্রিটন' জাতিকে ধ্বংস করে ইংলণ্ড অধিকার করল তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় প্রবন্ধটির প্রথমাংশে। এ ছাড়া স্যাক্‌সন্‌দের কবিতা, কবিতার ছন্দ প্রভৃতি বিষয়েও লেখক আলোচনা করেছেন। তাদের কবিতা "হৃদয়ের কথা মাত্র, আর কিছুই নহে।··· ছন্দও তেমনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ঠিক যেন হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সময় সকল কথা ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না।" অর্থাৎ ছন্দ ঠিক 'হৃদয়ের ছন্দ' নয়। (রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা তাঁর 'রাবণবধ' সমালোচনাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।) এই ছন্দ 'বড়-অদ্ভুত', তাতে 'মিল নাই বা অন্য কোন নিয়ম নাই'।

সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক ইংরেজ আদিকবি কিড্‌মন্‌ কি ভাবে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কবিত্বশক্তি লাভ করলেন তার বর্ণনা করেছেন এবং নিজে কিড্‌মনের 'পদ্যবাইবেল' থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদও করে দিয়েছেন। কিড্‌মন্‌ প্রসঙ্গে তিনি কৃত্তিবাসের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার তুলনা করে বলেছেন—

> "আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিড্‌মনের স্বপ্ন আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।"

পরিশেষে স্যাক্‌সন্‌ জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন—

> "স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্‌সন্‌ জাতীয়দিগের প্রধান গুণ।··· স্যাক্‌সন্‌ জাতিদের কল্পনা ও সৌন্দর্যপ্রীতি ছিল না, তাহাদের চরিত্রে কার্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্র ছিল।"

এরপরে তিনি 'নর্মান্‌জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্মান সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করেন দুই কিস্তিতে। প্রথম প্রবন্ধটিতে দেখালেন, নর্মান জাতি কি ভাবে স্যাক্‌সন্‌ জাতিকে উচ্ছেদ করে ইংলণ্ড অধিকার করল। স্বভাবে, ধর্মে, আচারে, এক কথায় মনুষ্যত্বের দিক্‌ থেকে তারা স্যাক্‌সন্‌দের চেয়ে অনেক উচ্চে ছিল। স্যাক্‌সন্‌ জাতি ছিল "পশুদের অপেক্ষা অল্পই উন্নত"। তাই এই জাতিটিকে কঠোর অত্যাচারের দ্বারা উৎখাত করতে হয়েছিল।

এই প্রবন্ধটির দ্বিতীয় প্রস্তাবে লেখক নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি কিছু কিছু সেমি-স্যাক্‌সন্‌ ভাষার কবিতা উদ্ধৃত করে নিজে তার অনুবাদ করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, স্যাক্‌সন্‌ সাহিত্য বা নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক আলোচনা

করেছেন প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য কি ভাবে জন্ম নিল তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদর্শনের জন্য। তাই বলেছেন—

"কিরূপে ইংরাজি সাহিত্য গঠিত হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নর্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়—ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।"

এর দ্বারা তিনি নিজে যেমন উপকৃত হয়েছিলেন, তেমনি উপকার সাধন করেছিলেন বাঙালী পাঠকবর্গের। এই প্রবন্ধগুলিতে বালক লেখকের ভাষায় যেন কোনো অপরিণতি নেই। তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় ও চিন্তায় তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেছেন এবং বলার ভঙ্গিটিও হয়েছে ঔৎসুক্যজনক। বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

২

ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া ইউরোপীয় সেরা সাহিত্যিকদের অল্পস্বল্প রচনা, তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন তথ্য জানবার সুযোগ কবির এই সময়েই হয়েছিল। দান্তে, পিত্রার্ক, গেটে, 'বালককবি চ্যাটার্টন' প্রমুখ কবিরা তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

ইটালীর আদিকবি দান্তের দুটি বিখ্যাত কাব্য 'ভিটানুভা' (বা নূতনজীবন) এবং 'ডিভাইনা কমেডিয়া' সম্বন্ধে লেখক কিছু আলোচনা করেছেন এবং কাব্য দুটির নায়িকা বিয়াত্রীচের প্রতি কবি দান্তের স্বপ্নময় অমর প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই প্রবন্ধের নাম, **'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য'** (১২৮৫ ভাদ্র)। বিয়াত্রীচে দান্তের নয় বৎসর বয়স থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত এক মহৎ প্রেমের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেবতারাও তাঁর আরাধনা করেন, এমন ছিল তাঁর দেবোপম মহিমা। দান্তে সারাজীবনই তাঁর অন্তরের সেই প্রেমময় সিংহাসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে নিঃস্বার্থ পূজা করেছিলেন। সেই অমর প্রেমসংগীতের বাণীই ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ কবি এই এই প্রবন্ধটির মধ্যে ধ্বনিত করেছেন। সে সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য স্থানে স্থানে দান্তের কবিতাংশগুলির পদ্যানুবাদ করে দিয়েছেন। ফলে একাধারে তাঁর গদ্য ও পদ্য-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল অতি অল্প বয়সেই। দান্তের স্বপ্নময় প্রেমকে তিনি যেন স্বপ্নময় ভাষাতেই বিবৃত করেছেন।

এই প্রবন্ধটিরই অনুরূপ আর-একটি প্রবন্ধ লেখেন **'পিত্রার্কা ও লরা'** (১২৮৫ আশ্বিন)। পিত্রার্কাও ছিলেন দান্তের মত ইটালীয় কবি এবং সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক। দান্তের মত তিনিও তাঁর কাব্যের মহান্ ভাবের দ্বারা সমস্ত ইউরোপবাসীকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। প্যারিস ও রোম থেকে একই দিনে তিনি সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহূত হয়েছিলেন।

পিত্রার্কারও লরার প্রতি ছিল দুর্দমনীয় অথচ স্বার্থশূন্য অনুরাগ। দান্তে ও পিত্রার্ক এই দুই মহাকবিই তাঁদের আরাধ্য প্রণয়িণীকে দূর থেকে দেখেই প্রেমে আত্মহারা হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই প্রেমের যাতনাই ভোগ করেছিলেন। আর তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তুও ছিলেন তাঁদের আরাধ্য প্রেমিকা। তাঁদের এই স্বার্থশূন্য অনুরাগ বালক কবিকে অতিশয় মুগ্ধ করেছিল। এই প্রবন্ধেও তিনি পিত্রার্কার কবিতাগুলির কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও একটি প্রবন্ধ **'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'** (১২৮৫ কার্তিক)। জার্মাণ মহাকবি গেটের চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে আশ্চর্য করেছিল। কবির ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ করে লেখক পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন। "যিনি জর্মাণ-সাহিত্যের অহঙ্কার ও অলঙ্কার স্বরূপ,— যিনি "ফষ্ট" নামক নাটক লিখিয়া মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন" সেই গেটের ব্যক্তিগত জীবন ছিল বড় বিচিত্র। এই কবি বাল্যকাল থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পর একজন নারীকে ভালবেসেছিলেন এবং বহু নারীরও ছিল তাঁর প্রতি ভালবাসা। বাল্যকালে গেটে ফুলের পাঁপড়ি ও পাখির পাখনা ছিঁড়ে দেখতেন সেগুলি কিভাবে গ্রথিত, তেমনি তিনি সারাজীবন রমণীদের হৃদয় নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজেও সাময়িক হৃদয়াবেগ অনুভব করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রেম ছিল ইচ্ছাধীন। প্রয়োজন ফুরালেই সে প্রেমকে দূর করতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হত না।—

> "যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনো আঘাত লাগিত সে বিষয়ে একটা নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।"

এইভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপের এইসব মহাকবিদের জীবনকাহিনী আলোচনা করে তরুণ-কবির মনে কি রসের সঞ্চার হত বলা যায় না। এইসব কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন গভীর রেখাপাত করেছে বলেও মনে হয়

না। তবে এটুকুই উপকার হয়েছিল, একদিকে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাঁদের জীবনী ও কাব্য পাঠ করে কবির জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং অপরদিকে, একাধারে তাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর গদ্যচর্চা ও তাঁদের কবিতাংশগুলির অনুবাদ করে তাঁর কবিতা রচনা-চর্চার সুযোগ তিনি নিজেই করে নিয়েছিলেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় আরেকটি প্রবন্ধ **'চ্যাটার্টন বালক কবি'** (১২৮৬ আষাঢ়)। এই কবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু তথ্য অবগত হন অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকে। পিতৃহারা এই কবি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত অবহেলিত। তাঁর চারিত্রিক প্রকৃতি কেউ বুঝতে পারতেন না, তাঁর মাতাও নন। তাঁকে অনেকেই পাগল বলে জানত। এমন অবস্থায় তিনি নীরব গির্জায়, পাষাণমূর্তিগুলির কাছে ঘুরে বেড়াতেন। ব্রিষ্টলের এমনই এক গির্জায় কিছু পুরোনো কাগজপত্র ছিল। সেগুলি তাঁর পিতা যখন গির্জার কর্মচারী ছিলেন তখন এনে গৃহে রেখেছিলেন। চ্যাটার্টনের প্রাচীন জিনিসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই এই কাগজপত্রগুলি তিনি অতি গোপনে পাঠ করে প্রাচীন ইংরেজি অক্ষর ও ভাষা শিখলেন এবং তারপরে প্রাচীন কবিদের অনুসরণ করে কবিতা লিখতে শুরু করলেন মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে। এইগুলিকে তিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন 'রাউলি' ছদ্মনামে, বলতেন তিনি ব্রিষ্টলের প্রাচীন কবি। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির মধ্যে সেইজাতীয় কবিতার অংশ পদ্যে অনুবাদ করেও দিয়েছেন।

চ্যাটার্টন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতিমাত্রায় আত্মযশপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু এই কবিতাগুলি ছদ্মনামে লিখলেন এই কারণে যে, স্বনামে লিখলে একজন বালকের পক্ষে তা সম্ভব বলে কেউ বিশ্বাস করত না। এই সুযোগ নিয়ে চ্যাটার্টনের কাছ থেকে প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করে কেউ কেউ আত্মনামে ঐতিহাসিক গ্রন্থও লিখতে শুরু করলেন। চ্যাটার্টন তাঁর যথার্থ মর্যাদা পেলেন না। তাই শেষপর্যন্ত মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আপনার অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা দগ্ধ করে আত্মহত্যা করলেন।

তাঁর মৃত্যুতে (১৭৭০) যে ক্ষতি হল তা সেদিন কেউ বোঝে নি। কিন্তু তাঁর যথার্থ মর্যাদা স্বীকৃত হল বহু বৎসর পর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, রসেটী, সাদী, কীট্‌স্ প্রমুখ ইংরেজ কবিরা চ্যাটার্টনের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

রবার্ট সাদী চ্যাটার্টনের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন (১৮০৩) এবং কীট্‌স্‌ চ্যাটার্টনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর 'Endymion' উৎসর্গ করেন (১৮:৮)।[১২] লেখকও বলছেন—

"১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেই পৃথিবী তাঁহার স্মরণার্থে প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া পূর্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইল।"

ভারতীতে উক্ত প্রবন্ধটির শেষে লেখা আছে 'ক্রমশঃ'। কিন্তু পরের সংখ্যাগুলিতে প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশ লক্ষিত হয় না।

কবি চ্যাটার্টনের কাব্য লেখার পদ্ধতি বালক রবীন্দ্রনাথকেও নূতন কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনার ইতিহাসটি পড়লেই জানা যায়।—

"তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

—জী-স্মৃ. 'ভানুসিংহের কবিতা'

সাহিত্য সমালোচনা-৩

এই যুগে রবীন্দ্রনাথকে আর এক-জাতীয় সাহিত্য- সমালোচনা করতে দেখা যায়। তা হল প্রধানতঃ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক। এই পর্যায়ে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন লেখকদের রচনার সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন, অথবা রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে কোনো সাহিত্যিক মন্তব্য করলে তিনি আবার তার 'প্রত্যুত্তর'ও দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই সাহিত্যদ্বন্দ্বগুলিতে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা করেন নি। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর ফলে তাঁর লেখনীঅস্ত্র ক্রমেই হয়ে উঠেছে শাণিত ও তীক্ষ্ণ। আর তিনি নিজে যে

১২ র-জী, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,' পৃ ৭৩, পা-টী ৩

মানসিক বল লাভ করেছেন, তাই তাঁর দীর্ঘপথের যাত্রাকে করেছে নির্ভীক ও দৃঢ়। অপরদিকে দেখি, তাঁর সঙ্গে এই মসীযুদ্ধে লিপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও তাঁকে কনিষ্ঠ বলে অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁরা তাঁর সঙ্গে সমভাবেই এই দ্বন্দ্বে নেমেছেন এবং বালকের মনে জুগিয়েছেন অসীম চিন্তার আগ্রহ। এইজাতীয় প্রবন্ধগুলি একে একে আলোচনা করলেই দেখা যাবে, সেগুলি তথ্য বা ভাষার দিক্ থেকেও নিতান্ত অপরিপক্ক ছিল না।

এই পর্যায়ের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া যায় '**বাঙালী কবি নয়**' (১২৮৭ ভাদ্র) ও '**বাঙালী কবি নয় কেন ?**' (১২৮৭ আশ্বিন) এই প্রবন্ধ দুটিকে। বাংলা সমালোচনা- সাহিত্য তখনও ঠিক সুষ্ঠুরূপ পায় নি। 'প্রাচীন কবিতা কী, নূতন কবিতা কী, যথার্থ কবিতার স্বরূপ কী, কবি কে, কাব্য বস্তুগত না ভাবগত' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বাঙালী লেখক ও পাঠককে সেদিন চিন্তিত করে তুলেছিল। বঙ্গদর্শন ছিল সে যুগে একটি সর্বজনপ্রিয় পত্রিকা; তাতে সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা হত। কবি ও কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে পত্রিকাটিতে বিস্তর আলোচনা হয়। বঙ্গদর্শনে এইরকমই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়, 'বাঙালী কবি কেন' (১২৮২ পৌষ)। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় (১ম খণ্ড) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের। তৎপূর্বে 'বান্ধব' পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় 'নীরব কবি' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন (১২৮১ মাঘ), পরে প্রবন্ধটি তাঁর 'প্রভাতচিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় (১২৮৪)। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ দুটির একত্র সমালোচনা করে 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবার লেখেন 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন ?' 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধের প্রথমাংশ কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধটির সমালোচনা বলেই মনে হয়। তাই ঐ প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি বললেন—

> "একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখ কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি !··· কবি শব্দের ঐরূপ অতিবিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাশান হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না।··· নীরব কবি বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছে ··· আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়।··· নীরব ও কবি দুইটি অন্যোন্যবিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে শুভদৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন।

এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভদৃষ্টি বলাই সঙ্গত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়?"

অপরপক্ষে, প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে কবি বঙ্গদর্শনের লেখককে আক্রমণ করেছেন মনে হয়। ঐ প্রবন্ধে লেখক বাঙালীর 'ন্যুব্জ দেহ ও কুঞ্চিত মনে'র সমালোচনা করেন এবং প্রবন্ধটিতে অনেক কঠিন কথাও বলেছিলেন। মনে হয়, উক্ত প্রবন্ধটির সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মাত্র বাক্য ধরে নিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ঐ লেখককে লক্ষ্য করে কবি বলছেন—

> "অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্যজাতি সাধারণত কবি ও বালকেরা অশিক্ষিতলোকেরা বিশেষরূপে কবি।··· কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক।"

সেই কারণেই কল্পনাপ্রিয় বালক কবি না-ও হতে পারে। আর কল্পনার মধ্যে শিক্ষা থাকা দরকার। তাঁর মতে বাংলাভাষায় খুব কম কবিতা আছে, যা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেতে পারে। সেইজন্য 'কবিকঙ্কণ' খ্যাত কবি হলেও তাঁর বর্ণিত 'কমলে-কামিনী' অংশকে রবীন্দ্রনাথ কবিত্বপূর্ণ মনে করতে পারেন না। কারণ তার মধ্যে 'পরিমাণ সামঞ্জস্য' নেই। 'কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে।' এই প্রসঙ্গেতিনি বলেছেন ভারতচর বিদ্যাসুন্দরও যথার্থ কাব্য নয়। Marlowe র 'Came, live with me and be my love'— কবিতার অনুবাদ করেও তার অনুরূপ ত্রুটি প্রদর্শন করেছেন।

পরিশেষে বলেছেন, 'আধুনিক বাঙালী' নানা বিষয় অবলম্বনে কবিতা লিখেছে ঠিকই, কিন্তু তাদের কোনো 'মহান্ ভাব' নেই। "হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা ভাসা ভাব লইয়া" তাদের কবিতা রচিত।

> "যে সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্ব্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কি করিয়া বলি বাঙ্গালী কবি?"

এ বক্তব্যের সমর্থনেই ভারতীর পরবর্তী সংখ্যায় লিখলেন, 'বাঙালী কবি নয় কেন?' সে যুগে বাংলাদেশে অসংখ্য ছোট-বড় কবির আবির্ভাব হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রবন্ধটি রচনা করেন। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে উত্তেজনা নেই, অনুভবের গভীরতা নেই, ঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই—

> "যাহার মনোবৃত্তিসকল অত্যন্ত দুর্বল সে কখনো কবি হইতে পারে না।··· বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্ত

নাই,··· অতএব বাঙ্গালী জাতি যদি না ভাবে ত সে প্রকাশ করিবে কিরূপে? কবি হইবে কিরূপে?”

বাঙালীর 'কল্পনা দৃষ্টি'ও অতি ক্ষীণ। যে দেশে কল্পনার প্রখরতা আছে গভীরতা আছে কাল্পনিক লোক প্রচুর আছে সে দেশে শুধু কাব্য নয়, বিজ্ঞান দর্শন সবেরই উন্নতি হয়। তাই বাঙালী বৈজ্ঞানিক নয়, দার্শনিক নয়, কবিও নয়। লঘু, অস্থায়ী কল্পনায় ফল হয় না। এ কল্পনা অলসের কল্পনা, এই আলস্যই বাঙালীকে কবি হতে দেয় নি। এই আলস্যের জন্য বাঙ্গালী বাহ্য প্রকৃতিকে জানতে চায় না, সুন্দরকে উপভোগ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি বাংলা কবিতা এবং শেলী প্রমুখ ইংরেজ কবির কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন দুই দেশের কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কত তফাত। অপরপক্ষে, বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' থেকে একটি অংশ ('একদিন দেব তরুণতপন') উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন এ জাতীয় কবিতার মধ্যে ভাবগভীরতা আছে। কিন্তু তৎকালে যে ঝোঁক এসেছিল তাতে “বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত।”

প্রকৃতপক্ষে, “রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আশা, উদ্যম, আবেগ, আগ্রহ” সব কিছুর মিলনে যখন একটা 'তুমুল সংঘর্ষে'র সৃষ্টি হয়, তখনই সেই “সমুদ্রমন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়।” কিন্তু আমাদের দেশে সেই সংঘর্ষ নেই, তাই আমাদের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্য, চিত্র-বৈচিত্র্য নেই।

রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তখন বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল। কিন্তু বাঙালীর মনস্বী জীবনের ইতিহাসে দেখা যায়, বাঙালী একদিন দার্শনিকও ছিল, কবিও ছিল। কালে বাঙালীর জীবনে এই সৃজনী-শক্তির অবসান হয়। বঙ্গদর্শনে 'বাঙালী কবি কেন?' প্রবন্ধের লেখকও এই কথাটি বলেছেন।

তবে তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্য হাওয়ার নূতন স্রোত এসে একটা নূতনতার আন্দোলন উপস্থিত করেছিল। তাই কবি আশা করছেন— হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে।

তৎকালীন বাঙালীর 'ম্যুব্জ দেহে'র মধ্যে যে প্রাণবস্তু ছিল তা অত্যন্ত সংকুচিত, দুর্বল। তাই সে যুগের নবীন কবিরা যে কবিতা লিখতেন তাও প্রাণহীন। তাদের মধ্যে 'অকারণ কষ্ট' নামে এক রোগ দেখা দিয়েছিল। 'বাহিরের কোনো দুর্ঘটনা হইতে ইহার জন্ম নহে'। কাব্যের মধ্যে দিয়ে দুঃখ ভোগ করতে তাদের ভাল লাগে এই তাদের সান্ত্বনা।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড) ও রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার (১ম খণ্ড) অন্তর্গত তাঁর প্রবন্ধটিতে দুটি ভিন্ন মতের অবতারণা করেছেন। তিনি জীবনী-গ্রন্থে বলেন, কবি 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে প্রকাশ করেন।[১৩] অপরপক্ষে, রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় বলেছেন, "এই দুইটি প্রবন্ধ ভাঙিয়া" [বাঙ্গালী কবি নয় ও বাঙ্গালী কবি নয় কেন] সমালোচনা গ্রন্থের উক্ত প্রবন্ধটি লেখেন।[১৪] যাই হোক, 'নীরব কবি'-বিষয়ক চিন্তাটা কবি বহুদিন মনে রেখেছিলেন। তাই পরবর্তী কোনো কোনো রচনায় তাঁকে আবার এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়।

২

এই পর্যায়ে কবির দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় হল বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি কবি কিভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা ভানুসিংহের পদাবলী ও জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রই জানেন।

বাংলাসাহিত্যে এমন একটা সময় ছিল, যখন বাংলার অন্যতম রত্নময় যুগ, বৈষ্ণব কবিতার যুগ বাঙালীর নিকট প্রায় অপরিচিত ছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঠিকই লিখেছেন—

> "যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, সেকালে বটতলা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা আর কোথাও পাওয়া যাইত না।"[১৫]

শিক্ষিত সমাজের কাছে বৈষ্ণবপদাবলীর সাহিত্যমূল্য প্রথম উদ্‌ঘাটন করে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৭০)। কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে প্রথম বৈষ্ণবপদাবলী সম্পাদন করেন জগদ্বন্ধু ভদ্র। তাঁর গ্রন্থ 'মহাজন পদাবলী'তে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস সম্বন্ধে সমালোচনা ও বিদ্যাপতির পদাবলী ও টীকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। অতঃপর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' বালকের হাতে

১৩ দ্রষ্টব্য : র-জী, পৃ ১৪২

১৪ 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী', র-জি. পৃ ২৪৯। এই প্রবন্ধ দুটি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য :—

ক র-জী, সন্ধ্যাসংগীত যুগের গদ্য : ২, পৃ ১৪১-৪৩

খ পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী. পৃ ২১৪-১৭

১৫ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা,' প্রবাসী, ১৩৩৯ বৈশাখ, পৃ ৬৭

পরে। তিনি কি ভাবে এই বই পড়েছিলেন এবং 'বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি' তাঁর কাছে কিরূপ ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল তার বিস্তৃত পরিচয় আছে জীবনস্মৃতিতে।

জগদ্বন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ('বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ; দীনেশচরণ বসুর 'মানসবিকাশ' গ্রন্থের সমালোচনা, বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ; বিবিধ প্রবন্ধ; মৃণালিনী উপন্যাস; কমলাকান্তের দপ্তর) ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গদর্শনে—'বিদ্যাপতি' ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ, 'জ্ঞানদাস' ১২৮০ মাঘ ও 'বলরাম দাস' ১২৮০ চৈত্র) বৈষ্ণবসাহিত্যের কাব্যরস বাঙালীসমাজে প্রচার করেন ও এইগুলি পাঠ করে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে ঔৎসুক্য জাগে। এ বিষয়ে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও ছিল অন্যতম প্রেরণাস্থল। অগাধ বৈষ্ণবপদসমুদ্র তাঁর কাছে ছিল কাব্যরস সম্ভোগের সামগ্রী, সাধনার ধন নয়। এই পদাবলীর রস তিনি এত গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে— একদিকে এর অনুকরণে পদাবলী রচনা করা তাঁর পক্ষে যেমন সহজ হয়েছিল, অপরদিকে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সাহচর্যে 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থ (১২৯২) সংকলনেও তেমনি উৎসাহ অনুভব করেছিলেন।

এই পর্যন্ত গেল কবির বৈষ্ণব রসোপভোগের পর্ব। এবার তার বিশ্লেষণের পালা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের '**প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে**'র অন্তর্গত '**বিদ্যাপতির পদাবলী**, নিয়ে কবি ভারতীর পৃষ্ঠায় (১২৮৮ শ্রাবণ) সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখলেন। এতে তিনি তাঁর 'সংগ্রহে'র কিছু ভুলত্রুটি দেখিয়েছেন। তবে সমালোচনায় তাঁর কোনো বীতশ্রদ্ধ দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় নি। তিনি সম্পাদকের ভুল দেখিয়েই সমালোচকের কর্তব্য শেষ করেন নি। প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সম্পাদকের অবহিত হওয়া উচিত তরুণ লেখক সে সম্বন্ধেও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পর ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (১২৮৮ ভাদ্র) শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে '**উত্তর প্রত্যুত্তর**'মূলক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। অক্ষয় সরকারের কিছু কিছু ভুলত্রুটি স্বীকার করেও যোগেন্দ্র-নারায়ণ তাঁকে সমর্থন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের যুক্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও তাঁকে, "তিনি কোন কারণ প্রযুক্ত ইতিপূর্বে সম্পাদকের উপর চটিয়া ছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া এই প্রস্তাবে গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন" ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে চেয়েছেন। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"আমি সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য লইয়াই অক্ষয়বাবুর সহিত

বিবাদ করিয়াছি, তাহা আমার কর্তব্য কর্ম। সাহিত্য-বহির্ভূত ব্যক্তিগত কোন কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার আক্রোশ প্রকাশ করি নাই।"

অবশেষে ঐ বছরের কার্তিক-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ **'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট'** অংশে আবারও প্রথম প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত একটি বিদ্যাপতি-পদাবলীর টীকার পুনঃসংশোধন করেছেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ ভাষা ও শব্দগত বিচারের দ্বারা বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য ও রস গ্রহণ করা যায় না। তাই এবার তিনি সাহিত্যিক সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই পর্যায়ে তাঁর **'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি'** (ভারতী ১২৮৮ ফাল্গুন) ও **'বসন্ত রায়'** (ভারতী ১২৮৯ শ্রাবণ) প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য। পরে দুটি প্রবন্ধই 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনা ইতিপূর্বে জগদ্বন্ধু ভদ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই করেছিলেন। এই তুলনামূলক আলোচনার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তবে উভয়ের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন আধুনিক লেখক বলেছেন, "বঙ্কিমের মানসিক কাঠামো যুক্তিপ্রধান, রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রধান।"[১৩]

এইযুগে বৈষ্ণবসাহিত্য বিচারের ধারা সম্পূর্ণ হল 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধে। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' বসন্ত রায়ের পদাবলী ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির সঙ্গে বসন্ত রায়ের তুলনা করে অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত সমালোচনা লিখলেন। তরুণ কবির চোখে বসন্ত রায়কে বিদ্যাপতি অপেক্ষা সহজ, স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ মনে হল।

এই যুগে বৈষ্ণবপদাবলীর যে রস ও সৌন্দর্য কবির মানসিকতায় উপলব্ধ হল পরবর্তী কালে তার অনুরণন চলেছিল অনেকদিন পর্যন্ত, তার সন্ধান তাঁর সাহিত্যেই আছে।

৩

এরপরে কবির এইজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী-লিখিত 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধের (১২৮৯ আষাঢ়-শ্রাবণ) **'প্রত্যুত্তর'** (১২৮৯ ভাদ্র)।

১৩ দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ আষাঢ়, পৃ ৭৫১

অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধটিতে বলেছেন যে, আধুনিক যুগে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশের কবিরা তাঁদের কবিতায় আন্তরিকতা বা দেশীভাব ভুলে গিয়ে ইংরেজির নকলে কবিতা লেখেন। ফলে তা হয় বাংলার স্বভাব-বিরুদ্ধ ও কৃত্রিম। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে, বিশেষতঃ প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাঁর এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, তা ইংরেজ হৃদয়েরই অনুকূল। অপরপক্ষে শাক্তপদগুলিতে যে প্রেম, যে অভিমান, তা নিতান্তই বাংলার হৃদয়ের কথা। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত বাংলা কবিতায় সেই হৃদয়গত ভাবের দৃষ্টান্ত বিরল।

অক্ষয় চৌধুরীর এই বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মানতেন যে, দেশকে জানতে হলে দেশের সাহিত্যকে জানতে হবে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এ কথা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধেও বলেছেন। কিন্তু অপরপক্ষে, যখন দেশে পাশ্চাত্ত্যের হাওয়া এসে পৌঁছেছে—

> "বাঙ্গালা দেশের বদ্ধ স্থির, নিস্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে সহসা এক তুমুল পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে··· যখন আমাদের বাহিরে ওলট্‌পালট্‌, যখন আমাদের অন্তরে ওলট্‌পালট্‌, তখনো যে··· প্রাচীন কবিদের কবিতার আঁচল ধরিয়া থাকিব··· ইহা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক !"

অর্থাৎ দেশে যখন সব দিক্ দিয়েই নূতনত্বের আবির্ভাব তখন সাহিত্য থেকে যাবে প্রাচীনের অন্ধকারে এ কখনই সম্ভবপর নয়।

প্রকৃতপক্ষে, প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি বলেছেন, সবকিছুকেই পূর্ণাঙ্গরূপে দেখতে হবে। তাকে একদিক্ থেকে দেখে, তাকেই চরম বলে সিদ্ধান্ত করে নেওয়া ঠিক নয়। অক্ষয়বাবুর বক্তব্যও সর্বত্র ভুল নয় আবার কবির বক্তব্যও অন্যদিক থেকে সত্য। দুই-এ মিলে সম্পূর্ণতা। কবি আসলে সাহিত্যকে রসের ও সৌন্দর্যের দিক্ দিয়ে বিচার করতে চান। কী সমাজ, কী সাহিত্য— কোনো-কিছুতেই কবি আতিশয্যকে পছন্দ করতেন না। আতিশয্য ও অত্যুক্তিতে সত্য নষ্ট হয়, সুন্দর হয় অসুন্দর। তাই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধে আতিশয্য বাদ দিলে যেটুকু সত্য থাকে এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও যেটুকু বাংলাদেশের উপযোগী ও গ্রহণীয়— সেটুকুই গ্রহণ করলে সাহিত্য হয় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ।

৪

এরপর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তদানীন্তন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের অন্যতম অধিপতি বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই সাম্রাজ্যের দ্বারে উপনীত নবীন লেখক রবীন্দ্রনাথ— উভয়ের মধ্যে যে লেখনীদ্বন্দ্ব সেদিন হয়েছিল, তা হয়তো আজ অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু সে যুগে এই দ্বন্দ্ব বাংলাসাহিত্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়ে বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে।··· সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।"

—জী-স্মৃ, 'বঙ্কিমচন্দ্র',

সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রচারিত হিন্দুধর্মের সমর্থনে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। এই পত্রিকা দুটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও লেখনী মারফত যথেষ্ট সংযোগ ছিল। 'প্রচার' পত্রের প্রথম সংখ্যায় (১২৯১ শ্রাবণ) বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দু ধর্ম' বিষয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং এতে 'সত্য' ও 'মিথ্যা'র মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, যেখানে "লোক-হিতার্থে" মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানে "কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক" মিথ্যা বলা অন্যায় নয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটির সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করে, তাঁর বক্তব্যের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ না করে তাঁর উল্লিখিত উক্তি ও আংশিক বক্তব্যের সূত্র ধরে চারমাস পরে এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখে ফেললেন।

এই প্রবন্ধটির নাম দেন '**একটি পুরাতন কথা**' (ভারতী ১২৯১ অগ্রহায়ণ)। পরে প্রবন্ধটি 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। প্রথমে প্রবন্ধটি সিটি কলেজ হলে একটি প্রবন্ধসভায় পঠিত হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। এই সমাজের শক্তি-বলেই হয়তো তিনি এমন আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ লিখতে সাহস করেছিলেন এ অনুমান অনেকেই করেন।[১৭] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধটিতে এমন কিছুই লেখেন নি যাতে ধর্ম নিন্দিত হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের মূলে কঠিন কুঠারাঘাত করে বললেন—

১৭ র-জী, 'ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন', পৃ ২০৫-২০৬

"কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের উত্তর দেন 'আদিব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়' প্রবন্ধে। সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতি কোনো আক্রমণ হলে প্রায়ই জবাব দিতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একাধারে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন বলে তিনি লিখলেন যে, তাঁর ঐ প্রবন্ধটি প্রচারে প্রকাশিত হবার পরে কয়েকবারই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। কিন্তু তখন লেখক কিছু বলেন নি। কিন্তু চারমাস পর হঠাৎ একদিন তিনি লেখনীঅস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলেন, এতে বঙ্কিম বিস্মিতই হয়েছিলেন। তাই লিখলেন—

"রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎ-স্বভাব, এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য।

তবে যে, এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।··· মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে।"

'বড় ছায়া' অর্থে আদি ব্রাহ্মসমাজকে ইঙ্গিত করলেন। কারণ ঐ সমাজ তাঁকে পরপর তিনবার আক্রমণ করেন, এটি চতুর্থবার। প্রত্যেকবারের আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তিনি জবাব দিতে বাধ্য হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধের জবাবে **'কৈফিয়ৎ'** (ভারতী ১২৯১ পৌষ)-স্বরূপ একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বোধ হওয়াতেই তিনি ঐ প্রবন্ধ লিখেছিলেন—

"আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আমি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।"

যে কারণেই লিখে থাকুন প্রবন্ধ শেষে তিনি বলেছেন—

"বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণবয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতা-গুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।"

এই প্রসঙ্গ তিনি 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'সত্য' প্রবন্ধেও (১২৯২ চৈত্র) উল্লেখ করেন।

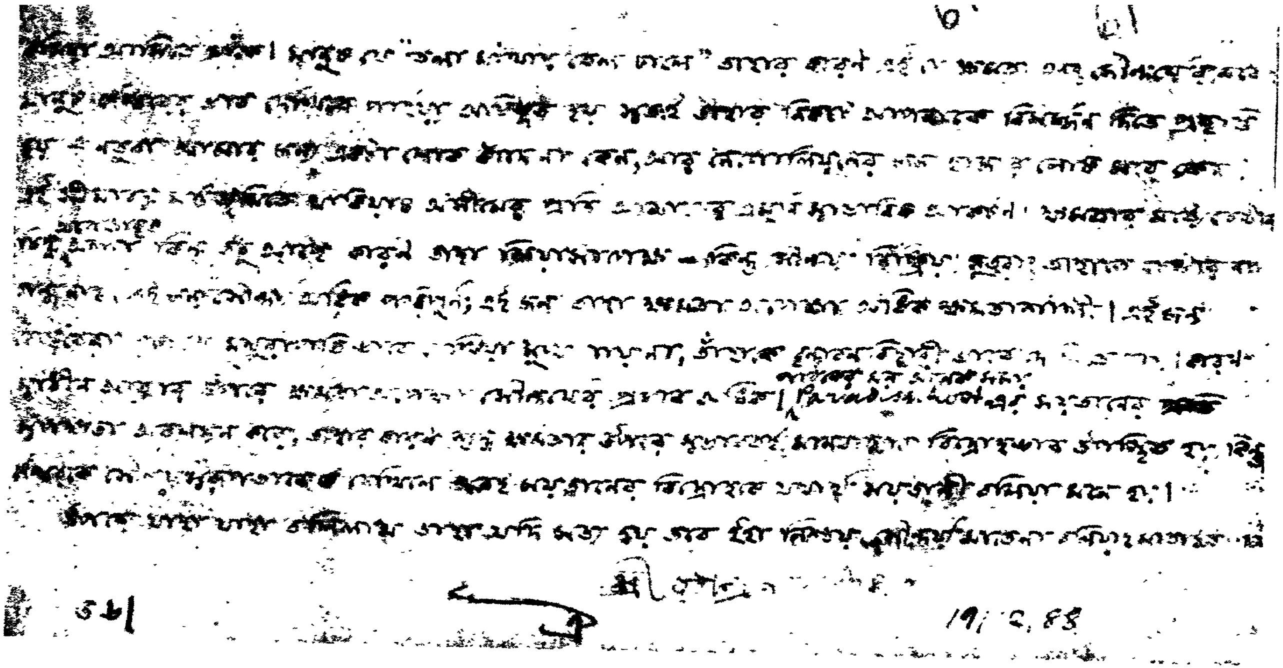
বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের উত্তর আর দেন নি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। বহুবৎসর পর জীবনস্মৃতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-প্রসঙ্গে বলেন—

> "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

এই কণ্টকোৎপাটন বঙ্কিমের বিপুল মহত্ত্ব সূচিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রকৃত সমালোচনায় যে ত্রুটিই থাক তাঁর সমালোচনার সাহস ও ক্ষমতা ক্রমশঃ কিরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাও লক্ষণীয়। এরপূর্বে তিনি বঙ্কিমের কিছু কিছু সমালোচনা করলেও এমন তীব্র আক্রমণ করার সাহস করেন নি। 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটিতেই বলেছেন—

> "বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না··· আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন।"

তাঁর এই উক্তি থেকে এটুকুই সিদ্ধান্ত করা যায়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহের পাত্র ছিলেন বলেই নয়, এই তরুণ-সমালোচকটির যোগ্যতা বিবেচনা করেও তিনি তাঁকে নানা ভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে এই লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহস পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনার ধারাটিকে সুদূর-প্রবাহিত করে দেবার সুযোগও পেয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু যাই হোক, এই যুদ্ধে জয়ী যিনিই হোন, এই ধরনের দ্বন্দ্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত লাভ হয়েছিল, তিনি আপনাকে প্রকাশিত ও বিকশিত করে তোলার পথটি ক্রমেই প্রশস্ত করে নিতে পারছিলেন। এটিও ছিল তাঁর আত্মগঠনের একটি প্রধান উপায়।



সৌন্দর্য : পাণ্ডুলিপিচিত্র

পারিবারিক- স্মৃতি- লিপি- পুস্তক ॥ রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ

৫

এইরকম উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক রচনার আরো কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তৎকালে ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত 'পারিবারিক খাতা'[১৮] থেকে। ঐ খাতাটিতে বাড়ির সকলে এবং ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব তাঁদের ইচ্ছামত যে-কোনো বিষয় নিয়ে লিখতেন। ওটা যেন একটা 'ডায়ারি'র মত ছিল। ঐ খাতাতেও দেখি, মাঝে মাঝে একজনের বক্তব্যের উত্তর আরেকজন দিচ্ছেন অথবা একের লেখার সমালোচনা করছেন অপরে। খাতাটি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ২৬নং প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব' সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (১৯।১১।৮৮)। ৪৭নং লেখায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তারই প্রত্যুত্তর দিয়েছেন (তারিখ নেই)।

আবার ৫৩নং লেখার বিষয়বস্তু 'সৌন্দর্য'। এ সম্বন্ধে লিখলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ পৌষ। ১৮৮৮)। ৫৫ নম্বরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তারই উত্তর (১৯।১২।৮৮)। ৫৬ নম্বরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঐ সম্পর্কে আবারও লেখেন এবং শেষে বলেন 'Let us hear from Rabi'। তবে দুঃখের বিষয় ৫৭নং প্রবন্ধটি পাওয়া যায় নি। তাই সেটি রবীন্দ্রনাথের উত্তর কিনা বোঝা যায় না। তবে এই দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথ যখনই অপরের লেখার পক্ষে বা বিপক্ষে বলার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই বিনা দ্বিধায় তিনি লিখে গেছেন। পরবর্তী জীবনে এই লেখাগুলির বিষয়গত মর্যাদা তিনি স্বীকার করুন আর না করুন, এ কথা স্বীকার করতে হবে, এর মাধ্যমে তাঁর লেখনী ক্রমেই শাণিত হয়ে উঠছিল। এই লাভটুকুর মূল্যও কম ছিল না।

ঐ খাতাতেই দেখি 'অকাল বিবাহ' সম্বন্ধে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর একটি পত্রের উত্তর লিখেছেন। আবার 'বৈষ্ণবধর্ম' সম্বন্ধে লিখেছেন প্রভাতকুমারের (মুখোপাধ্যায়?) পত্রের উত্তর। অর্থাৎ এই বিষয়গুলি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হয়েছিল, এ অনুমান স্পষ্ট। এছাড়া আরও কত বিষয়ের যে

১৮ দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত—

পারিবারিক-স্মৃতি-লিপি-পুস্তক
ইহাতে পরিবারের
সকলেই
(আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)
আপন মনের ভাব-চিন্তা-স্মর্তব্য বিষয়
ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।

আলোচনা দেখা যায় এই খাতাটিতে তার সীমা নেই। বলাবাহুল্য, এই খাতাটিরও প্রধান লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চিন্তার প্রবাহ যে কত বিচিত্রপথেই গিয়েছিল, এ যুগের লেখাগুলিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। আর সেদিক্ থেকে এই পারিবারিক খাতাটিও অমর হয়ে রয়েছে।

সমাজ ও রাষ্ট্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রাষ্ট্রনৈতিক মত সম্বন্ধে বলেছেন—

> "আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।"

বালককাল থেকেই, বিশেষতঃ পারিবারিক প্রভাবের ফলে তিনি এই ভাবটিই উপলব্ধি করেছিলেন যে—

> "জীবনের যা-কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি।.. 'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি।... আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।"

—কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' ১৩৩৬

লেখকের এই উক্তি থেকে তাঁর রাজনৈতিক মতের স্বরূপটা জানা গেল। কিন্তু তিনি যে 'সাধনা' পত্রিকারও বহুপূর্বে রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন তারই আলোচনা বর্তমানে করা যাবে। তবে চিন্তার প্রকৃতিটা চিরদিনই ছিল প্রায় একই রূপ। 'বাল্যকাল' থেকেই দেশের সমাজ ও রাজনীতি

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান মতবাদ ছিল, "দেশকে জানো"। যারা সমাজে শুধু 'এক-চোখো-সংস্কার' করতে চান, তাদের তিনি চিরকালই ঘৃণা করেছেন। তাঁর মতে এঁরা—

> "বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অত্যন্ত ভয় করেন।··· সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারিদিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।"

দেশ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন—

> "আমাদের সমাজের পদে পদে এত শতপ্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলো অস্পষ্ট বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না। ·· আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ তাহা হইলে আর সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে।"

এইসব কথা তিনি 'জিহ্বা আস্ফালন', 'চেঁচিয়ে বলা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে বলেছিলেন। এইখান থেকেই আমাদের সমাজ ও তার সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হতে শুরু করে। তদানীন্তন ব্রাহ্মধর্ম, হিন্দুধর্ম ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আরো আলোচনা করেন 'বঙ্গে সমাজ বিপ্লব', 'পারিবারিক দাসত্ব', 'সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার,' 'তৃতীয় পক্ষ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে। সমকালীন প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতেও এইসব বিষয়ে লেখককে চিন্তা করতে দেখা যায়।

'বঙ্গে সমাজ বিপ্লব' (১২৮৪ মাঘ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাজে বিপ্লবকে আহ্বান জানিয়েছেন। সে যুগে যে সামাজিক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তাকে কবি 'শুভলক্ষণ' বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজে 'রক্ষণশীল' ও 'সংস্কারশীল' দুইদল চিরকাল জাগ্রত থাকে। উভয়ের মধ্যে মানসিক সংঘাত অক্ষুন্ন না থাকলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে এই বিপ্লব যখনই বন্ধ করা হয়েছে (যেমন— পুরাণের যুগে) তখনই সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে এবং দেশ 'অবনতির অন্ধকারে' আচ্ছন্ন হয়েছে। সমকালীন সামাজিক বিপ্লবকে তিনি সেইজন্যই আহ্বান করেছেন। তাতে মানুষের মনের বল বাড়ে এবং সমাজ একটি নূতন দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। পরবর্তী 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৩১৮) প্রবন্ধে তাঁর এই মতের প্রতিফলন আরো স্পষ্ট হয়েছে।

আবার **'পারিবারিক দাসত্ব'** (১২৮৭ চৈত্র) প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন, পরিবারে গুরুজনেরা শিশুদের শাসন করতে গিয়ে যেমন 'ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব' সৃষ্টি করেন, বঙ্গদেশের সমাজেও তেমনি ভয়েরই একাধিপত্য। ভয়

ছাড়া, সন্ত্রাস ছাড়া কোনো কাজ তাদের দিয়ে করানো যায় না। কিন্তু জাতিকে স্বাধীন করে তুলতে হলে, তাকে ছোটোখাটো বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্র-বিষয়ক চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় **'চেঁচিয়ে বলা'** (১২৮৯ চৈত্র), **'জিহ্বা আস্ফালন'** (১২৯০ শ্রাবণ) প্রভৃতি প্রবন্ধেও। ইংরেজি শিক্ষার ফললাভ যাই হোক না, প্রধানতম অমঙ্গল হয়েছিল দেশের নাড়ীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের অন্তরের টান ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে সৃষ্ট হয়েছিল শ্রেণীগত সমাজ। পূর্বকালে ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচের মধ্যে জ্ঞানের মাত্রাগত পার্থক্য ছিল। কেউ জানত কম, কেউ বা বেশি। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার যুগে ইংরেজি-জানা আর ইংরেজি-না-জানার মধ্যে দেখা দিল দুস্তর ব্যবধান। এই জ্ঞান-বৈষম্যই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আনল জটিলতা। তাই রবীন্দ্রনাথ বারেবারেই দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, দেশকে জানা মানে কোনো সাময়িক হৃদয়াবেগের প্রকাশ নয়। দেশকে জানতে হবে অন্তরের সঙ্গে। দেশের লোকের হৃদয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

এইসব কথা তিনি পরিণত বয়সেও বলেছেন। দেশকে যথার্থ জানতে হলে দেশের সাহিত্যকে, তার ভাব ও ভাষাকে বুঝতে হবে অন্তর দিয়ে— যার মধ্যে নিহিত আছে দেশের অন্তরের বাণী।

'সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার' প্রবন্ধেও তিনি বলেন প্রাচীন দেশীয় সংস্কার উচ্ছেদ করা আবশ্যক। কিন্তু বিদেশাগত কুসংস্কারও গ্রহণ করা উচিত নয়। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের অপকারই হয়।

২

রাজনীতি বিষয়েও তিনি জাতিকে বারেবারে আত্মনির্ভরশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজের অনুকরণ করলে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। তাই ঐ সময়ে লেখা **'ন্যাশন্যাল ফণ্ড'** (১২৯০ কার্তিক) প্রবন্ধটিতে তিনি বললেন—

> "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ...ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।... ইংরেজের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।... ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।"

এই প্রসঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি পরনির্ভরশীলতা বর্জন করতে বললেন।—

> "বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"

বলা বাহুল্য, কবির এই শিক্ষাচিন্তা তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর এই রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আরো আলোচনা দেখি **'টৌন্‌হলের তামাশা'**, **'অকালকুষ্মাণ্ড'** প্রভৃতি রচনায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা আন্দোলনের সমালোচনা ছিল এই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু। তবে এ যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র-বিষয়ক লেখাগুলি প্রায়ই তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপে পূর্ণ এবং লেখক অনেকসময়েই একেকটি বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে উত্তেজিত হয়ে লিখেছেন। সর্বক্ষেত্রেই তা একান্ত আন্তরিক বা গাম্ভীর্যপূর্ণ নয়। এই ধরনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইংরেজের অসভ্য শাসনের সম্বন্ধে লেখা তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা হল **'জুতাব্যবস্থা'** (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। আর **'হাতেকলমে'** (১২৯১ ভাদ্র) নামক প্রবন্ধে দেশসেবা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত শক্ত ভাষায় দেশবাসীর কর্ণগোচর করবার চেষ্টা করলেন।

এইসব লেখা বিভিন্ন কারণে, বিচ্ছিন্ন চিন্তার সূত্রে রচিত হয়েছিল। কিন্তু দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে এইভাবেই তাঁর চিন্তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েও উঠেছিল। এরই পরিচয় আছে পরবর্তী কালের 'সমাজ', 'কালান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অন্তর্গত গভীর চিন্তামূলক ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধগুলিতে। কিন্তু সেই প্রবন্ধগুলিতেও বিচ্ছিন্ন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে মনে উদ্বুদ্ধ হত— তার স্বীকৃতি তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির মধ্যেই আছে।

ইতিহাস

ইতিহাস-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে লিখেছিলেন। ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর স্বকীয়। এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা—

> "যে সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়।"

কিন্তু আমাদের দেশে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা "ভারতবর্ষের

নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র।" কিন্তু সেটা ভারতের চিরন্তন আদর্শের ইতিহাস নয়।—

"নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইঁহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।··· পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা— নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

—ভারতবর্ষ ও স্বদেশ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১৩০৯

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। তাই তাঁর ইতিহাস ভারতের মারামারি কাটাকাটির ইতিহাস নয়। 'ঘরের পড়া' যুগে, জীবনের অতি প্রত্যুষকালে তিনি এই বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'ঝান্সীর রাণী'। এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেই সিপাহিবিপ্লবের নেত্রী ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর উপরে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার প্রমাণ আছে।··· এই প্রবন্ধটিতে ষোলো বছরের বালক দেশানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে যে গভীর চিন্তাশীলতা ও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২ বার্ষিক সংখ্যা, পৃ ৩১

মালতীপুঁথিতে প্রবন্ধটির একটি খণ্ডিত রূপ পাওয়া যায়। প্রবন্ধটির ভাষা ও রচনাপ্রণালী দেখলে মনে হয়, ওটি কোনো ইংরেজি লেখার অনুসরণে রচিত। পরে 'ভারতী' পত্রিকায় ওই প্রবন্ধেরই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ প্রকাশ হয় (১২৮৪ অগ্রহায়ণ)।[১৯] ১৯৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের শতবার্ষিকী স্মরণে কবির

১৯ প্রবোধচন্দ্র সেন: ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা', পৃ ২৭৯

স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্রণসহ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এবং 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

এই প্রবন্ধে লেখক ভারতবর্ষের অন্যতম বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈএর প্রতি তাঁর ভক্তি নিবেদন করেছেন। যাঁরা সত্যকার বীর তাঁরা দেশের জন্য কি ভাবে ত্যাগ স্বীকার করেন, সে কথাই তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন। লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। তবু লেখক যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বামী মারা যাবার পর বিধবা রানী তাঁর অপরিসীম মানসিক ও শারীরিক বলে কিভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণ প্রবন্ধটিতে কিয়দংশে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই বীরত্ববর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক তাঁতিয়া টোপী, রাজপুত অধিপতি নৃপৎ সিং প্রভৃতি বীরেদের মানসিক বীর্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের এইসব প্রকৃত বীর ও বীরাঙ্গনাদের যথার্থ পরিচয় আমরা ইংরেজ প্রভাবে রচিত ইতিহাস থেকে পাই না। লেখক সেইসব বীরদের যথার্থ পরিচয় ইতিহাসের অন্ধকার থেকে উদ্‌ঘাটিত করে ভারতবর্ষের যথার্থ ঐতিহাসিক ধারা রক্ষার প্রয়াস করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা'র যথার্থ পরিচয় দিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "মিথ্যা ইতিহাসের কুহেলিকা বা মোহান্ধকারকে নিরসন করে সত্য ইতিহাসের আলোকে স্বদেশকে উজ্জ্বল করে দেখবার ব্রতই গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ·· নেহাত তথ্যপুঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল ইতিহাসের তত্ত্ব ও শিক্ষার প্রতি।"
>
> —'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ ২৭০-৭৫

রবীন্দ্রনাথের এই 'তত্ত্বদৃষ্টি' ভারতীয় ইতিহাসের যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারে নিয়োজিত ছিল, তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি অতি উদার অতি বিরাট্‌ ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে, এই আমার বিশ্বাস।"[২০]

এই উক্তি থেকে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায়। এই চিন্তার দ্বারা ইতিহাসচর্চা না হলেও, ইতিহাসের আসল লক্ষ্য যে শিক্ষা, যা

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র (২৩ আশ্বিন ১৩১৬), বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩০০

জাতিকে তার প্রকৃত সার্থকতার অভিমুখে চালনা করে, সে শিক্ষাটি যথার্থভাবে লাভ করা সম্ভব হয়।

ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে শিখজাতির উত্থানপতনের ইতিহাসের প্রতি কবির একটি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং প্রথমজীবনেই শিখজাতির উত্থানের ইতিহাস নিয়ে তিনি অন্ততঃ তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রথম **'কাজের লোক কে?'** (বালক, ১২৯২ বৈশাখ)। এই প্রবন্ধে তিনি শিখজাতির আদিগুরু নানকের জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নানকের পিতা কালু ছিলেন ব্যবসায়ী ও অর্থলোভী। অপরপক্ষে, ছেলেবেলা থেকেই নানক ছিলেন অতি ধার্মিক। এই পথ থেকে কোনোক্রমেই তাঁকে সরানো যায় নি। তিনি গৃহস্থ হয়েও ছিলেন সন্ন্যাসী। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন ঈশ্বরের মহিমা। প্রবন্ধশেষে লেখক গুরু নানক ও তাঁর পিতা কালুর জীবনের কার্যকলাপের হিসাব করে দেখতে চেয়েছেন, "কে বেশি কাজ করিয়াছে?"—

> "আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না।··· নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চার-শো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে।"

নানকের মৃত্যুর পর তাঁর মহত্ত্বের আভা শিখজাতির মধ্যে প্রজ্বলিতই ছিল। তাঁর ধর্মের আদর্শ অবলম্বন করে আরো নূতন নূতন গুরুর আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা শিখ জাতিকে উন্নতি ও মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করে দেন। এই রকমই এক গুরু, গুরু গোবিন্দের মহত্ত্ব ও কীর্তির কথা তিনি বিবৃত করেছেন পরবর্তী প্রবন্ধ **'বীরগুরু'**তে (বালক, ১২৯২ শ্রাবণ)। এই বীরগুরু গোবিন্দ সিং কিভাবে জাতিভেদ প্রথা লুপ্ত করে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সমগ্র শিখ জাতিকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সাহসী যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং সমস্ত জাতিকে 'সিংহ' উপাধি

দিয়েছিলেন সে কাহিনীই প্রবন্ধটিতে বিবৃত হয়েছে। এই গুরুর নেতৃত্বে শিখেরা যে অদম্য মানসিক বল প্রাপ্ত হয়েছিল, যে শক্তিতে তারা একদিন এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছিল, "সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।"

এই গুরু গোবিন্দের মহৎ আদর্শের বাণী কবি তাঁর পরবর্তী সাহিত্যেও প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত 'গুরু গোবিন্দ' ও 'শেষ শিক্ষা' কবিতা দুটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির মাত্র তিন বৎসর পরে লেখা 'গুরু গোবিন্দ' (১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ) কবিতায় এই শিখগুরু কিভাবে সমগ্র-জাতিকে দুর্দম সাহসিকতায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ!…
হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে
আসে লোক কত শত।"

আর 'শেষ শিক্ষা' (১৩০৬ কার্তিক) কবিতায় পাঠান বালককে পুত্রসম পালন করার পর তাকে দিয়েই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কিভাবে নিজেকে হত্যা করিয়েছিলেন, সেই কাহিনীটি বিবৃত করেছেন। তারপরে গুরু গোবিন্দের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে শিখজাতি জেগে উঠল; 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' করে অবতীর্ণ হল স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাদের অন্যতম নেতা বন্দার নেতৃত্বে 'মোগল-শিখের' প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল এবং মোগলরা বন্দাকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। 'শিখস্বাধীনতা'র এই কাহিনীটি পুনরায় কাব্যিক ভাবে ও ভাষায় প্রতিধ্বনিত হল 'বন্দীবীর' (১৩০৬ কার্তিক) কবিতাটিতে।

একই কাহিনী কবি নানাভাবে— কখনও গদ্য, কখনও বা পদ্যে বলছেন।

এর কারণ আসলে কিছুই নয়, ভারতীয় ইতিহাসে শিখজাতির বীরত্বপূর্ণ আদর্শের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধার প্রকাশমাত্র।

এর পরবর্তী প্রবন্ধ 'শিখস্বাধীনতা' (বালক, ১২৯২ আশ্বিন) শিখেদের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই ইতিহাস। শিখদের শেষ গুরু গোবিন্দ সিং মৃত্যুর সময় বন্দা নামক এক বৈরাগীর উপর শিখজাতির কর্তৃত্বভার দিয়ে যান। বন্দাকে কেন্দ্র করে শিখেরা তাদের আন্দোলন শুরু করে। বন্দাকে মোগলরা নৃশংস ভাবে হত্যা করে। কিন্তু গুরু নানক বা গোবিন্দের শিষ্য এই জাতি পরাস্ত বা ভীত হবার জাত নয়। তারা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে প্রবল পরাক্রমে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করল। গুরু গোবিন্দের আদর্শ আংশিক সফল হল।

এই প্রবন্ধগুলি নীরস ইতিহাস লেখার গতানুগতিক রীতিতে লিখিত নয়। আসলে এগুলি ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত সাহিত্য। ভাষা স্থানে স্থানে বেশ কাব্যিক ও রমণীয়। আসলে বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও তাঁর প্রাবন্ধিক রূপটি কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠছিল সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর এই প্রবন্ধগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর ইতিহাস-চিন্তা কেমন তীক্ষ্ণ ও গভীরতর হয়ে উঠেছিল তা তাঁর পরবর্তী সাহিত্য আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

সংগীত

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।" 'গানটা' কোনোদিনই তাঁর জীবনে 'ফাঁকি ছিল না'। অর্থাৎ জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল থেকেই গান ছিল কবির মজ্জাগত। জীবনে জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যিনি গানের আবহাওয়ায় মানুষ এবং নিজেও ছিলেন গান গাইতে অভ্যস্ত, সেই গায়ক, ভাবুক ও চিন্তাশীল কবি যে গান সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনাও অনেক করবেন—এ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ের মত সংগীত সম্বন্ধেও চিন্তা করেছিলেন জীবনের আদিপর্ব থেকেই। সমস্ত জীবনে যেমন তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন, তেমনি সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধনিবন্ধ, চিঠিপত্র ও বিভিন্ন মন্তব্যও করেছেন জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁর 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণটি পড়লে গীত সম্বন্ধে কবির বিভিন্ন মতামত কি ছিল সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

ছেলেবেলায় বিলাত যাত্রার পূর্বেই গান রচনায় তাঁর 'হাতেখড়ি' হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সহায়তায় তাঁর এই সাধনা চলেছিল, সে-কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। এই সংগীত রচনার সমকালেই তাঁর মনে সংগীত ও অভিনয় সম্বন্ধে নবতর ভাবনার উদয় হল সংগীত সম্বন্ধে স্পেন্সরের একটি প্রবন্ধ[২১] পাঠ করে। স্পেন্সর ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে অন্যতম। আর ছিলেন 'সে যুগের ভাঙনশীল যুবকদের গুরুস্বরূপ'। এই প্রবন্ধ পড়ে সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নূতন দৃষ্টি যেন খুলে গেল। জীবনস্মৃতিতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র আলোচনা প্রসঙ্গে কবি নিজে বলেছেন—

"কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।"

এই ভাবনা থেকেই তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র জন্ম। এই গীতিনাট্যে তিনি কতরকমের পরীক্ষা করেছেন, তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। বাল্মীকি-প্রতিভায় সংগীত সৃষ্টিতে কবি যে পরীক্ষা করলেন তারই সমর্থনে তিনি পরপর তিনটি প্রবন্ধ লেখেন—'সংগীত ও ভাব', 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' এবং 'সংগীত ও কবিতা'। এই তিনটি প্রবন্ধ আমাদের আলোচ্য পর্বেরও অন্তর্গত। তাই প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পূর্বদিন সন্ধ্যায় (১২৮৮ বৈশাখ ৮) বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধটি—**'সংগীত ও ভাব'** পাঠ করেন। সাধারণ সভায় এই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ছিল, 'গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা' কণ্ঠসংগীতের মূল উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটিতে কবির লিখিত অংশ কমই ছিল।—

"দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানা প্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম।"

এই কারণে সভাপতি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে 'বন্দে বাল্মীকিকোকিলং' বলে 'প্রচুর সাধুবাদ' প্রয়োগ করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন—

---

২১ The Origin and Function of Music: Essays—Scientific, Political and Speculative. Vol. I, 1868

এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: র-জী, 'বাল্মীকিপ্রতিভা', পৃ ১০১

"সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা।··· গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই ; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় স্বরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

বিশ বৎসর বয়সে প্রবন্ধটিতে কবি যে মত ব্যক্ত করলেন, তার প্রায় আরো ত্রিশ বৎসর পর 'জীবনস্মৃতি'তে তাকেই অস্বীকার করে বলেছেন—

"যে-মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে।··· গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো ; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো।"

—জী-স্মৃ, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'

কিন্তু এই কি কবির চরম মত? কবির সমগ্র সাহিত্যেই— সে কাব্যে, গানে, ছন্দে, প্রবন্ধে, সর্বত্রই দেখা যায় ভাঙাগড়ার খেলা। এখন যা বলছেন, পরে তাকেই খণ্ডন করছেন। নিজের পরীক্ষা তাঁর নিজের কাছেই। সংগীত সম্বন্ধে তিনি কখন কি ভেবেছেন, তা আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। কিন্তু সমগ্র জীবনের আলোচনা-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত যে এই পর্বেই হয়েছিল, সেটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়।

সংগীত সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ '**সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা**' (১২৮৮)। সংগীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি হার্বার্ট স্পেন্‌সরের মতের অনুগামী, সে কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে তাঁর যে মত ব্যক্ত হয়েছে তারই সমর্থনে তিনি স্পেন্‌সরের The Origin and Function of Music— প্রবন্ধটি অবলম্বন করে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখলেন। এই প্রবন্ধে কবি বলেন যে, মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সংগীত আর রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভাব প্রকাশ করা।—

"আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-

স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা-প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।”

সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন—

“মনুষ্য জাতির সুখ-বর্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী।··· বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবন সঞ্চার করে।”

কিন্তু, “আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে··· তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।··· যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চ শ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।”

সংগীত সম্বন্ধে তৃতীয় প্রবন্ধ **‘সংগীত ও কবিতা’**ও প্রথম দুটির মতো প্রথমে ভারতী পত্রে (১২৮৮) প্রকাশিত হয়। পরে ‘সমালোচনা’ গ্রন্থটির অন্তর্গত হয়। এই প্রবন্ধে কবির লক্ষ্য—“আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সংগীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিব।” তাঁর মতে সংগীত ও কবিতার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, কেবল উন্নতির তারতম্য।

গদ্য ও পদ্যে তফাত হল, গদ্য আমাদের ‘বিশ্বাস’ করায় নানা যুক্তির সাহায্যে আর পদ্য ‘উদ্রেক’ করায়। যে সব কথায় যুক্তি খাটে, তা গদ্যের দ্বারা অন্যকে বোঝানো যায়, কিন্তু যাতে যুক্তি নেই তাকে কবিতার দ্বারা অনুভব করানো ছাড়া উপায় নেই। তাই “চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভূতির ভাষা পদ্য।”

এরপর ম্যাথিউ আর্নল্ডের চিত্র, সংগীত ও কবিতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের মর্ম উদ্ধৃত করে কবি দেখালেন শিল্পীর কাজ হল সর্বাপেক্ষা শুভমুহূর্তটিকে বেছে নিয়ে চিত্রে গেঁথে ফেলা। এর পরের মুহূর্তের ভাব চিত্রে থাকে না। তেমনি একটিমাত্র ভাব বেছে নিয়ে সুর দান হল সংগীতের কার্য। কিন্তু কবিতার কাজ আরও বিস্তৃত। ভাব থেকে ভাবান্তরে তাকে গমন করতে হয়। ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে সংগীত একটা স্থির ভাবের ব্যাখ্যামাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অনুসরণীয় নয়, তা নয়। কারণ সংগীত ও কবিতা “উভয়ে যমজ ভ্রাতা।” কিন্তু উন্নতি ও শিক্ষার

তারতম্যে কবিতার মত সংগীতের সে বয়স হয় নি। পরিশেষে তিনি কামনা করেছেন, সংগীত যেন কতগুলো 'নাম ও নিয়মের মধ্যে' বদ্ধ না হয়ে থাকে।—

> "কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে সংগীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক।… তাহা হইলে…প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।"

এক কথায়, তিনি 'সংগীতের মুক্তি' কামনা করলেন। বলা বাহুল্য, নিজের এই কামনাটি তিনি নিজেই পূর্ণ করেছিলেন। গানকে ভাবের অনুসারী করে তিনি তাকে কি সুদূরপ্রসারী করেছিলেন, তা আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। কিন্তু তাঁর সংগীতচিন্তা যে তাঁর জীবনেরই বিভিন্ন স্তরে, সংগীত রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কি পরিণতি লাভ করেছিল তা বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তারই সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই।

বিচিত্র রচনা-১

এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে লেখকের বয়সোচিত ধর্মই চোখে পড়ে। জীবনের বিচিত্র সমস্যা স্বভাবসুলভভাবেই বালকের মনে সাড়া জাগিয়েছে এবং তিনি সেগুলি নিয়ে অল্পবিস্তর চিন্তা ও আলোচনা করেছেন। তবে এইসব প্রবন্ধে গভীর আন্তরিকতা বা মতামতের উগ্রতা ও দৃঢ়তা— কোনোটিই তেমন গভীর নয়। বেশির ভাগ রচনাগুলিই অ-নামে লেখা। বিচ্ছিন্ন চিন্তার এই সমষ্টিকে শ্রেণীগতভাবে উপস্থাপন করা এখানে সম্ভব নয়। তাই যথাসম্ভব কালক্রম রক্ষা করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম **'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য'** (১২৮৪ মাঘ) প্রবন্ধে তিনি বঙ্গদেশের উন্নতির জন্যে মনে একটি আশা পোষণ করেছেন। সভ্যতা-প্রসারের জন্য প্রথম দরকার ধন। ধনলাভ হলেই 'জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে'। ধনের জন্য দরকার উর্বর ভূমি। বাংলাদেশের ভূমি উর্বর। তাই লেখক আশা করেন এর দ্বারা "বঙ্গদেশ এককালে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারিবে।" কিন্তু দেশ উর্বর হলেও ধনবণ্টন-বৈষম্যের জন্য দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউই দেশের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন না। এরজন্য প্রয়োজন বাণিজ্যবৃদ্ধি।

দ্বিতীয়তঃ, 'দেশের আর্দ্রবায়ু' আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর। তবে পরিশ্রম যথেষ্ট করতে পারলে এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। মনের দুর্বলতা দূর হলেই শরীরের দুর্বলতাও দূর হয়। পরিশেষে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন—

"আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে যে দুইটি বাধা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা নষ্ট করিবার তেমনি দুইটি অমোঘ উপায় আছে— ব্যবসায় ও ব্যায়াম।"

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালির বাহুবল' প্রবন্ধটির সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈষম্য উভয়ই লক্ষিত হয়। এর পূর্বেও 'অভিলাষ' কবিতায় ও 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা ··' প্রবন্ধে বঙ্কিমের এই প্রবন্ধটির বিরোধিতা ও সমর্থন দুইয়েরই আভাস দেখা গেছে। ফলে এই প্রবন্ধ লেখার সময়ও যে বঙ্কিমের প্রবন্ধটি তাঁর মনে ক্রিয়া করতে পারে, সে বিষয়ে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

এই প্রবন্ধ রচনার অল্পদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা নিয়ে লিখলেন **'সান্ত্বনা'** (১২৮৪ চৈত্র)। প্রবন্ধটিতে কবির স্বাক্ষর আছে 'ভঃ'। একের দুঃখে অপরে যে সান্ত্বনা দেয়, তাদের তিনি দুইভাগে ভাগ করে বলেছেন, যাঁরা সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা দুঃখ লাঘব করতে চান তাঁরা আসলে দুঃখীর সঙ্গে সমব্যথা বা হৃদ্যতা উপলব্ধি করতে পারেন না। দুঃখীর সঙ্গে যাঁরা সমব্যথী হন, কবি তাঁদেরই পছন্দ করেছেন। দুঃখের সময় দুঃখের ভাবনা করার মধ্যেও আনন্দ আছে। তাই বলেছেন—

"সান্ত্বনা অনেকসময় বড় বিরক্তিজনক··· যদি তুমি তাহার দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে পার ত ভাল, নতুবা তাহার ভাবনার সময় অলীক সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার ভাবনায় ব্যাঘাত দিও না।"

মহারহস্যময় সমুদ্রের বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন **'সামুদ্রিক জীব —প্রথম প্রস্তাব'** (কীটাণু-১২৮৫ বৈশাখ) প্রবন্ধটিতে। প্রসঙ্গক্রমে রচনাটিতে বিহারীলালের একটি লোমহর্ষক সমুদ্র-বর্ণনামূলক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'নবরত্নমালা' (১৯০৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ **তুকারামের** অভঙ্গের অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। সেইগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১২৮৫ বৈশাখ)। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের গঠনে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের দান কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে পূর্বে নানা জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ প্রসঙ্গে এ কথাটিই স্মরণীয় যে, কবি যেমন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নানা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। কারণ, তিনি নিজেও ছিলেন সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক। তাই তিনি তাঁর

'নবরত্নমালা'য় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত ও মারাঠী অভঙ্গের অনুবাদ করিয়েছিলেন। এতে ফল এই হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেলেন, অপরদিকে কবীর, নানক, চৈতন্যের মত তুকারামও যে ভারতীয় ঐতিহ্যের একজন ধারক, সে ধারণাটিও স্পষ্ট হল। তাঁর রচিত পরবর্তী সাহিত্য থেকেই তার পরিচয় মেলে।[২২]

এর কিছুকাল পরে প্রকাশিত **'অকারণ কষ্ট'** (১২৮৭ আশ্বিন) প্রবন্ধে লেখক বলেন, যারা দুঃখবিলাসী, অকারণ কষ্ট ভোগ করার মধ্যেই তাদের আনন্দ।

ইংরেজ বণিকগণ একদা চীনে কি ভাবে বলপূর্বক আফিং-ব্যবসার প্রচলন ও বিস্তার করে চীনাবাসীদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তার বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন **'চীনে মরণের ব্যবসায়'** (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। চীনের এই সর্বনাশে ভারতবর্ষেরও অনেক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি হয়েছিল। প্রবন্ধটির প্রথমাংশের ভাষা বেশ নাটকীয়। প্রবন্ধটিতে লেখক নিজের নাম দেন নি। Theodore Christlieb-এর 'The Indo-British Opium Trade' গ্রন্থের অনুবাদ করেন জার্মান লেখক David B. Croom। ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

অপরপক্ষে, জাপান যে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ, তার উন্নতির কারণ কি, তা অনুসন্ধান করে ও জাপান দেশের ইতিহাস বর্ণনা করে লেখেন **'জাপানের বর্তমান উন্নতির মূলপত্তন'** (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। প্রবন্ধ রচনার '১৩ বৎসর পূর্বে' জাপানে ছিল 'শোগুন' অর্থাৎ সেনাপতি-বংশের আধিপত্য, সম্রাট্ ছিলেন 'সাক্ষীগোপাল'। তাদের শাসনকালের বিভিন্ন বর্ণনা, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কিভাবে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত কিভাবে 'শোগুন' বংশের অবনতি ও সমাপ্তি হয়ে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রবন্ধটিতে।

এর পরেই **'জাপানের বর্তমান উন্নতি'** প্রবন্ধে (১২৮৮ আষাঢ়) 'শোগুন' আধিপত্যের শেষে সম্রাটের প্রতিষ্ঠা এবং দেশের উন্নতির জন্য সম্রাটের বিভিন্ন সংস্কারের বিবরণ লিখলেন। পূর্ববর্তী কিয়োটো নগরের পরিবর্তে সম্রাট্ য়েদো বা টোকিয়ো নগরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমেই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তনের দিকে নজর

২২ **দ্রষ্টব্য : স্বদেশ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১৩০৯ ভাদ্র ; তুকারাম প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—সজনীকান্ত দাস : 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী) পৃ ২৩৮-৩৯ ; রবীন্দ্রনাথ : 'রূপান্তর' (১৯৬৫), পৃ ১১১-২৯ ও গ্রন্থপরিচয়, পৃ ২১১, ২১৮-১৯**

দিলেন এবং সেইসঙ্গে সৈন্যবাহিনী ও সামরিক ব্যবস্থারও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। নূতন মুদ্রা প্রবর্তন ও ডাক ব্যবস্থাদিরও প্রচলন হয়। সর্বাপেক্ষা উন্নতি হল শিক্ষাব্যবস্থায়। শিক্ষা প্রবর্তিত হল সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য। আর এই সকল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল জাপানী ভাষা ও সাহিত্য। ইতিহাস, নীতিতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই জাপানীগ্রন্থ প্রচুর আছে। জাপানী সাহিত্যে নাটক অপেক্ষা 'কবিতা ও গীতের ভাগই বেশি।' আর কবিতাগুলি বড় নয়, খুব ছোট ছোট। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কবি প্রবন্ধটির মধ্যে একটি 'খুব দুঃখের গান'ও অনুবাদ করে দিয়েছেন ('বাতাসে অশথ পাতা পড়েছে খসিয়া' ইত্যাদি)।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পরবর্তী কালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (১৩১২ আষাঢ়) 'জাপানের প্রতি' নামে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি জাপানী কবিতার গঠন ও ছন্দের অনুকরণে রচিত। তাই কবি ওই কবিতাগুলির ভূমিকা হিসাবে জাপানী কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও আলোচনা করেছিলেন। বর্তমানে ভূমিকাসহ কবিতাগুলি 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থের সংকলন বিভাগের অন্তর্গত। কবির মতে জাপানী কবিতা জাপানী জাতির চরিত্রের প্রতিবিম্ব। 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থেও (১৩২৬) বলেছেন, ওদের কবিতা "ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়।" কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাটি তার ব্যতিক্রম। এই গানটি পরবর্তী কালে সামান্য পরিমার্জিত আকারে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের (১৮৮৬) 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' অংশে সংকলিত হয়— 'কোনো জাপানী কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হইতে' এই শিরোনামে।

যাই হোক, সাহিত্যোন্নতি ছাড়া সম্রাট্ সংবাদপত্র, দীপ মন্দির (Light House) নির্মাণ, রাজপথ ও সেতুর উন্নতি সাধন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক জাপানকে একটি পরিপূর্ণ উন্নত দেশে পরিণত করেন। জাপানের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূল কারণ হল "রাজা হইতে প্রজা পর্যন্ত সকলেরই হৃদয়ে প্রগাঢ় নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা।" তিনি আরও বলেছেন—

"এককালে জাপান সমস্ত এসিয়ার মধ্যে যে প্রবলতম জাতি হইবে তাহার আভাস এখন হইতেই দেখা যাইতেছে।··· জাপানীরা ইংলণ্ডের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত এসিয়ার অদৃষ্ট নিয়মিত করিবে —কে বলিতে পারে হয় তো আমরা চিরপরাধীন ভারতবাসী কোন্‌দিন আবার জাপানের করকবলে পতিত হইব।"

এই প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশালতা ও ক্ষমতায় চীনদেশ হয়তো পৃথিবীর প্রবলতম জাতি হতে পারত, কিন্তু অহিফেনের বিষে সে দেশ গাঢ় নিদ্রার কবলে পড়েছে। তাই তাদের অদূর ভবিষ্যতে কোনো আশা নেই।

জাপান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বিমুগ্ধ মনোভাব ও তার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী কালে রচিত 'জাপান-যাত্রী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯০৪-০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে বিজয়ী জাপানের অভ্যুদয়-গরিমা সমস্ত এশিয়াকে গৌরবান্বিত করে তুলেছিল। তখনকার জাপানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। 'জাপানের প্রতি' কবিতা তিনটিতে তাঁর সেই মুগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। 'জাপান-যাত্রী'তে তারই প্রকাশ ব্যাপকতর। বস্তুতঃপক্ষে, 'বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায়' আলোচ্য প্রবন্ধটিকে 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট বিভাগে সংকলনের যোগ্য বলে মনে হয়।

ভাষা ও তথ্যের বিচারে জাপানের উন্নতি-বিষয়ক প্রবন্ধ দুটিকে অনেকাংশেই কোনো ইংরেজি রচনার অনুসরণে লিখিত বলে মনে হয় এবং উক্ত জাপানী কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদটি ছিল ইংরেজি রচনারই অন্তর্গত।[২৩] জাপান-সম্পর্কিত এই প্রবন্ধ দুটিই অনামে লিখিত অর্থাৎ অ-স্বাক্ষরিত। তবুও সামগ্রিক বিচারে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। প্রবোধচন্দ্র সেন ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— দুইজনেই অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এই প্রবন্ধ দুটি রচনার সমকালেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে লিখলেন **'যথার্থ দোসর'** (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। এই প্রবন্ধে তিনি বললেন, এ সংসারে সকলেই প্রাণের, মনের 'যথার্থ দোসর' পেতে চায়। কিন্তু কেউ পায়, কেউ পায় না। প্রকৃতিদেবী দুটি হৃদয়ের জন্য দুটি হৃদয় সৃষ্টি করে রাখেন। কিন্তু 'যাহার সহিত আমার চিরজীবনের সম্বন্ধ তাহার সহিত ইহজন্মে আর দেখা হইল না।' প্রেমের এই তত্ত্ব কবি ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে Shelley, Edwin Arnold, Christiana Rossetti প্রমুখ ইংরেজ কবিদের কবিতা অনুবাদ করে দিয়েছেন। এছাড়া Arthur O'shanghnessy-র একটি কবিতাও উদ্ধৃত করেন।

এই প্রবন্ধেরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ রচনা করেন **'গোলামচোর'** (১২৮৮ আষাঢ়)। তাস খেলার রূপকের মাধ্যমে লেখক জীবনের একটি সত্যের কথা

২৩ দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'বাংলায় জাপানি ছন্দ', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৯ মাঘ-চৈত্র, পৃ ২০২-২০৯

বলেছেন। তাসে যেমন 'গোলামচোর' হওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার, জীবনেও তেমনি বিবাহ, প্রেম ইত্যাদি ভাগ্যের খেলা। তাই জীবনে কেউ ঠকলে তাকে নিয়ে পরিহাস করা অন্যদের উচিত নয়। প্রবন্ধটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন অবিবাহিত। তাই তিনিও তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

'নিমন্ত্রণ সভা' (১২৮৮ আষাঢ়) প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন, আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ সভায় শুধু আহারের আয়োজনই প্রাধান্য লাভ করে। আহার ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠান হয় না। আলাপ-আলোচনার জন্য লোকে একত্র হতে চায় না। সমাজের এই ত্রুটিটি সংশোধন করার একটা প্রস্তাব এনেছেন এই প্রবন্ধে। এই কারণেই পরবর্তী কালে তিনি নিজে সাহিত্য আলোচনা, গান, আবৃত্তি প্রভৃতির জন্য সভানুষ্ঠান প্রবর্তন করেন।

'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' (১২৮৮ শ্রাবণ) প্রবন্ধটি আসলে সাহিত্য-আলোচনা জাতীয় রচনা। নামকরণ থেকে বলবার ভঙ্গি পর্যন্ত সর্বত্রই লেখক রূপক ব্যবহার করেছেন, ফলে তা বেশ সরস হয়ে উঠেছে। খাদ্যের যেমন চারপ্রকার ভেদ আছে, সাহিত্যেরও তেমনি তিনি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 'চর্ব্য' অর্থাৎ শক্ত জিনিস, খালি facts, যুক্তি; তাকে চিবিয়ে হজম করতে হয়। সকলের সে গুণ থাকে না। সে খাদ্য প্রধানতঃ পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য। তদানীন্তন বাঙালীরা চর্ব্য-সাহিত্যে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁরা 'চোষ্য' খেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের সাহিত্য সে খাদ্যে পরিপূর্ণ ছিল না। তাই, "আমরা একটা বিলাতী দাই-এর দুগ্ধ পান করিতেছি [সমৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য] আমাদের মায়ের দুধ কম।" কিন্তু এই দুধ সকলের সয় না এবং ব্যয়সাধ্যও। অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্য সবাই বোঝে না, বোঝা কঠিনও। 'পেয়' অর্থাৎ ধূম্র-পানের আনন্দ মুহ্যমান্ দেহে বল সঞ্চার করে, অলস শরীরে স্ফূর্তি আনে, কখনও আবার আবেশের সঞ্চারও করে। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে চর্ব্য ও পেয় উভয়ই উপযুক্ত।

চর্ব্য ও পেয়ের মাঝামাঝি লেহ্য পদার্থ সহজে খাওয়া যায়, হজমও হয়। তাই বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশে এরই প্রাদুর্ভাব বেশি। এই খাদ্যগুলির আবার বিভিন্ন স্বাদ— ঝাল, তিক্ত, অম্ল, মিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, সমকালীন মাসিক সংবাদপত্রগুলিতে (বিশেষতঃ 'ভারতী') লেখক সর্বজাতীয় খাদ্য ও সকলপ্রকার স্বাদ প্রার্থনা করে সম্পাদকবর্গের কাছে আবেদন করেছেন; তারমধ্যে লেহ্যই বিশেষভাবে কাম্য। এ প্রসঙ্গে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে

মুখরোচক বলেছেন এবং তাঁর সকল লেখাই মিষ্ট ও অম্লের মাঝামাঝি 'দধি'র স্বাদে উপভোগ্য।

এই রূপক-প্রবন্ধটির মতই **'দারোয়ান'** নামক রূপক-প্রবন্ধে (১২৮৮ ভাদ্র) লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে জীবনে যুক্তি বা reason প্রবল, না, আবেগ বা emotion প্রবল। এ প্রশ্নটি মানবজীবনের চিরন্তন প্রশ্ন। একটি রূপকের মাধ্যমে তিনি এই প্রশ্নটির বিচার করেছেন। মানুষের জীবনে যুক্তি বা বুদ্ধিকে তিনি 'দারোয়ানে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই দারোয়ান মানুষের সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করবার জন্য নিযুক্ত আছে। এই শক্তি তাকে সর্বদা চালনা করতে চায়। কিন্তু লেখকের প্রশ্ন, এই যুক্তি বা বুদ্ধিরূপ দারোয়ান যদি সর্বদা মানুষকে পাহারা দিয়ে রাখে তবে মনের পূর্ণ বিকাশ হয় কি?—

> "নিতান্তই যুক্তির নির্দিষ্ট চারিটি দেওয়ালের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান, মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে, আবার সর্বতোভাবে যুক্তিকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়ানও ভাল নয়।··· মাঝে মাঝে যুক্তির অনুমতি লইয়া কল্পনার রাজ্যে খুব খানিকটা ছুটিয়া বেড়াইয়া আসা উচিত।"

অর্থাৎ যুক্তিরাজ্যের বাইরে কল্পনার যে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, তাকেও জীবনে উপেক্ষা করা যায় না। পরিশেষে বলেছেন—

> "আমার দারোয়ানটা রোগা হউক যাহা হউক··· অনেক সময় সে বেচারী পারিয়া উঠে না, বলবান্ দস্যুদের কাছ হইতে লাঠি খাইয়া অনেকবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই।"

তাঁর এই 'রোগা দারোয়ান' 'বলবান্ দস্যুদের' সঙ্গে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে যে 'উদ্যম' হারাত না এবং স্পর্ধাও তার কম ছিল না, তা এই অধ্যায়ের 'সাহিত্য সমালোচনা' পর্যায়গুলিতে, বিশেষতঃ তৃতীয় পর্যায়েই দেখা গেছে।

'জীবন ও বর্ণমালা' (১২৮৮ কার্তিক) প্রবন্ধটিও বেশ সরস ও কৌতুক-জনক ভঙ্গিতে লেখা মানবজীবনের ব্যাখ্যা। আমাদের বর্ণমালায় অ থেকে হ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যেই গুপ্ত আছে জীবনের এক-একটি রহস্য।

> "আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ আমাদের নাটকের ন্যায় (কাঁ) দায় আরম্ভ (হা) সায় শেষ। আমাদের বর্ণমালা 'অহং' শব্দের একটি ব্যাখ্যা। অ-য়ে ইহার আরম্ভ, হ-য়ে ইহার শেষ।"

লেখক তাঁদের পণ্ডিতমশায়ের সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি বর্ণমালার দ্বারা জীবনের পর্বগুলিকে ভাগ করতে পারতেন।—

"লিখিত ভাষাবিশেষ পড়িবার জন্যই যে বর্ণমালা বিশেষ উপযোগী তাহা নহে। তাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত থাকে।... আমাদের বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, আমাদের জীবনেও পাঁচ ভাগ আছে। কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ ; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য।"

এ ছাড়া বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশুদের উঃ, ইঃ, আঃ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি তাদের আত্ম-প্রকাশের উপায়। বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গিতে লেখা জীবনের সঙ্গে বর্ণমালার যে সংযোগ-প্রদর্শন তা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সম্ভব ছিল।

ঐ বছরেই লেখা রবীন্দ্রনাথের আরো একটি বিশিষ্ট রূপক-প্রবন্ধ **'রেলগাড়ি'** (১২৮৮ অগ্রহায়ণ)। রেলগাড়ি, রেলস্টেশন ইত্যাদির রূপকে তিনি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের যথার্থ মান নির্ণয় করতে চেয়েছেন। একদিকে বাল্মীকি, অপরদিকে শেলী, বাইরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ সকলেরই সাহিত্যে কি স্থান এবং কি মান এবং তা যথার্থ হয়েছে কিনা, এ সবই তাঁর আলোচ্য বিষয়। অবশেষে বাংলার তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির মান কি ছিল এবং যতটুকু ছিল, তা উদ্যমের অভাবে যথাযোগ্য মূল্য পাচ্ছিল কি-না—এ সব চিন্তাও তিনি করেছেন। নিজেকেও করেছেন ঐ দলেরই অন্তর্গত। প্রবন্ধটির ভাষা, উপমা-প্রয়োগ এবং রূপক সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ রূপক বা হেঁয়ালি-রচনারই পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর-মনের গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন **'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি'** প্রবন্ধে (১২৮৮ অগ্রহায়ণ)। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শেলী, টেনিসন্ প্রমুখ ইংরেজ কবিদের চিন্তা কি রকম ছিল, তাই তিনি ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস করেছেন। তৎকালীন বিদেশী-সাহিত্য পাঠেরই প্রত্যক্ষ ফল এইসব প্রবন্ধ।

এইভাবে দেখি, বিচ্ছিন্ন চিন্তার জাল কবির মনকে সে সময় থেকেই ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করছিল। 'বিবিধপ্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা' গ্রন্থদ্বয়েও আছে এইরকম টুকরো-চিন্তার সমষ্টি। ছেলেবেলার কাব্য ও ছন্দ রচনা সম্পর্কে কবি বলেছেন, সেগুলি 'ভাঙা ছন্দে' 'টুকরো কাব্যের পালা', 'উল্কা বৃষ্টি'র মত। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভাষাতেই প্রকারান্তরে বলা যায়, এ যুগের গদ্যরচনাও ভাঙাচিন্তায় টুকরো সৃষ্টির পালা। পরবর্তী কালে এইসব ভাঙাচিন্তাই অনেক ক্ষেত্রে জোড়া লেগে হয়েছে পূর্ণ, আবার কখনও এক-একটি চিন্তাই সূত্র ধরে হয়েছে দীর্ঘায়ত। অর্থাৎ পরিণতিতে যে বনস্পতি তার ডালপালা বিস্তার করে হয়েছে বিপুল, বিশাল তারই প্রথম সবুজ অঙ্কুরটি বা চারাগাছটি মাটি ছেড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এই পর্বে।

বিচিত্র রচনা-২

বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার দ্বিতীয় পালা শুরু হল ১২৯২ সালে। ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে ঠাকুরবাড়ি থেকে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাড়ির বালকবালিকাদের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। কিন্তু কেবল তাদের রচনার দ্বারা মাসিকপত্র চলতে পারে না, তাই রবীন্দ্রনাথের উপরে পত্রটির পরিচালনার ভার অর্পণ করলেন। এই নূতন পত্রিকার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে নূতন প্রেরণা আনল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, প্রবন্ধ সর্বপ্রকার রচনার দ্বারা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করতে শুরু করলেন। তাঁর পূর্বোল্লিখিত ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপরে কতগুলি গভীর চিন্তামূলক প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে পূজার সময় কবি গেলেন সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। ঐখান থেকে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে লাগলেন 'বালকে'র জন্য। এই রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ **'রুদ্ধগৃহ'**। প্রবন্ধটিতে একটি রূপকের মাধ্যমে আমাদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে কবির বহুচিন্তিত একটি বাণী প্রথম ধ্বনিত হল, যার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে তাঁর জীবনের প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই। প্রবন্ধটিতে 'রুদ্ধগৃহ', 'জীবন', 'মৃত্যু' সমস্তই রূপক। এরই মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের সামাজিক অদূরদর্শিতার কথা বলেছেন। আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিজেদের অন্য সব দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি। 'আচার' ও 'বিচারে'র 'মরুবালুরাশি' দ্বারা নিজেদের রেখেছি আচ্ছন্ন করে।— "এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।" এই বদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার জন্য, মৃত্যুকে জীবনের স্রোতে এক করে ভাসিয়ে দেবার জন্য লেখক আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

> "জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোনো ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু, রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়।"

কিন্তু কবির সারাজীবনের বাণী—"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।"

> "মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে এক তালে নৃত্য করে, সেখানেও মৃত্যুর জীবন আছে; সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে।"

কবির এই চিন্তাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে "নাচে মৃত্যু, নাচে ছন্দ তালে তালে তা তা থৈ থৈ"— এই গানে।

'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি তাঁর যে চিন্তার পরিচয় দিলেন, তা তাঁর সমস্ত জীবনেরই অন্যতম মহৎ বাণীর প্রথম সূচনা। তিনি 'অচলায়তন' নাটকে এ কথা বলেছেন, বলেছেন 'তাসের দেশ' নাটকে। যে গৃহ 'অচল' তাকে ভেঙে ফেলে ভাসিয়ে দিতে হবে জগতের স্রোতে, যে 'দেশ' নিয়মের বন্ধনে শৃঙ্খলিত, সে বন্ধনকে ছিন্ন করে দেশকে মুক্ত করতে হবে। মাত্র কয়েক বৎসর পরে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দেউল' কবিতাটিতে (১২৯৯ ফাল্গুন) এই বাণীর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যে দেউলে ছিল না 'জানালাদ্বার', ছিল 'সকল দিক্ অন্ধকার' সে ছিল 'শব্দহীন গৃহ' মাত্র, সেখানেই একদিন দেখা গেল—

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের করপরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি
আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি।

'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাতেও (১২৯৯ ফাল্গুন) কবির ঐ মর্মবেদনাই প্রকাশিত।—

জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে!
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।
বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।

টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ—
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

এর পূর্ববর্তী 'দেউল' কবিতাটিতে কবির যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, তার থেকে যেন মুক্তি পেয়ে তাঁর 'বিশ্বনৃত্যে'র ছন্দ বেজে উঠেছে পূর্ণোদ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, 'অচলায়তন', 'তাসের দেশ,'[২৪] 'দেউল', 'বিশ্বনৃত্যে'র 'খাঁচা', 'প্রার্থনা' কবিতার 'গৃহের প্রাচীর' ইত্যাদি সব একই অর্থদ্যোতক। জীবনের নানা স্তরে বারেবারে কবি এগুলিকে ভাঙতে বলেছেন। আর তারই প্রথম বাণী ধ্বনিত হয়েছে 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে। প্রকৃতপক্ষে, 'যেথায় থাকে সবার অধম', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে' (গীতাঞ্জলি ১৯১০), 'গোরা' (১৯১০) 'অচলায়তন' (১৯১২) ইত্যাদি সবই কবির এই একই চিন্তাপ্রসূত। 'রুদ্ধগৃহে' যার শুরু 'দেউল'-এর পথ বেয়ে তারই পরিণতি আরো অনেক দূরে।[২৫]

সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজের দেশকে একই স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে, কোনো চিন্তাভাবনা, কোনো নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখলে জগতের আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না।

তাই যে কথা বলেছেন 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে—

"এ গৃহ রুদ্ধ রাখিও না— দ্বার খুলিয়া দাও।··· সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে"

সে কথাই বলেছেন 'বঙ্গমাতা'কে সম্বোধন করে—

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে···
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালছেলে করে।···
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।

২৪ 'তাসের দেশ'-এর মূল রূপ, 'একটি আষাঢ়ে গল্প'— সাধনা ১২৯৮ আষাঢ়, 'দেউল'-এরই সমকালীন।

২৫ প্রবোধচন্দ্র সেন : ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, 'অচলায়তন', পৃ ২২০

সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।

—চৈতালি, 'বঙ্গমাতা' ১৩০২

আবার যে চিন্তার বশবর্তী হয়ে বলেছেন—

"যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনা হয়, সেই পবিত্রস্থানে ভয় আর আসিতে পারে না। যে পথে মানুষ সর্বদা চলে ফিরে সেখানে কণ্টক বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না।" সেই চিন্তা মনে রেখেই অন্যত্র লিখেছেন—

"সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ-'পরে
মন্ত্র-তন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।"

—চৈতালি, 'দুই উপমা' ১৩০২

মৃত্যুকে ভয় না করে বীরের ন্যায় তাকে বরণ করার কথা কবি 'মা ভৈঃ'[২৬] প্রবন্ধেও বলেছেন। এই 'মৃত্যু' মানে মনের সংকীর্ণতা ও চিন্তার অগভীরতা। এই মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে যেদিন আমাদের 'কর্মধারা' 'দেশে দেশে' 'দিশে দিশে' 'নির্বারিত স্রোতে' প্রবাহিত হতে পারবে, সেইদিনই আসবে চরম সার্থকতার দিন।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধটি পড়ে অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে লেখেন " 'রুদ্ধগৃহে'র ভাব ধরিতে পারিলাম না" (শ্রীঅঃ-স্বাক্ষরিত)। একজনের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে থাকা 'আপনি গর্হিত বলিয়াছেন'। কিন্তু তাতে অসুন্দর কিছু আছে বলে তিনি মনে করেন নি।

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আপনি 'রুদ্ধগৃহ' যে ভাবে বুঝিয়াছেন, আমি ঠিক সে ভাবে লিখি নাই।" তারপর তিনি তাঁর পূর্ববক্তব্যকে আরও বিশ্লেষণ করে ঐ কথাই বোঝালেন যে—

"মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি। কিন্তু অনেক সময় সে ভয় অকারণ।... একটি জীবনের মধ্যেও শত সহস্র বিস্মৃতি চাই তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে।... অতএব আমাদিগকে বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়া অসীম

২৬ বিচিত্র প্রবন্ধ, 'মা ভৈঃ' ১৩০৯

২৭ নৈবেদ্য ৭২, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য'

একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে।··· তাই বলিয়াছিলাম দ্বার রুদ্ধ রাখিও না, যে আসে সে আসুক, যে যায় সে যাক্ আমি কেবল প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।"

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই 'বলাকা' কাব্যের অন্তর্গত 'শাজাহান' (১৩২১ কার্তিক) কবিতায়—

মিথ্যা কথা— কে বলে যে ভোল' নাই ?
কে বলে রে খোল' নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?···
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

পূর্ববর্তী 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে তিনি আসলে যা বলেছিলেন, এই প্রবন্ধে তার ব্যাখ্যা হয়েছে আর একটু অন্য ধরনের। তবে 'মৃত্যু' শব্দটি রুদ্ধদ্বারেরই ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির চিন্তা নানাসময়ে নানা রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই একই বক্তব্য ভিন্নসময়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে।

'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধটিতে কবির 'রচনার রসসম্ভোগ' অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর বিষয়বস্তুর গভীরতা কম নয়, কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি বারেবারেই দেখা দিয়েছে। তা হল, এই পৃথিবীতে প্রেম ও ভালবাসাই সমস্ত মানুষকে এক বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ রেখেছে। এই প্রেমের বন্ধনই পৃথিবীর চিরন্তন সত্য। অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর যাত্রাপথে মানবজাতির যে অবিশ্রান্ত গতি প্রবাহিত, তার অন্তর্নিহিত বন্ধনটি হল প্রেমের বন্ধন। তাই কবি বলেছেন—

"প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত, তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত।··· পথ চলিতে

আর-কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়।"

এই প্রবন্ধেও 'শাজাহানে'র মনোভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে—

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

তাই তিনি স্থাপন করেন 'তাজমহল'। এই স্মৃতিসৌধ যেন চিরদিনের জন্য—

চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

এই প্রবন্ধটি প্রথমে 'বালকে' প্রকাশিত হয়। পরে 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রবন্ধটির অংশবিশেষ সংকলিত হয়। প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্যে 'রাজপথের কথা' ছোটগল্পটির আইডিয়া লক্ষ করা যায়।

এরই সমকালে লেখা **'লাইব্রেরি'** প্রবন্ধে কবির বক্তব্য হল, লাইব্রেরি জিনিসটা যেন শব্দের ও ভাষার মহাসমুদ্র। কিন্তু তাকে শৃঙ্খলিত, নিস্তব্ধ করে রাখা হয়েছে অক্ষরের মধ্যে, গ্রন্থের মধ্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সব যেন পাশাপাশি নিস্তব্ধ হয়ে আছে এই লাইব্রেরির মধ্যে। কত শত সহস্র বৎসরের জ্ঞান-সংগীতপ্রবাহ এখানে নীরবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ শুনিতেছ।"

পৃথিবীর কত মহাপুরুষের 'কণ্ঠ' "সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।"

কিন্তু পৃথিবীর এই মহাআসনতলে বাংলাদেশের স্থান কতটুকু? বাঙালীর জ্ঞান কত ক্ষুদ্র! "সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে", বাঙালি কি তখন আত্মগোপন করেই থাকবে! কবি বাঙালীকে এই শতকণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালীর দিন আগত। তাকে জাগ্রত হয়ে 'বিশ্বসংগীতে'র সঙ্গে এককণ্ঠ হবার জন্য কবি তাকে আশ্বাস দিয়েছেন। এই ভাবটির প্রতিধ্বনি শোনা যায় সমকালে রচিত, 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আহ্বানগীত' কবিতায়[২৮]।

২৮ দ্রষ্টব্য: 'আহ্বানগীতে'র আলোচনা, ৩য় অধ্যায়

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর একমাস পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাবক্ষে 'সরোজিনী' নামক স্টীমারে ভ্রমণে বেরোলেন। সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সন্তানদের নিয়ে চললেন। এই নদীবিহারের বর্ণনা দিয়েই কবি লিখেছিলেন **'সরোজিনী প্রয়াণ'** প্রবন্ধ (১২৯১, জ্যৈষ্ঠ ১১)। ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসাবে প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট এবং তদুপরি এর ভাষার উৎকর্ষ প্রবন্ধটিকে কাব্যিক মূল্য প্রদান করেছে।

'বালক' পত্রিকা প্রকাশের মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইস্টারের ছুটিতে (২৫ চৈত্র ১২৯১) ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা, সুরেন্দ্র ও আরেকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দশদিনের জন্য হাজারিবাগ ভ্রমণে গেলেন। মধুপুর ও গিরিধি হয়ে হাজারিবাগ পৌঁছালেন। সেই ভ্রমণের একটি ছোট বিবরণ দিয়ে তিনি **'দশদিনের ছুটি'** প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করেন। 'বালক' পত্রিকা প্রকাশের পর তার আষাঢ়-সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে 'ছোটনাগপুর' নামে 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়।

এর পূর্বের প্রবন্ধটি ছিল জলভ্রমণের বৃত্তান্ত, এবার স্থলের। এটিও অপরূপ ভাষার মাধুর্যে ও প্রকাশভঙ্গির রমণীয়তায় তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা-সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম। বিচিত্র-প্রবন্ধে কবি যে 'রচনার রসসম্ভোগে'র কথা বলেছেন, তা এই প্রত্যেকটি রচনা সম্বন্ধেই সত্য। প্রকৃতপক্ষে, রচনারীতির অপূর্বতার জন্যই এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার আলোকে গভীর চিন্তামূলক বহু প্রবন্ধই লিখেছেন। আবার, কখনো কখনো বালক বয়সের উপযোগী নানা ধরনের সরস ও হালকা বিষয়ের অবতারণাও করেছেন। হাস্যরসকে সাহিত্যিক পর্যায়ে প্রয়োগ করার প্রবণতা তাঁর এই বয়স থেকেই দেখা দিয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত আছে তাঁর হাসির গান ও হেঁয়ালি নাট্যগুলির মধ্যে। কারণ, প্রাত্যহিক জীবনের মত সাহিত্যেও হাস্যরসের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করার পর লেখক 'ভানুসিংহ ঠাকুরে'র জীবন-পরিচয় দিতে গিয়ে **'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী'** নামে একটি ব্যঙ্গরচনা প্রকাশ করেন (নবজীবন, ১২৯১ শ্রাবণ)। কিন্তু প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই এটি তাঁর রচনা বলে প্রচারিত হয়।

কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনী বা তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে সাধারণতঃ যে ধরনের গবেষণা হয়ে থাকে, তারই একটা ব্যঙ্গাত্মক নমুনা লেখক এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। নানারকম কাল্পনিক সন-তারিখ, সমকালীন ব্যক্তি ও ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি ভানুসিংহের কালনির্ণয় করার একটি প্রচেষ্টা করেছেন। এরই নমুনাস্বরূপ বলেন, "ভানুসিংহ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।" এই উক্তিটির থেকে প্রমাণ হয় যে, ভানুসিংহ ঠাকুর আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তাঁর কবি-প্রতিভা "মা সরস্বতীর চোরাই মাল।… লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়।"

এর কিছুকাল পরে লেখক 'বালক' পত্রিকায় যে ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি প্রকাশ করতে থাকেন, তার প্রথম রচনা '**রসিকতার ফলাফল**' (১২৯২ বৈশাখ)। অনেক সময়ই দেখা যায়, অনেকের রসিকতার রস উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকে খুব কম। তারা তাকে বাস্তবদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে কোনো গভীর অর্থ আছে কিনা সেই সন্ধানেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লেখক বিভিন্ন কাল্পনিক ও কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র অন্তর্গত উক্ত রচনাটিতে। "পঞ্চমীর চাঁদের আলো রামধনবাবুর টাকের উপর চিক্ চিক্ করিতেছে।" এই হাসির কথাটি নিয়ে অনেকেই চিন্তা করতে বসবেন—এটি "আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, সমুদ্রের জলে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে" ইত্যাদি বর্ণনা থেকে চুরি করা। এই প্রসঙ্গে "কী অদ্ভুত প্রতারণা! কী অপূর্ব দুঃসাহসিকতা!!!"—এইসব মন্তব্য করতেও তাঁরা ছাড়বেন না। আবার কেউ কেউ আরো গভীরভাবে চিন্তা করে বলবেন—

> "রামধনবাবু যে নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণবাবুর টাক নাই বটে, কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় অল্প অল্প টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ অতিশয় নিন্দনীয়।"

এই ধরনের উদ্ভট দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন— নিন্দা করা বাঙালীর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই লেখক হতাশ হয়ে বলেছেন, "আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না।"

এই জাতীয় আরেকটি রচনা '**ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য**' (১২৯২ চৈত্র)। এই 'ডেঞ্জে পিঁপড়ে'রা আসলে ইউরোপীয় জাতির প্রতিনিধি। সে যুগে ইংরেজরা ভারতবর্ষীয়দের এবং ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ জাতিরা বিশ্বের অশ্বেতকায়

জাতিসমূহকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখত। জাতি, বর্ণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্ববিষয়ে তারা অন্যকে নিজেদের চেয়ে ছোট ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত বলে বিচার করত। শুধু তাই নয়, তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করাও পবিত্র কর্তব্য বলে প্রচার করত। কেননা তাতে হৃতসর্বস্ব অবনত জাতিদেরই উপকার সাধিত হয়, তারা উন্নত হয়। শ্বেতাঙ্গ জাতিদের এই তথাকথিত পবিত্র দায়িত্ব সেকালে 'White man's burden' নামে আখ্যাত হত। এই শ্বেতাঙ্গ জাতিকে লেখক বলেছেন, তারা "ডেঞে জাতি, উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।" আর অন্যেরা "পিঁপড়ে, সামান্য পিঁপড়ে"— এছাড়া আর কোনো যুক্তি নেই। এই যে তথাকথিত উচ্চজাতির মনের সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিক্ষীণতা তারই একটা বিদ্রূপাত্মক-রূপক লেখক রচনা করলেন কিশোরবয়সেই। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও সূক্ষ্ম ও তীব্র হয়েছে পরিণত বয়সে। কিন্তু তার মূলটি দেখা দিল 'বালক' পত্রিকার যুগ থেকেই। বাঙালী চরিত্রের কতগুলি উৎকট বৈশিষ্ট্য তথা বিশ্বের কতগুলি অন্যায় নিয়ম রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই পীড়া দিয়েছে। তার দৃষ্টান্ত আছে সে যুগের হেঁয়ালি নাট্যগুলিতে তথা তাঁর সমগ্র জীবনের রচনাবলীতে। সেই অনুভূতিটিই অঙ্কুরিত অবস্থায় দেখা দিল জীবনের প্রথমে রচিত এই প্রবন্ধটিতে।

পরলোকগতা বৌঠানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত '**পুষ্পাঞ্জলি**'র আলোচনাটিও করব বর্তমান প্রসঙ্গেই। রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রভাতে তাঁকে যিনি মাতৃস্নেহ দিয়ে পালন করেছেন, বন্ধুপ্রীতি দিয়ে সঙ্গ দিয়েছেন এবং সাহিত্যচর্চায় যিনি ছিলেন তাঁর 'নিত্যসহচর শ্রোতা সমালোচক বন্ধু'[২৯] সেই বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। সেই মৃত্যুই বোধহয় তাঁর জীবনে ছিল সবচেয়ে নির্মম। এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া বহুদিন পর্যন্ত তাঁর বহু রচনায় নানা ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ পায়। মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পরে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি' (১২৯২ বৈশাখ) নামক গদ্যরচনা সেই শোক প্রকাশের প্রথম অভিব্যক্তি। ঐ রচনায় তাঁর হৃদয়ের বেদনা আবেগ-আকুল ভাষায় প্রকাশিত হয়। রচনাগুলির মধ্যে বৌঠানের প্রতি তাঁর ভক্তি স্নেহ ভালবাসা অন্তরের গভীরতম উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং ভাষার মাধুর্যে তা হয়েছে কাব্যরসের সমপর্যায়ভুক্ত। তিনি যখন বলেন—

---

২৯ র-জী, পৃ ১৯৫

"সকলের সে ও আমার সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত ;— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম!··· সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত।··· আমি কেবল ভাবিতেছি এমন তো আরও সতেরো বৎসর যাইতে পারে! ·· কত শত দিনরাত্রি একে একে আসিবে, কিন্তু তাহারা একেবারে তিনি-হীন হইয়া আসিবে!"

—তখন মনে হয় রচনাটির মধ্যে অনেক উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু সে উচ্ছ্বাস একান্তই তাঁর আন্তরিক। প্রিয়জনের বিরহের কথা, মৃত্যুর কথা তাঁর পূর্বে এমন অশ্রুসজল ভাষায় পাঠককে অশ্রুসিক্ত করে আর কে বলতে পেরেছেন! শোকপূর্ণ রচনা বলে কবি বোধহয় 'পুষ্পাঞ্জলি'কে তাঁর কোনো গ্রন্থে স্থান দেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুষ্পাঞ্জলির সুর বারেবারে কত রূপে তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৌঠাকুরানী জীবিত কালে সাহিত্যে তাঁকে একভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে তিনি যেন নূতনতর প্রেরণা নিয়ে আবির্ভূত হলেন কবির হৃদয়ে, সকলের অগোচরে। আর কবিও বারেবারে মনেপ্রাণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন তাঁরই উদ্দেশ্যে তাঁর 'শৈশব সংগীত', 'ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলী', 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও আরো কত রচনার অঞ্জলি সাজিয়ে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কবি তাঁকে ভুলতে পারেন নি। পুষ্পাঞ্জলি রচনার পঁচিশ বৎসর পরে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে গিয়ে তাঁর আবার মনে পড়ে যায় "এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা রহিল আর যাহা রহিল না এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!"[৩০] 'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও 'লিপিকা' (১৯২২/১৩২৯) লিখতে গিয়ে তিনি যেন ভাবে-ভাষায় পুষ্পাঞ্জলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন।[৩১] এছাড়া অ-প্রত্যক্ষভাবে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্যে বারে বারে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'বলাকা'র অন্তর্গত 'ছবি' কবিতায় (১৩২১) কবি উপলব্ধি করেছেন—

ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

৩০ দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ মাঘ-চৈত্র, পৃ ২৯৮

৩১ দ্রষ্টব্য : র-জী, পৃ ১৯৬

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই…
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।

এ কবিতাটি সম্পর্কে অবশ্য মতান্তর আছে।[৩২] কেউ কেউ বলেন (যেমন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ) ঐ ছবি বৌঠান কাদম্বরী দেবীর। আবার অনেকের মতে (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ) ঐ ছবি ছিল কবিপত্নীর। পত্নীপ্রেমের প্রেরণাও কবিজীবনে কম ছিল না। 'স্মরণ' (১৯১৪) কাব্যের বহু কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যের অন্তর্গত 'পূর্ণতা' (১৯২৪) ও 'কৃতজ্ঞ' (১৯২৪) কবিতা দুটিতেও দেখি পত্নীর প্রতি কবির প্রেম কত গভীর ও তার প্রেরণা কত বিস্তৃত। তাই 'ছবি' কবিতাটিতে 'বিস্মৃতির মর্মে' বসে কবির অন্তরকে দোলায়িত যিনি করেছেন তিনি কবিপত্নী হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে কবিতাটি নিয়ে মতান্তর থাকায় এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিতাটির উল্লেখমাত্র করে বিস্তৃত আলোচনা থেকে নিরস্ত থাকা গেল। কারণ বৌঠানের প্রেরণা কবি-জীবনে যে কতখানি ছিল, তা তো রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা।

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, 'আকাশপ্রদীপে'র 'শ্যামা' (১৯৩৮), 'কাঁচা আম' (১৯৩৯) প্রভৃতি কবিতায় তাঁরই কথা নানা সুরে ধ্বনিত হয়েছে।[৩৩]

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রভাব নিয়ে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন দেখি না। এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য শুধু এই যে, পুষ্পাঞ্জলিকে কবি বর্জন করলেও তাঁর সমগ্র জীবনে তাঁর হারানো বৌঠাকুরানীর স্মৃতি তথা 'পুষ্পাঞ্জলি'র সুর বারেবারেই ঝংকৃত হয়েছে জীবনের একেবারে অন্তিম পর্যন্ত। তাই এই রচনাটি নেহাত পরিত্যাজ্য বা অনুল্লেখ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। পরন্তু, রবীন্দ্র-সাহিত্যে রচনাটি একটি বিশিষ্ট মূল্য লাভের অধিকারী বলেই পরিগণিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই বোধহয় ইদানীংকালে গবেষকগণ রচনাটির মূল্য-নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন।[৩৪]

১২৯২ সালে ভারতী পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তেরোটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই পৃথিবীর ও জীবনের কয়েকটি

৩২ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রজীবনী-দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ৩৬২

৩৩ র-জী, পৃ ১৯৬

৩৪ জগদীশ ভটাচার্য : 'পুষ্পাঞ্জলি ও লিপিকা', কবি ও কবিতা, ১৩৮১ বৈশাখ, অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

নিয়ম ও অনুভূতিকে অবলম্বন করে কবির দার্শনিকচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের প্রেমের প্রসার কত বিস্তর!— তা মাটি থেকে আকাশ, অতীত থেকে বর্তমানে প্রসারিত। এই প্রেম "জড় পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে।" আবার, অতীতের মৃতপুরুষের প্রেমে বর্তমানের জীবনই যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

অপর দিকে প্রাচীন বৃক্ষের দিকে নজর করে কবির মনে আর এক চিন্তার উদয় হয়। এই গাছ কত প্রাচীন— তার অন্তরে জাগ্রত আছে কত স্মৃতি, কত ইতিহাস, কত স্নেহ, প্রেম, দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তবু তারা নির্বাক। কবি যেন অনুভব করেন—

> "উহাদের ধীর গম্ভীর ঝর ঝর শব্দে সেই প্রাচীনকালের কাহিনী যেন ধ্বনিত হইতেছে,··· উহাদের ধ্যাননেত্রের কাছে অতীতকালের সুখ-দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিগুলি বিরাজ করিতেছে।"

আবার মানুষের জীবনে শোকের দরকার কি, এই নিয়েও তিনি চিন্তা করেছেন। শোক আমাদের উদাস করে, সংসারের ভার লাঘব করে। অপর-দিকে মানুষের মধ্যে উদারতা ও সংকীর্ণতা, এ দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে; পুরাতন ও নূতনের সামঞ্জস্যেই জীবনের সম্পূর্ণতা। এইসব টুকরো টুকরো বিষয়ে তাঁর চিন্তা বিবর্তিত হয়েছে এই প্রবন্ধগুচ্ছের মধ্যে।

বিচিত্র-প্রবন্ধ রচনার প্রথম পর্যায়েও দেখেছি তাঁর চিন্তাধারা কত 'অজস্র-সহস্রবিধ' স্রোতের মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে চেয়েছে। এই পর্যায়ে সেই বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত স্রোতপ্রবাহই গভীরতর ও বিস্তৃততর হয়ে তাঁর নিজের ও সমগ্র বাঙালীর মানসক্ষেত্রকে পরিপূর্ণতায় ভরপুর করতে চাইছে। পরিণতির যে সফলতা তার জয়যাত্রা এখান থেকেই শুরু।

(২) গ্রন্থানুক্রমিক পরিচয়

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১৮৮১ অক্টোবর ২৫)

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণীকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে লেখকের আপত্তি ছিল। কারণ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই তিনি বলেছিলেন, বিদেশে গিয়ে বিদেশকে প্রথম দর্শনে তাঁর যা মনে হয়েছে তাই তিনি লিখেছেন; 'ভারতী'তে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য সবসময় তাঁর মনে ছিল না। তাই পত্রগুলিতে তাঁর যে-সব মতামত প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি সর্বত্রই চূড়ান্ত নয় এবং কবি সেগুলি সম্বন্ধে খুব 'সাবধান'ও ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও কয়েকটি দিক্ থেকে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র যথেষ্ট গুরুত্ব আছে তা স্বীকার করতে হবে। লেখক বলেছেন—

> "একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।"
>
> —য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ভূমিকা

নূতন বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় যে-কোনো সাধারণ ব্যক্তির মনকেই অনেকখানি প্রসারিত করে। আর রবীন্দ্রনাথের মত সর্ববিষয়ে সচেতন কিশোরের মনে নূতন দেশ ও জগতের অভিজ্ঞতা যে সুদূরপ্রসারী হবে তাতে আর সন্দেহ কি। এ বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েও কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ওই প্রথম অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আরো একটি বিষয়ে এই পত্রশ্রেণীর বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। এই পত্রগুলিকে অবলম্বন করে ভারতীর সম্পাদক, তাঁর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ও উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক অনেক আলোচনা হয়। ফলে তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৪০) সেদিন অনায়াসেই ঐ পত্রগুলিকে ভারতীতে অপ্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি সেগুলিকে প্রকাশ করেছেন কনিষ্ঠভ্রাতার প্রতি একাধারে স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এবং তৎসঙ্গে তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন নি। অপরপক্ষে, সতেরো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরূপ মন্তব্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতার তিনি অপব্যবহার করেন নি। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা

প্রদর্শনেও তাঁর বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নি। এই যে একদিকে স্নেহপূর্ণ বিরূপ সমালোচনা, অপরদিকে লেখকরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতার 'সমান আসনে' বসে শ্রদ্ধাশীল অথচ স্বাধীন মতপ্রকাশ— বাংলা সাহিত্যে এ-ও এক অভিনব দৃষ্টান্ত। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে যুক্তিপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ স্বাধীন আলোচনার ভিত্তিভূমি অনেক সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উভয় ভ্রাতার মধ্যে এই বিতর্ক প্রসঙ্গে বহুবৎসর পরে (১৯২০-২১) অসহযোগ-আন্দোলন বিষয়ে পুনরায় যে দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র বিতর্ক ঘটেছিল, তা-ও স্মরণ করা কর্তব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের বিশেষ সমর্থক। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। ফলে উভয়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের দুইখানি চিঠি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩৫] এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'উপসর্গের অর্থবিচার'[৩৬] ও তৎসমর্থনে রবীন্দ্রনাথের 'উপসর্গ-সমালোচনা'[৩৭] প্রবন্ধ দুটির নামও উল্লেখযোগ্য।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রভাবনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব ও তার গুরুত্ব কতখানি তার বিচার পৃথক্ আলোচনা-সাপেক্ষ। কিন্তু, তর্কবিতর্কের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তার ফলে রবীন্দ্রনাথের বিচার-বিতর্ক করার ক্ষমতা যে অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণীর মূল্যবিচার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। এই পত্রগুলি ঠিক 'চিঠিপত্র' বা 'ছিন্নপত্রে'র মত নয়। তবুও আর-একজনকে [জ্যোতিদাদা] উদ্দেশ্য করে লেখার ফলে এগুলিকে নিছক নীরস প্রবন্ধ বলেও মনে হয় না। এগুলির মধ্যে চিঠিপত্র-সুলভ একটা ঘরোয়া ভাবও প্রকাশ পেয়েছে। আসলে এই পত্রশ্রেণী একাধারে ভ্রমণবৃত্তান্ত ও পত্রসাহিত্য। এর ফলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত হল। বস্তুতঃ, বাংলাসাহিত্যে পত্রাকারে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা ও এই বর্ণনার মাধ্যমে চিন্তামূলক মতামত প্রকাশ— এই রীতিটি রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই ধারাতেই 'বিশ্বযাত্রী' রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে লিখেছেন, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', 'পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ', 'যাত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। স্বামী বিবেকানন্দের

৩৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৮ মাঘ-চৈত্র

৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থভাগ চতুর্থসংখ্যা ও পঞ্চমভাগ দ্বিতীয়সংখ্যা

৩৭ 'ভারতী' পত্রিকা, ১৩০৬ বৈশাখ

৩৮ দ্রষ্টব্য— পুলিনবিহারী সেন: রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী, পৃ ৪৩২

'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ দুটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ওই দুটি গ্রন্থেও ভ্রমণকাহিনী ও নানা বিষয়ে সুগভীর চিন্তা একত্র সমন্বিত হয়েছে। অবশ্য এই দুই মনস্বীর রচনাভঙ্গি ও সুগভীর চিন্তাভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যও প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এর ভাষা। এ বিষয়ে পরে (অষ্টম অধ্যায়ে) বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-একটি বিশেষ দিক্ চোখে পড়ে। তা হল, গ্রন্থটির এখানে-সেখানে বহু ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থপাঠের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'যুগবিভাগ' অংশে দেখানো হয়েছে বালক বয়স থেকে বিভিন্ন সাহিত্য পাঠ করে তাঁর মনোজীবন কিভাবে গড়ে উঠেছিল। এইসব বিচিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ তাঁর মনে কিভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল তার কিছু প্রমাণ আছে এই গ্রন্থটিতে। সুদূর বিলাতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পরিবেশে বাস করেও তাঁর এইসব অংশ কি করে পুরোপুরি মুখস্থ ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দু'চারটি দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

গ্রন্থটির পঞ্চম পত্রে 'ইঙ্গবঙ্গ'দের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, তাঁরা 'দলবহির্ভূত' লোকেদের কাছে যথেষ্ট আস্ফালন করেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের কাছে পরস্পরের স্বরূপ বেশ জানা আছে, কিছুই গোপন থাকে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বররুচির 'নীতিরত্ন' থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে এবং তার অনুবাদ করে দিয়ে নিজের বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছেন।

কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।

অনুবাদ—

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা,
মাণিকে জড়ানো হোক তার পা-দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্—
রাজহংস নয় কভু, তবুও সে কাক।[৩৯]

—য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ৫ম পত্র

৩৯ দ্রষ্টব্য— পম্পা মজুমদার: রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পৃ ৫৬২

ঐ পত্রেই ইঙ্গবঙ্গদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাঁরা বিলেতে গিয়ে অতি নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। মিসেস উড্রো নাম্নী এক ভদ্রমহিলা কবিকে একদিন এ সম্বন্ধে বলেছিলেন এবং কবি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলেন—

> "হে ইঙ্গবঙ্গ, যদি ইংরাজদের মুখ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ না শুনলে তোমাদের চৈতন্য না জন্মায় তবে Thackeray এ বিষয়ে কী বলেন শোনো।— 'It may safely be asserted that the persons who joke with servants or barmaids at lodgings are not men of a high intellectual or moral capacity. To chuck a still-room maid under the chin, or to send Molly the cook grinning, are not, to say the least of them, dignified act of any gentleman.' "

Thackeray-র আর একটি উদ্ধৃতি আছে ষষ্ঠপত্রে 'মিলনের উপলক্ষ্য' প্রসঙ্গে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একটি উদ্ধৃতি দেখি ষষ্ঠ পত্রে। বিলাতে সুদর্শনা যুবতী বা সুদর্শন যুবকের কতখানি খাতির সে বর্ণনা দিতে গিয়ে জ্যোতিদাদাকে তিনি বলেছেন—

> "তোমার মত সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এসে এখানকার হৃদয়রাজ্যে এত ভাঙচুর লোকসান করতে পার যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে ওঠে। তা হলে চতুর্দিক থেকে
>
> ঘন
> নিশ্বাস প্রলয়বায়ু, অশ্রুবারিধারা
> আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকাররব—
>
> তুলে দেও।"
>
> —য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ৬ষ্ঠ পত্র

এই ধরনের আরো নানা নানা দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে বইটির এখানে-সেখানে। পত্রজাতীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত হলেও বিভিন্ন সাহিত্যের সংমিশ্রণে গ্রন্থটি সাহিত্যে নূতন রসের আস্বাদ এনে দিয়েছে এবং তা একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের স্বীয় সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩ সেপ্টেম্বর ১১)

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করে এবং 'আরম্ভপথ' থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে গঙ্গাতীরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখন বর্ষাকাল। কবির মনেও এল ভরা জোয়ার। তাই তিনি বলেছেন—

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।"

—জী-স্মৃ. 'গঙ্গাতীর'

তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীতের পালা' তখনও পুরোদমেই চলছে— 'ভাঙা ভাঙা ছন্দে ও আধো আধো ভাষা'য়। মানসিক এই অবস্থাতেই—

"গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসংগীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে; সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম, মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব— কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে; প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।"

জী-স্মৃ, 'প্রভাতসংগীত'

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলির পরিচয় লেখক নিজেই যথার্থভাবে দিয়ে দিয়েছেন এবং গ্রন্থটির পুনঃসংস্করণ কেন হয় নি বা কেন করা হয়নি তার কারণও বিবৃত করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত যেমন নিতান্তই 'অমূলক' ছিল না, তেমনি এই টুকরো-গদ্যগুলিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোনো নূতন ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিল কি না তাও বিচার করে দেখা দরকার।

লেখক কিন্তু গ্রন্থটিকে প্রথম সংস্করণের পরে 'সমাধি' দিতে চাইলেও হয়তো অজান্তেই গ্রন্থের শেষ রচনা 'সমাপন' প্রবন্ধে বইটির একটি ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বলেছেন এবং তাঁর জীবনের একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের কথাও

উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর এই জীবনসত্যের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে পৃথিবীর চিরন্তন সত্য। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে তিনি বলেছেন—

"আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে আসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন। পাছে কেহ ইহাদের সত্য-অসত্য আবশ্যক-অনাবশ্যক উপকার-অপকার লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন। কারণ, এ বইখানি সে ভাবে লেখাই হয় নাই।"

কিন্তু যা লেখা হয়েছে তার মূল্যও কম নয়—

"ইহা, একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে··· সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।··· এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতি মুহূর্তে মনের গঠনকার্য চলিতেছে। এই মহা শিল্পশালা এক নিমেষ কালও বন্ধ থাকে না। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের অদৃশ্য অভ্যন্তরে অনবরত কি নির্মাণকার্যই চলিতেছে!··· এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্যশীল পরিবর্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য, সমতা ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ।·· জীবন্ত উদ্ভিদে আজ যেখানে অঙ্কুর, কাল সেখানে চারা; আজ দেখিলাম সবুজ কিশলয়, কাল দেখিলাম সে পীতবর্ণ পাতা হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে; আজ দেখিলাম কুঁড়ি, কাল দেখিলাম ফুল, পরশু দেখিলাম ফল। আমার লেখাগুলিকেও সেইভাবে দেখ।··· আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মত, ফুলের মত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পোষণ-কার্যের সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়ত কাজে লাগিতে পারে।"

এই জগতের প্রতিটি নিয়ম যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন লাভ করছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের মানসিক জীবনও ছিল চিরপরিবর্তনশীল, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর রচনাবলীতে। জাগতিক নিয়মের তালে পা দিয়ে কবিও তাঁর মনকে পরিচালিত করেছিলেন; তাই তাঁর কোনো দুটি গ্রন্থের সুর এক হয়েও এক নয়। আর পাঠক তারই রসে চিরদিন মুগ্ধ হয়ে আছে। বালক লেখক তাঁর জীবনের এতবড় সত্যটিকে বোধহয় না জেনেই এই প্রবন্ধে বলে ফেলেছেন। অপরদিকে, তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বদাই প্রেমমুগ্ধ। জানা-অজানাকে তিনি ভালবাসতে চেয়েছেন, আত্মীয় বলে ডাকতে চেয়েছেন— সেই কথাও তিনি বলেছেন উক্ত প্রবন্ধেই—

"মনে মনে মিলন হয় এমন লোক সচরাচর কই দেখিতে পাই ? এই জন্য মনের ভাবগুলিকে যথাসাধ্য সাজাইয়া চারি দিকে পাঠাইয়া দিতেছি যদি কাহারো ভাল লাগে ! যাঁহারা আমার যথার্থ বন্ধু, আমার প্রাণের লোক, কেবলমাত্র দৈববশতই যাঁহাদের সহিত আমার কোনো কালে দেখা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত যদি মিলন হয় ! সেই সকল পরমাত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া আমার এই প্রাণের ফুলগুলি উৎসর্গ করি।"

এই প্রসঙ্গে তিনি এক বিশেষ ব্যক্তিকে [সম্ভবতঃ স্বর্গতা কাদম্বরী দেবী, যাঁর সঙ্গে চন্দননগরে একসঙ্গে বাস করেছিলেন] এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি বিশেষ আন্তরিক টান অনুভব করে বলেছেন—

"আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল— এক লেখা তুমি আর আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।"

গ্রন্থটির ভূমিকা ও উপসংহারে তিনি যে কথা বললেন—অর্থাৎ বিচিত্রভাবের অভ্যুদয়ের কথা, সেগুলি তাঁর নিজের জীবনে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল বা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও কতটুকু প্রযোজ্য তা একটু চিন্তা করে দেখা যেতে পারে।—

কবি বা ভাবুকদের ভাব কিরূপ, ভাবের জন্ম কিভাবে হয়, তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা কিভাবে লুপ্ত হয়ে যান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 'ছোটভাব', 'জগতের জমিদারী', 'প্রকৃতি পুরুষ', 'আত্মময় আত্মবিস্মৃতি' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি লেখেন। এই চিন্তাগুলিকেই জাগতিক নিয়মের অনুবর্তী করে লেখক আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন 'জগতের জন্মমৃত্যু', 'অসংখ্য জগৎ' প্রভৃতি রচনায়।

কোনো কোনো রচনায় রাজনীতির ভাবও কিঞ্চিৎ আছে। 'দয়ালু মাংসাশী' 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার' প্রভৃতি প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে উপলক্ষ্য করে কিছুটা রসের অবতারণা করেছেন। এইসব রচনায় ভাবের প্রসার তত নেই, যতটা আছে রসের আবেশ।

'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল', 'অনধিকার', 'অধিকার' প্রভৃতি প্রবন্ধে কিন্তু লেখক বেশ গভীরভাবের কথা বলেছেন— এগুলি তাঁর পরিণত রচনার সঙ্গে সমগোত্রীয় বলা যায়।

বসন্তে ও বর্ষায় এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে মানুষের জীবনের কি পার্থক্য ঘটে তার দার্শনিক বিচার করে 'বসন্ত ও বর্ষা' প্রবন্ধে বলেন—

"বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত

করিয়া রাখে।··· বর্ষাকালে আমাদের "আমি" গাঢ়তর হয়, আর বসন্তকালে সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।"

অপরদিকে 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রবন্ধে বলেছেন—

"প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকী আর সমস্তই হারাইয়া যায়।··· প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা।··· প্রভাতে আমি জগৎ-রচনার কর্মকারক ও সন্ধ্যাকালে আমি জগৎ-রচনার কর্তা কারক। প্রভাতে "আমি" নামক সর্বনাম শব্দটি প্রথমপুরুষ, সন্ধ্যাবেলায় সে উত্তম পুরুষ।"

এই প্রবন্ধগুলিতে বিষয়ের গভীরতার সঙ্গে ভাষার কারুকার্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'অনধিকার', 'অধিকার' প্রভৃতি প্রবন্ধে মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করে দার্শনিক ধরনের আলোচনাও করেছেন।

ভালবাসা জিনিসটাকে হৃদয়ে কি ভাবে স্থাপন করা উচিত, সে কথা বলেছেন 'মনের বাগানবাড়ি' প্রবন্ধে। রচনাটির ভাষাপ্রয়োগ অত্যন্ত অলংকৃত ও মনোগ্রাহী।—

"যাহাকে তুমি ভালবাস তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও; হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না।"

এই নিয়ে আলোচনা করে পরিশেষে বলেছেন—

"ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ করা নহে, ভালবাসা অর্থে ভাল-বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা। যাঁহাদের হৃদয়কাননের ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারি দিকে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্বরহৃদয় বিজ্ঞ বৃদ্ধেরাই ভালবাসার নিন্দা করেন।"

'গরীব হইবার সামর্থ্য', 'কিন্তুওয়ালা', 'বেশী দেখা ও কম দেখা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে মনুষ্যচরিত্রের এক-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন। যথার্থ ধনী কে এই নিয়ে 'গরীব হইবার সামর্থ্যে' আলোচনা করেছেন, আবার পরশ্রীকাতরতা সম্বন্ধে বলেছেন 'কিন্তুওয়ালা'তে।

'নৌকা', 'ফলফুল', 'মাছধরা' প্রভৃতি ক্ষুদ্ররচনাগুলিতে রূপকের মাধ্যমে লেখক এক-একটি ছোট অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন।—কখনও ব্যক্তিগত প্রতিভা সম্বন্ধে কখনও বা ভাবুকের মনে ভাবের উত্থান-পতন সম্বন্ধে। এছাড়া 'স্ত্রৈণ',

'জমা-খরচ', 'মনোগণিত', 'দ্রুত বুদ্ধি', 'ধরা কথা', 'খাঁটি বিনয়' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে হাল্কা ভাবের প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেকটি রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করলে এর অকারণ আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং ভাবের সামঞ্জস্য থাকে না। তবে যে ক'টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হল, তাতে দেখা যায়, সাধারণ মনুষ্যসমাজকে উপলক্ষ্য করেই লেখক বলেছেন। আর কয়েকটিতে কবি বা ভাবুকদের উদ্দেশ্যেও তাঁর চিন্তা প্রসারিত হয়েছে।

রামমোহন রায় (১৮৮৫ মার্চ ১৮)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের কি স্থান, তা নিয়ে বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা করতে দেখা যায়। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বহু কথা বলেছেন, নানা বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে তাঁর প্রশস্তি করেছেন। বর্তমানে 'চারিত্রপূজা' ও 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' গ্রন্থে রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রচিন্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়।

১২৯১ সালে (৫ মাঘ) রামমোহন-স্মরণার্থ সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তিনি রামমোহনকে ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সর্ববিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। তার মধ্যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ও ভারতীয় ঐক্যসাধনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য রামমোহন যে আন্দোলন করেন সে কথাই প্রধানতঃ বলা হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তিনি রামমোহনকে বিশেষ মর্যাদা দেন ও ব্রাহ্মধর্ম ভারতের সনাতন ধর্ম বলে প্রচার করেন। তবুও রামমোহন জাতীয় ধর্ম ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে দেশ ও জাতিকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, সে কথাই রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ বলতে চেয়েছেন।

এরপরে তাঁর রামমোহন সম্বন্ধে প্রথম বড় প্রবন্ধ পাই ১৩০৩ সালে এবং ১৩৩৫ মাঘ পর্যন্ত অন্যূন চারটি প্রবন্ধে তিনি রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐ প্রবন্ধগুলিতে তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্যকেই আরো সুচিন্তিত ও সুপরিণত রূপে উপস্থাপিত করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের কথা তিনি অবশ্য স্পষ্ট করে আর উল্লেখ করেন নি; বলেছেন সত্যধর্মের কথা। প্রাচীন সংস্কার, প্রাচীন ধর্মকে খণ্ডন করে যা সত্যধর্ম, রামমোহন রায় তাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন।

"আমাদের দেশে এখনও সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।"

এই কঠিন, 'ভীষণ' সত্যকে আহ্বান জানিয়ে লেখক বলেছেন—

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন।

"রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।··· ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন।" [১৩০৩ আশ্বিন ?]

রামমোহন রায়ের অন্তরে যে 'সত্যশিখা' 'প্রদীপ্ত' হয়ে উঠেছিল এবং তারই আলোকে যে তিনি বঙ্গবাসীকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন, সে কথাই লেখক তাঁর প্রবন্ধগুলিতে প্রধানতঃ বলেছেন। তিনি বেদ-উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে দেখালেন রামমোহন সত্যের পূজারী, একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। প্রথম প্রবন্ধে যা বলেছেন, তাকে কিছুটা খণ্ডন করে বললেন—

"তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকল'কই বললেন, 'ভাব সেই একে'।" [১৩২২ কার্তিক]

রামমোহন এই একের সাধনা এবং—

"মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।··· জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন, প্রতিকূলতার সাময়িক কুহেলিকায় তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস করতে পারবে না।" [১৩৩৫, ১১ মাঘ]

রামমোহন যেন রুদ্রের আহ্বানে তাঁর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।—

"সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয় নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে সত্যকে গ্রহণ করে নি। যত দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে।·· এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ।··· নিন্দা অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত করতে হবে।" [১৩৩৫ ভাদ্র]

নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে তিনি এই 'অমৃতে'র বাণীকে বিশ্বের ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রামমোহন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বললেন তারই চরমতম সিদ্ধান্ত করলেন রামমোহন রায়ের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে দুটি ভাষণে। প্রথম ভাষণে (১৩৪০ পৌষ ১৪) বললেন—

"সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা।··· ঐক্য-বোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি।··· অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই।"

এই দ্বন্দ্বের মাঝে 'শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে' কালে কালে অনেক মহাপুরুষেরও আবির্ভাব ঘটেছে। কবীর, দাদু, রজ্জব সকলেই এই মহাপথের পথিক ছিলেন। রামমোহন রায় বর্তমান কালে সেইপথের মহাপথিক। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সকলকে একত্রে মিলিত হবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। সকলের মিলিত যে ধর্ম তাই সত্যধর্মের নামান্তর। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও 'মহা অতিথিশালায়' সকলকে তিনি অবাধে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধেও (১৩৪০ পৌষ ১৬) ঐ কথাই তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই [রামমোহন] তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল ; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন 'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের

সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন।”

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন কবীর-দাদূ-রজ্জব-রামমোহনের নির্মিত ভারতপথের অন্যতম মহাপথিক। তিনি নিজেও বলেছেন, তাঁদেরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি গেয়েছিলেন—

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।…

এর পরেও তাঁকে রামমোহন সম্বন্ধে আরও তিনটি প্রবন্ধ লিখতে দেখা যায়। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বেও (১৩৪৭) তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া বিভিন্ন রচনায় রামমোহন-প্রসঙ্গ বহুবার উল্লেখ করেছেন।

দেখা গেল, কবি-চিন্তায় রামমোহনের স্থান কত বৃহৎ ছিল এবং তার প্রভাব তাঁর ধর্ম ও জীবন-ভাবনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ১২৯১ সালে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে ভাবনা তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে অঙ্কুর রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত সেই ভাবনাই ক্রমপরিণত ও বিকশিত হয়েছে মাত্র। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার কিছু বহিরাঙ্গিক পরিবর্তন বা রূপান্তর দেখা যায় বটে, তবু স্বীকার করতে হবে যে, এ বিষয়ে তার মূলভাবটি উপ্ত হয়েছিল তাঁর জীবনের সেই প্রভাতকালেই। আর এই প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্র-ভাবধারার অন্যতম প্রথম সূচনা হিসাবে বিশেষ মূল্য লাভের যোগ্য, এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য।

আলোচনা (১৮৮৫ এপ্রিল ১৫)

‘সন্ধ্যাসংগীত’ পর্বের গদ্যগুলি যেমন ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামে প্রকাশিত হয় তেমনি ‘প্রভাতসংগীত’ ও ‘ছবি ও গানে’র যুগে লিখিত গদ্যগুলি ‘আলোচনা’ নামে প্রকাশ পায়। লেখক বলেছেন—

“এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।”

—জী-স্মৃ, ‘প্রভাতসংগীত’

‘আলোচনা’র রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য হল, ওগুলি সবশুদ্ধ ছয়টি বড় প্রবন্ধে বিভক্ত। সেইগুলি আবার কতগুলি উপপ্রবন্ধে বিভক্ত। এই রচনাগুলি ক্ষুদ্রতা বা ভঙ্গির দিক্‌ থেকে অনেকটা ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’র মত মনে হলেও বিষয়গত বা

মননগত পার্থক্য দুইএর মধ্যে অনেকখানি। 'আলোচনা'র প্রবন্ধগুলি বিবিধ-প্রসঙ্গের ন্যায় হাল্কাভাবে লিখিত নয়। বয়স্ক চিন্তাশীল দার্শনিকের মত গম্ভীর ও জটিল। ভাবের এই গভীরতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ে। ঐ নাটকের অন্তর্নিহিত সুরটির সঙ্গে আলোচনার কোনো কোনো রচনায় (যেমন—'ডুব দেওয়া') সামঞ্জস্য দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> "আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে-ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতি-শোধের স্থান কী তাহা জানি ন, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

কবির এই কথাটি আমাদের আলোচনার পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাল্য বা যৌবনের রচনা বলে লেখক 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতো 'আলোচনা'কেও তাঁর রচনাবলী থেকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। অথচ, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্যের অন্যতম জীবনসত্য,— বর্জনকালে তিনি বোধহয় সে কথাটি মনে রাখেন নি। কিন্তু এতবড় একটি 'আইডিয়া' এই যৌবনে অঙ্কুরিত হয়ে কিভাবে বিশালতা লাভ করল তা এই রচনাগুলিকে বর্জন করলে জানা সম্ভব নয়। তাই, এই রচনাগুলি কোনো মতেই উপেক্ষার যোগ্য নয়— এগুলির বিশদ আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশেষতঃ, রবীন্দ্রনাথের শৈশবে পদ্য অপেক্ষা গদ্য ছিল অনেক বেশি পরিণত। সেদিক্ থেকেও এই গদ্যগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

সীমা ও অসীমের সম্বন্ধে লেখকের যে আন্তরিক অনুভূতি তা প্রধানতঃ **'ডুব দেওয়া'** প্রবন্ধটির মধ্যেই আলোচিত হয়েছে। বড় প্রবন্ধগুলির অন্তর্গত ছোট প্রবন্ধগুলি আসলে বিচ্ছিন্ন নয়। সেগুলির মধ্যে আলোচনার যোগসূত্র আছে। তাই 'ডুব দেওয়া'র অন্তর্গত উপপ্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ঐ একই ভাবের দ্যোতক। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রবন্ধগুলিতে লেখক প্রায়ই একটি করে ছোট কবিতা লিখে সংক্ষেপে তার অন্তর্নিহিত অর্থটিকে বুঝিয়ে

দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইসব কবিতা অন্য কাব্যগ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে।

'ছোট বড়' রচনায় বলেছেন, একটি বালুকণিকাও ক্ষুদ্র নয়; তার মধ্যেও অসীম লুক্কায়িত।—

"চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে।" এই ভাবেরই অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনাতে অনেক পাওয়া যায়। তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।...
আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে, ছোট কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।

—'উৎসর্গ': ১৪ (১৩০৭ ফাল্গুন)

অন্যত্র বলেছেন—

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।"

—'স্ফুলিঙ্গ': ১৬৪

ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎ প্রকাশিত—এই অর্থই কবিতা দুটির মূল কথা। প্রেমিকের প্রেমের মধ্যেও এই বাণীই ধ্বনিত হচ্ছে। 'ডুবিবার স্থান' প্রবন্ধে বলেছেন—

"যাহাকেই তুমি ভালবাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে

লইয়া যাইবে··· নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল'।"

এই কথা কবি পরেও বলেছেন, তাঁর 'মানসী' কাব্যে—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

—'অনন্তপ্রেম' ১৮৮৯ ভাদ্র

ঐ প্রবন্ধে কবি এই প্রসঙ্গেই আবার বলেন—

"যেখানে অনুরাগ নাই সেইখানেই সীমা, সেইখানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ।" 'মানসী'র 'পূর্বকালে' (১৮৮৯ ভাদ্র ২) কবিতাতে প্রেমের এই 'অনন্ত' ও চিরন্তন রূপ সম্বন্ধে কবিকে বলতে দেখি—

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

'পুরাতনের নূতনত্ব' প্রবন্ধেও ঐ একই কথা প্রকারান্তরে ও প্রসঙ্গ-ভেদে উল্লেখ করেছেন।—

"জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্তমান। নিত্যনূতন-নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা··· অসীম যতই পুরাতন হউক্-না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না!"

"এক কাঠা জমি' প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান।"

'জগৎমিথ্যা', 'জগৎ সত্য' ইত্যাদি লেখাগুলিতেও এই সীমা-অসীমের কথাই নানা ভাবে বলেছেন—

এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি!

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রত্যেক জ্ঞেয় জিনিসের পিছনে যে অদৃশ্য অসীমতা আছে তারই মধ্যে ডুব দেবার জন্য লেখক যেন পরামর্শ দিয়েছেন। সমগ্র জীবন ধরেই তাঁর এই চিন্তা ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাই 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর', 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি', 'অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর', 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে' প্রভৃতি রবীন্দ্ররচিত এই অতিপরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে বারেবারেই তাঁর সেই ভাবনার অনুরণন জেগেছে। অপরপক্ষে বলা যায়, পরিণত বয়সের এই ভাবগুলির বীজ অল্পবয়সের 'আলোচনা'তেই উপ্ত হয়েছিল।

'ধর্মে'র প্রবন্ধগুলিতে তিনি মানুষের অপূর্ণতাকে এমন একটি বিশ্বজনীন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন যে, তখন মনে হয় আমাদের অপূর্ণতা, আমাদের পাপ কিছুই দোষের নয়। সে যেন পূর্ণতারই আরেক দিক্। পূর্ণ-অপূর্ণ দুইয়ে মিলে সম্পূর্ণতা। 'প্রেমের যোগ্যতা', 'পথ', 'পাপপুণ্য', 'চেতনা', 'অচৈতন্য', 'বিস্মৃতি' সবগুলি রচনাই একজাতীয় ও একই ভাবসূত্রে গ্রথিত। 'চেতনা'তে বলেছেন—

"সকলেই ধর্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে, সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।"

আবার 'বিস্মৃতি'তে বলেছেন, "স্মৃতি বিস্মৃতি একই জাতি।"

এই অসম্পূর্ণতাই তাঁর চোখে ধর্ম হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে সত্য, যে জাগতিক সত্য আমাদের পরিচালিত করছে তাঁর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা মনের ভ্রম ব্যতীত কিছুই নয়। এ সম্পর্কে 'জগতের বন্ধন' প্রবন্ধে বলেছেন—

"আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র ?··· আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী

হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য।"

এই সত্যটিকেই একটি কবিতার দ্বারা আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—

যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
ক্ষুদ্র এই আপনার খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।

*　　*　　*

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
সেও ভাবে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া।
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্ধ্বে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ত্যজিতে
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

তাই প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্রুব সত্য, তার অনুগামী হওয়াই যথার্থ ধর্ম। 'জগতের ধর্ম' প্রবন্ধে কবি তাই বলেন—

"জগৎ যে অচল নিয়মের উপর আশ্রয় করিয়া বর্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধর্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অনুকণার ধর্ম।"

আর এই ধর্ম পালনের জন্য স্বার্থপর হলে চলবে না। "পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম"। 'সচেতন ধর্ম', 'অপক্ষপাত', 'সকলে আত্মীয়', 'জড় ও আত্মা' প্রভৃতি রচনায় 'উদাহরণ' দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন জগৎ হচ্ছে মহাআত্মীয়তার কেন্দ্রস্থল—

জগতস্রোতে ভেসে চল
　　যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবিশশী
　　চল রে সেথা যাই!

—'স্রোত' (প্রভাত-সংগীতে সংকলিত)

এই 'জগৎস্রোতে' নিজেকে বিলিয়ে দিলে—

"ধর্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংসও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থাপরিবর্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা। অচেতনতাই অধর্ম। ধর্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব।"

সর্বশেষে 'একটি রূপক' রচনায় লেখক বলেছেন, জগতে শোক, তাপ, দুঃখ সবই আছে। কিন্তু তারই মধ্যে দিয়ে আনন্দস্রোত সর্বদা প্রবাহিত। এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য সর্বংসহা মহাদেবের তুলনা দিয়ে বলেছেন, তিনি জগতের সমস্ত দুঃখ, শোক, সমস্ত বিষ আত্মস্থ করেছেন, 'উনি যে মৃত্যুঞ্জয়', মৃত্যুস্বরূপা কালী তাঁর প্রিয়তমা। কিন্তু তবু তিনি আনন্দিত, হর্ষগানে মুখরিত, সর্বদাই নৃত্যে রত। আর ঐ কালীই অনেকসময় গৌরীরূপে আমাদের স্নেহরসে মণ্ডিত করছেন। কাজেই মৃত্যুতে বা দুঃখে কাতর হলে চলবে না। তার অন্তরেই আছে অনন্ত আনন্দের স্রোত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে মহাদেব শিবের পরিকল্পনাটি লক্ষ করবার বিষয়। শিব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে ধারণা রবীন্দ্রদৃষ্টি তার অনুগত নয়। মহাদেবকে তিনি জগতের দুঃখকষ্ট-আনন্দের ধারক হিসাবে দেখেছেন। এই মহাদেবই নটরাজের মূর্তিতে, তাঁর নৃত্যের একেক পদক্ষেপে জগৎকে পরিচালিত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, শিব ও কালী সম্বন্ধে কবির যে স্বকীয় পরিকল্পনা তার পরিচয় তাঁর রচনাবলীতে বহুস্থানেই পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'শৈশব সংগীতে'র অন্তর্গত 'হরহৃদে কালিকা' কবিতাটি (১২৮৭ আশ্বিন) উল্লেখযোগ্য।—

"কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে ?
নাই হোথা সুখ আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের পৃথিবীর ভাবনা !"

এই ভাবনারই পরিচয় আছে বহুদিন পরে লেখা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মোহানা' ('কালীপূজা' ১৩৩৪, ৭ কার্তিক) কবিতায়—

"বিপুল তব বক্ষ 'পরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ।
ধুলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।
কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে আলো কলুষজাল।"

মহাদেব শিবকে কবি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাতে তিনি বারেবারে প্রেরণা পেয়েছেন নিজের জীবনেও। শিবকে মৃত্যুস্বরূপ মনে হলেও তিনি তাঁকে আহ্বান করেছেন আপন অন্তরে। কারণ শিবের 'প্রলয়নাচনে' যেমন জাহ্নবী

'মুক্তধারায়' তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল কবিও তেমনি তাঁর সংগীতের 'তরঙ্গদল' 'উন্মাদিনী দিশাহারা' রূপে প্লাবিত করতে চান। তাই বলেছেন—

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে ॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥

এই ভয়ংকরকে, সুন্দরকে আপন অন্তরে আহ্বান করে বলেছেন—

মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ,
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধোজাগরূক নয়নে
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

—উৎসর্গ ৪৫, 'অত চুপিচুপি'

এই শিব রবীন্দ্রসাহিত্যে কখনও মৃত্যুঞ্জয়, কখনও ভোলানাথ। আবার কোথাও বা রুদ্র, কোথাও মহাকাল। নটরাজরূপেও তিনি বারেবারে

প্রতিভাত হয়েছেন কবির মনে।[৪০] কখনও আবার শিবকে তিনি বলেছেন 'পাগল'। তাঁর উক্তিতেই তা বোঝা সহজ হবে।—

"পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর।··· যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া।"

—'বিচিত্রপ্রবন্ধ, 'পাগল' ১৩১১

'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে তিনি সুন্দরের প্রকৃত অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আপনার মধ্যে যার পূর্ণ সামঞ্জস্যবোধ আছে সেই সুন্দর। আর যে সুন্দর, 'সমস্ত জগতের সঙ্গে' তার সামঞ্জস্য। এই সৌন্দর্যই প্রেম আনে। এই প্রেম অন্যের মনে প্রেম সঞ্চার করে, এই সুন্দর অপরকে সুন্দর করে। এই সুন্দরই জগতের সত্য, তাই সে আমাদের আত্মীয়বৎ, আমাদের 'মনের মত'। কদর্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না। এই কথাগুলিই তিনি 'সৌন্দর্যের কারণ', 'সৌন্দর্য বিশ্বপ্রেমী', 'মনের মিল' 'আমরা সুন্দর', 'সুন্দর সুন্দর করে' ইত্যাদি উপপ্রবন্ধগুলির মধ্যে বলেছেন। প্রেম ও সৌন্দর্য উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে 'জ্ঞান ও প্রেম'এর মধ্যে প্রভেদও প্রদর্শন করেছেন—"জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়।" একই সূত্রে 'আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার' প্রবন্ধে বলেছেন—

"যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে, তাও ভাল করিয়া পাইবে না; যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।"

এই প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গেই Mrs. Browning-এর 'Inclusions' কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন।

'কবির কাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু মনে 'সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া' কবিদের কাজ।

"সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।"

কবিরাই এই 'স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক'। এই প্রবন্ধটিতে লেখকের ভাষা কবিত্বের উচ্চশিখরে পৌঁছেছে। আর, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক লক্ষ্মী সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র রচনাটি প্রবন্ধশেষে সংযোজিত হয়েছে, তাকে গদ্যকবিতা বললে বোধহয় ভুল হবে না। ভাষায় ও ভাবে এটি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। "যাহারা···

---

৪০ দ্রষ্টব্য—পম্পা মজুমদার: রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পৃ ১৯২–২১২

হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়" কবিকল্পনায় তারাই 'লক্ষ্মীছাড়া'। কিন্তু যিনি শ্রী ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই জগৎকে যথার্থ ঐশ্বর্যশালী করতে পারেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথের মানসী-লক্ষ্মী।

পরবর্তী '**কথাবার্তা**' প্রবন্ধটিতে একটিই আলোচ্য বিষয়—'**সন্ধ্যাবেলায়**'। এটি 'বিবিধপ্রসঙ্গে'র অন্তর্গত 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রবন্ধের মত নিছক দর্শনচিন্তা-প্রসূত রচনা নয়। পরন্তু, দুটি ব্যক্তির কথাবার্তা বলার কল্পনায় একটি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। যে প্রাকৃতিক নিয়মে এই পৃথিবী চলছে তার সম্বন্ধে একটি সুগভীর চিন্তার পরিচয় এতে আছে। এই অনন্ত জগতে পৃথিবীর কি স্থান সে সম্পর্কেও লেখক বিশেষ চিন্তা করেছেন—

"সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি— সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী-ছাড়াই বেশী— এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। দিনে··· পৃথিবীর মধ্যে ছোটখাট যাহা কিছু সমস্তই চলাফিরা করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে।"

এই যে জাগতিক উপলব্ধি তাই পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ কবিকে শ্রেষ্ঠবিজ্ঞানীর পদেও উত্তীর্ণ করেছিল। প্রকৃতির গতি, প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতির স্নেহ, শান্তি সকলই তিনি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিতে চিন্তা করেছেন ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই অভিভূত করেছে। উপনিষদের যে বাণী—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বংপূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

তা কবির মনকে চিরদিনই মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে। তাঁর রচনার বহু জায়গায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি কবিতায় ঐ কথাই প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে,
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগৎ-বিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল খেলাধুলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অম্বর-আকাশ।
আলোকেতে দেখো শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

—মানসী, 'আকাঙ্ক্ষা

গানের স্বরে কবি যখন অন্তরের 'পূজা' নিবেদন করেছেন, তখনও তাঁর মনের মধ্যে ভাষান্তরে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বের এই মহারহস্যের ভাবনা।—

এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে॥
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।

—গীতবিতান, 'জীবনমরণের-সীমানা ছাড়ায়ে'

এইভাবে যদি সন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, বহু গানের বীজ নিহিত আছে তাঁর বাল্যকালের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। সাধারণ পাঠকের ধারণা, 'ছিন্নপত্রাবলী' রবীন্দ্র সাহিত্যসাধনার প্রথম ভিত্তিভূমি। কিন্তু সে ধারণা যে সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়, তার প্রমাণ আছে তাঁর কিশোর বয়সের সাহিত্যচিন্তা ও রচনাবলীর মধ্যে।

'**আত্মা**' প্রবন্ধটিতে তিনি মানুষের হৃদয় বা অন্তরকে 'আত্মা' বলেছেন। যে ব্যক্তি 'আত্ম-বিসর্জন' করতে পারে অর্থাৎ নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে পারে, আত্মার উপর তারই অধিকার। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে লেখক বলেছেন—

"যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী।… যে পরকে দিতে পারে, নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, টাকা ত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এপার পর্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হৃদয়ের সম্পত্তি।"

স্বার্থপর লোকের যখন মৃত্যু হয় তখন সে ঢের টাকা রেখে মরে, কিন্তু 'একপয়সাও লইয়া' মরে না।

কিন্তু যে নিঃস্বার্থ, তার মধ্যেই মহত্ত্ব। "আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়।" জগতের প্রত্যেকটি পরমাণু নিজেকে রাক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করে—এ কথা ঠিকই। কিন্তু "নিজের-ক্ষুধায়-কাতর সংগ্রামপরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে"—এই অনুভূতি হৃদয়ের অনুভূতি। তাতেই আত্মার প্রকাশ। আমাদের হৃদয়ে যেসব উচ্চ আশা ও মহত্ত্ব বিরাজ করে তাদেরই মূল্য 'স্থায়ী'। যে লোকের আত্মায় এই মহত্ত্ব থাকে না, তার দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটে। কিন্তু যার হৃদয়ে মহত্ত্ব আছে, তার মৃত্যুর পরেও সেই সত্য, সেই হৃদয়ের দেবত্ব অপরের হৃদয়ে বিরাজিত থাকে।

'আত্মা' সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে লেখক সর্বপ্রথম রচনা 'আত্মগঠন'-এ প্রবন্ধ-রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা এ ক্ষেত্রে বলা দরকার।—

> "আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সজীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকূল ভাব ও শব্দগুলি নিজের চারি দিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে-সকল ভাব কোনকালেও ভাবি নাই তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ-আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এইজন্য, প্রবন্ধের মর্মস্থিত মুখ্য ভাবটি যত সজীব হয় প্রবন্ধ ততই ভাল হয়; নির্জীব ভাব আপনাকে আপনি গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এ নিমিত্ত ভাল লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নূতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।"

তারপর 'আত্মার সীমা' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "মানুষের আত্মাও এইরূপ ভাবের মত।··· আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়।"

সংক্ষেপে বলা যায়, আত্মা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে ধারণা— মৃত্যুর পর ব্যক্তিবিশেষের একটা দেহহীন অস্তিত্বমাত্র, লেখক এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই ধারণাটি পালটে দিলেন। আত্মা যে যথার্থতঃ কি তার ব্যাখ্যা করাই তাঁর এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য।

'বৈষ্ণবকবির গান' প্রবন্ধে 'সৌন্দর্য ও প্রেম' সম্পর্কে লেখকের নূতন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের একটি গানকে

অবলম্বন করে তাঁর এই চিন্তাধারার উদ্ভব, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

'সৌন্দর্য' বস্তুটি জগতের সমস্ত কিছুর উপরে এক অপরূপ প্রকাশ যেখানে আমাদের সমস্ত শ্রান্তির অবসান হয়, মনের গ্লানি দূর হয়। এই সৌন্দর্যের তীর্থেই কবি-লেখক তাঁর স্বর্গলোকের কল্পনা করেছেন—

"আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্যকল্পনার চরম তীর্থ।··· সৌন্দর্য যেন স্বর্গের জিনিস পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে সৌন্দর্যকেই পাঠাইতে হয়।"

'পৃথিবীর আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে' এই স্বর্গভূমিতেই তার বিরাম ঘটে। জ্ঞানদাসের 'মুরলী করাও উপদেশ' ইত্যাদি পদটি যেন "সৌন্দর্যচ্ছবিতে ···আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।"

'বাঁশির স্থর' উপপ্রবন্ধটিতে ঐ পদটিরই অন্তর্নিহিত অর্থ লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সৌন্দর্যস্বরূপ যিনি তাঁর হাতে সমস্ত জগৎ একটি বাঁশি। সেই অসীম সৌন্দর্য বাঁশির স্থরে বলেন "রাধে মোর" অর্থাৎ আমাদের সকলকেই যেন সর্বক্ষণ তিনি আহ্বান করছেন। কিন্তু পৃথিবীর নানা বন্ধন কাটিয়ে আমরা সর্বদাই তাতে সাড়া দিতে পারি না—

"সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।"

আবার অনেক সময় 'বিপরীত'ও দেখা যায়।··· "জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে" অর্থাৎ "জগতের সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্য"কে আহ্বান জানায়। উভয়ে যখন মিলিত হয়, তখন 'সৌন্দর্য স্বর্গ' ও 'মর্ত্য' যেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সৌন্দর্যের প্রতি চির আকর্ষণবশতঃ রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় ছেলেবেলা থেকেই সৌন্দর্য বা স্থন্দরকে নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। 'আলোচনা'র বিবিধ রচনাবলীর মধ্যেও এই বিষয়ই মুখ্য। রচনাগুলি প্রবন্ধজাতীয় হলেও তাঁর ভাষার অসাধারণত্বে তা সর্বত্রই কাব্যময় ও রমণীয় হয়ে উঠেছে।

সর্বাঙ্গীণভাবে বলা যায়, 'আলোচনা'তে কবির কতগুলি গভীর চিন্তার প্রথম উদ্ভব। পরবর্তী সাহিত্যে সেগুলিই গভীরতর ও বিস্তৃততর রূপ নিয়েছে। তাই রবীন্দ্রপ্রবন্ধাবলীর আলোচনায় 'আলোচনা'র স্থান কোনো দিক্‌ থেকেই নগণ্য নয়।

চিঠিপত্র (১৮৮৭ জুলাই ২)

বালক পত্রিকায় (১২৯২) যখন 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস, 'রসিকতার ফলাফল' প্রভৃতি ব্যঙ্গনাট্যগুলি ও 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই ষষ্ঠীচরণ ও নবীনকিশোরের নামে লেখা 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' পত্রধারা প্রকাশিত হয়। এই পত্রধারা বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার এক নূতন আদর্শ স্থাপন করল। সনাতন আদর্শ ও সংস্কার এবং নূতন যুগের দৃষ্টি, উভয় দিক্ সম্বন্ধেই লেখকের চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে এই লেখাগুলির মধ্যে। কিন্তু লেখক নিজে রয়েছেন পটভূমির অন্তরালে। কল্পিত ঠাকুরদা ও নাতির বাদানুবাদ ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে লেখক তখনকার দুই বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। ষষ্ঠীচরণ প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির সমর্থনে নাতির কাছে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে পত্র লিখছেন, তর্ক করছেন। অপরপক্ষে, নবীনকিশোর বর্তমান কালের ধর্ম কী তা পিতামহকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে. লেখক যেখানে প্রাচীনের পক্ষ অবলম্বন করে লিখেছেন, সেগুলি পড়লে মনে হয়, সেই যুক্তিই চিরন্তন সত্য, তার বিরুদ্ধে কিছু হতেই পারে না। আবার নবীনের পক্ষে তিনি সম্পূর্ণই নূতন।

প্রথম পত্রেই ষষ্ঠীচরণ নবীনকিশোরের উদ্দেশ্যে বলেছেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে পত্র লেখার সময় সম্বোধনে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। মনে ভক্তি না থাকলেও 'প্রণামপুরঃসর' চিঠি লেখা উচিত। কারণ তা দেখতে শোভনীয় এবং এর থেকেই ভক্তির উদ্রেকও হয়। বিশেষতঃ, আধুনিক কালে নবীনরা চিঠি লিখতে তো 'মাই ডিয়ার' লেখে। জগতের লোককে 'প্রিয়' করে যদি তোলা যায়, তবে প্রাচীন প্রথাগুলিও পত্র লেখার ক্ষেত্রে মেনে চলাই সংগত। আর নামকরণের ব্যাপারেও লজ্জার বিষয় কিছুই নেই। কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিনামের যোগ কম, যোগ হচ্ছে তার কর্মের সঙ্গে।—

"আমাদের প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো নাম শুনিতে নিতান্ত মধুর নয়— যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু ওই সকল নাম অক্ষয়-বটের মতো আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে। আমাদের আজকালকার উপন্যাসের ললিত নলিনমোহন প্রভৃতি কত মিঠি মিঠি নাম বাহির হইতেছে, কিন্তু এখনকার পাঠক-পিপীলিকারা এই মিষ্ট নামগুলিকে দুই দণ্ডেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে— সকালের নাম বিকালে টিকে না।"

উত্তরে নবীনকিশোর পিতামহকে জানায়—

"যে লোক যে কালে জন্মগ্রহণ করে সে কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে কালের উপযোগী কাজ সে ভালো করিয়া করিতে পারে না।··· সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীনকালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে।"

এই প্রসঙ্গেই সে আরও বলেছে—

"পূর্বে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ভাবের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। ···এখন মতের অনুরোধে অনেকে পিতামাতাকে ত্যাগ করিতেছেন, এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে··· ।"

নবীনকিশোরের বক্তব্যের শেষাংশের সূত্র ধরে তৃতীয় পত্রে ষষ্ঠীচরণ আবার বলেছেন, প্রাচীনকালে ব্যক্তি ও ভাব উভয়ের প্রতিই আমাদের ভক্তি-প্রীতি ছিল, শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রতি নয়।—

"আমাদের ব্রাহ্মণেরা কি সমাজের হিতার্থ সমাজ ত্যাগ করেন নাই? রাজারা কি ধর্মের জন্য বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করেন নাই?··· ঋষিরা কি জ্ঞানের জন্য, অমরতার জন্য, সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেন নাই? পিতৃসত্য-পালনের জন্য রামচন্দ্র যৌবরাজ্যত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য হরিশচন্দ্র স্বর্গত্যাগ, পরহিতের জন্য দধীচি দেহত্যাগ করেন নাই?··· কুকুর যেরূপ অন্ধ আসক্তিতে মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সীতা কি সেইভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, না মহৎ ভাবের পশ্চাতে মনুষ্য যেরূপ অকাতরে বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া যায় সীতা সেইরূপ ভাবে গিয়াছিলেন? তবে কি ব্যক্তির প্রতি ভক্তি একই সময়ে থাকিতে পারে না?···'পারে না' বলিয়া এমন একটি রত্ন অবহেলায় হারাইয়ো না।"

এইভাবে উভয় পক্ষের বাদানুবাদ ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে। দাদামশায় বারেবারেই প্রাচীনকালের শ্রদ্ধা, ভক্তি, মহত্ত্ব, ধর্ম ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের কালকে সমর্থন করতে চেয়েছেন। তাই মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনীসকল, এমন কি, প্রাচীন গ্রীক ইলিয়ড-ওডিসি মহাকাব্যগুলি থেকেও

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। নবীনকিশোর সেইসব দৃষ্টান্ত শিরোধার্য করেও নিজকালের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে নি।

ষষ্ঠ পত্র থেকে আলোচনার বিষয় একটু পরিবর্তিত হয়েছে। নবীনকিশোর বাংলার বাইরে ভ্রমণে গিয়ে বাংলার মহত্ত্ব অনুভব করেছে।—

"বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ— প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।"

এই প্রসঙ্গে সে চৈতন্যলীলার মহত্ত্ব অনুভব করেছে এবং সে যুগের স্বাধীনতাকামী যুবকের প্রতিনিধি হিসেবে বলেছে, "প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা।" বৃদ্ধ পিতামহ অবশ্য 'উগ্র সভ্যতানল' থেকে পৌত্রকে নিরস্ত করে স্নেহশীল পিতামাতার আশ্রয়ে সুখের কুটীরে স্থাপন করতে চেয়েছেন। নাতিটি উগ্রপন্থীর মতো জবাব দিয়ে বলেছে—

"হয় মরিব, নয় বাঁচিব, এই কথাই ভালো। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই।··· আমার যেটুকু বল, যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম—মরিতে হয় তো চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।"

এই নবীনকিশোরের শেষ পত্র। প্রত্যুত্তরে ষষ্ঠীচরণ তাঁর শেষ পত্রে জানিয়েছেন নব অভ্যুদয়কে তিনি সাদরেই আমন্ত্রণ করেন। তবে পশ্চাৎকেও অবহেলা করা উচিত নয়। তাই নাতিকে বলেছেন—

"সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও, কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখো।"

এইভাবে উভয়ের মত-বিনিময়ের মাধ্যমে লেখক প্রাচীন কাল ও আধুনিক কাল উভয়েরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে রূপদান করতে চেয়েছেন। সে যুগে প্রাচীন-পন্থীরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে উগ্রপন্থী এবং নবীনেরা সংস্কারপন্থী বলে সমালোচনা করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতপক্ষে মধ্যপন্থী, যা উগ্রতা নয়, ভীরুতাও নয়,— যা সামঞ্জস্যের পথ, সুন্দরের পথ, সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলবার পথ, সেই পথেরই যাত্রী ছিলেন— তারই পরিবাহক এই পত্রাবলী। উভয়পক্ষের যুক্তিগুলিকেই তিনি সুষ্ঠুভাবে, বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই কোনো মতকে চরম বলে প্রতিষ্ঠিত করে অন্যকে আঘাত দিতে চান নি। সেইজন্যই 'চিঠিপত্রে'র মধ্যে ষষ্ঠীচরণ ও নবীনকিশোর

অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান, প্রবীণ ও নবীনের আপাতবিরুদ্ধ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাবার একটা মৌলিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের মতই এই গ্রন্থেও ষষ্ঠীচরণ ও নবীনকিশোরের আলোচনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্রের তর্কবিতর্ক ও মন্তব্যাদিরই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। একজন প্রবীণ ও অপরজন নবীনের প্রতিনিধি।

সমালোচনা (১৮৮৮ মার্চ ২৬)

এই গ্রন্থের প্রায় সবগুলি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ১৯ থেকে ২৩ বছর বয়সের রচনা। কেবল 'সত্যের অংশ' প্রবন্ধটি পরে রচিত হয়। প্রবন্ধগুলির কাল-ক্রমিক বিবরণ বিবৃত হয়েছে 'পরিশেষ' বিভাগে। এক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ অবান্তর। গ্রন্থটি লেখক তাঁর পূজনীয়া মেজ বৌঠাকুরানী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে উৎসর্গ করেন।

এই গ্রন্থের বেশির ভাগ প্রবন্ধই সাহিত্য-সমালোচনামূলক এবং অনেক-ক্ষেত্রেই সেগুলি অপর কোনো লেখকের প্রবন্ধ বিষয়ে বিতর্ক। বর্তমানে গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাবে এবং বিষয়-বস্তু অনুযায়ী মোটামুটি শ্রেণীগতভাবে উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

আমাদের জীবন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই 'বর্তমানের গায়ে অতীতকালের একটা নামসই থাকা নিতান্তই আবশ্যক।' অতীতকে বাদ দিলে আমাদের জীবনের স্রোতধারা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীবনে "একটি নিমেষমাত্র লইয়া কিসের সুখ।··· আমাদের জীবনের জন্মশিখর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্যন্ত যদি যোগ থাকে তবে তাহার কত বল!" তাই লেখক তাঁর জীবনে ও লেখায় অতীত কালের চিহ্নগুলিকে 'যত্ন' করে রাখতে চান। যাঁরা অতীতকে অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করতে চান, তাঁদেরই সম্বন্ধে সমালোচনা করে তিনি এই কথাগুলি বললেন 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১২৯০ শ্রাবণ)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের পশ্চাতে ব্রাহ্মসমাজের একটি ইতিহাস আছে বলে মনে করেছেন।[৪১]

জীবনে যাঁরা সকল বিষয়কেই তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, কৈফিয়তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কিশোর লেখক লিখলেন, 'তার্কিক' প্রবন্ধ (১২৯০ আশ্বিন)। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স অল্প, তাই তাঁর রচিত

৪১ র-জী, পৃ ১৮১-৮২

সাহিত্যের সমালোচনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ সমালোচক, যাঁরা প্রায় প্রতিপদেই তাঁর রচনার খুঁত ধরতে ব্যস্ত থাকতেন। মনে হয়, এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলিতে লেখক তাঁদের উদ্দেশ্যেই নিজের মত ব্যক্ত করলেন। তাই বলেছেন—

"তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকিলে প্রাণের উদারতা সংকীর্ণ হইতে থাকে। আমি কাল্পনিক লোক, আমার জগৎ লাখেরাজ জমি··· জগতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারি, যাহা ইচ্ছা উপভোগ করিতে পারি।··· আমি যখন অসীমের রাজ্যে আছি··· তুমি আমাকে হাজার চোখ রাঙাও না কেন আমি ডরাই না।··· আমি যা বলি তাহা প্রাণের ভিতর হইতে বলি, যুক্তি অযুক্তি খতাইয়া হিসাবপত্র করিয়া বলি না।"

এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও বললেন—

"যে পাড়ায় ক্রোশ-তিনেকের মধ্যে তার্কিক লোকের গন্ধ আছে, সেখানে বোধ করি কোন ভাবুক লোক তিষ্ঠিতে পারে না।"

পরিশেষে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, সাহিত্যে 'প্রতিকূল সমালোচনা' করা উচিত নয়।

এই জাতীয় আর একটি প্রবন্ধ হল 'বিজ্ঞতা' (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। যেসব তথাকথিত 'বিজ্ঞ' লোক সব কাজের মধ্যেই 'যদি', 'কিন্তু', 'কদাচ', 'কিঞ্চিৎ' প্রভৃতি কথাগুলো ব্যবহার করে তার বিচার করতে চান, তাঁদের সম্বন্ধে লেখক তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। লেখক নিজে এই ধরনের পরিহাসে, বিদ্রূপে সেদিন অনেক সময়ই জর্জরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই বিদ্রূপ-ব্যঙ্গে বিরত হবার লোক ছিলেন না। তাই যেসব 'বিজ্ঞ'—

"সংশয় করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া··· সৎকার্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাঁহাদের হাস্যের বিদ্যুতাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন"

তাঁদের উপহাসকে তুচ্ছ করে দিয়ে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন—

"আইস, যাহাদের হৃদয় আছে, আমরা প্রকৃতিমাতার উৎসবালয়ে যাই। সেখানে জীবনের অভিনয় হইতেছে, সেখানে সৌন্দর্যের উৎস উৎসারিত হইতেছে, সেখানে মাপাজোকা কার্পণ্য নাই, সেখানে বাঁকাচোরা অনুদারতা নাই— সেখানে দুইমুখা প্রাণ নাই। এ-সকল বিজ্ঞলোকদের সহিত আমাদের পোষাইবে না— আমরা ইহাদের চিনিতে পারিব না, ইহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারিব না— ইহারা উপদেশ দিবার সময় বড়

বড় নীতিকথা বলে, কিন্তু ইহাদের মনে পাপ আছে, ইহাদের সর্বাঙ্গে সংক্রামক রোগ!”

এই উক্তি থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রচনার আদর্শটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির আদর্শটি আরও বিশেষভাবে পরিষ্কার করে বলেছেন ‘সত্যের অংশ’ প্রবন্ধে। লেখক বা চিত্রকর উভয়েরই শিল্পসৃষ্টির সময়ে নজর রাখা দরকার “যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ তাহাই বড় করিয়া আঁক”, আনুষঙ্গিকটাকে তার অংশ হিসাবেই দেখানো উচিত। কারণ—

“যাহারা একেবারে সত্যের চারিদিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোন দিকই ভাল করিয়া দেখাইতে পারে না।”

প্রকৃতপক্ষে, এইসব ছোট প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির কয়েকটি আদর্শ গঠন করতে চেয়েছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজের মানসিকতারও একটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন।

‘তার্কিক’, ‘বিজ্ঞতা’ প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ‘মানসী’র ‘নিন্দুকের প্রতি নিবেদন’, ‘কবির প্রতি নিবেদন’ প্রভৃতি কবিতাতেও। কবিতাগুলিতে তিনি বলেছেন—

যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দেব ঠাঁই—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই?
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)—
কেন তাহে তব রোষ?…
তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন—
নয়নে কঠোর হাসি।
দূর হতে যেন ফুঁষিছে সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি— …
যদি ভুল হয় ক’দিনের ভুল!
দু দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?

—‘নিন্দুকের প্রতি নিবেদন’ ১৮৮৮

এইসব ভালোমন্দ বিচার ছেড়ে 'কবি'র প্রতি তিনি নিবেদন করে বলেছেন—

মন্দ কহিছে কেহ ব'সে
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

—'কবির প্রতি নিবেদন' ১৮৮৮

ঐ কবিতাতেই কবিকে জগতের নিয়ম দেখিয়ে তিনি ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন—

দেখো হোথা নূতন জগৎ—
ওই কারা আত্মহারাবৎ
যশ অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।…
হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল-মাঝে?

'ভৈরবীগান' (১৮৮৮) কবিতাটির মধ্যেও এই কথাই ভিন্ন সুরে বলা হয়েছে। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে গিয়ে যাঁরা পিছুটানে ব্যথিত হন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।

যারা আত্মচিন্তায় বিভোর, যারা—

'সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দোলাবে'

তাদের কবি ঘৃণা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ—

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবনকাল পাষাণ কঠিন
সরণে।

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।

এইসব চিন্তা ও আদর্শের পরিচয় পরিণত রবীন্দ্রসাহিত্যে বারেবারেই পাওয়া যায়। কিন্তু 'মানসী'-যুগের পূর্বেই যে তার স্পষ্ট ও পুষ্ট অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তারই দৃষ্টান্ত রয়েছে 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্গত এইসব প্রবন্ধে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন—

"এই সব সমালোচনার মধ্যে না আছে আন্তরিকতা, না আছে গাম্ভীর্য, না আছে কঠোর যুক্তি; নিতান্তই রঙের বাক্স লইয়া বালকের খেলার মতন, এই রচনাগুলিতেও লেখনীর রেখা দিয়া অস্পষ্ট বাক্য ও লঘু চিন্তার খেলামাত্র।"

—র-জী, পৃ ১৮২

কিন্তু মনে হয়, এই ধরনের মন্তব্য করা তখনই সহজ যখন সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তাধারা আমাদের মনে একটা স্পষ্ট ছাপ অঙ্কন করে। অর্থাৎ পরিণত রবীন্দ্রচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বালকের চিন্তাকে লঘু বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যেদিন তিনি নিজেও জানেন না, তাঁর ভবিষ্যৎ কী এবং তাঁর বুদ্ধি, চিন্তা ও যুক্তি কোন্ পথে যাবে, সেদিন যখন তিনি এই আলোচনাগুলি করেছেন, তাঁর মনের নানা ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন, তখন সুবুদ্ধি-পাঠকের পক্ষে সেগুলির গুরুত্ব কতখানি হতে পারে, তা একবার বিচার করে দেখা অবশ্যকর্তব্য।

বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ জাতীয় চিন্তাশক্তির বলেই সেদিন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সে যুগের প্রবীণ সাহিত্যিকদের সমালোচনা করতে বা তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার সাহস রাখতেন। তার প্রমাণ আছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং আজও সেগুলির গৌরব কিছুমাত্র ম্লান হয়ে যায় নি।

২

এই ধরনের আর-একগুচ্ছ প্রবন্ধের মধ্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করে লেখা 'নীরবকবি ও অশিক্ষিত কবি', 'একটি পুরাতন কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে অন্যত্র প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। পুনরুল্লেখ অবাঞ্ছনীয়। শুধু মধু-বঙ্কিম নন, কোথায় বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, বসন্তরায় আর কোথায় ইংরেজ কবি Marlow, Tennyson কেউই তাঁর সমালোচনা থেকে মুক্তি পান নি। বিভিন্ন

বৈষ্ণব কবি ও তাঁদের কাব্য-সমালোচনা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। Marlowর একটি কবিতাংশ নিয়ে সমালোচনা করেছেন 'নীরবকবি ও অশিক্ষিত কবি' প্রবন্ধটিতে। এবার তিনি মাত্র বিশ বৎসর বয়সে কবি টেনিসন্-রচিত 'De Profundis' নামক এক দীর্ঘ কবিতার সমালোচনা লিখতে প্রবৃত্ত হলেন (১২৮৮ আশ্বিন)। টেনিসন্ ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর প্রথম পুত্রের জন্মের পর তিনি উক্ত কবিতাটি লেখেন (১৮৫২)। কিন্তু নিতান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে লেখা বলে কবিতাটি প্রকাশে তাঁর সংকোচ ছিল। অবশেষে ১৮৮০ সালে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'De Profundis— লাটিন বাইবেলের ১৩০ সংখ্যক সামগীতের প্রথম শব্দ। কবিতাটি সে যুগের সমালোচকদের নিকট সমাদর লাভ করে নি। এমনকি 'Puncle' নামক পত্রে 'De-Rotundis' নামে parody পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্য, তার সুর আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ কবির অন্তরকে ঝংকৃত করে তুলেছিল। তাঁর সে অনুভূতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন লেখক বলেছেন, "কবিতাটি যে সমাদৃত হয় নাই, তাহার একটা কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত গভীর, গুরুতর।" সদ্যোজাত শিশুর—

> "কচিমুখ, মিষ্ট হাসি, আধ আধ হাসি, আধ আধ কথা ইহার বিষয় নহে··· কচিভাব ব্যতীত আর একটি ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সকলের চোখে পড়ে না, কিন্তু তাহা ভাবুক কবির চক্ষে পড়ে। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে একটি অপরিসীম মহান্ ভাব, অপরিমেয় রহস্য আবদ্ধ আছে, টেনিসন্ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন— সাধারণ পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না অথবা এই অচেনা ভাব হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না।"

টেনিসনের সেই 'অচেনা ভাব', সেই গভীর দার্শনিকতার ব্যাখ্যা করার স্থান এটি নয়। তবে লেখক তাঁর অনুভূতির অপরিসীম গভীরতার সাহায্যে এই ভাব শুধু আয়ত্তই করেছিলেন তা নয়, তা ভাষার বলিষ্ঠতা এবং ব্যাখ্যা করার অদ্ভুত কৌশলে পাঠকের কাছে কত সহজভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। তাই বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ভাবুকদের সম্বন্ধে এ কথা বলতে দ্বিধা করেন নি যে—

> "বস্তুগত মহান্ ভাব পর্যন্তই বোধ করি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত 'Paradise Lost' এর অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।"

কাব্যবিচারের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মনে কাব্য-জিজ্ঞাসাও জাগ্রত হতে থাকে। এই সময়েই তিনি সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি লিখছিলেন। তাই কবি হিসাবে কাব্যের অন্তর্নিহিত রহস্যও তাঁর মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এই জিজ্ঞাসা-বোধ থেকেই তিনি 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (১২৮৮ বৈশাখ), 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' (১২৮৮ শ্রাবণ) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি লেখেন।

নিজের কাব্যরীতিতে কবি নূতনের যে প্রেরণা পেয়েছেন, তার সঙ্গে প্রাচীনের অনেক পার্থক্য। তিনি বলেছেন, কিছু কবিতা বস্তুগত আর কিছু কিছু ভাবগত, যেগুলির বিচরণ হৃদয়রাজ্যে। তাঁর ভাষায় বলা যায়—

> "ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।"

এই দুই জাতের কবিতার মধ্যে কোন্‌টা ভালো তার বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর-এক জগতে লইয়া যায়।"

সেইজন্যই জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য এত উপভোগ্য, সেইজন্যই বসন্ত ঋতু মনকে মাতাল করে। কবিতারচনার ক্ষেত্রে বস্তুর থেকে যত দূরে থাকা যায়, তত তা বেশি মনোগ্রাহী হয়।

> "শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি, ততই ত ভাল।"

একদিকে 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' সম্বন্ধে চিন্তা, অপরদিকে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল কবিতার বিষয়বস্তু কি, এই বিষয়ের পরিবর্তন হয় কি না এবং কবির আন্তরিক অনুভূতির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগ কোথায়? এই নিয়ে লিখলেন 'কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন'। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই বলেছেন, মহাকাব্য রচনার কাল গত হয়েছে। এই চিন্তা তাঁর প্রথম দেখা দিয়েছিল 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধেও তিনি মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্য ও খণ্ডকাব্যের প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যুগের হাওয়ায় কাব্যের রূপও বদলায় সে সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখনকার সভ্যজগতের সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত বা ইলিয়ড-ওডিসি-যুগের অনেক তফাত।—

> "এখন শ্রমবিভাগের কাল। সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রমবিভাগ।

কবিতাতেও শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইয়াছে।... যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।"

এই কথা বলতে গিয়ে সৌরজগৎ থেকে যেভাবে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল তারই সঙ্গে সুন্দরভাবে উপমিত করেছেন মহাকাব্যের থেকে খণ্ডকাব্য ও গীতি-কাব্যের উৎপত্তিকে। অর্থাৎ মহাকাব্যের মধ্যে তারা একসময়ে একাঙ্গীভূত হয়ে ছিল; পরে তাদের পরিধি ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করে এবং মহাকাব্য থেকে তারা পৃথক্ হয়ে পড়ে।

এই যে অত্যন্ত যোগ্য উদাহরণের সাহায্যে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা তথা কঠিন ভাবকে ভাষার প্রাঞ্জলতায় সহজ ও সরস করে বুঝিয়ে দেওয়া—এ বৈশিষ্ট্য বোধকরি আজকের মত সেদিনও একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বর্তমান ছিল। প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও ভঙ্গিগত বিশেষত্বটিও পাঠককে মুগ্ধ করে। কাব্যবিচার করতে করতে কবিতার সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক সম্বন্ধেও কবির মনে নানা প্রশ্ন জাগতে থাকে। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধটিও তৎসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। সংগীত ও কবিতা সম্বন্ধে কবির মনে এই যে নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল তার মূলে ছিল হার্বার্ট স্পেন্সরের মতামতের প্রেরণা।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাউলের গান' (১২৯০ বৈশাখ) প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে উদ্ভূত আধুনিক সাহিত্যের যেমন বিচারের প্রয়োজন আছে, তেমনি খাঁটি বাঙালি হৃদয়ে যে গীতরস অনাবিল ধারায় যুগযুগান্ত ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তারও সুবিচার হওয়া দরকার। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসতৃপ্ত বাঙালীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সর্বপ্রথম দেশীয় কাব্যের সৌন্দর্য তুলে ধরলেন। 'বাউলের গান' নামে সামান্য একটি গীত-সংগ্রহের সমালোচনা সূত্রে তিনি তাঁর এই বক্তব্য স্পষ্ট করে বলেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি যা বলেছেন, তা যেন তাঁর ব্যক্তিজীবনেরই প্রতিধ্বনি—

"এমন কোনো কোনো কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না।"

অবশেষে একদিন কবি নিজের 'মর্মস্থানটি' আবিষ্কার করে আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে এ কথা যেমন সত্য, জাতির জীবনেও তা তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে, বাঙালীর যা প্রাণের ভাষা, যা হৃদয়ের আবেগ তা আমরা যথার্থভাবে জানতে পারি না। ইংরেজি বা সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে যে ভাষা নির্মাণ হয়, তা হয় নির্জীব ও কৃত্রিম। তাই আমাদের দেশীয় ভাবের ও ভাষার কবিতাসংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক কবিরা যেসব প্রেমের কবিতা, বিরহের কবিতা লেখেন, তার মধ্যে আন্তরিকতা নেই। এই কারণেই লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রয়োজন। 'ব্রহ্ম-সংগীত' ও 'আধুনিক ইংরাজিওয়ালাদিগের রচনাকে' এর মধ্যে স্থান দেওয়ায় তিনি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ 'আমরা ত ভাল গান শুনিবার জন্য এ বই কিনিতে চাই না। অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনিতে চাই।... প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় ...সেই প্রসন্নতা লাভ করে', এই 'অশিক্ষিত' হৃদয়ের মধ্যেও কত গভীর কথা, কত প্রেমের কথা লুকানো থাকে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কয়টি বাউল গীতির উদ্‌ধৃতিও দিয়েছেন এবং দেশীসাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে চৈতন্যদেবকে একটি শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন।

এই গ্রন্থে সামাজিক বিষয়েও দুইটি প্রবন্ধে আলোচনা করতে দেখা যায়। এক, 'একচোখো সংস্কার' (১২৮৮ পৌষ) ও দুই, 'সমস্যা' (১২৯১ ফাল্গুন)। একচোখো সংস্কারে বললেন, দুইদল লোক সমাজ সংস্কার করে। একদল লোকা-চারকে সমূলে উৎপাটিত করতে চান। অপরদল অর্ধপন্থী, তাঁরা সংস্কারকে সম্পূর্ণ ছাড়তেও পারেন না, আবার পুরোপুরি মানতেও পারেন না। তা ছাড়া আর একদল আছেন যাঁরা সর্বসংস্কারের বিরোধী। লেখক এঁদের কাউকেই সমর্থন করেন না। কারণ, একচোখামির দ্বারা সংস্কার সাধন সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর মতে এঁদের মতামতের সমন্বয় সাধনের দ্বারা যথার্থ সংস্কার করা দরকার। 'রক্ষণশীল' দল 'উৎপাটনশীলে'র সাহায্য করলে তবেই সমাজ একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করবে। এই প্রবন্ধটির, বিশেষতঃ এর শেষ অংশটির মধ্যে যেন তাঁর 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' ইত্যাদি নাটকগুলির 'প্রথম চরণধ্বনি' শুনতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'সমস্যা'তে তিনি সংস্কারকদের মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামির অভিযোগ করে সামাজিক সমস্যাগুলিকে সকল দিক্ থেকে বিচার করলেন। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ কখনই বিশেষ একটি মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। সর্বদাই

তিনি সমন্বয়ের পক্ষপাতী— সে সাহিত্যেই হোক, আর, বাস্তবজীবনেই হোক। সেই দৃষ্টি নিয়েই এই প্রবন্ধটিতে বলেছেন—

"শান্ত সংযতভাবে সমাজ-সংস্কারের প্রতি মন দাও। অথচ বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গুদেহ জড়াইও না।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি রচনার পর তাকেই পূর্ণতা দেবার জন্য 'সমস্যা' প্রবন্ধটি লেখেন। কারণ, রামমোহন প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের সমর্থন করলেও কবি কতগুলি ব্যাপারে মনেপ্রাণে ছিলেন হিন্দু। তাই তিনি উগ্রপন্থী নব্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে সমর্থন করলেন না। বরঞ্চ, আদিব্রাহ্মসমাজের মতবাদকে আদর্শ হিন্দুত্ব মনে করে তারই সমর্থন করেন। একচোখো সংস্কারেও আদিব্রাহ্মসমাজেরই সমর্থন পাওয়া যায়।[৪২]

এই প্রবন্ধগুলি সমাজ সম্বন্ধে লেখকের সাময়িক চিন্তাধারার বুদ্‌বুদমাত্র মনে হলেও, পরবর্তী জীবনে যে একেবারে বিফল হয় নি, তার প্রমাণ তাঁর বহু রচনাতেই আছে।

ছিন্নপত্র

'ছিন্নপত্র' (১৩১৯/১৯১২) নামে সুপরিচিত গ্রন্থটির অন্তর্গত পত্রগুলির অধিকাংশই 'সাধনা' পত্রিকার যুগে রচিত (১২৯৮-১৩০২)। 'সাধনা'র যুগকে রবীন্দ্রসাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। তাঁর বহু ছোটগল্প, সোনার তরী, চিত্রা, বিদায় অভিশাপ, গোড়ায় গলদ, ব্যঙ্গকৌতুক, পঞ্চভূতের ডায়ারি, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, বিভিন্ন বিষয়ে লেখা অনেক প্রবন্ধ, বিবিধ-প্রসঙ্গকথা, নানা শ্রেণীর গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতি রচনাসম্ভারে এই পর্বটি পরিপূর্ণ। এইসব রচনার সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় ঘটেছিল গ্রন্থ ও পত্রিকা মারফত। কিন্তু এমন রচনাও ছিল, যা একান্তভাবেই কবির মানসজীবনের অনুভূতিপ্রসূত ও ব্যক্তিগত আবেগের কথা। তারই আকর-গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র' তথা 'ছিন্নপত্রাবলী'।

কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আত্মজীবনের কথা বলেছেন 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ (১২৯৩) পর্যন্ত। আর সেই ধারাকেই যেন

---

৪২ র-জী, পৃ ১৩৮, ২০৮

'চিত্রা' (১৩০২) পর্যন্ত প্রবাহিত করে নিয়ে গেছেন ছিন্নপত্রের মাধ্যমে। এই গ্রন্থে কবির শিল্পী ও সমালোচক মনের ছবিটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ১৩৪৫ সালে 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে'—তিনটি গ্রন্থ একত্রে 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির যে ভূমিকা লিখে দেন, তাতে 'ছিন্নপত্রে'র যথার্থ পরিচয়টি স্পষ্ট হয়েছে।—

> "পত্রধারার 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেইসকল গ্রাম্য-দৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল। তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চারদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউডস্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা সয় না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।"

মনের এই যে সহজভাব সহজরূপে প্রকাশিত হল, তা কবির আত্মকথারই রূপান্তর। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, জীবনস্মৃতির পরিশিষ্ট হিসাবে তাকে গণ্য করা যায়। আঠারো বৎসরে লেখা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' থেকে সত্তর বৎসরে লেখা 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত যে বিরাট্ পত্রসাহিত্য, তা লেখকের ডায়ারি বা রোজনাম্চা জাতীয়। এগুলি নামে চিঠি বা পত্র হলেও অনেকসময়ই পত্রোদ্দীষ্ট ব্যক্তি সেখানে গৌণ। লেখক যেন সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে এবং সদ্য সদ্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সেগুলি লিখেছেন।

কিন্তু ছিন্নপত্রের পত্রধারা রচনাকালে প্রকাশনের জন্য কবির মনে কোনো তাড়া বা ইচ্ছা ছিল না। কেবল মনের কথা ব্যক্ত করার আনন্দেই তিনি লিখেছেন এবং অত্যন্ত প্রিয় ভাইঝি বা অতিপ্রিয়জনের কাছেই তা ব্যক্ত হয়েছে। তাই ছিন্নপত্রের রচনাধারা একেবারে অন্তরের ভাষায় তথা মুখের চলিত ভাষায় লেখা। তাতে কোনো কৃত্রিমতা স্থান পায় নি। কিন্তু মহৎ ব্যক্তির মনের ভাব সাধারণ মানুষের মত নয়। তাই অতি পরিচিত চলতি ভাষায় লেখা অতি সামান্য চিন্তাও তাঁর লেখনীর স্পর্শে হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

বাংলাসাহিত্যে এ এক অভিনব সৃষ্টি। এইজন্য ছিন্নপত্র সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা বাংলাসাহিত্যে পৃথক্ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কবি নিজেও এই পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।"

—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২০০, শিলাইদহ (১৮৯৫)

"সেইজন্য বহুবার পাঠ করিলেও ছিন্নপত্র ম্লান হয় না। ইহার মধ্যে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনযৌবনের, পরিচ্ছন্ন দেহমনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা ও অনুভাব কিভাবে ধীরে ধীরে নানা বর্ণে, শতদলের কোরকের ন্যায় প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহার সন্ধান পাই।"

—র-জী, পৃ ৪৩৮

ছিন্নপত্রে ইন্দিরাদেবীকে লেখা পত্রাবলী থেকেই আমরা কবিমানসের একটি বৃহৎ অংশের পরিচয় পাই। কিন্তু ইন্দিরাদেবী ছাড়াও তিনি প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে কিছু কিছু পত্র লেখেন 'মানসী'র যুগে। তবে প্রমথ চৌধুরী বা প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রগুলি ছিন্নপত্র সম্পাদনকালে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ওগুলি পাওয়া গেলে মানসী থেকে চিত্রা পর্যন্ত কবির একটা অবিচ্ছিন্ন জীবনভাষ্য পাওয়া যেত।

মানসীর পরবর্তী যুগ বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। মানসী-পূর্ব যুগটাই এই আলোচনার পরিধিভুক্ত। প্রিয়নাথ সেন বা প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা পত্রগুলি পেলে ছিন্নপত্রের লেখককে আমরা প্রথম থেকে জানতে পারতাম। ইন্দিরাদেবীর কাছে যা লিখেছেন তার সূচনাটিও স্পষ্টরূপে জানা যেত। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, সবই হারিয়ে যায় নি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট লিখিত পত্রগুলি পাওয়া গেছে এবং ছিন্নপত্রের প্রথমাংশে সেই আটটি পত্র প্রকাশিতও হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান গ্রন্থে ঐ আটটি পত্রই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং এর থেকেই উত্তরকালীন পত্রগুলি সম্বন্ধেও ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হতে পারে।

শ্রীশবাবুকে লেখা মূল পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। মূল পাণ্ডুলিপিতে চিঠি লেখার কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই। নানা পরোক্ষ প্রমাণ থেকে তারিখগুলি আন্দাজ করা হয়েছে।[৪৩]

৪৩ দ্রষ্টব্য—ছিন্নপত্র : গ্রন্থপরিচয়

২

প্রথম পত্রটিতেই সমুদ্রের একটি ছোট্ট বর্ণনার মধ্যে সমুদ্রের মতই কবিমনের বিস্তার ও গভীরতা পরিস্ফুট হয়েছে। সমুদ্র জিনিসটা কত ভয়ঙ্কর, তবু সে একটা জায়গায় এসে আপনাকে রুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে; মানুষের কাছে তার পরাজয়। এ প্রসঙ্গে ইংরেজি ইতিহাসের উল্লেখ করে বলেছেন—

> "মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল—তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃদ্ধ সমুদ্র তার শুভ্র ফেনা নিয়ে King Lear-এর মতো ঝড়ে ঝঞ্ঝায় অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করছে।"

বিশাল সমুদ্রের সৌন্দর্য ও রহস্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত সাহিত্যে বারেবারে নানা কথা বলেছেন। এই পত্রটির প্রায় সমকালেই লেখা 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্গত একটি কবিতায় কবিমনের ঐ একই ভাবনার অভিব্যক্তি দেখি।—

কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে,
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।
অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।

—'সমুদ্র'

কিছুকাল পরে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতে (১২৯৯ চৈত্র) সমুদ্রকে সম্বোধন করে কবি প্রায় একই ভাবের কথা বলেছেন—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; ···
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া।

এই সমুদ্রকে কবি 'জননী' বলে সম্বোধন করে বলেছেন—

"হে আদিজননী, সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ;

এ কল্পনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে জাগ্রত হওয়াই সম্ভব।

অপর একটি পত্রে (তৃতীয় পত্র) দেখি, তিনি সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত রচনা ও আপনার ভাবে আপনার তন্ময় হবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন এর প্রেরণা জুগিয়েছেন শ্রীশচন্দ্র। ইংরেজরা যেমন 'বর্মায় চীনে' আফিম ঢুকিয়েছিল তেমনি—

"আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোটো কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন, আমাকে আমারই প্রভাতসংগীত সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলতেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ করে বসে থাকতুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ করতুম··· আফিমের নেশা একেই বলে।"

এই ভাবটি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত শর্মার উক্তিগুলির অনুরূপ।

এই সময়েই তাঁর সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার সমাপ্তি হয়েছে (১২৯২ চৈত্র)। কবির মাথার বোঝা গেছে নেমে—

"দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চার দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।" এবার কবি ক্রমে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছেন। "নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা"—সবকিছুর জন্যই কবির মন ব্যাকুল হয়েছে। পরবর্তী পত্রগুলি ও ছোট-গল্পে এই সুরই প্রকটিত। আর, সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রেরণাদাতা শ্রীশচন্দ্রকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

পঞ্চম পত্রটিতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-রচিত 'ফুলজানি' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির লেখককে প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছেন। সেইসঙ্গে কী জাতীয় রচনা তার হাতে শ্রেষ্ঠরূপ পাবে তারও একটি নির্দেশ বা ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম-রচিত 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাস যে যথার্থ বাঙালীর জীবনকথা হতে পারে নি এবং শ্রীশবাবু যদি সাধারণ বাঙালীর প্রাণের কথা অঙ্কন করেন তবে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হতে পারবেন সেই কথাও জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার ছোটগল্পে সাধারণ বাঙালির জীবনযাত্রার ও প্রাণের পরিচয় দেবার প্রয়াস দেখা যায়।

দেখা যাচ্ছে, এক-একটি পত্র কবির এক একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা। কবির চিন্তা যে কত 'বিচিত্রগামী' তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

এরপরের পত্রগুলিতেও সাধারণ ঘরোয়া দু'একটি কথাবার্তা নিয়ে কবিকে সরস মন্তব্য করতে দেখি। যেমন—'সপ্তাহ' নামক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কৌতুক করতে দেখি ষষ্ঠ পত্রটিতে।—

> "সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসবে কিন্তু 'সপ্তাহ' আর বের হবে না।··· সপ্তাহ্ বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ করতে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত কিন্তু সপ্তাহ নেই।"

আবার সপ্তম পত্রে সামান্য বাতের ব্যথা উপলক্ষ্য করে কত কৌতুকই করেছেন!

শ্রীশবাবুর কাছে লেখা শেষ পত্রটির বিষয়বস্তু অতি সামান্যই। বর্ষাকাল, তিনি তাঁর সাহিত্য-সুহৃদকে কাছে পাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একই বক্তব্য একবার গদ্যে ও একবার পদ্যে বলেছেন। কিন্তু এই বলার কায়দা, উপমা-প্রয়োগ ও ছন্দ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে সামান্য বক্তব্যও হয়ে উঠেছে মনোরম ও বিশেষত্বপূর্ণ।

দেখা যাচ্ছে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে লেখা আটটি পত্রের মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া কথাবার্তারই আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গেই এসেছে সাহিত্যসমালোচনার কথা, এসেছে বৈজ্ঞানিক নিয়ম, ইতিহাস বা ভৌগোলিক কার্যকারণের নানা চিন্তা। এই সামান্য বিষয়গুলি থেকে এই উদীয়মান বিশ্বসাহিত্যিকের অসামান্যতার প্রাথমিক পরিচয়টি পাওয়া যায়—যার পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল পরবর্তী জীবনের প্রতিটি ধাপে। আর, বিষয় ও চিন্তা যত বিচিত্রপথে বিস্তৃত হয়েছে, ভাষাও হয়ে এসেছে তত সহজ, সরল, অথচ কারুকার্যময়।

১৮৯০ সাল পর্যন্ত লেখা ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি ভাইঝি ইন্দিরার কাছে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়। তবে এটুকুই বলা যায় যে, ছিন্নপত্রাবলী বহুবিস্তৃত রবীন্দ্রচিন্তার

কেন্দ্রভূমি হিসাবে পরিচিত। আর তার সহজ ভাষাও গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। ভাষার এই সহজতা বাংলাসাহিত্যের অগ্রগতিকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ভাষা ও চিন্তার এই সরলতা ও সমৃদ্ধি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অল্পবয়স থেকেই। তাই আদিপর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটি জানতে হলে ছিন্নপত্রের প্রথম পর্বটিকে উপেক্ষা করা চলে না।

রবীন্দ্ররচিত প্রবন্ধাবলীর প্রাথমিক পর্বটি সম্বন্ধে সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও সাহিত্যসৃষ্টির বীজ নিহিত রয়েছে প্রধানতঃ তাঁর প্রবন্ধগুলিতেই। ভাষা ও ভাবসৃষ্টিতে সারা জীবনে কবি যত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন এই প্রবন্ধগুলিকে বাদ দিলে তার যথার্থ প্রকৃতিটি নিরূপণ করা সম্ভব হোতো না। এইখানেই এগুলির বিশেষ গুরুত্ব। তাই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস সত্ত্বেও এই অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হল।

অষ্টম অধ্যায়

ছন্দ, অলংকার ও গদ্যশিল্প

ছন্দ, অলংকার, ভাষা ও শব্দ— এ সবই সাহিত্যের অঙ্গবিশেষ। এর মধ্যে ছন্দের ব্যবহার কাব্যে। কবি-মনের ভাববৈচিত্র্য ধ্বনিবৈচিত্র্যের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় ছন্দে। অপরপক্ষে, গদ্য ও পদ্য উভয়কেই সুষমামণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজন হয় অলংকারের। ভাষা ও শব্দ হল গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ সাহিত্য-সৃষ্টি করার প্রধান মাধ্যম। কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধভেদে ভাষার রূপ ও প্রকৃতি-বৈচিত্র্য ঘটে। প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই আপন মনোভাব প্রকাশের অবলম্বন এই ভাষা, শব্দ, ছন্দ ও অলংকার। তবে প্রতিভাভেদে তার শক্তি ও সৌন্দর্যের তারতম্য ঘটে। রবীন্দ্রপ্রতিভা ছিল সর্ববিষয়েই অনন্যসাধারণ এবং তার স্ফুরণ ঘটেছিল একেবারে বাল্যকালেই। ফলে স্বভাবতঃই সাহিত্য প্রকাশের এই অঙ্গগুলি সম্বন্ধেও তাঁর সজাগ মনের প্রকাশ দেখা দিয়েছিল জীবনের প্রত্যুষকালে, আর, পরিণতিতে তাই পৌঁছেছিল সর্বোচ্চশিখরে। সাহিত্যের এই অঙ্গগুলির মধ্যে ছন্দ সম্বন্ধেই তাঁর বোধের উন্মেষ ঘটে সর্বাগ্রে। অলংকার-সচেতনতা দেখা দেয় তার কিছুদিন পরে। তবে ছন্দ ও অলংকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নূতন শব্দপ্রয়োগ ও শব্দসৌন্দর্যসৃষ্টির একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা তাঁর অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের প্রচেষ্টা। তাই কালানুক্রম অনুসরণ করে প্রথমে ছন্দ ও তার পরে যথাক্রমে অলংকার ও গদ্য-রীতি তথা শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

(১) ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্য ও বিবর্তন

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা ও ছন্দরচনার সূচনা প্রায় একইকালে— এ কথা অনায়াসেই বলা যায়। কারণ, কবিতা ও ছন্দ তো একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর প্রথম জীবনে কাব্যরচনার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তখনই দেখেছি 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' রচনার সময় থেকেই তাঁর মিল ও ছন্দজ্ঞান সজাগ হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনের সেই প্রথম কবিতাটির প্রতি তাঁর এত দুর্বলতার কারণ এই ছিল যে, তখনই তিনি বুঝেছিলেন—

"কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে

বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।”

—জী-স্মৃ, 'শিক্ষারম্ভ'

ঐ অধ্যায়েই দেখেছি, কৈলাস মুখুজ্জের মুখে ছড়া শুনে তাঁর মনে কেমন ছন্দের দোলা লাগত। এগুলি তাঁর অতি সূক্ষ্ম ছন্দানুভূতিরই পরিচায়ক। এই-ভাবেই ছোট ছোট ছড়া শোনা ও লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর ছন্দজ্ঞান শাণিত হতে থাকে এবং তিনি ছন্দ, মিল ও শব্দযোজনা বিষয়ে তাঁর বিশেষত্বের পরিচয় দিতে শুরু করেন। এই যুগে নিজের ছন্দচর্চা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

“হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে।··· পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাততুম। আট-অক্ষর ছয়-অক্ষর দশ-অক্ষরের চৌকো চৌকো কত-রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা।”

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫

আরও আগে তাঁর 'সিঙ্গিমামা কাটুম্' থেকে শুরু করে বহু ছোট ছড়া রচনার শুরু। কবি 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'য় তার বর্ণনা দিয়েছেন, কাব্যরচনা প্রসঙ্গে সে কথা আলোচিতও হয়েছে। তাঁর এই ছন্দ-সচেতনতায় ইন্ধন জুগিয়েছিল নর্মাল স্কুলের শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের কাছ থেকে পুরস্কার-স্বরূপ পাওয়া 'ছন্দোমালা' (১২৭৫ বৈশাখ) নামক বইটি। রবীন্দ্রনাথের মনে এই বইটি বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল বলে মনে হয়। কারণ, পরিণত বয়সে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি ছেলেবেলার বহু বইয়ের নাম বিস্মৃত হলেও এই বইটির কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

ছন্দের মিল সম্বন্ধে তাঁর সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায় আরও একটি ঘটনা থেকে। তাঁর আর-এক শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত তাঁর ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য দু'লাইন ছড়া দিয়ে তাঁকে পূরণ করতে বললেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ এরসঙ্গে মিলিয়ে লিখলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

—জী-স্মৃ, 'কাব্যরচনাচর্চা'

বলা বাহুল্য, এই দুটি অংশেই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

নর্মাল স্কুলে অধ্যয়নের প্রায় সমকালেই তিনি ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছে কিভাবে ছন্দরচনার কৌশল শিক্ষা করেছিলেন সে ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন জীবনস্মৃতির 'কবিতা-রচনারম্ভ' অধ্যায়ে। কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ করেছি। ঐ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, 'পয়ার ছন্দে' তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল কিভাবে। এই ছন্দ বুঝে নিয়ে কবি 'কাঁচা অক্ষরে' অজস্র পদ্য লিখতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এইসময় থেকেই সচেতন বালককবির ছন্দচর্চার সূত্রপাত। এইভাবে শিশুকবির কাব্যরচনা ও ছন্দচর্চার পালা এগিয়ে চলল। 'ঘরের পড়া' যুগে দেখি তিনি 'কুমারসম্ভব', 'ম্যাক্‌বেথ' প্রভৃতির অনুবাদ করেছেন। ঐ অনুবাদ করার সময়ে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর মন কতটা সজাগ ছিল তাও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছন্দ-উপলব্ধির ক্ষমতা কত সূক্ষ্ম ও গভীর ছিল তা কবির একটি উক্তি থেকেই স্পষ্ট জানা যায়।—

> "একবার বাল্যকালে··· একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না;··· আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। ··· জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'— এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটা সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত— ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত— সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'— এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম।"
>
> —জী-স্মৃ, 'পিতৃদেব'

আরও একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং' এই

পদটি পড়ে কবির মন কেমন ঝংকৃত হত তার বর্ণনাও তিনি করেছেন 'পিতৃদেব' অধ্যায়েই। আর বড়োদাদার মুখে 'মেঘদূত' কাব্যের আবৃত্তি শুনে তিনি কেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তার বিবরণও সেখানে পাওয়া যায়—

> "তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না— তাঁহার আনন্দ আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

বড়োদাদার কাছ থেকে তিনি তাঁর নূতন ধরনের ছন্দরচনার প্রেরণাও পেয়েছিলেন অনেকখানি। দ্বিজেন্দ্রনাথের ছন্দ বিশেষভাবেই ছিল মৌলিক। কনিষ্ঠভ্রাতার সজাগ মন তাতে সাড়া না দিয়ে পারত না।

সংস্কৃত ছন্দের প্রতি আকর্ষণের আরও পরিচয় পাই আমেদাবাদ বাসপর্বে। তিনি বলেছেন, মেজদাদার লাইব্রেরিতে 'সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ' পাঠ করে—

> "সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।"
>
> —জী-স্মৃ, 'আমেদাবাদ'

অসাধারণ প্রতিভাবান্ কবির পক্ষেই এত অল্পবয়সে এই নিবিড় উপলব্ধি সম্ভব ছিল। একদিকে মনের গভীরে অপর কবিদের ছন্দ-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছন্দ ও ধ্বনি রচনা করার প্রবণতাই তাঁকে পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ কবি ও ছান্দসিকে পরিণত করেছিল। ছন্দে তিনি নূতন নূতন নীতি ও পরিভাষা প্রবর্তন করেন, ছন্দ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থও বাংলা ছন্দশিল্পের অন্যতম পাথেয়রূপে পরিগণিত হয়েছে।

২

ছন্দের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের ফলেই ছন্দরচনার একটা ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়। তারপরে তার উপর সৌধ গড়ে তোলার পালা। 'ভারতভূমি' ও 'অভিলাষ' থেকে শুরু করে 'মানসী' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে, এই যুগটির মধ্যে ছিল দুটি পর্ব। প্রথম স্তরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখ তদানীন্তন কবিদের অনুসরণ করেই প্রধানতঃ ছন্দরচনা করেছেন। যদিও স্থানে স্থানে তাঁর স্বকীয়তার চিহ্নও অস্পষ্ট নয়। তবু এই পর্বটাকে প্রধানতঃ copy book-এর যুগ বলাই সমীচীন। আর সন্ধ্যাসংগীতের সময় থেকেই শুরু হল প্রধানতঃ তাঁর স্বাধীন ছন্দচিন্তা। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন, "In Evening songs, I first found my genius; before that,

I echoed other men's songs."[১] তাঁর এ উক্তি কবিতার ভাব অপেক্ষা ছন্দ-বিষয়ে অধিক প্রযোজ্য। তাঁর প্রথম যুগে লেখা কবিতা ও কাব্যগ্রন্থগুলির ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যাবে।

প্রথমে আলোচনা করব copy book যুগে তিনি কোন্ কোন্ কবিকে কতখানি অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্যই বা কতটা রক্ষিত হয়েছিল। এই কবিদের মধ্যে একদিকে ছিলেন সমকালীন কাব্যরচয়িতারা আর অন্যদিকে বৈষ্ণবপদকর্তারা—যাঁদের অনুসরণ করে কবি লেখেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এ ছাড়া এই যুগে তিনি অনেক পাশ্চাত্ত্য কবির অনুসরণেও কবিতা রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছে' প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য ভাবেরই অনুসরণ দেখা যায়, ছন্দে বিশেষ অনুবৃত্তি আছে বলে মনে হয় না।

Copy book-এর যুগে কবির ছন্দসৃষ্টির মধ্যে প্রথম যেটি বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত, তা হল 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অনুবাদ। এই অনুবাদে ছন্দ-রচনার একটু 'অদ্ভুত বিশেষত্ব' লক্ষ করা যায়। এই বিশেষত্বপূর্ণ ছন্দটিকে দলবৃত্ত (Syllabic) ছন্দ-রচনার পূর্ব প্রয়াস বলে গণ্য করা যেতে পারে। তবে ঘরের পড়ার যুগে প্রথম যে অনুবাদ করেছিলেন, তাতে এই বিশেষত্বপূর্ণ ছন্দ ছিল না। তখন তিনি সমগ্র কাব্যটি একই ভাষা ও ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। পরে 'ভারতী'তে প্রকাশিত (১২৮৭) 'ডাকিনী' অংশেই এই বিশেষত্ব দেখা যায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারেই এই পরিবর্তন করা হয়েছিল মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে (৩য় অধ্যায়)।

ম্যাক্‌বেথের সমকালে রচিত ও মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত কুমারসম্ভবের অনুবাদের যে দুটি খসড়া পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রথমটিতে কাঁচা হাতের পরিচয় যথেষ্ট আছে। ছন্দে আছে পয়ারের বাঁধারীতি (৮।৬) রক্ষা করার সযত্ন প্রয়াস। এটি বালক রবীন্দ্রনাথের হাতেই সৃষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু পরের খসড়াতে আছে পাকাহাতে সংশোধনের চিহ্ন। আর 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪) এই দ্বিতীয় রূপেরই উন্নততর তৃতীয় সংস্করণ লক্ষ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই সংশোধিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপদানে বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন আগ্রহী। ওগুলির ভাষা ও ছন্দেও তাঁর রচনার বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এই সব তথ্য সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[১] **Edward Thompson: *Rabindranath Tagore*, 2nd ed. (1948), chapter 15, p 174-75**

এ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কুমারসম্ভবের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপ যতটুকু ছিল তাতে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু দেখা যায় না। বরঞ্চ, মধুসূদনের ডাকিনী অংশের যে পরিবর্তিত রূপটি পাওয়া যায়, তা দলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ রচনার ইতিহাসে বিশেষ মূল্য লাভের যোগ্য।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'ভারতভূমি'তে পয়ার ও ত্রিপদীতে মিলিয়ে নূতন ধরনের স্তবক রচনা করার প্রবণতা লক্ষ করা গেল। 'ভারতভূমি' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় অধ্যায়) এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। তারপর পরবর্তী কবিতা 'অভিলাষে' তিনি ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখালেন ততোধিক। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির মধ্যে প্রাচীন ও নবীন নানা ছন্দোবৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কবিতাটি আগাগোড়াই পয়ার বন্ধে লেখা। তবে সর্বত্র ৮।৬ মাত্রার যতিবিভাগের নিয়ম রক্ষিত হয় নি। অনেক জায়গায় আছে ৪।১০ মাত্রার বিভাগ। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই পরবর্তী রচনা—

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এর প্রথম পঙ্‌ক্তির ৪।১০ মাত্রাবিভাগের সঙ্গে অভিলাষের—

'রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তিমাঝে' পঙ্‌ক্তিটির মাত্রাবিভাগ একইরূপ। এই দৃষ্টান্ত থেকেই মনে হয়, 'অভিলাষ' রচনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ছন্দোবোধ নেহাত কাঁচা ছিল না। কবিতাটির ছন্দ আগাগোড়াই অমিল। কিন্তু মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমানতার ধারা তিনি অনুসরণ করলেন না। বরঞ্চ, তিনি সংস্কৃত চতুষ্পদী শ্লোকবন্ধ রচনার রীতি প্রয়োগ করেছেন। সমগ্র কবিতাটি উনচল্লিশটি শ্লোকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি শ্লোক চার পঙ্‌ক্তি নিয়ে গঠিত। মধুসূদন তাঁর অমিত্রাক্ষর রীতির মাধ্যমে বাংলাছন্দে মিল রক্ষার অত্যাবশ্যকতা শিথিল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই মিলহীন ছন্দের আদর্শ নিয়ে সংস্কৃত চতুষ্পদীর মত শ্লোকবন্ধ গঠন করে মিশ্রিত ধরনের ছন্দোবন্ধ রচনা করলেন। পূর্বোল্লিখিত কুমারসম্ভবের অনুবাদ তিনি করেছিলেন অভিলাষ রচনার প্রায় সমকালেই। কুমারসম্ভবের প্রথম খসড়াটি (যেটি রবীন্দ্রকৃত বলে অনুমিত) ও অভিলাষ কবিতার ছন্দ প্রায় একই ছাঁচে গড়া; দুটিই অমিল প্রবহমান পয়ারবন্ধে রচিত। প্রকৃতপক্ষে, মধুসূদন মিল বর্জনের যে-পথ রচনা করেছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ সেই পথেই অগ্রসর হলেন, কিন্তু মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণ করলেন না। করলেন সংস্কৃত শ্লোকবন্ধের রীতি।

তবে কুমারসম্ভবে অনুবাদের প্রয়োজনে প্রতি শ্লোকে চার পঙ্‌ক্তি রাখা সম্ভব হয় নি। কিন্তু স্বাধীন রচনা 'অভিলাষে' সেই রীতি রক্ষিত হয়েছে। রচনা-ভঙ্গিগত কিছু কিছু মিলও লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুমারসম্ভবের 'ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ'প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে 'অভিলাষ' কবিতার 'নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা' পঙ্‌ক্তি যেন একই ছাঁচে গড়া। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার আদর্শ অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয়। বস্তুতপক্ষে, রচনাকাল, ছন্দগঠন ও রচনাভঙ্গি—সবদিক্ থেকেই কুমারসম্ভবের অনুবাদ ও অভিলাষ কবিতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর এই রচনা দুটিকে তাই একত্রে বিচার করাই সমীচীন। ছন্দ বিষয়ে এই রচনা দুটিতে তিনি সংস্কৃত ছন্দোরীতির অনুসরণই করেছেন বেশি। এ বিষয়ে তৎ-কালীন আর-একজন শ্রেষ্ঠ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছন্দের প্রভাবও অনেক-খানি কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয়। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য প্রকাশিত হয় 'অভিলাষ' প্রকাশের পরের বৎসর (১৮৭৫)। ঐ কাব্যের প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে কবি হেমচন্দ্র লেখেন যে, তিনি মধুসূদনের পথ অবলম্বন করেন নি, বরঞ্চ—

> "ইংরেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাংলাভাষার সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎ পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অভিলাষ' কবিতাতেও সেই আদর্শই অবলম্বন করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তৎকালীন শ্রেষ্ঠকবি ছন্দোবন্ধ গঠনে যে পন্থা গ্রহণ করেছেন, অভিলাষে তারই পূর্বাভাস রয়েছে। শ্রেষ্ঠকবির পূর্বেই বালক রবীন্দ্রনাথের এই নূতন পথে পদার্পণ কম গৌরবের কথা নয়। ভাবের ক্ষেত্রেও যেমন তিনি বহু কবির ভাবমাধুরী সঞ্চিত করে তাকে আপন সৌরভে সুরভিত করেছেন, ছন্দগঠনেও তেমনি বিভিন্ন কবির 'চিত্ত ফুলবনমধু' সন্ধান করে রচনা করেছেন তাঁর নিজেরই মধুচক্র।

অভিলাষের পরবর্তী 'হিন্দুমেলায় উপহার' (১৮৭৫) কবিতাটির ছন্দেও হেমচন্দ্রের চারপঙ্‌ক্তির স্তবকগঠন-রীতি অনুসরণের প্রবণতা দেখা যায়। পর্বগুলি ৬ মাত্রায় বিভক্ত, শেষ পর্ব অপূর্ণ, ৫ মাত্রার। এই কবিতার ভাবে যেমন হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীতে'র প্রতিধ্বনি শোনা যায়, ছন্দেও তেমনি তার ঝংকার ধ্বনিত হয়েছে।—

অমার আঁধার | আসুক এখন |
মরু হয়ে যাক্ | ভারত কানন |

চন্দ্র সূর্য হোক্ | মেঘে নিমগন |
প্রকৃতি শৃঙ্খলা | ছিঁড়িয়া যাক্ |

—'হিন্দুমেলায় উপহার'

এর সঙ্গে—

বাজ রে শিঙ্গা | বাজ্ এই রবে |
সবাই স্বাধীন | এ বিপুল ভবে |
সবাই জাগ্রত | মানের গৌরবে |
ভারত শুধুই | ঘুমায়ে রয় |

—'ভারত সংগীত' (কবিতাবলী)

এই অংশটি প্রায় অভিন্ন।

'হিন্দুমেলায় উপহার' পর্যন্ত ভাবে, ভাষায়, ছন্দে হেমচন্দ্রের অনুবর্তন অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে। কিন্তু তার সমকালে রচিত 'হোক্ ভারতের জয়' ও অল্প কিছুদিন পরে লেখা 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা দুটির ছন্দে দেখা গেল প্রধানতঃ বিহারীলালের অনুসরণ।[২]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর অল্পবয়সের লেখাগুলিতে 'বঙ্গসুন্দরী'তে ব্যবহৃত তিনমাত্রা-মূলক ছন্দের অনুসরণই প্রধানতঃ দেখা যায়। কারণ—

"তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মত চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়,··· একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।··· ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।"

—জী-স্মৃ. 'সন্ধ্যাসংগীত'

এই তিনমাত্রার ব্যবহার 'শৈশব সংগীতে'র (১৮৭৪-৭৯) অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। শৈশব সংগীতের তিনমাত্রার কবিতাগুলিকে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার পূর্ববর্তী বলে মনে করে যায়। যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

বঙ্গসুন্দরীর অনুবৃত্তি কাটাতে তাঁর সময় লেগেছিল। তারপরে তিনি আকৃষ্ট হন বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রতি। 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় যখন সারদামঙ্গল প্রকাশিত হচ্ছিল (১২৮১) তখন তিনি সে কাব্য পড়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 'জীবনস্মৃতি'তে 'সাহিত্যের সঙ্গী' অংশে তিনি তাই

২ প্রকৃতপক্ষে, এ ছন্দ বিহারীলালের নয়, বাংলাসাহিত্যে বহুপ্রচলিত ত্রিপদীবন্ধেরই নব রূপায়ণ; কবিদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নব আলোকিত। এই নব রূপায়িত ছন্দের সূচনা আসলে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদনের যুগ থেকে।

জানিয়েছেন, 'বিহারীবাবুর মত কাব্য লিখিব' তাঁর 'মনের আকাঙ্ক্ষাটা' সে পর্যন্ত ধাবিত হত।

বিহারীলালের হাতে নবসৌন্দর্যপ্রাপ্ত বাংলার প্রচলিত ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই 'হোক্ ভারতের জয়' ও 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা দুটি ঐ আদর্শে রচনা করলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রকৃতির খেদের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলেই সারদামঙ্গলের সঙ্গে এই সাদৃশ্য স্পষ্ট হবে। সারদামঙ্গলে দেখি—

অসীম নীরদ নয়,
ও-ই গিরি হিমালয়!
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি!
ব্যেপে দিগ্‌ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি!

—হিমালয় বর্ণনা, 'সারদামঙ্গল', চতুর্থসর্গ

প্রকৃতির খেদে আছে—

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা,
বিধির মানসবালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

এই বন্ধ আসলে চৌপদীবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ত্রিপদী[৩] হিসাবেই গণনা করেছেন। সারদামঙ্গলও প্রধানতঃ এই চৌপদীবন্ধেই রচিত। মনে রাখতে হবে আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রসৃষ্টিকে বিহারীলালের অনুসারী বলে মনে হলেও এই ত্রিপদী (বা চৌপদী) বন্ধ বিহারীলাল বা রবীন্দ্রনাথ কারুরই নূতন সৃষ্টি নয়। এ 'প্রচলিত ত্রিপদী'। 'ভারতভূমি' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় অধ্যায়) এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। তবে তা 'সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত' হয়ে প্রতিভাবান্ কবিদের হাতে হয়ে ওঠে অভিনব। সারদামঙ্গলও তার ব্যতিক্রম নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যগুলিতেও দেখি তারই অনুবৃত্তি। 'প্রকৃতির খেদে'

৩ রবীন্দ্রনাথ: 'বিহারীলালের ছন্দ', ছন্দ (১৯৭৬), পৃ ১৩ ও আনুষঙ্গিক পা-টী ২

কবি স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারেই স্তবক-গঠনেও অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন—

অভাগী ভারত ! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে,
তাহলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ ?
তা হলে কি পূতধারা মন্দাকিনী নদী
তোর উপত্যকা 'পরে হতো বহমান ?
তা হলে কি হিমালয়,
গর্বে ভরা হিমালয়
দাঁড়াইয়া তোর পাশে
পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার-মুকুট শিরে করি পরিধান ?

এখানে তিনি প্রথম ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে মিল দিয়েছেন। অপরদিকে, চতুর্থ ষষ্ঠ ও শেষ পঙ্‌ক্তিতে মিল হয়েছে। পয়ার-ত্রিপদীর [চৌপদী] মিলনও রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। যেমন—

আবার ধরিয়া ধীরে সুমধুর তান।
প্রকৃতি বিষাদে দুঃখে আরম্ভিল গান ॥
কাঁদ্‌! কাঁদ্‌! আরো কাঁদ্‌ অভাগী ভারত
হায়! দুঃখ-নিশা তোর,
হলো না হলো না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হলো না আগত ?

'পয়ার-ত্রিপদী'তে মিলিয়ে কবিতা রচনা করার প্রবণতা আরো শিশুবয়স থেকেই দেখা দিয়েছিল সে কথা কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সময়ে।[৪] তাঁর সেই চেষ্টা চলেছিল বহুদিন পর্যন্ত। 'প্রকৃতির খেদ' তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'প্রকৃতির খেদে'র অল্পদিন পূর্বে ও 'হিন্দুমেলায় উপহারে'র সমকালে রচিত 'হোক্ ভারতের জয়' নামক যে কবিতাটি ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে, তার পঙ্‌ক্তিবিন্যাস ও স্তবক-গঠনের আদর্শও কবির এই যুগের ছন্দচেতনারই অনুগত। ছন্দশিল্পে 'প্রকৃতির খেদ' ও 'হোক্ ভারতের জয়' সমগোত্রীয়।

৪ আত্মপরিচয় (অধ্যায় ৫) ও ছেলেবেলা (অধ্যায় ১১); এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'ভারতভূমি' কবিতার আলোচনা।

'প্রকৃতির খেদে'র সমকালে রচিত 'বনফুল' কাব্যের (১২৮২-৮৩) ছন্দেও আছে সেই পয়ার-ত্রিপদীর মিলন।—

নিশার আঁধাররাশি ॥ করিয়া নিরাস।
রজতসুষমাময় ॥ প্রদীপ্ত তুষারচয় ॥
হিমাদ্রিশিখরদেশে ॥ পাইছে প্রকাশ। —প্রথম সর্গ

এখানে কবি মিল দিয়েছেন প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে। ৮ ॥ ৬ I ও ৮ ॥ ৮ ॥ ১৪ I (৮+৬) হিসাবে পঙ্‌ক্তি বিভাগ করে কবি তাঁর ইচ্ছামত পঙ্‌ক্তিগুলিকে সাজিয়েছেন। এইভাবেই তাঁর 'ছন্দ ভাঙাগড়া'র খেলা স্পষ্ট রূপ নিচ্ছিল। আবার কখনও নিছক ত্রিপদীবন্ধের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়—

নিভৃত যমুনাতীরে। বসিয়া রয়েছে কি রে।
কমলা নীরদ দুই জনে।
যেন দোঁহে জ্ঞানহত। নীরব চিত্রের মত।
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে। —চতুর্থ সর্গ

কখনও আবার শুধুই পয়ারে লিখেছেন—

ওই রে কুমারী উষা। বিলোল চরণে।
উঁকি মারি পূর্বাশার। সুবর্ণ তোরণে।
রক্তিম অধরখানি। হাসিতে ছাইয়া।
সিঁদুর প্রকৃতিভালে। দিল পরাইয়া। —সপ্তম সর্গ

'প্রকৃতির খেদে'র [প্রতিবিম্ব পাঠ] মত পঙ্‌ক্তিবিন্যাসও দেখা যায়—

গেছে খুলে দিগ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক
কোথা কুঞ্জ—কোথা বন—কোথায় কুটীর!
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর! —অষ্টম সর্গ

দেখা যাচ্ছে, আসলে কবি এই যুগটাতে গতানুগতিক ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধকেই আপন মনের খুশিতে নূতন নূতন করে সাজাচ্ছিলেন স্তবকগঠনে, পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে।

৩

'বনফুল' কাব্যের অল্প কিছুদিন পরে (১২৮৪) লেখা হলেও 'কবিকাহিনী' কাব্যে কবির ছন্দোবোধ বেশ প্রসারলাভ করেছে। 'ভারতী' পত্রিকায় মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাব্যটিও প্রকাশিত হচ্ছিল। ফলে মেঘনাদবধের ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা তখন যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছিল। ভারতীতে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয়, দুটি সমালোচনাতেই কবি বিষয়-বিচারে কাব্যটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ঐ কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে চিরকালই তাঁর মন ছিল সপ্রশংস। প্রকৃতপক্ষে, ঐ ছন্দের প্রবহমানতা ও শব্দের ঝংকার কবির মনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। 'অভিলাষ' প্রভৃতি কবিতায় ঐ ছন্দের অনুসরণ না করলেও কবিকাহিনীর সূচনাতেই দেখি কবি অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান ছন্দের অনুসরণ করেছেন।—

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।

এখানে কবি যুক্তাক্ষর প্রয়োগ থেকে বিরত থেকেছেন। ক্রমে তিনি যুক্তাক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পরবর্তী কালে তিনি বলছেন—

"বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে।··· যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে।··· মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।" — 'বিহারীলাল', সাধনা ১৩০১ আষাঢ়[৫]

অন্যত্র ঐ সূত্রেই বলেছেন—

"বাংলা শব্দগুলো বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না।··· এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন।··· যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।··· বাংলাভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।" —'ছন্দবিচার', বিচিত্রা (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ)[৬]

৫ দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথ : 'ছন্দ', পৃ ১২-১৩
৬ দ্রষ্টব্য—পূর্ববৎ, পৃ ১২৪-২৫

পরবর্তী কালে লিখিত কবির এই মন্তব্য ও অনুভূতি তাঁর বাল্যকালের রচনাতেই ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কবিকাহিনীর প্রথম সর্গেই দেখি :

যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু-জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।

এই অংশে 'নিশ্বাস', 'ঘুমন্ত', 'বন্য', 'প্রান্তর', 'ধান্য', প্রভৃতি অনেকগুলি যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি!
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে।
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়। —তৃতীয় সর্গ

শুধু অমিল প্রবহমান ছন্দই নয়, এ কাব্যে তিনি সারদামঙ্গলের 'ত্রিপদী' ছন্দকেও মিলহীন রূপ দিয়েছেন।—

এতকাল হে প্রকৃতি করিনু তোমার সেবা
তবু কেন এ হৃদয় পূরিল না দেবি?
এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর? —দ্বিতীয় সর্গ

এ বন্ধ আসলে কবির স্বেচ্ছায় রচিত মিলহীন চৌপদীবন্ধ। এই কারণেই তিনি নিজের সে যুগের ছন্দরচনা সম্বন্ধে বলেছেন—"এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫

সমকালীন 'বান্ধব' পত্রিকায় সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'কবিকাহিনী'র কাব্য ও ভাবগত মর্যাদার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

"কবি-কাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় মাইকেলের ন্যায়

সর্বত্র মিল্‌টনের অনুসরণ এবং হেমবাবুর ন্যায় সংস্কৃত কবিদিগের ছন্দানুবর্তন না করিয়া, কোনো কোনো স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য কাহারও নিকট ভাল লাগিত না।”

রবীন্দ্রজীবনীকারও কাব্যটির ছন্দ সম্বন্ধে বলেছেন—

‘কবিকাহিনীর কবিতাগুলির ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বনফুলের ন্যায় ইহাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, ইহাতে পয়ারের মিল নাই, যাহা পরবর্তী যুগের নাট্যকাব্য ও বিসর্জন-আদি নাটকের মধ্যে দেখা যায়। সে যুগে কোনো কবি কাব্য রচনাকালে মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্তিত নূতন ছন্দকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না; রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের যতই তীব্র সমালোচনা করুন, কাব্য রচনাকালে তাঁহাকে মাইকেলেরই তেজোময় অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।”

—র-জী, পৃ ৭৬

তবে তদানীন্তন অন্যান্য কবিদের চেয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এইখানেই যে, তিনি যে-ছন্দই অনুসরণ করুন-না কেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তা ও স্বকীয় অনুভূতিটুকু মিলিয়ে দিতে তিনি কখনোই দ্বিধাবোধ করেন নি।

৪

এ পর্যন্ত গেল কবির ছন্দোবন্ধ রচনা ও মিলস্থাপনের মধ্যে নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্থাপনের প্রবণতার দিক্‌। কিন্তু ছন্দোরীতির ব্যাপারেও কবি একেবারে অচেতন ছিলেন না। বাংলাকাব্যে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে ছন্দোবন্ধের অভাব ছিল না। কিন্তু রীতির দিক্‌ থেকে একমাত্র মিশ্রবৃত্ত (composite) রীতিই ছিল সমধিক প্রচলিত। কিন্তু সেই রীতিটিও সুগঠিত বা সুনিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যে কৃত্রিমতা বা অপূর্ণতা ছিল, তা প্রথমাবধিই কবির অনুভূতিকে পীড়িত করেছিল। তাই প্রথম রচনাগুলি থেকেই দেখি প্রচলিত ছন্দকে ভেঙেচুরে একটা নূতন রূপ দেবার অশান্ত প্রয়াস। ‘শৈশব সংগীত’ (১৮৭৪-৭৯) থেকে শুরু করে ‘বনফুল’, ‘কবিকাহিনী’র বেড়া ডিঙিয়ে ‘ছবি ও গান’ পর্যন্ত এই অতৃপ্তি ও প্রয়াসের যুগ পরিব্যাপ্ত। অতঃপর ‘কড়ি ও কোমলে’র পর্ব পেরিয়ে ‘মানসী’তে এসে তিনি কিছুটা তৃপ্তি লাভ করলেন।

এই তৃপ্তিলাভের পথ বা পন্থা কী তা একটু দেখা দরকার। রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে কবিরা সাধারণতঃ অক্ষরসংখ্যার হিসাব গণনা করেই ছন্দ রচনা করতেন। কিন্তু

তাঁরা বোধহয় বুঝতে পারেন নি, লিপিবদ্ধ অক্ষরের সঙ্গে ছন্দের কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। ছন্দ নির্ভর করে ধ্বনিগত কালপরিমাণের উপর, অক্ষরের উপরে নয়। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ কথাটি স্পষ্ট অনুভব করেন 'মানসী' রচনার পর্বে। এর পূর্বে তাঁর অন্তরে এর প্রতি একটা আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তিনি যেন ঠিক পথটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।।

হয়তো সেইজন্যই তিনি অল্পবয়সের রচনায় যুক্তাক্ষর বর্জন করে স্বরান্ত ব্যঞ্জন বা বিশুদ্ধ স্বরধ্বনি বেশি ব্যবহার করতেন। তখন তিনি অনুভব করেছিলেন, ব্যঞ্জনসংঘাত দেখা দিলেই ছন্দের, বিশেষতঃ, তিনমাত্রার ছন্দের সহজ ধ্বনিপ্রবাহে বাধা ঘটে। ছন্দকে সহজ, সরলভাবে প্রকাশ করতেই বালক-কবির সেদিন আগ্রহ বেশি ছিল। তখন তিনি 'কল্পনা'কে কলপনা, 'ঝর্ণা'কে ঝরণা, 'পূর্ণিমা'কে পূরণিমা ইত্যাদি বলতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যুক্তবর্ণ একেবারেই বর্জন করে চললে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ বৈচিত্র্যহীন, নিস্তরঙ্গ ও শক্তি-হীন হয়ে পড়বে, যুক্তবর্ণহীন ভাষাও হবে দুর্বল, এ কথাটিও সেই প্রতিভাশালী বালকটি একই সঙ্গে অনুভব করলেন। এইকারণে প্রথম থেকেই কবিমনে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। মানসীতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যুক্তধ্বনিকে দুইমাত্রা হিসাবে গণনা করে একটা সমাধান পেলেন। কিন্তু এই আবিষ্কার তো তাঁর আকস্মিক নয়। বিশেষতঃ, যে কবি একাধারে গীতরচয়িতাও, মাত্রাবৃত্ত রীতির এই ধ্বনি-বিশেষত্ব তাঁর মনোবীণায় অনেক আগেই ঝংকৃত হয়েছিল, তাঁর কানে বেজেছিল তারই সুর। তাই চেতনে হোক, অচেতনে হোক, মানসী-পূর্ব যুগেও তাঁর রচনায় বাংলাভাষার স্বাভাবিক রীতি অনেক ক্ষেত্রেই ফুটে উঠেছে। 'কবিকাহিনী'র আলোচনায় সে ব্যতিক্রম দেখানো হয়েছে। 'শৈশব সংগীতে'ও দেখি স্থানে স্থানে ছন্দের স্বাভাবিকতা আত্মপ্রকাশ করেছে।[৭]—

কোন ফুল-বালিকা
গাঁথি ফুল-মালিকা
ফুল-বালকের কথা একমনে শুনিছে,
'বিব্রত' শরমে,
হরষিত মরমে,
আনত আননে বালা ফুল দল গুণিছে!

—'ফুলবালা', শৈশব সংগীত

৭ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'মাত্রাবৃত্ত রীতির পূর্বাভাস', ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১০-১৫

আবার ওই কবিতাতেই দেখি—

ওই দেখো হোথা রজনী-'গন্ধা'
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা!
চমকিয়া কহে 'কল্পনা' বালা—
দেখিয়া কানন-ছবি
ভুলিয়া গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি!

এই রচনাটি সম্ভবতঃ ১৮৭৪ সালের রচনা। এই কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রাচীন মিশ্ররীতি অনুসরণ করেছেন। যেমন, "হোথায় দেখেছ 'লজ্জাবতী' লতা লুটায়ে ধরণী পরে।" অথচ, উদ্‌ধৃত অংশে 'বিব্রত', 'গন্ধা', 'কল্পনা'—প্রভৃতি শব্দগুলিতে দুইমাত্রার মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। আসলে এ কথা সত্য যে, যখনই তিনি সতর্ক হয়ে পুরোনো রীতি মানতে গেছেন, তখনই যুগ্মধ্বনি দুইমাত্রার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর, যখন কবি হয়েছেন অসতর্ক তখনই যুগ্মধ্বনি পেয়েছে তার দুইমাত্রার মর্যাদা। এর থেকেই কবির স্বাভাবিক ধ্বনিরস ও ছন্দ-বোধের প্রখরতা অনুমান করা যায়। তবে কবি তখনও রীতিটিকে পুরোপুরি ধরতে পারেন নি। তাই উত্থানপতন ও অসমতলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, 'মানসী'তে কবির যে সর্বজনবিদিত জয়যাত্রা, মাত্র 'তেরো হইতে আঠারো বৎসরে'র মধ্যে লেখা শৈশব সংগীতের মধ্যেও তার পদধ্বনি বেশ স্পষ্ট হয়েই উঠেছিল। এই ব্যতিক্রম অবশ্য অন্যান্য রচনাতেও আছে। কিন্তু 'তেরো' বছর থেকেই তার সূত্রপাত। এদিক থেকে 'শৈশব সংগীতে'রও একটা পৃথক্ মর্যাদা আছে। কিন্তু তা সর্বত্র স্পষ্ট বা সচেতন নয় বলে অনেকক্ষেত্রে সর্বজনের অগোচরেই থেকে গেছে।

'মানসী'তে এসে কবির সচেতন অনুভূতি থেকে সৃষ্ট ছন্দের প্লাবন প্রাচীন সমস্ত সংস্কারের উপর জয়ী হল। এরজন্য যে ভূমিকা তৈরি হচ্ছিল তা একদিকে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হয়েছে। অপরদিকে, কার্যকরী হয়েছিল তাঁর জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণবপদকর্তাদের ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী-সাহিত্য পাঠের ফল। জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' ও ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণবপদাবলী, এ দুইই মাত্রাবৃত্ত (প্রত্নকলাবৃত্ত, old moric) ছন্দে রচিত। এই উভয়ের সঙ্গেই

বাল্যকালে তাঁর পরিচয় ঘটায় তাঁর স্বাভাবিক শ্রুতিবোধ আরও বেশি প্রখর হয়েছিল। এরই ফলস্বরূপ তিনি লেখেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ব্রজবুলিতে লিখিত এই কাব্যটি তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দসৃষ্টিতে অনেকখানি সহায়তা করে ভবিষ্যতের জয়যাত্রাকে প্রায় অনিবার্য করে তুলল। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রতিভাজাত গীতিনৈপুণ্য ও নব নব সুর উদ্ভাবনের অশান্ত প্রয়াস। এই কারণে তিনি অতি অল্প বয়সেই লিখতে পেরেছিলেন—

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।

—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, পদ ৮

চৌপদীবন্ধে রচিত এই ছন্দের প্রায় হুবহু অনুবৃত্তি দেখা যায় 'মানসী'র 'গুরুগোবিন্দ' প্রভৃতি কবিতায়। মানসী প্রকাশের অল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত হয় 'পদরত্নাবলী' (১২৯২ বৈশাখ)। তারও কিছু প্রভাব এইসব রচনায় রয়ে গেছে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, 'কড়ি ও কোমলে'র 'বিরহ' কবিতাটিতেই প্রথম মাত্রাবৃত্ত (moric) ছন্দের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। তবে রচনাকালের দিক্ থেকে তা মানসীরই সমকালীন। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। 'ভানুসিংহে'র উদ্ধৃত কবিতাংশটির মধ্যে যেন গোবিন্দদাস কবিরাজের—

শরতচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্লমল্লিকা মালতীযূঁথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।

—প্রভৃতি পদেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আবার, হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী,
নহি নহি আওল কালা।

—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, পদ ৩

এই পদটি যেন বিদ্যাপতির—

"তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুতমিত রমণীসমাজে"

এবং জয়দেবের "চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি-গুলির সঙ্গে একই ছন্দে এবং সুরে গাঁথা।

আসলে, বৈষ্ণব কবিদের ছন্দকে আত্মস্থ করে, তাকে আবার বাংলার নূতন-ছন্দে তিনি প্রয়োগ করছিলেন। 'ভানুসিংহ' তার একটি সফল পদক্ষেপ। তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দরচনার যাত্রাপথে তাঁর 'ভানুসিংহ' বিশেষভাবেই স্মরণ রাখার যোগ্য।

৫

মাত্রাবৃত্ত ছন্দরচনার পথ যেমন একদিকে গঠিত হচ্ছিল, অপরদিকে, দলবৃত্ত (Syllabic) রীতিও কবির অসতর্ক ও স্বাভাবিক বোধের প্রেরণায় ক্রমশঃই একটি রূপ পরিগ্রহ করছিল। ছোটখাটো ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'ম্যাকৃবেথে'র ডাকিনী অংশে এর উদ্ভব। 'সিঙ্গিমামা কাটুম্' প্রভৃতি ছড়ায় তারই পূর্বপ্রয়াস দেখা যায়। ম্যাকৃবেথের ডাকিনীদের উক্তির জন্য যে বিশেষ ছন্দের প্রয়োজন অনুভূত হয়, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দস্যু ও 'কালমৃগয়া'র শিকারীদের উক্তিতেও সে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। যেমন—

আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।

—'বাল্মীকিপ্রতিভা', প্রথম দৃশ্য

এবং, কাল সকালে উঠব মোরা, যাব নদীর কূলে।
শিব গড়িয়ে করব পুজো, আনব কুসুম তুলে।

—'কালমৃগয়া', প্রথম দৃশ্য

'প্রভাতসংগীত' (১২৯০) কাব্যেও উৎসর্গপত্রে এই ছন্দোরীতি প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায়।—

আমায় দেখে আসিস ছুটে
আমায় বাসিস ভালো,
কোথা হতে পড়লি প্রাণে
তুই রে উষার আলো।

—প্রভাতসংগীত, 'স্নেহ উপহার'

'প্রভাতসংগীতে' অবশ্য এই রীতিই একমাত্র অবলম্বন নয়, তাতে 'সন্ধ্যা-সংগীত' পর্বের বিশেষত্বই প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই ছন্দোরীতির শক্তি ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কবিমনের আস্থা যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তারই

প্রমাণ রয়েছে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলির মধ্যে। প্রভাতসংগীতের প্রায় সমকালেই রচিত 'সিন্ধুদূত' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে (১২৯০) বাংলা ছন্দের স্বাভাবিকতা ও তার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর যে অভিমত প্রকাশ হয়, তখনকার দিনের পক্ষে সত্যিই তা বিস্ময়কর। এই রীতির প্রয়োগ এরপরে ব্যাপকতর হয় 'ছবি ও গান' কাব্যে। তার দৃষ্টান্ত যথাস্থানে দেওয়া যাবে। ঐ রীতিরই পূর্ণবিকাশ ও সাফল্য দেখা দিয়েছিল 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যে। বর্তমান প্রসঙ্গে এই কাব্য আলোচনা-বহির্ভূত। কিন্তু তার পটভূমিকাটি যে গঠিত হয়ে চলেছিল তৎপূর্ব যুগটিতেই, তা না বললে এই পর্বের ছন্দ আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। সেইজন্যই দলবৃত্ত রীতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

এই পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল, cop, book-এর যুগেও কবির চিন্তা ও অনুভূতি বারেবারেই নিজের পথ খুঁজে নিতে চাইছে। তারপরেই শুরু হল একদিকে ছন্দোবন্ধ রচনা, অপরদিকে, বাঁধাছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সাধনা।

৬

ছন্দোবন্ধ (verse form) বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্যায়ের (১৮৮১-৮২) কবিতাগুলি রচনা করবার সময় থেকে। সেই সময়ে ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখার যেসব 'ছাঁচ' বা বন্ধ প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হৃদয়ে যখন যে ভাব যে রূপ বা আকার নিয়ে আসে তাকে সে রূপ দিয়েই প্রকাশ করতে লাগলেন। এ বিষয়ে হয়তো রোমান্টিক যুগের ইংরেজি কাব্যগুলির কিছু প্রভাব কার্যকরী হয়ে থাকতে পারে। কারণ, রোমান্টিকতার যুগে ছন্দে এই ধরনের স্বাধীনতা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ্ প্রমুখ দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কবিতা পড়ে এই ধরনের বন্ধ রচনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন, এ অনুমান হয়তো একেবারে অমূলক হবে না। বিশেষতঃ, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসে তিনি বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় লাভ করেছিলেন। এরফলে লাভ হয়েছিল এই যে, "একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস" 'যৌবনের আরম্ভকাল' থেকেই তাঁর জীবনে সহায়ক হয়েছিল।—দ্রষ্টব্য, জী-স্মৃ, 'প্রিয়বাবু' অধ্যায়

সে যাই হোক, রোমান্টিক ইংরেজ কবিদের আদর্শ যথার্থই তাঁর সহায়ক

হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। এ প্রসঙ্গে কবির মত ছিল, ছন্দ জিনিসটা কবির নিজের ভাবপ্রবাহের উপর নির্ভর করবে। তাই তা হবে তাঁর স্বাধীন সৃষ্টি। 'সন্ধ্যাসংগীতে' তারই দৃষ্টান্ত মিলছে ভূরি ভূরি। কবি ছন্দ-সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন—

"ছন্দ কেমন হবে কবিরাই ঠিক করবেন,··· ইংরেজি সাহিত্যে এক-সময়ে ছন্দের ভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কোথাও ব্যতিক্রম হত না। তার পর কোলরিজ প্রভৃতি কবিরা এসে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করলেন, তাঁরা কাটাকাটা ছন্দের ভাগ মানলেন না, কোথাও বেশি কোথাও কম চালাতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তাতে আপত্তি হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁদের প্রথাটাই চলে গেল। সুতরাং ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।"

—'ছন্দবিচার'-১, ছন্দ, পৃ ১২৭

এই যে ছন্দের নিয়ম না মেনে তাকে ভেঙে দেওয়ার প্রথা, তা মাইকেল মধুসূদন, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকদের সময় থেকেই চলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁদের রচনা থেকেও প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভাব ও ধ্বনিবোধের উপর নির্ভর করেই নূতন ছন্দ-ধারা প্রবর্তন করলেন। তাই পুরাতন পয়ার বা ত্রিপদী বন্ধের উপরেও তিনি তাঁর নিজের শ্রুতিবোধকে আরোপ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পয়ারের ৮॥৬ বা ৮॥১০ অথবা ত্রিপদীর ৮॥৮॥৬ বা ৮॥৮॥১০ বন্ধ যদি হতে পারে, তবে পদগুলির মাত্রাসংখ্যা বিচিত্র ধরনেরই বা হবে না কেন? তাই তিনি প্রাচীন রীতি ও ছন্দোবন্ধ নিয়ে বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা করেছেন। এরই ফলে স্বাধীন মুক্তবন্ধ (free form) ছন্দ রচনা করলেন 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'। এরই চরমতর পরিণতি 'বলাকা' ও 'পলাতকা'য়। একেই আমরা 'মুক্তক' বন্ধও বলে থাকি।

বাঁধারীতির বন্ধন থেকে এই মুক্তিলাভের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৯) 'সন্ধ্যাসংগীত' অংশে লিখেছেন—

"এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না, আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।"

এই নূতন আনন্দেই তিনি ঐ গ্রন্থে আবারও বলেছেন, পূর্বে তিনি বিহারীলাল প্রমুখ কবির ছন্দ অনুসরণ করতেন, কিন্তু—

> "সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই।... কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে-জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি।"

আরও পরবর্তী কালে 'আত্মপরিচয়' (অধ্যায় ৫, পৌষ ১৩৩৮) দিতে গিয়ে সন্ধ্যাসংগীতের এই মুক্তবন্ধ (free form) ছন্দের কথা মনে করেই তিনি বলেছিলেন—'আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া।' এই 'লাগাম-ছেঁড়া' ছন্দেই সেদিন তাঁর কাব্যস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল প্রচণ্ডবেগে। তাই বলেছেন, "শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো।"
তার অল্পকাল পরে তিনি হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে (১৩৩৯, কার্তিক ৪) লেখেন—

> "আমার বয়স যখন আঠারো তখন আমি প্রচলিত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামতো ছন্দে কবিতা লিখতে স্রুরু করেছিলুম। আমার সেই ছন্দের কাব্যকে তৎকালীন সাহিত্যের প্রবীণ মুরুব্বিরা 'কাব্যি' বলে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছিলেন।"

—'চিঠিপত্র' নবম খণ্ড (১৩৭১ বৈশাখ), পত্রসংখ্যা ১০১

সন্ধ্যাসংগীতের 'লাগাম-ছেঁড়া' ছন্দই এই উক্তির লক্ষ্য। রচনাবলী-সংস্করণ 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র ভূমিকাতেও (১৩৪৬ আশ্বিন) তিনি বলেছেন, সে সময়কার কবিতা—

> "আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি যখন 'ভারতী'তে প্রকাশ হচ্ছিল, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' (১২৮৮ কার্তিক) ও 'অভিমন্যুবধ' (১২৮৮ অগ্রহায়ণ) নাটক দুটি সম্বন্ধে একটি সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন (১২৮৮ মাঘ)। এই প্রবন্ধে তিনি নাটক দুটিতে ব্যবহৃত গিরিশচন্দ্রের ছন্দের বিশেষ সুখ্যাতি করে বলেছেন, ঐ ছন্দ 'হৃদয়ের ছন্দ'। প্রকৃতপক্ষে, গিরিশচন্দ্রের ছন্দের সঙ্গে সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ ছিল সমগোত্রীয়। তাই তিনি গিরিশচন্দ্রের ভাঙা-ছন্দের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে বলেছেন—

"কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার ও শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"[৮]

সন্ধ্যাসংগীতের মুক্তবন্ধ ছন্দের রূপটি কেমন তা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে—

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসনখানি দেছেন টানিয়া।
পশ্চিমে গিয়াছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

—'দুই দিন', প্রথম স্তবক

আরেকটি দৃষ্টান্ত—

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই-যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।

—'তারকার আত্মহত্যা', প্রথমস্তবক

দেখা যাচ্ছে, এই কবিতাংশগুলিতে ছন্দশাস্ত্রের কোনো পূর্বরীতিই মানা হয় নি, এ ছন্দ সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই রূপটিকে পরবর্তী যুগের মুক্তবন্ধ ছন্দের আদিপ্রকাশ বলে অনায়াসেই গণ্য করা যায়। সন্ধ্যাসংগীতের এই ছন্দ 'প্রভাতসংগীত'-এও অনুবৃত্ত হয়েছে। যেমন—

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

৮ দ্রষ্টব্য: 'মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ', ছন্দ (১৯৭৬) পৃ ২৪৭ এবং ২৯৫-৩০২

আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই কাব্যগুলি 'হৃদয়ের ছন্দে' লেখা, অর্থাৎ এ ছন্দ লিরিক কবিতার উপযোগী হৃদয়ানুভূতির ছন্দ। তাই স্বভাবতঃই লিরিক কবিতার হৃদয়ছন্দ হয়েছে মিত্রাক্ষর। তবে স্থানে স্থানে মিল-বর্জনের অধিকারও রাখা হয়েছে। পরবর্তী কালে 'বন্দী বীর' প্রভৃতি কোনো কোনো কবিতায় এই ভাঙা-মিত্রাক্ষরের অল্পাধিক প্রয়োগ দেখা যায়। অবশেষে এই মুক্তবন্ধ ছন্দ পূর্ণশক্তিতে প্রযুক্ত হয় 'বলাকা' ও 'পলাতকা' কাব্যে। এই দুই কাব্যের ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'বেড়াভাঙা' পয়ার ('গদ্যছন্দ', ছন্দ)। এই 'বেড়াভাঙা' পয়ারই প্রথম দেখা দিয়েছিল সন্ধ্যাসংগীতের 'লাগামছেঁড়া' 'হৃদয়ের ছন্দ' রূপে। আর এই লাগামছেঁড়া, বেড়াভাঙা 'হৃদয়ের ছন্দ'ই পরবর্তী কালে 'পুনশ্চ' প্রভৃতি গদ্যকাব্যে আত্মপ্রকাশ করে মাত্রাসংখ্যা-নিরপেক্ষ 'ভাবের ছন্দ' রূপে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ভাঙা-মিত্রাক্ষরের প্রতি কবির আন্তরিক প্রবণতা থাকলেও ভাঙা-অমিত্রাক্ষর রচনার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। তবে তা গরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মতো নাট্যরচনাসুলভ 'বাগ্ভঙ্গি'র অনুগত নয়, তা লিরিককবিতাসুলভ হৃদয়-ভাবেরই অনুগত। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রায় সমকালে রচিত 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' (১৮৮৭) কবিতাটিতে—

যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,

ওই নয়নের
নিবিড় তিমির-তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।

এ কবিতার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ 'চোদ্দোঅক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার'[৯] বলেছেন। দুঃখের বিষয়, তৎকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যে এইরকম ছন্দের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না।[১০] পরবর্তী জীবনে অবশ্য এর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। সে যুগে কবির আন্তরিক প্রবণতা ছিল ভাঙা-মিত্রাক্ষরের প্রতি। সন্ধ্যাসংগীতেই তার প্রথম প্রকাশ। সেইজন্যই তিনি বলেছেন, 'সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।' এ ছন্দ তৎকালে 'বাজারে' প্রচলিত ছিল না, এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু কবি খেয়াল করেছিলেন কি না জানি না, এই মুক্তবন্ধ মিত্রাক্ষর মধুসূদনের 'সদা ও গদা', 'সূর্য ও মৈনাক-গিরি', 'মেঘ ও চাতক' প্রভৃতি কতকগুলি নীতিগর্ভ কবিতাতে প্রযুক্ত হয়েছিল।

৭

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ছবি ও গান' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"প্রভাতসংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর-একরকম করিয়া শুরু হইল।"

এই উক্তি কবির ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধেও সমভাবে সত্য। সন্ধ্যাসংগীতে ছন্দশিল্পী হিসাবে কবির স্বকীয়তা প্রকাশের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল। প্রভাত-সংগীতেও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। 'ছবি ও গান' কাব্যে দেখা যায় স্বাধীন ছন্দরচনার নূতন প্রচেষ্টা। মনে রাখা দরকার রচনাকালের বিচারে ছবি ও গানের যুগ প্রথম পর্বের পরবর্তী নয়। ছবি ও গানের বেশির ভাগ কবিতার রচনাকাল প্রভাতসংগীতের শেষ কবিতাগুলি রচনার (১২৮৯ ফাল্গুন-চৈত্র) সমকালীন। কিন্তু ছন্দশিল্পের বিচারে যে কাব্যটিতে নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত হয় তাতে সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের পর্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী ছন্দোবন্ধের সংস্কার ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তখনও তিনি মাত্রাস্থাপনের

৯ 'বেড়াভাঙা' ও 'গণ্ডিভাঙা' পয়ার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—ছন্দ, 'গদ্যছন্দ', পঞ্চম বিভাগ, পৃ ২১৯

১০ ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা গণ্ডিভাঙা পয়ার সম্বন্ধে কবি বলেছেন—"ও-ছন্দের কবিতা আরও রচনা করেছিলুম। কিন্তু সেগুলি আর প্রকাশ করা হয় নি।" এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ ১৯৪-৯৫ এবং 'ছন্দ জিজ্ঞাসা', পৃ ২৭৬

পূর্বতন রীতি অনুসরণ করেই চলছিলেন। অথচ, সেকালে প্রচলিত মাত্রা-স্থাপনরীতির কৃত্রিমতা সম্বন্ধেও যে তিনি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনায় (ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ)। ওই সমালোচনায় বলা হয়েছে—

> "ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।··· আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই।"

এর অর্থ এই যে, পূর্বাগত সাধুছন্দে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত শব্দের শেষ হস্ বর্ণটিকে হস্ বলে গণ্য না করে অকারান্ত বলেই গণ্য করা হয়। এখানেই ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ ও ছন্দপাঠের বিরোধ। অর্থাৎ বাংলা সাধুছন্দ ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী নয়, সে ছন্দ কৃত্রিম। কিন্তু রামপ্রসাদ যখন তাঁর কাব্যে বলেন—

মন্‌বেচারির্ কি দোষ আছে
তারে যেমন্ নাচাও তেম্‌নি নাচে।

তখন তাতে হসন্তের মর্যাদা রক্ষা করে স্বাভাবিক উচ্চারণ দেখা যায়। ফলে প্রতি ছত্রে পাওয়া যায় আট-মাত্রা (অতিপর্ব 'তারে' বাদ দিয়ে)। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> "যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"

ভারতীতে এই অভিমত প্রকাশের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন (১২৮৯ ফাল্গুন-চৈত্র)। সেই স্বাভাবিক ছন্দে লেখা কবিতাগুলিই সংকলিত হয়েছে 'ছবি ও গান'-এ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই কাব্যের অন্তর্গত 'স্বাভাবিক ছন্দ' -পর্যায়ের একটিমাত্র কবিতা 'কে' ভারতীতে প্রকাশিত হয়, উক্ত ছন্দ সম্বন্ধে অভিমতসূচক প্রবন্ধটি প্রকাশের পরের মাসেই। কবিতাটির একটি অংশ নিম্নরূপ—

সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে রে।
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।

কবিতাংশটির ঢেউয়ের, চাঁদের, আলোর প্রভৃতি ছয়টি শব্দেই হসন্ত শব্দের হস্ উচ্চারণ রক্ষিত হয়েছে, অকারান্ত শব্দ হিসাবে গণনা করা হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম 'তার'। এই শব্দে 'র'-কে অকারান্ত ধরে নিয়ে একমাত্রা মূল্য দেওয়া হয়েছে। এইজন্যই ছবি ও গান কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন— 'হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোন কোন স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে' অর্থাৎ হসন্ত শব্দকে সাধুছন্দের ভঙ্গিতে পড়লে 'ছন্দের ব্যাঘাত' হবে। ছবি ও গান কাব্যের 'বিরহ' কবিতাটি থেকে দুটি বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে কাব্যটির ছন্দোবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা সহজ হবে :

১. ধীরে ধীরে 'প্রভাত' হল, আঁধার মিলায়ে গেল,
উষা হাসে কনকবরণী।

২. বহিছে 'প্রভাত' বায়, আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল।

দুই দৃষ্টান্তে 'প্রভাত' শব্দটি দুইরকম মাত্রামূল্য পেয়েছে। প্রথম 'প্রভাত'-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক ও তার মাত্রামূল্য দুই। দ্বিতীয় 'প্রভাত'-এর উচ্চারণ কৃত্রিম, তার মাত্রাসংখ্যা তিন।

প্রকৃতপক্ষে, কাব্যটিতে অনেক স্থলেই তিনি কাব্যের প্রয়োজন অনুসারে হসন্ত শব্দের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক উভয়বিধ উচ্চারণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। একই কবিতায় 'প্রভাত' শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ লক্ষণীয়। তা ছাড়া প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই দেখছি 'প্রভাত' শব্দে ধরা হয়েছে দুইমাত্রা, অথচ 'আঁধার' ও 'কনক' শব্দে তিন মাত্রা। ছন্দে মাত্রাগণনার এই স্বাধীনতাই ছবি ও গানের বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই তিনি বলেছেন—"কোনো কোনো গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।" এইরকম হসন্ত শব্দের কখনও স্বাভাবিক ও কখনও কৃত্রিম উচ্চারণের মিশ্রণে রচিত অন্ততঃ এগারোটি কবিতার (কে, দোলা, আদরিণী, খেলা, বিদায়, বিরহ, পাগল, মাতাল, বাদল, আচ্ছন্ন, অভিমানিনী) নিদর্শন 'ছবি ও গান' কাব্যে পাওয়া যায়। কোনো কোনো দৃষ্টান্তে দেখা যায়, হসন্ত বা হস্‌মধ্য শব্দের মধ্যস্থিত রুদ্ধদল কখনও সংকুচিত ও একমাত্রিক, কখনও আবার প্রসারিত ও দ্বিমাত্রিক। যেমন, 'বিদায়' কবিতায়—

১ হাত দুটি তার ধ'রে দুই হাতে
মুখের পানে চেয়ে সে রহিল ;
কাননে বকুল-তরুতলে
একটিও সে কথা না কহিল।

২. গভীর রাতে বাতাসটি নেই, নিশীথে সরসীর জলে
কাঁপে না বনের কালোছায়া ;
ঘুম যেন ঘোমটা-পরা বসে আছে ঝোপে-ঝাপে
পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া।

উচ্চারণের হিসাবে দেখা যাবে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পদে আছে দশমাত্রা। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পদে আছে আট-আট-দশ মাত্রার তিন পদ। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যে-সকল পাঠকের কান আছে, তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর।"

কিন্তু সহজ শ্রুতিবোধ ক'জনের আছে? বোধহয় সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে একমাত্র গীতরচনা ছাড়া এ-রকম নির্দিষ্ট রীতিহীন ছন্দ আর রচনা করেন নি। এই কাব্যে চলতি ও সাধু ছন্দের যে মেলামেশা শুরু হয়েছিল, তা সহজ হয় নি, হয়েছিল এলোমেলোভাবে। পরবর্তী কালে এইজাতীয় ছন্দোরীতি যে কবির কানকে তৃপ্ত করতে পারে নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'ছবি ও গান' কাব্যের বর্জিত কবিতার তালিকায়। ঐ তালিকার নয়টি কবিতার মধ্যে সাতটিই (আদরিণী, খেলা, বিদায়, বিরহ, মাতাল, বাদল, আচ্ছন্ন) উক্তপ্রকার বাঁধাবাঁধিহীন সহজছন্দে রচিত। ছন্দোগত দুর্বলতাই এই বর্জনের অন্যতম প্রধান কারণ।

দেখা গেল, ছবি ও গানের কয়েকটি কবিতায় কবি সহজ হবার চেষ্টায় ও ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে সাধু ও স্বাভাবিক (রামপ্রসাদী) রীতির ছন্দের মেলামেশা ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। এসব ক্ষেত্রে কবি একই কবিতায়, এমনকি একই পঙ্‌ক্তিতে ছন্দের বিভিন্ন রীতি প্রয়োগের স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। এইধরনের স্বাধীন ছন্দোরীতিকে বলা যায় স্বৈরবৃত্ত বা মুক্তবৃত্ত (free style) ছন্দ। সন্ধ্যাসংগীত পর্বে কবি একই কবিতায় বিভিন্ন বন্ধের প্রয়োগ করেছেন। তাকে বলা হয়েছে স্বৈরবন্ধ বা মুক্তবন্ধ (free-form) ছন্দ। ছবি ও গানের কোনো কোনো কবিতায় (যেমন—'পাগল') উভয়বিধ স্বাধীনতাই সমন্বিত হয়েছে। অর্থাৎ সেসব কবিতা একাধারে মুক্তবৃত্ত ও মুক্তবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে 'সিন্ধুদূত' কাব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।" এই পরীক্ষাই তিনি শুরু করেছিলেন ছবি ও গান কাব্যে। তবে তাতে সর্বত্র রামপ্রসাদী রীতি অনুসৃত হয় নি,

প্রচলিত সাধুরীতিতেই প্রয়োজনমত রামপ্রসাদী বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছেন। তার ফলেই মুক্তবৃত্তের জন্ম।[১১] কিন্তু কোনো কোনো কবিতাংশে রামপ্রসাদী ছন্দের এমন বলিষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায়, যা বাংলাছন্দের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্রকাব্যখানিকে স্মরণীয় করে রাখবে। যেমন, 'পাগল' কবিতার একটি অংশ—

যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।
বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধেয়ে,
বনে যেন দুইটি বসন্ত।
দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবন-সাগরের জলে,
কোথাও যেন নাহি রে তার অন্ত।

এই-যে অমিশ্র চলতি রীতির ছন্দ, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। এটাই রামপ্রসাদী ছন্দ। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় দলবৃত্ত ছন্দ। বন্ধের দিক দিয়ে এই অংশটি সাধুরীতির ত্রিপদী বন্ধের ছাঁচে ঢালা।

রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত রীতির প্রয়োগ ছবি ও গান কাব্যেই যে প্রথম প্রয়োগ করলেন, তা নয়। এর পূর্বেও ম্যাকবেথের ডাকিনী অংশের অনুবাদে অথবা বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া প্রভৃতি নাটকে এর ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু সেসব রচনা উঁচুস্বরে বাঁধা নয়। ওগুলিতে লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দকে লৌকিক কায়দায় হাল্কা ভাবের বাহন করেই রাখা হয়েছিল। এই কাব্যেই প্রথম বাংলাভাষার আটপৌরে লঘুছন্দকে গভীর হৃদয়ানুভূতির বাহন হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন—

"In Kshanika, I found my language … I first realized the beauty and music of the colloquial speech. That gave me an extra ordinary sense of joy and power. There had been nothing like it in our literature before. But now we are flooded with it"[১২]

১১ 'ছবি ও গান কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ', ছন্দ, পৃ ৩০৯

১২ Edward Thompson : *Rabindranath Tagore*, 2nd ed. (1948). chapter 15, p 174-75

কিন্তু দেখা যাচ্ছে 'ছবি ও গান' কাব্যেই 'ক্ষণিকা', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যের ছন্দোগত পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেই রামপ্রসাদের যথার্থ উত্তরসূরী বলা যায়। ছন্দের ইতিহাসে ছবি ও গান কাব্যের প্রধান গৌরব দলবৃত্তরীতির প্রয়োগের উপরই নির্ভর করছে, নবোদ্‌ভাবিত মুক্তবৃত্ত ছন্দের উপরে নয়।

পরিশেষে সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত এবং ছবি ও গান সম্পর্কে কবির মন্তব্যটুকু আলোচনা করা প্রয়োজন। হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত এক পত্রাংশে[১৩] কবি বলেছেন, ছবি ও গানের 'ভাঙা-ছন্দ' আসলে ছন্দপতন নয়। অর্থাৎ এ ছন্দ কবির অজ্ঞতা বা অক্ষমতাজনিত নয়, ইচ্ছাকৃত। কারণ কবি 'বালকবয়সেও স্পর্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবিলীলা শুরু' করেছিলেন এবং এই ভাঙাছন্দ সম্বন্ধেই তিনি তাঁর 'লাগামছেঁড়া' ছন্দের কথাও বলেছিলেন। কবির এই ছন্দভাঙার আলোচনাই করা হয়েছে সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীতের মুক্তবন্ধ ছন্দ এবং ছবি ও গানের মুক্তবৃত্ত ছন্দের প্রসঙ্গে।

কিন্তু ঐ পত্রেই বলছেন, রীতিভঙ্গের এই ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও বালককবি প্রচলিত ছন্দোবন্ধ বা ছন্দোরীতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন নি।—

"বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করিনে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে।"

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত এবং ছবি ও গানের ছন্দের প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। সন্ধ্যাসংগীতে ছন্দ ভাঙার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। কিন্তু প্রচলিত বন্ধ অনুসরণ বা নূতন বন্ধ গড়ার প্রয়াস যে একেবারে নেই তা নয়। প্রভাতসংগীতে পূর্ববর্তী বন্ধ রক্ষা করার চেষ্টাই অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কাব্য দুটিতে বন্ধের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এলেও মাত্রাবিন্যাসের প্রচলিত রীতিকেই তিনি মেনেছেন। অপরপক্ষে ছবি ও গান কাব্যে রীতিলঙ্ঘনের প্রয়াস প্রকট, কিন্তু পূর্বতন বন্ধের অনুসরণই বেশি। এইভাবে পুরাতন ও নূতনেব সম্মিলন, ভাঙা ও গড়ার খেলা কবির জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চলেছিল— তা তাঁর পরবর্তী কাব্যসাধনার ইতিহাস থেকেই জানা যায়। ছন্দভাঙার প্রতি কবির এই সমান আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাঁর ছন্দচর্চার প্রথম প্রহরেই। অর্থাৎ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসমৃদ্ধ কাব্যরচনায় যে বিচিত্র ছন্দোবন্ধ ও অজস্র ছন্দোরীতির সমাবেশ দেখা যায়,

১৩ হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ২৯)। দ্রষ্টব্য: 'চিঠিপত্র' নবম খণ্ড (১৩৭১ বৈশাখ ২৫), ৫৯-সংখ্যক পত্র

তার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল কবিজীবনের আদিপর্বেই (১৮৭৪-৮৩)। 'ছবি ও গান'-এর পরবর্তী 'কড়ি ও কোমলে' ছন্দের নূতন পরীক্ষা সমৃদ্ধতর হয়ে দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'মানসী' (১৮৯০) ভাবে-ভাষায়-ছন্দে তাঁর প্রথম যথার্থ কাব্য। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'কেও (১৮৮৬) তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নি। মানসীতে যেমন দেখা দিয়েছে ছন্দের নানা খেয়াল তেমনি কড়ি ও কোমলেও ছন্দ ও ভাষা নানা রূপ নেবার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সন্ধ্যাসংগীতের যুগ থেকেই কবির ছন্দ নূতন সাজে সজ্জিত হতে চাইছিল। ছবি ও গানের যুগে কবির এই চেষ্টা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে

> "চলতিভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে-সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।"
>
> 'ছবি ও গান', সূচনা

কড়ি ও কোমলে ছন্দের সেই পরীক্ষা অনেকখানি সাফল্যলাভ করেছে। তাই রবীন্দ্র-ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে কড়ি ও কোমলের স্থান উপেক্ষণীয় নয়।

'মানসী' থেকে কবির হাতে কলাবৃত্ত (moric) রীতি পূর্ণবিকশিত রূপ লাভ করে, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কড়ি ও কোমলেও সেই সাফল্যের আভাস অপরিলক্ষিত নয়। এই রীতির প্রধান অবলম্বন ছয়-মাত্রার পর্ব। মানসী-পূর্ব যুগে ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদলকে দুইমাত্রার মূল্য দেবার রীতি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাতে কবির কান সায় দিত না। তাই তিনি ষণ্মাত্রপর্বের কবিতায় যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করে চলেছেন, অর্থাৎ শব্দের অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদল বর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কিয়ৎপরিমাণে বিহারীলালের অনুগামী।

প্রকৃতপক্ষে, কড়ি ও কোমলে নব্য কলাবৃত্ত রীতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় 'বিরহ' কবিতাটিতে (১২৯৩)। আধুনিক কালে কলাবৃত্ত রীতির প্রথম গৌরব এই কবিতাটির প্রাপ্য। কবিতাটির—

কত শারদ যামিনী | হইবে বিফল |
'বসন্ত' যাবে | চলিয়া

এই পঙ্‌ক্তিতে 'বসন্ত' শব্দের 'সন্' দলটিতে দুইমাত্রার স্বীকৃতি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের এই রীতির ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে মানসীতে। 'মানসী'র প্রথম কলাবৃত্ত রীতির কবিতা 'ভুলভাঙা'র রচনাকাল (১২৯৪ বৈশাখ) ও 'কড়ি ও কোমলে'র 'বিরহ' কবিতার রচনাকালের (ভারতী ও বালক, ১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন) মধ্যে মাত্র কয়েকমাসের প্রভেদ। তাই 'বিরহ'কে 'ভুলভাঙা'রই পূর্বাভাস বলে গণ্য করা যায়।

মিশ্রবৃত্ত (composite) রীতির ছন্দ নিয়েও কড়ি ও কোমলে নানারকম পরীক্ষা চলেছে। দলবৃত্তের মিশ্রণও ঘটেছে কিছু কিছু। কাব্যের খাতিরে কবি এযুগে স্বৈররীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। অর্ধকলাবৃত্তে প্রধান পরীক্ষা চলেছে বিভিন্ন আয়তনের পদপ্রয়োগ অর্থাৎ বন্ধ রচনা ও সনেট রচনার বৈচিত্র্য নিয়ে। কড়ি ও কোমলেই কবি সনেট রচনায় হাত পাকাতে শুরু করেন। বস্তুতঃ এই কাব্যে সনেট রচনার বৈচিত্র্যই বিশেষ লক্ষণীয়। এই বৈচিত্র্য প্রধানতঃ দুইরকম— পদগঠন ও মিলস্থাপনগত। আট-ছয়-মাত্রার দ্বিপদীই সনেটের প্রধান বাহন। মধুসূদনের সমস্ত সনেটই এই রীতিতে লিখিত। কড়ি ও কোমলের সনেটগুলিরও অধিকাংশ এই রীতির ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু আট আট মাত্রার দ্বিপদী (গান রচনা), আট-দশ-মাত্রার (চিরদিন, রাত্রি) এবং দশ-দশ-মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদীতে (যৌবন-স্বপ্ন, ক্ষণিকমিলন, সন্ধ্যার বিদায়) রচিত কয়েকটি সনেটও দেখা যায়। মিলের দিক্ থেকেও সনেটগুলিতে কবি বহু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

কড়ি ও কোমলে লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতিতেও কতকগুলি কবিতা রচিত হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই 'অসংস্কৃতা' ও 'ভাঙাচোরা'।[১৪] তার কোনো পর্বে আছে পাঁচটি দল, আবার কোথাও আছে তিনদল বা দুইদল। এসব ক্ষেত্রে ছড়ার মতো কোথাও দ্রুত, কোথাও মন্থরভাবে আবৃত্তি করে ছন্দের সমতা রক্ষা করতে হয়।

যেমন 'সাত ভাই চম্পা' কবিতায়—

৪ ৪ ৫ ২
গাছটি কাঁপে । নদীর ধারে । ছায়াটি কাঁপে । জলে—
৩ ৪ ৪ ২
ফুলগুলি । কেঁদে পড়ে । শিউলি গাছের । তলে।

১৪ 'অকৃতবেশা অসংস্কৃতা ছড়া' ও 'ভাঙাচোরা ছন্দ' শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

অথবা,

৪ ৪ ৩ ১
সন্ধে হলে | জোনাই জ্বলে | পাতায় পা | তায়,
৪ ৪ ৩ ১
অশথ্ গাছে | দুটি তারা | গাছের মা | থায়।

আর-একটি দৃষ্টান্ত—

৪ ৪ ৩ ২
নাম রেখেছি | বাব্লা রানী | একরত্তি | মেয়ে।
৪ ৪ ৪ ২
হাসিখুশি | চাঁদের আলো | মুখটি আছে | ছেয়ে।
৪ ৪ ৪ ১
ফুট্‌ফুটে তার | দাঁত ক'খানি , পুট্‌পুটে তার | ঠোঁট,
৪ ৫ ৩ ১
মুখের মধ্যে | কথাগুলি সব | উলোট্ পা | লোট্। …
৪ ২ ৪ ১
"চলি চলি | পা— পা—" | টলি টলি | যায় ,
৪ ৪ ৪ ১
গরবিণী | হেসে হেসে | আড়ে আড়ে | চায়।

—'হাসিরাশি'

দলবৃত্ত রীতিতে বিভিন্ন বন্ধ রচনাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। আট-ছয় মাত্রার সাধারণ দ্বিপদী বন্ধে লিখিত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।' আট-আট ও দশ-দশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদীও আছে, যথাক্রমে 'মা-লক্ষ্মী' ও 'আকুল-আহ্বান' কবিতাদ্বয়ে। চৌপদীর ক্ষেত্রেও দেখি অপূর্ণপদ চৌপদী লিখেছেন 'পুরোনো বট' কবিতায়—

লুটিয়ে পড়ে | জটিল জটা ॥
ঘন পাতার | গহন ঘটা ॥
হেথা-হোথায় | রবির ছটা ॥
পুকুর ধারে | বট I

এই অংশে চতুর্থ পদ অপূর্ণ। অপর পক্ষে, পূর্ণ পদ চৌপদী দেখি 'সারা-বেলা' কবিতায়। এই ধরনের দৃষ্টান্ত খুব কম কবিতাতেই পাওয়া যায়। যেমন—

কোন্ ছায়াতে | কোন্ উদাসী ॥
দূরে বাজায় | অলস বাঁশি ॥
মনে হয় কার | মনের বেদন ॥
কেঁদে বেড়ায় | বাঁশির গানে I

দলবৃত্ত রীতিতে খণ্ডিত পদপ্রয়োগের ফলে যে বিচিত্রতা ও অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে, তাও রবীন্দ্র-কৃত একটি নূতন পরীক্ষা। 'তুমি' কবিতাটি পাঠ করলেই এই নূতনত্ব কারো শ্রুতি এড়াতে পারে না।—

তুমি   কোন্ কাননের ফুল,
  তুমি   কোন্ গগনের তারা।
তোমায়   কোথায় দেখেছি
  যেন   কোন্ স্বপনের পারা॥

এই কবিতায় 'অতিপর্ব' প্রয়োগের রীতিও লক্ষণীয়। অতিপর্ব ব্যবহার করে 'ছন্দের অভ্যস্ত স্পন্দে অভিনবত্ব জাগিয়ে তোলা'ও রবীন্দ্রছন্দের একটা বিশিষ্টতা। কড়ি ও কোমলে দলবৃত্ত রীতিতে লেখা 'তুমি' এবং কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত 'বিরহ', 'বিলাপ' ও 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় অতিপর্ব প্রয়োগের সুষ্ঠু নিদর্শন লক্ষ করা যায়।

বাংলা ছন্দের ত্রিবিধ রীতিই (দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত) প্রকাশ পেয়েছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। তবে কোনো কোনো স্থলে অপরিণতি অবশ্যই আছে। তবুও ভাবে ও ছন্দে কাব্যটির গুরুত্ব অনুভব করে কবি বলেছেন—

"বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।"

—জী-স্মৃ, 'কড়ি ও কোমল'

ছন্দের এই নানা রূপ ধরে ওঠার চেষ্টা বাংলা ছন্দের তিন রীতিতেই দেখা গেল। "এটাও এই কাব্যের ছন্দোগৌরবের পরিচায়ক।"[১৫]

১৫ প্রবোধচন্দ্র সেন: 'কড়ি ও কোমলের ছন্দপরিচয়', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১১৭-২১

এর পরে 'মানসী' রচনার যুগ (১৮৮৭-৯০) থেকে কবি পেলেন পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। এতদিন পর্যন্ত ভাবে-ভাষায়-ছন্দে তাঁর যে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল, তাই শিল্প রূপ ধরে সার্থক হয়ে উঠতে শুরু করল 'মানসী' থেকে।

(২) অলংকার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রসাহিত্যে অলংকার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রেও তিনি ছন্দের মতোই নিয়ম ও নীতিভঙ্গের আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। ছন্দসৃষ্টি সম্পর্কে 'ছন্দবিচার' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, ছন্দ জিনিসটা কবিদের নিজেদের কানের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হওয়া উচিত, কোনো 'অকাট্য নিয়ম' মেনে ছন্দরচনা করা যায় না। এ ব্যাপারে তিনি রোম্যান্টিক যুগের ইংরেজ কবিদের সমর্থন করেছেন— ছন্দালোচনা প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যে অলংকার প্রয়োগ সম্বন্ধেও দেখি, কবি এই নীতিই মেনে চলেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ প্রমুখ কবিরা ছন্দের মতো কাব্যে অলংকার-নির্মাণেও ছিলেন বিদ্রোহী। তাঁরা তদানীন্তন (১৯শ শতক) ছন্দ ও অলংকার-শাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে কাব্যকে করেছিলেন কবির স্বকীয় আনন্দ ও আবেগ প্রকাশের অনুগত। অর্থাৎ তাঁদের যুগে শুরু হল কাব্যে কবির আধিপত্যের যুগ, কাব্যশাস্ত্রের নয়।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিদের কাব্য পড়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়, এ কথা ছন্দপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে মধুসূদন দত্ত প্রথম এই নিয়মভঙ্গের যাত্রাপথ নির্মাণ করেন। কিন্তু তা প্রধানতঃ ছন্দের ক্ষেত্রে, অলংকার প্রয়োগে নয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম কি ছন্দ, কি অলংকার, কি শব্দ-প্রয়োগ সবদিক্‌ থেকেই এই পথকে প্রশস্ত ও জয়যুক্ত করলেন। তাঁর এই অভিযান শুরু হল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই, জীবনের অতি প্রত্যূষে; কখনও চেতনে, কখনও অ-চেতনে।

ছন্দ আলোচনা কালে দেখা গেছে, এ সম্পর্কে কবি জীবনের একেবারে প্রথম থেকে বহু চিন্তা করেছেন, বলেছেন এবং লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ। জীবনের প্রায় ষাট বৎসরে (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর মনে এ চিন্তা বিবর্তিত হয়েছে বারেবারে, স্তরে স্তরে। তাঁর বহু প্রবন্ধ, ভাষণ ও চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে 'ছন্দ' নামক গ্রন্থে।[১৬]

১৬ রবীন্দ্রনাথ : 'ছন্দ' (১৯৭৬), পৃ ২৫৯

আবার, ভাষারীতি নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অলংকার নিয়ে তিনি কখনও সচেতনভাবে চিন্তা করেন নি, কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখেন নি, এমনকি, সামান্য একটি অনুচ্ছেদেও এ নিয়ে আলোচনা করেন নি। 'জীবন-স্মৃতি'তে একবারই মাত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, ছেলেবেলায় পাঠ্যব্যাকরণে তিনি অলংকার শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর মাতৃদেবীর কাছে একটি কবিতাংশ মুখস্থ বলে তাঁকে বিস্মিত করে দিতেন।—

ওরে আমার মাছি!
আহা কী নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর
কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি।

—জী-স্মৃ, 'প্রত্যাবর্তন'

এই অংশটির মধ্যে যে একটা কাব্যিক কৌতুকরস আছে তা তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এতে কী অলংকার আছে, সে অলংকারের নাম কী— এসব বিষয় গবেষণা করার কথা তিনি চিন্তামাত্রও করেন নি। কেবল 'উপমা', 'রূপক' প্রভৃতি একটি দুটি অলংকারের নাম কদাচিৎ করেছেন। কিন্তু তা অলংকার-প্রয়োগার্থে নয়; ব্যাপকতর অর্থে, সাহিত্যিক ভাষ্যকে স্পষ্টতর করতে।

অথচ সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি সমস্ত জীবনে কত অজস্র অলংকার ব্যবহার করেছেন তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তার যদি হিসাব করতে হয়, তবে তা তাঁর ছন্দচর্চার পরিধিকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়।

এ কথা বোধ করি বলতে পারা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যে অলংকার প্রয়োগ কবির শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের, বা প্রণালীবদ্ধ চিন্তার দান নয়, তা তাঁর প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাঁর কাব্য জ্ঞানের নিয়মে সীমিত নয়, তাঁর উপলব্ধির মন্ত্রে ব্যাপ্ত। কবি তাঁর গানে বলেছেন—

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।

তাঁর আরাধ্যকে তিনি তাঁর সুরের দ্বারা পূজা করেছেন, বাস্তবে তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। কবির এই উক্তিকে আমরা তাঁর কাব্যধর্ম সম্বন্ধেও প্রয়োগ করতে পারি। তাঁর কাব্যে যে অলংকারের ঝংকার, তাতে কবির অন্তরটিই পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে— ভাষা দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেবার

দরকার হয় না। রবীন্দ্র-অলংকারের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর প্রাণের কথাটিই যেন অলংকারের দর্পণে স্বতঃপ্রতিফলিত হয়ে পাঠকের কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। তাতে কোনো সংস্কারের অন্তরাল নেই, নেই কোনো কৃত্রিমতার অস্বাচ্ছন্দ্য। ছন্দপ্রয়োগে কবি সচেতন ছিলেন বলে তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই মেপেজুখে চলতে হয়েছে। কিন্তু অলংকারসৃষ্টিতে কবি সম্পূর্ণ অ-সচেতন। তাই তার আবেদন একেবারে মুক্ত ও অকৃত্রিম। তাঁর মন যা বলতে চেয়েছে, তাঁর লেখনী তাকেই তুলে ধরেছে।

এরজন্য অবশ্য কবিকে প্রথমদিকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রকাব্য, তার ছন্দ-অলংকার সবই সেদিন 'নূতন সাজ' পরে এসেছিল, যা 'বাজারে চলিত ছিল না।' তাই পুরাতনপন্থী শাস্ত্রজ্ঞেরা তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। কিন্তু যে-কবির প্রাণ মুক্ত-বিহঙ্গের মতো, তাঁকে খাঁচায় ধরে রাখবে কে! কবি নিজের সৃষ্ট প্রবাহ পথে নিজের তরণী ভাসিয়েছেন। শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছেন সবার উপরে।

যাই হোক, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অলংকার-প্রয়োগের এই বিপুল সম্ভার থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো বিস্তৃত আলোচনা হতে দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছন্দ নিয়ে ভেবেছেন ও লিখেছেন বলে বহু গবেষকও বোধহয় তাঁর আলোচনার সূত্র ধরেই আরও চিন্তা করেছেন, করেছেন রবীন্দ্রকৃত ছন্দের বিশ্লেষণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অলংকার নিয়ে কোনো চিন্তা করেন নি বলেই কি রবীন্দ্র-অলংকারের বিবর্তন সম্বন্ধে কোনো গবেষকও চিন্তা করলেন না? সামান্য দু-একটি আলোচনা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্মতভাবে লিখিত শ্রীজটাধারী মালাকারের 'রবীন্দ্র-কাব্যে অলঙ্কার' গ্রন্থটি ছাড়া এ-বিষয়ে কোনো রচনা দৃষ্ট হয় না। অথচ, অলংকার-প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বকবির মানসিকতার কত বড় একটি দিগন্ত প্রকাশিত হয়েছে তা একটু আলোচনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে অলংকার-প্রয়োগের স্বরূপ বিচার করতে হলে দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থেও তেমন অবকাশ নেই। স্বল্প পরিসরে ও নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে যতটুকু সম্ভব, বর্তমানে সেটুকুর মধ্যেই অলংকার-যোগে কবির উপলব্ধি ও অনুভূতির বিকাশটুকু দেখাবার চেষ্টা করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু পদ্যেই অলংকার ব্যবহার করেন নি; গদ্যেও বহু অলংকৃত বাক্য ও শব্দ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তবে অলংকারগুলি যে তাঁর নিজের সৃষ্টি তা নয়, পুরাতনকেই নূতন করে ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন।

এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রধানতঃ রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি প্রভৃতিকে তিনি বহু ব্যাপক ও বিচিত্র রূপ দিয়েছেন। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত-সহযোগে এই আলোচনার সত্যতা বিচার করা যাক।

২

অলংকার সৃষ্টির নৈপুণ্য ও শব্দচয়নের বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা 'ভারতভূমি' (১৮৭৪) থেকেই দেখা যায়। 'ভারতভূমি'তে উপমার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

সুনীল অম্বরে ঐ ভাসে শশধর।
লইয়া তারকামালা, গগনে করিছে খেলা,
অমরবেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর।

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রোচিত সমাসোক্তির কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে।—

বিধৌত ধরণীতল স্নিগ্ধ চন্দ্র করে।
স্বচ্ছ শ্বেত বাস পরি, অবনী সাজিল মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা ভূতলে, অম্বরে।

অথবা, এই প্রবাহিণী তটে হাসে কুমুদিনী ;
দোলায়ে নীহার হার, গরবেতে বারে বার
মলয় হিল্লোলে স্বল্প দুলে গরবিনী।

সাধারণকেও অসাধারণ করে বলার প্রতিভা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর রচনায় দেখা যায়। মৃদু-বাতাসে আন্দোলিত কুসুমের শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

যবে তুই ফুলবালা, গলে ধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন ;

এই ধরনের অলংকার-প্রয়োগই ক্রমে পরিণতি লাভ করে তাঁর উত্তরকালীন সাহিত্যে। 'ভারতভূমি'র পরে প্রকাশিত 'অভিলাষ' কবিতা থেকে তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য হল আরও নিপুণ ও ব্যাপক। রবীন্দ্রজীবনীকার এই কবিতাটির ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সম্পর্কে 'বালকোচিত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই উক্তিটি যে যথাযথ নয় তা বোঝা যাবে। কবি এক জায়গায় বলেছেন—

তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।

এই অংশটির মধ্যে তিনি বোধহয় অজান্তেই অথচ নিপুণভাবে একটি সমাসোক্তি অলংকার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর পরবর্তী "গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে"—এই গানটির মধ্যে আছে সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, এখানে সমাসোক্তি প্রয়োগই আসল কথা নয়। সমাসোক্তি তো চিরকালীন অলংকার। কিন্তু অভিনব ভঙ্গিতে প্রয়োগ করার কৃতিত্ব আছে ক'জনের? পথের ধারে আসন পাতার পরিকল্পনা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও মনেই উদ্‌বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনা পরিণত বয়সে হয়েছে আরও অনেক সূক্ষ্ম। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে তখন থেকেই তাঁর আপন আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছিলেন, তার দৃষ্টান্ত সর্বদিক থেকেই দেখা গেল 'ভারতভূমি' ও 'অভিলাষ' কবিতাদ্বয়ে।

সমাসোক্তির আরও নূতন নূতন প্রয়োগ দেখি পরবর্তী কবিতাগুলিতেও—

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

—'হিন্দুমেলায় উপহার'

ঐ কবিতাতেই রূপকেরও একটি সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়—

ভারতকঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখনও দিবে রে জ্যোতি।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাতেও দেখা যায় রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের নিপুণ প্রয়োগ। তার প্রথম স্তবকটিতেই রয়েছে তার নিদর্শন—

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

'শৈশবসংগীতে'র অন্তর্গত 'ফুলের ধ্যান' কবিতাটি নামকরণ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই অলংকৃত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।—

মুদিয়া আঁখির পাতা
কিশলয়ে ঢাকি মাথা,
উষার ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি,...
তরুণ রবির অরুণ চরণ
জাগিছে হৃদয় 'পরি।—

এই কবিতাটি যেন সমাসোক্তিরই একটি ব্যাপক পরিমণ্ডলের মধ্যে বহুদলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সে যুগের গান—

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!

অথবা

বলি, ও আমার গোলাপবালা,
তোল মুখানি, তোল মুখানি
কুসুমকুঞ্জ কর আলা।

প্রভৃতিতেও আছে তাঁর অলংকার শিল্পের পরিচয়। আরও কিছুকাল পরে লেখা সন্ধ্যাসংগীতে কবিতার ভাব ও ছন্দ যেমন অনেক উন্নত হয়েছে, অলংকার-প্রয়োগের পরিধিও হয়েছে প্রসারিত।—

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া
মৃদু মৃদু ও কী কথা কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে,
নিখিলের মুখপানে চেয়ে।

—'সন্ধ্যা'

এ যেন, নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা

—কল্পনা, 'অশেষ'

—তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাসোক্তিটিরই পূর্বরূপ। এই সন্ধ্যারই বিদায়যাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি একটি সমাসোক্তি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে—
যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুল কাননে,

চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে ;
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান বধূ যায় বিষাদের বাসর-শয়নে।

—কড়ি ও কোমল, 'সন্ধ্যার বিদায়'

এই পাঁচটিমাত্র পঙ্‌ক্তি যেন সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি ও রূপকের একটি আশ্চর্য চিত্রশালা। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বারবার অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সন্ধ্যার বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'উর্বশী' কবিতার—

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি

অথবা, ঐ কাব্যেরই 'সন্ধ্যা' কবিতার—

সন্ধ্যা আসে শান্তময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা।

এই অংশগুলিতে সন্ধ্যা-বর্ণনার অভূতপূর্ব অলংকৃত দৃষ্টান্ত মেলে। এই 'শান্তময়ী' পূজারিনী সন্ধ্যাটিই সম্পূর্ণ বৈরাগিনীর বেশে দেখা দিয়েছে 'কথা' কাব্যের 'পণরক্ষা' কবিতায়—

গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম মাঠ-পারে

'সোনার তরী'তে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় দেখি সন্ধ্যা যেন নদীস্বরূপা—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা

এখানে কবি সমাসোক্তি-রূপক-অতিশয়োক্তির মালা গেঁথেছেন। তাঁর এই প্রবণতা জীবনের শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। সন্ধ্যার বর্ণনা করতে গিয়ে দেখি তিনি বিভিন্ন অলংকারের সমাবেশ ঘটিয়েছেন 'নবজাতকে'র 'সন্ধ্যা' কবিতায়—

নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার
চিরনববধূ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভৃতে।

এইরকম অসংখ্য বর্ণনা বারেবারে দেখা দিয়েছে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে। কিন্তু, পরিণত বয়সেও তিনি তাঁর এই তরুণ বয়সের চিত্রমালার সৌন্দর্য অতিক্রম

করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও 'কড়ি ও কোমলে'র 'সন্ধ্যার বিদায়' কবিতার এই ছোটো অংশটি সম্পর্কে আর-একটি কথা বলা বোধহয় অবান্তর হবে না। সন্ধ্যার বিদায়ের দৃশ্যে যেন কালিদাসের 'শকুন্তলা' কাব্যের একটি দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। সখীদ্বয়সহ শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। রাজাও নিলেন বিদায়। শকুন্তলা তাঁকে ফিরে ফিরে দেখবার ছলনায় সখীকে ডেকে বললেন—

'অণসূএ অহিণঅকুসসূঈএ পরিকৃখদং মে চলণং
কুরবঅসাহাপরিলগ্‌গং অ বক্কলং।'

অনসূয়ে, নবোদ্‌ভূত কুশাঙ্কুরে আমার পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আর পরিহিত বল্কলখানিও কুরুবকের ডালে জড়িয়ে গেছে।— তাই তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। উক্ত কবিতাংশেও দেখি, সন্ধ্যা যেন শকুন্তলার মতো পিছন ফিরে চাইছে, তার স্বর্ণাঞ্চল জড়িয়ে গেছে বকুলের ডালে। এর থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর শরীরের রক্তস্রোতের মতোই এইসব কাব্যের ভাবনা মিশ্রিত হয়ে প্রবাহিত হত। আর তা স্বকীয় রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করত নূতন নূতন ক্ষেত্রে ও নব নব রূপে।

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। উপমা ও রূপকের মিলন লক্ষ করা যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

উত্তরবায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাঁদিছে শুধু,
"চলে গেল, চলে গেল,
সকলেই চলে গেল গো।" —সন্ধ্যাসংগীত, 'পরিত্যক্ত'

'সন্ধ্যাসংগীতে'র অন্তর্গত ছোট্ট কবিতা 'শিশির'-এ একটি ছোট্ট অথচ অসাধারণ উপমা ও সমাসোক্তির অভূতপূর্ব মিলন দেখা যায়।—

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ—
শিশুটির কল্পনার মতো
জনমি অমনি অবসান?"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ জাতীয় অলংকারের প্রয়োগ অভাবনীয় ছিল বললেই হয়। এইসব উপমা ও সমাসোক্তির আরও একটি দৃষ্টান্ত—

স্তব্ধ বাদুরের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।

মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথবায়,
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।

—ছবি ও গান, 'নিশীথচেতনা'

কবির নূতন নূতন অলংকৃত সম্বোধন তাঁর কাব্যকে করেছে অসাধারণ। প্রভাত সংগীতে 'প্রতিধ্বনি'কে তিনি বলেছেন, 'তুই চিরকবি'। আবার কখনও বলেছেন—

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যামসমান।

—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, পদ ১৯

উপমা ও রূপকের মিলিত সৌন্দর্য দেখা যায় 'কড়ি ও কোমলে'র 'যৌবন-স্বপ্ন' কবিতায়।—

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।

এ ছাড়া 'নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই' রূপকের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় কি? অনুপ্রাসের ব্যবহারও যে কত মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেখি 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্গত 'বাঁশি' কবিতায়—

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।

এই কবিতাংশটির মধ্যে কবির স্বভাবসুলভ সমাসোক্তিটিও আত্মপ্রকাশ করেছে। 'নিশ্চয়' অলংকারের একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখি ঐ গ্রন্থেরই 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতায়—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।

সে যুগে লেখা একটি বিবাহসংগীতের মধ্যে কবি অজান্তেই সৃষ্টি করেছেন একটি 'অর্থান্তরন্যাস' অলংকার।—

ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়।
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে, তোমারি হল জয়—
তোমার কৃপায় এক হল আজি এই যুগলহৃদয়।

—'জগতের পুরোহিত তুমি'

শুধু কবিতায় নয়, অলংকৃত বাক্য ও শব্দের ব্যবহার দেখা যায় কবির প্রথম যুগের গদ্যরচনাগুলিতেও। সে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু ভাষাসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে প্রায়ই অলংকারের ঔজ্জ্বল্যে সে কথাও স্বীকার করতে হবে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গদ্যসৃষ্টির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' থেকেই। গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের তুলনা ও গীতিকাব্যে কবির আন্তরিকতা বিচার করতে গিয়ে তিনি সুন্দর একটি রূপকের প্রয়োগ করেছেন—'গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প।'

এর পরেই দেখি 'ভিখারিনী' ও 'করুণা'তে তাঁর ভাষার লাবণ্য ও অলংকারের ঔজ্জ্বল্য।—

"কমল আলুলিত কুন্তলে, শিথিল অঞ্চলে তুষারে অর্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মতো পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল।"

—ভিখারিনী, প্রথম পরিচ্ছেদ

কবির লেখনীস্পর্শে সাধারণ উপমা অলংকারও হয়ে ওঠে অসাধারণ, রূপক হয় অপরূপ। তাই গল্পের নায়িকা কমলের শারীরিক পরিণতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল।"

—ভিখারিনী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তুষারাবৃত পর্বতের বর্ণনা—

"শৈল-শিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষার-দর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল।"

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তুষারকে তিনি দর্পণের রূপকে সৌন্দর্যময় করেছেন। 'করুণা'তেও কবির বর্ণনা যেমন মনোহারিণী, অলংকার সৃষ্টি তেমনি শিল্পকুশলী।—

"পুষ্করিণীর ধারের পরস্পর-সংলগ্ন অন্ধকার নারিকেল-কুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার রজতরেখা পড়িয়াছে।… আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-

চাওয়ি করিয়া আছে ;··· তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।"

—'করুণা', ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উদ্‌ধৃত অংশটিতে অতি নিপুণহস্তে তিনি সমাসোক্তির ব্যবহার করেছেন। বিরোধ অলংকারের একটি অভিনব প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে—

"কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে!"

এইভাবে তাঁর সাহিত্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কত অসংখ্য অলংকার তিনি কত বিচিত্র রূপসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন! অথচ, তা উৎসারিত হয়েছে তাঁর অন্তরের স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণীটির মতোই, প্রচেষ্টাবিহীন, নির্মলধারায়। তাঁর হাতে চিরাচরিত অলংকারগুলিই পেয়েছিল নতুন ও অভিনব রূপ। আসলে, রবীন্দ্রকাব্যের অলংকার তাঁর কাব্যরসের বহিরঙ্গ নয়, তা রসেরই অঙ্গস্বরূপ। কবিচিত্তে যে মুহূর্তে রসের উদ্‌বোধন হয়েছে, সেই মুহূর্তে অলংকারগুলিও পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সমস্ত জীবনে তিনি যে কত অলংকার ব্যবহার করেছেন তার হিসাব নেওয়াই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম যুগের রচনা থেকে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করা গেল।

(৩) শব্দপ্রয়োগ ও নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তনে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়বস্তু যেমন বিভিন্ন, তেমনি ভাবে ও ছন্দো-বৈচিত্র্যে তা অতুলনীয়। কিন্তু গদ্যশিল্পী হিসাবেও তাঁর প্রতিভা যে কোনো অংশে কম নয় তা অনেকসময়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। গদ্য রচনায় তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র ও বৈচিত্র্য বহু-প্রসারিত ও বহু-শাখায়িত। এমনকি, তাঁর বালকবয়সের সাহিত্য বিচার করলে মনে হয়, তাঁর মনন কখনও বা তাঁর কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেছে। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার স্পষ্ট করেই বলেছেন—

"সেকালে যেসকল গদ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ছিল, এমনকি সেকালের কোন প্রবীণ লেখকের পক্ষেও তেমন রচনা সহজ ছিল না।··· ষোল বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ বৎসর— এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা ও লিখিত প্রবন্ধ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই প্রতিভার আদি উন্মেষ কোন্ পথে হইয়াছে।

বাস্তবিক এত অল্পবয়সে মানসশক্তির (intellect) এমন জাগরণ কবি-জীবনে অতিশয় বিরল। ইংরেজ কবি কীটস্-এর পত্রাবলীতে যে অসাধারণ মানসতীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণবিকাশকালেই ঘটিয়াছিল— রবীন্দ্রনাথের হইয়াছিল আরও অল্পবয়সে এবং কবিশক্তি বিকাশের পূর্বে।”

—কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য. প্রথম খণ্ড (১৩৫৯) পৃ ৩৬

লেখক এই 'মানসশক্তি' ও 'মানসতীক্ষ্ণতা' বলতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতির কথাই বলেছেন। কবি তাঁর এই চিন্তার রাজ্যকে মহিমান্বিত করেছেন যে অসামান্য ভাষায়, ভঙ্গিতে ও অলংকার প্রয়োগে তাও পাঠকবর্গকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করে। অনেকসময় হয়তো বিষয়গুলি হাল্কা, কিন্তু প্রকাশের মনোহারিত্বে তিনি তাকে অমর করেছেন। আবার কখনও বিষয়ও গভীর, আর তার প্রকাশও অভিনব, ফলে তার মূল্যও হয়েছে চিরস্থায়ী। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার প্রবন্ধগুলি থেকেই এর সূচনা দেখা দিয়েছিল। বহু প্রবন্ধে আছে অপূর্ব রূপকের প্রয়োগ। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যের ছোঁওয়া লেগে তা হয়েছে স্বতন্ত্র ও চিরন্তন। প্রকৃতপক্ষে, সবদিক্ থেকে রবীন্দ্র-গদ্যসাহিত্যের বিচার করলে তিনি চিন্তানায়ক হিসাবে শ্রেষ্ঠ, না, শিল্পী হিসাবে মহৎ, তিনি মননসাধক হিসাবে বড়, না, শিল্পসাধক হিসাবে অদ্বিতীয়— তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

তাঁর এই সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের একেবারে প্রথম পর্বে তা মোহিতলালের উক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা ছন্দের মতো বাংলা গদ্য-শিল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই চর্চা করতেন। তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন জীবনস্মৃতিতে। ছন্দোমাধুর্য ও শব্দসৌন্দর্য— এই দুইয়ের প্রতিই ছিল তাঁর সমান আকর্ষণ। ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, 'জীবনস্মৃতি'র একেবারে প্রথম অধ্যায়েই (শিক্ষারম্ভ) তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কৈলাস মুখুজ্জের আবৃত্তি-করা ছড়ার মধ্যে আর-কিছু না হলেও বালকের মন অপহরণ করত সেই 'দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা।' অর্থাৎ শব্দের কারুকার্য ও শব্দপ্রয়োগের বিশেষত্বের প্রতি তাঁর মন ছিল সজাগ। অপরপক্ষে, নূতন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দপ্রয়োগের দিকে তাঁর নিজেরও ছিল সচেষ্ট প্রয়াস। তার নিদর্শন হিসাবে কবি নিজে বলেছেন, নীল কাগজের খাতায় যখন প্রথম কাঁচাহাতে গদ্য লিখতে শুরু করেন, তখন পদ্মের উপরে একটি কবিতা লিখেছিলেন এবং সযত্নে ভ্রমরের পরিবর্তে 'দ্বিরেফ' শব্দটি প্রয়োগ

করেন। তিনি বলেন, 'সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ওই শব্দটার উপরেই আমার আশাভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল।' নবগোপালবাবু ঐ শব্দটি শুনে হেসেছিলেন, তাতে কবি মর্মাহতও হন। তবু ভাবলেন,

"নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন।··· নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে, কিন্তু দ্বিরেফ শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।"

—'কবিতা রচনারম্ভ'

এর থেকে এ কথাই বোঝা যায়, নূতন শব্দপ্রয়োগের প্রবণতা ও সে বিষয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রখর। বিভিন্ন সংস্কৃত ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে ভাষাকে নবরূপে গড়ে তোলার চেষ্টাও তখন থেকেই দেখা দিয়েছিল। অন্যত্র দেখি, তিনি একটি পদ্যে 'নিকটে' শব্দের সঙ্গে মিল দেবার জন্য 'শকটে' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু,

"গুণদাদার প্রবল হাস্যে ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ-পর্যন্ত তাহার আর-কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"

—'বাড়ির আবহাওয়া'

গুণদাদার হাস্য সত্ত্বেও এ কথাটি এখানে প্রতিপন্ন হয় যে, ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করলেও বালক বয়স থেকেই ভাষার অভিনবত্ব সৃষ্টি করার প্রবণতা ছিল সেই 'একঘরে ছেলের মজ্জাগত'। না-জানাকে জানা, গতানুগতিকের মধ্যে অভিনবত্ব দান করা ও অজানা ভাষাকে আত্মস্থ করে তাকে নূতনরূপে প্রয়োগ করার একটা স্পৃহা তাঁর আবাল্য জীবনের ব্রত ছিল বলা যায়। তিনি গোপনে লুকিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' পড়েছিলেন। আর পড়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ', বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু', সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। সাহিত্যের প্রতি অসীম আগ্রহই ছিল তার প্রধান কারণ। তবে বালকের কাছে ভাষা ও শব্দ অনেকক্ষেত্রেই দুরূহ মনে হত। অথচ, তাতেই যেন তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। এ-বিষয়ে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে বলেছেন—

"বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার

ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"

কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক (মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং) পড়ে তাঁর মন কেমন মেতে উঠেছিল তার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন 'পিতৃদেব'অধ্যায়ে।—

"আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিত-দেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল; সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।"

ঐ অধ্যায়েই তিনি বলেছেন, ছেলেবেলায় একদিন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে করতে তাঁর দু'চোখ ভরে কেমন জল আসতে লাগল। এর কারণ আর কিছুই নয়—"অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"

অজানা শব্দের প্রতি এই দুর্বার আকর্ষণের আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আমেদাবাদ বাসের পর্বে। মেজদাদার লাইব্রেরিতে তিনি কত সংস্কৃত ও ইংরেজি বই পড়তেন। সব শব্দের অর্থও বুঝতেন না। ইংরেজি বোঝার জন্য একটা 'ডিক্‌শনারি' ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই ডিক্‌শনারির সাহায্যে তিনি তাঁর ইংরেজি শব্দকোষ বৃদ্ধি করতেন। আর সংস্কৃত কাব্যগুলি কিছু আন্দাজে ও কিছু তার ধ্বনিতরঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কবি উপলব্ধি করতেন।

দেশে বসে কবি ইংরেজি শব্দ ও ভাষা আয়ত্ত করলেন। আর বিদেশে বিদেশিনীকে বাংলা ভাষা শেখাতে গিয়ে দেখলেন,

'ইংরেজি বানান রীতির' অসংযমের মতো "বাংলা বানানও বাঁধন মানে না;··· ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে··· তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম।"

—জী-স্মৃ, 'লোকেন পালিত'

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা আন্তরিক ঔৎসুক্য ছিল। এই ঔৎসুক্যই তাঁকে কালে কালে ভাষায় নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য ও নবকলেবর দান করতে সাহায্য করেছে। তাই পরবর্তী কালে রাবীন্দ্রিক ভাষা বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হল।

ভাষা যে সাহিত্য ও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ তা রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কী এ নিয়ে পরিণত বয়সে তিনি বলিষ্ঠ

আলোচনা করেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩) প্রভৃতি প্রবন্ধে।

২

বালক বয়স থেকেই বাংলাভাষা ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সচেতনতার কারণ কি তা ভেবে দেখা দরকার। এর প্রধান কারণ মনে হয় তাঁর স্বপ্রতিভাজাত আন্তরিক কৌতূহল। এ সম্বন্ধে পরিণত বয়সে তিনি যা বলেছেন, তার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল সেই বালক কালেই এ অনুমান বোধহয় নিরর্থক নয়।—

"ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতিমুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। ...সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর-এক যুগের বাতির মুখে জলতে জলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল।"

—'বাংলাভাষা পরিচয়', ভূমিকা

লেখক এই বিবর্তনের পথ ধরেই ভাষাকে আরও নূতন, আরও আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার ব্রতে আত্মনিয়োগ করলেন জীবনের অতি প্রত্যুষকাল থেকেই। তাঁর এই প্রয়াসে ইন্ধন জুগিয়েছিল সেকালের যুগপ্রভাব। তখনকার দিনে নূতন যুগের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে, নূতন নূতন মনীষীর হাতে বাংলার বাণীরূপ পেয়েছে নিত্যনূতন সাজ। —

"বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ।"

—'বাংলাভাষা পরিচয়', অধ্যায় ৬

এই মনীষীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলের বঙ্কিমচন্দ্র।

"তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল... বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।"

—পূর্ববৎ

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে বলেছেন—

"বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।… পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।"

—আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র'

বাংলা ভাষার সেই 'যৌবন'কালে এই ভাষাসচেতন বালকটির 'হৃদ্‌পদ্ম' বিকশিত হয়ে উঠল। তিনি আপন প্রাণের ভাষা প্রবাহিত করলেন নূতন নূতন খাতে। ছন্দ ও অলংকারের মতো ভাষা-ব্যবহারেও তিনি প্রচলিত ও শাস্ত্রোক্ত রীতির বন্ধনমোচন করলেন।

৩

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের (১৮৭২) পাঁচবৎসর পরে 'ভারতী' পত্রিকার (১৮৭৭) আবির্ভাব। এতদিনে রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছেন। এর পূর্বেই জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁর লেখা প্রকাশ হতে শুরু করেছে। প্রথমাবধিই দেখি তিনি একদিকে তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেও ভাষাকে সহজ রূপ দিয়েছেন, অপর দিকে অতি সাধারণ প্রচলিত শব্দের সাহায্যে ভাষাকে করেছেন গাম্ভীর্যপূর্ণ। তা ছাড়া সামান্য কোনো বিষয়ও তাঁর বলার ভঙ্গিতে মনোহর হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধটি থেকেই দেখা দিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—

"যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়।"

—'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'

এ ভাষায় একদিকে আছে সাধুশব্দের প্রয়োগ, অপর দিকে কল্পনাবিহারী কবির কল্পনাবৈভব। ভাষার এ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ একই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।—

"জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারী কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ।"

—'বাংলাভাষা পরিচয়', অধ্যায় ৫

এর পরেই লেখকের 'ভারতী'তে আত্মপ্রকাশ এবং তাঁর 'অজস্র সহস্রবিধ' রচনায় ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ হতে থাকে। ভারতীর প্রথম বর্ষে শুধু মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনাপ্রবন্ধ প্রকাশ হয়। দ্বিতীয় বর্ষেই তাঁর আমেদাবাদ ও বোম্বাই-বাসের পর্ব, তার পরে বিলাত-গমন। এসময়েই তাঁর ভাষা ও শব্দের সম্পদ্ আরও অনেক বৃদ্ধি পেল সে কথা আগে বলা হয়েছে। ফলে বিষয়ের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও শব্দ-প্রয়োগের বিচিত্র পরীক্ষাও শুরু হল। বলা বাহুল্য, এই বিষয়বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাশৈলীও (prose style) নব নব রূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।—

এই যুগে লেখা 'জুতাব্যবস্থা', 'চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে রূপকের ব্যবহার। ইংরেজ শাসকদের শাসনব্যবস্থার নিয়মাবলীকে বিদ্রূপ করে লেখক বলেছেন 'জুতাব্যবস্থা'। প্রবন্ধটিতে 'ভাঁড়াইয়া', 'জাঁক করিয়া', 'ঠন্‌ঠোনে' প্রভৃতি অতি ঘরোয়া শব্দের ব্যবহার করে লেখক বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন।—

"আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয়টি করিয়া জুতা বরাদ্দ?' আজকালকার বি-এ এম-এরা না কি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইতেছে।"

'চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয়' প্রবন্ধেও রূপকের প্রয়োগ অতি চমৎকার। "যাঁহাদের বুদ্ধি দাঁতওয়ালা, চর্ব তাঁহাদের স্বাভাবিক খাদ্য"; "বুদ্ধির ভোজে নভেলকে তামাক বলে"; "বঙ্কিমবাবুর হুঁকার খোলে অনেকটা কবিতার জল থাকে।"—এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে তিনি একটা হেঁয়ালি প্রবন্ধের মাধ্যমে সাহিত্যিক রসবিভাগ করেছেন। প্রবন্ধটির ভাব সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'জীবন ও বর্ণমালা'য় অতি নিপুণ ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে লেখক জীবনের সঙ্গে বর্ণমালার একটি আশ্চর্য সমন্বয় দেখিয়েছেন।—

"এই পণ্ডিত প্রবর [কোনো-এক পণ্ডিত মহাশয়] আজ পঁচিশ বৎসর, বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশুদের কর্ণধার হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান তরঙ্গিণী পার করিয়া আসিতেছেন। যদি কোনো শিশু বিভূতির ভাঁটায় এক পা পিছাইয়া পড়ে, তবে তাহার কর্ণ ধরিয়া এমন সুন্দর ঝিঁকা মারিতে পারেন যে, সে আর এগোইবার পথ পায় না। "উঃ" "ইঃ" "আঃ" প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি অতি সহজে, সতেজে ও সমস্ত মনের সহিত উচ্চারণ করাইবার জন্য তিনি অতি সহজ কতকগুলি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন।··· ইংরাজদের ও আমাদের বিবাহ পদ্ধতির কি প্রভেদ, তাহা দেখিতে মনুও খুলিতে হইবে না, ইতিহাসও পড়িতে হইবে না ; বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বাহির হইয়া পড়িবে। ইংরাজী বর্ণমালায় 'L' অক্ষরের পর 'M' অর্থাৎ Love এর পর Marriage। আমাদের বর্ণমালায় "ব"-এর পর "ভ" অর্থাৎ বিবাহের পর ভালবাসা।"

এইভাবে মাত্র ষোলো-সতেরো বৎসর বয়সে অতি সাধারণ বিষয়কে ভাষা ও ভঙ্গির কারুকার্যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ও অভূতপূর্ব রূপ দিয়ে বাংলার সাহিত্যসভায় শুধু যে একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র আসন দখল করলেন তা নয়, কোনো কোনো বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা অধিকার করতেও সমর্থ হলেন।

৪

এদিকে বিলেতযাত্রার পথে জাহাজ থেকে শুরু করে বিলেত পৌঁছে সেখানকার জীবনযাত্রা, আদবকায়দা বর্ণনা করে তিনি 'য়ুরোপ-যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' লিখে ভারতীতে পাঠাতে লাগলেন। এই পত্রগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এগুলি চলতি রীতির গদ্যে লেখা। ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন—

"আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনদের সহিত মুখামুখি এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।"

এরই স্বপক্ষে অন্যত্র বলেছেন—

"য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলাসাহিত্যে চলতিভাষায় লেখা

বই এই প্রথম।... বাংলা চলতি ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

—'প্রবেশক', পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, এই বইটিই চল্‌তিভাষার প্রথম নিদর্শন। বাংলা চল্‌তি গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় তিনি প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য যে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন (১৮৫৪) তার প্রধান লক্ষ্য ছিল,

"যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।"

'আলালের ঘরের দুলাল'ও (১৮৫৮) এই ভাষাতেই রচিত হয়। কিন্তু প্যারীচাঁদের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত ও ফারসী শব্দের প্রাধান্য ঘটে এবং "দোষের মধ্যে প্রধান হইতেছে একই সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলতিরূপের ব্যবহার।"[১৭] তাই প্যারীচাঁদের ভাষাকে চলতিভাষার নিদর্শন বলে গণ্য করা যায় না। আলালের ভাষা আসলে সরল সাধুভাষা, তবে মাঝে মাঝে চলতি ভাষার ভঙ্গি ও চলতি ক্রিয়াপদের মিশ্রণ ঘটেছে। অপরপক্ষে, প্যারীচাঁদের পরবর্তী কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষায় স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা অনেক বেশি। খাঁটি কলকাতার ভাষা তিনি অবিরাম গতিতে লিখেছেন। তাঁর ভাষায় মার্জিত ভাব বিশেষ পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাতে সাধুভাষার মিশ্রণ নেই, আছে, "কথ্যভাষার প্রধান গুণ সরসতা, লঘুতা এবং অদম্য প্রাণশক্তি।"[১৮] রবীন্দ্রনাথের হাতে এই চল্‌তি ভাষাই প্রকাশ পেল পরিমার্জিত ও শিল্পসম্মত রূপে। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'মুখোমুখি' কথা বলার ভাষা বলেছেন, তা আসলে যথার্থ মুখের ভাষা নয়, পরন্তু সাহিত্যে ব্যবহার্য মার্জিত রুচির চল্‌তি গদ্য। একদিকে সাধু ও সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগে ভাষাকে কখনও গাম্ভীর্যদান করেছেন, আবার কখনও সাধারণ মৌখিক শব্দ ব্যবহার করে তাকে সরল রূপ দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য পরিষ্কার হবে।—

"যে ঘরে থাকতেম সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারি দিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র।... তখন

১৭ সুকুমার সেন: বাংলাসাহিত্যে গদ্য (১৩৭৩), পৃ ৭৬

১৮ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: বাংলাগদ্যরীতির ইতিহাস (১ম সং, ১৩৭৪), পৃ ১৬৭

অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে— সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে, যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে— সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।"

—'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', প্রথমপত্র

এ ভাষা কথা বলার ভাষা নয়। এতে সাধু শব্দ আছে, আবার সাধারণ ব্যবহারের ভঙ্গিটিও প্রযুক্ত হয়েছে। সব মিলে এটি হয়েছে সাহিত্যিক চল্‌তি-রীতির গদ্য। এই রীতিটিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দান করা ছিল লেখকের জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পরিণত বয়সে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী—সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রানী, একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর-একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা··· রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতিভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে গোয়ালের ধারে···। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায়, আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।"

—'বাংলাভাষা পরিচয়', অধ্যায় ৯

জীবনের শেষ প্রান্তে লেখা তাঁর এই গ্রন্থেও দেখি চল্‌তিভাষার প্রতিষ্ঠা দানে কবির সংকল্প; তখনও তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আশা ছাড়েন নি। তাই প্রথম বয়স থেকেই য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে ভাব অনুযায়ী, বিষয়ানুযায়ী ভাষাকে রূপদান করতে তিনি চেষ্টিত হয়েছিলেন। আরও সহজ অথচ কবিত্বপূর্ণ, কবিতাজাতীয় ভাষাও তিনি ব্যবহার করেছেন পত্রগুলিতে।—

"তুমি যদি এখানে আসতে, ভাই, তা হলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে, সমুদ্রের ঢেউ গুনতে গুনতে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধেবেলায় সাগর-বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের 'পরে গাছের তলায়— গল্প হত, হাসি

হত— ঠাণ্ডায় যদি কাশি হত বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম।”

—দ্বাদশ পত্র

ছোট ছোট বাক্যে কবিত্বময় বর্ণনার পরিচয় পাই নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

“আমরা এখন Devonshireএর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বলে একটা নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনও দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই— চারি দিক হাস্যময়। চারি দিকে সবুজবর্ণ, চারি দিকে গাছপালা, চারি দিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে।”

—দ্বাদশ পত্র

এইসব বর্ণনাগুলির মধ্যে যেন কবিতার ছন্দ অনুভব করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবানুযায়ী রুচির আভিজাত্য ও পরিচ্ছন্নতা-পূর্ণ সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত।

প্রসঙ্গক্রমে প্রায় সমকালেই স্বামী বিবেকানন্দের হাতে রচিত চল্‌তি গদ্যের উৎকর্ষের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর রচনা-প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা (১৮৯৭)। ঐ পত্রিকাতেই স্বামীজার দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় ‘বিলাতযাত্রীর পত্র’ নাম দিয়ে। পরে ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থে পত্রগুলি সংকলিত হয়। এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ভাষা অতি বেগবান্ ও প্রাণশক্তিপূর্ণ। বিবেকানন্দের মনে যেমন ছিল প্রবল উদ্যম ও প্রাণশক্তি, তাঁর ভাষাও ছিল তেমনি সাবলীল ও বলিষ্ঠ। বিবেকানন্দের ভাষা সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের মতো মার্জিত ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন নয়, আবার কালীপ্রসন্নের মতো আটপৌরে বা অশালীনও নয়। দুইয়ে মিলে তার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থের “সুয়েজখালে : হাঙ্গরশিকার” অংশটি এই উত্তেজনা ও প্রাণ-পূর্ণ রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন।

যাই হোক, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও শব্দ-ভাণ্ডারকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করে দিলেন। এই যাত্রাপথেই কিছুকাল পরে রচিত হয়েছিল ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’ (সাধনা ১২৯৮-৯৯)। এই গ্রন্থের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত চলতিভাষায় লেখা। তবে তার ভূমিকাটি যখন লিখলেন তখনও তা রচিত হল চলতিগদ্যেই। এই প্রথম চলতিভাষায় লেখা গভীর ভাবাত্মক রচনা। কবি দেখালেন যে, গভীর চিন্তামূলক বিষয়ও মুখের ভাষায় লেখা যায়, শুধু চিঠিপত্রেই তা সীমাবদ্ধ নয়। চলতিভাষার ইতিহাসে তাই ‘য়ুরোপ-যাত্রীর

ডায়ারি'র একটি বিশেষ স্থান আছে। তবে চলতিভাষার সমগ্র ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ-বিষয়ে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের চেয়েও অগ্রণী ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থদ্বয়। শব্দগুলিকে সহজ ভাবে ও ভাষায় প্রয়োগ করার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ কেউ (প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ) কিয়ৎপরিমাণে করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের হাতে সর্বত্র ভাষার সমতা বা সৌষ্ঠব রক্ষিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সে কাজটি করলেন পূর্ণাঙ্গরূপে। তিনি নিজেই বলতেন, বাংলাভাষার বাক্যগঠন এমন যে, ভাষা যেন এলিয়ে পড়তে চায়। ভাষার এই দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য তিনি চিরকালই সচেতন ছিলেন।

৫

রাবীন্দ্রিক ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, বিষয় অনুযায়ী ভাষাকে যথাযোগ্য রূপ দেওয়া। অর্থাৎ রচনাশৈলীগত (style) সাম্যের দিকে তাঁর সচেতনতা ছিল খুব বেশি। তাঁর একেবারে বাল্যরচনা, যেগুলি তিনি চিরদিনই বর্জনীয় মনে করতেন— সেই 'ভিখারিনী' গল্প বা 'করুণা' উপন্যাসও ভাষা-গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ মর্যাদা লাভের অধিকারী। 'ভিখারিনী' গল্পটির প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই রাবীন্দ্রিক ভাষার স্বকীয় ভঙ্গিটি পরিস্ফুট হয়েছে।—

> "কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী, জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপ্‌ঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি দুইটি শীর্ণকায়, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটীরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া, এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলট্‌পালট্‌ করিয়া নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী, নিস্তরঙ্গ সরসী, লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তর-বিন্যস্ত মেঘ-মালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে।"

সমস্ত গল্পটিই প্রায় এরকম অলংকৃত, সুশোভিত, মাধুর্যময় ভাষায় গঠিত। সুকুমার সেন বলেছেন, ভিখারিনীর 'কাহিনী যতটা কাঁচা ভাষা ততটা নয়।' কিন্তু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। এর ভাষায় যে সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতা আছে তা তাঁর পরিণত-রচনাতেও সবসময় সুলভ নয়।

'করুণা' উপন্যাসে কয়েকটি হাস্যরসাত্মক বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের মনের প্রকাশ ঘটেছে সহজ ভাষা ও সরল শব্দপ্রয়োগে।—

> "দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন, সরিতে গিয়া একরাশি হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন, হাঁড়ির উপর কলসি পড়িল, কলসির উপর হাঁড়ি পড়িল, এবং কলসি হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল, হাঁড়িতে কলসিতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল, এবং কলসি হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল।"
>
> —পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও হাস্যজনক এবং স্বাভাবিক ও ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন উপন্যাসটির পণ্ডিত-মহাশয়ের চরিত্রচিত্রণ ও বিবাহবর্ণনায়। দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ দীর্ঘায়ত করা অনাবশ্যক।

৬

বর্তমান আলোচ্য পর্বের এক প্রান্তে দেখি, ভিখারিনী-করুণা-য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, আর অন্য প্রান্তে বালক পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৯২) 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধ ও কতগুলি হেঁয়ালি নাট্য। ভাষারীতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে এই রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বালক পত্রিকায় প্রকাশিত দশদিনের ছুটি, সরোজিনী-প্রয়াণ, রুদ্ধগৃহ, পথপ্রান্তে, লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাশিল্পের নিদর্শন বলে গণ্য হবার যোগ্য। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধগুলি আরও কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে সংকলিত হয় 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারস-সম্ভোগে।"

ঐ ভূমিকাতেই তিনি আরও বলেছেন, গ্রন্থটির 'বাজেকথা' প্রবন্ধটির মধ্যেই এই বক্তব্যের যথার্থ প্রকাশ। অর্থাৎ 'বাজেকথা' নিয়েও যে সাহিত্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখালেন। তাঁর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি রচনায় এই শ্রেণীর গদ্যরচনার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য শুধু যে শিল্পসৌন্দর্যে মনোহর তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে কাব্যিক মর্যাদা লাভেরও অধিকারী। এই বিশেষত্ব রবীন্দ্রপূর্বযুগের বাংলা গদ্যে প্রায় অভাবনীয়। পরবর্তী যুগের রচনা 'পঞ্চভূতে'ও কবি গদ্যশিল্পসৃষ্টির অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সাধারণ কথাকে শিল্পের অভিনব

ভঙ্গিতে তিনি অসাধারণ রূপ দিয়েছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলিকে সেদিক্ থেকে 'পঞ্চভূতে'র অগ্রদূত বলা যায়।

বর্তমানে আলোচ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে' ও 'লাইব্রেরি'র বিষয়বস্তু গভীর চিন্তামূলক। এইসব চিন্তা কবির সমগ্র জীবনের বিভিন্ন পর্বে নানাভাবে বারেবারে দেখা দিয়েছে; কিন্তু বালককালের এই রচনাগুলি সুন্দর ভঙ্গি ও অলংকৃত ভাষা-গুণের জন্যই চিরকালীনতার মর্যাদা পেতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যাক।—

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত।··· কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে।··· অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।"

—'লাইব্রেরি'

আরও একটি উৎকৃষ্ট ভাষার নিদর্শন দেওয়া যায় যাতে অলংকারের বাহুল্য নেই, কিন্তু ভাবে আছে অলংকারের গভীরতা।—

"মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে; পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মতো খেলা করে।"

—'রুদ্ধগৃহ'

ভাবের গভীরতাকে ভাষার সহজতার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে বলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। অপর দিকে, 'দশদিনের ছুটি', 'সরোজিনী-প্রয়াণ' প্রভৃতি রচনায় অসামান্য প্রাকৃতিক রূপবর্ণনা লক্ষ করা যায়।—

"সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে একেকটা মুণ্ডের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল। আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া যেন পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে। আকাশে উড়িবার

জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না ; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে।··· চারিদিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকা চুলের মতো দেখাইতেছে।··· দূরে দূরে এক একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

—'দশদিনের ছুটি'

আবার অন্যত্র দেখি—

"জাহাজ অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ঢেউগুলি চারি দিকে লাফাইয়া উঠিতেছে— তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে ; গর্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে ; স্পর্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে··· একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুল্‌কুল্‌ শব্দে, মৃদুমৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে।"

—'সরোজিনী-প্রয়াণ'

কবি-প্রাবন্ধিকের লেখনীর স্পর্শে এই ভাষা এমন মহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, পাঠককে যেন স্তব্ধ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, এই গদ্যাংশগুলিকে সময়ে সময়ে কাব্য বলেও ভ্রম জন্মায়। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকে কত বিচিত্ররূপে, কত বিভিন্নভঙ্গিতে কত অপরূপত্ব দিয়েছিলেন তা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন। কিন্তু সেই পরিস্ফুট রূপটি যে জীবনের প্রথম পর্বেই প্রায় বিকশিত অবস্থায় দেখা দিয়েছিল তা সাধারণতঃ আমাদের নজরে পড়ে না। 'বালকে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এদিক্‌ থেকে 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির চেয়ে স্বতন্ত্র। 'ভারতী'র প্রবন্ধগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়ের বৈচিত্র্যে গৌরবান্বিত, তবে গদ্যরীতির বৈষম্যও স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। অপর দিকে, বালকের প্রবন্ধগুলি বিষয়ের গুরুত্বে যাই হোক, গদ্যপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত।

এই প্রবন্ধগুলির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'বালক' পত্রিকায় কতগুলি হেঁয়ালিনাট্য ও ব্যঙ্গকৌতুক প্রকাশিত হতে থাকে। বিষয়ের বৈচিত্র্য, ভাবের নবীনত্ব ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে সেগুলির ভাষা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ভাবে ও ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যেমন এই জাতীয় রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়

না, তেমনি পরবর্তী কালে বহু প্রহসনাদি লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। একমাত্র সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বা 'হ-য-ব-র-ল'-তে হাস্যরসের খোরাক মিলেছে প্রচুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনাগুলির সঙ্গে তা এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত হবার মতো নয়। 'ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য' প্রভৃতি নামকরণ বা 'পেটে খেলে পিঠে সয়' প্রভৃতি সাধারণ উক্তির মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় রচনাগুলিতে একদিকে আছে ভাবের হেঁয়ালি, অপর দিকে ভাষার সহজ ও স্বাভাবিক রূপ। ঘরোয়া, মৌখিক শব্দপ্রয়োগ ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই তিনি এনেছেন অসাধারণতা।

এই রচনাগুলির প্রায় সমকালেই 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯২ বৈশাখ) 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক রচনাগুচ্ছ একেবারে স্বতন্ত্র রীতি ও বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

"সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে। কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল? ·· প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপর পড়িয়াছে!"

অন্যত্র আছে,

"কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে না হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কী উৎসবময় বলিয়া মনে হইত।··· আজি ঐ বাঁশি শুনিয়া প্রাণের এক জায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে সকল উৎসব আরম্ভ হয় সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়।"

মৃত্যুর শোকে কবির গদ্য যেন সহজ ভাষায় অতি মধুর ও আবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সহজ শব্দ ও সরল রীতি প্রয়োগ করেও যে ভাষাকে কবিতার পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, 'পুষ্পাঞ্জলি' তার অন্যতম নিদর্শন।

এর পরেই তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র পালা। ছিন্নপত্র ভাষায়, ভাবে বাংলায় এনেছিল এক নূতন জোয়ার, সে কথা প্রায় সকলেরই জানা। তারই সূচনা হল এই পর্বটিতে। ছিন্নপত্রও পত্ররচনা। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে তিনি যে চিঠি লেখার আদর্শটি স্থাপন করলেন, ছিন্নপত্রে তা যেন আরও স্বাভাবিক রূপ ধরে প্রকাশ পেল। এ প্রসঙ্গে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

"আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার

গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেক্ড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ঘড়্‌-হুড়্‌মুড়্‌— হৈহৈ, সেই মাছি-ভন্‌-ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম।"

—ছিন্নপত্র, দ্বিতীয় পত্র

এ ভাষা একেবারে মৌখিক দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা। আবার ঐ পত্রেই রাবীন্দ্রিক রীতির বিশিষ্ট দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—

"আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোষ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিণী তাকিয়া— সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে··· আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে— কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুইবাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ···।"

এই সাধারণ বিষয়কে বিশেষভাবে প্রকাশ করার রীতিটিই 'ছিন্নপত্র' তথা রবীন্দ্ররচনার বৈশিষ্ট্য। শুধু গদ্য নয়, কবিতাতেও তাঁর ভাষাসৃষ্টির অভিনবত্ব দেখা যায় প্রতি পদক্ষেপে।

এই আলোচনা থেকে মোটামুটি দেখা গেল, মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকেও করেছেন পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত। আমাদের গতানুগতিক ভাষা নানা বেশে নানা শব্দে সজ্জিত হয়ে বারেবারে দেখা দিয়েছে নানা রূপে। পুরাতনকে নতুন করে সাজিয়ে পাঠককে উপহার দেওয়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাজ। প্রচলিত আটপৌরে ভাষাকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া, আবার সাধুভাষাকে সাধারণ জীবনে নামিয়ে আনা— এ কাজ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনই করেছেন এই কর্মের সাধনা। পরিণত বয়সে ভাষা নিয়ে লিখেছেন দুটি গ্রন্থ— শব্দতত্ত্ব (১৯০৯) ও বাংলাভাষা পরিচয় (১৯৩৮)। আর তাঁর এই পরিণত ভাষাচিন্তা নিয়ে অনেক গবেষক আলোচনা করেছেন; আধুনিক বাংলার ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও সাহিত্যেকরা লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে সংকলিত 'রবীন্দ্রায়ণ' গ্রন্থটিতেই রয়েছে তার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। শ্রীভবতোষ দত্ত-রচিত 'বাংলাগদ্য ও রবীন্দ্রনাথ', শ্রীসুকুমার সেনের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষাব্যবহার', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্‌লাভাষা' ও শ্রীঅমলেন্দু বসু-রচিত

'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষাশিল্প ও শব্দ-ব্যবহারের বিশিষ্টতা নিয়ে তাঁরা বিদগ্ধ ও সচিন্ত্য আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ কবির পরিণত গদ্য ও ভাষা-চিন্তাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। অথচ, বাল্যকাল থেকেই তাঁর ভাষাবৈচিত্র্য কিভাবে ক্রমপরিণতি লাভ করছিল সে-সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ পর্যন্ত একটিও হয়েছে বলে মনে হয় না। এই অধ্যায়ে সে-যুগের গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ ও ভাষাশিল্প সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা করা গেল।

নবম অধ্যায়

উপসংহার

হিমাদ্রি-শিখর থেকে গঙ্গানদীর অবতরণ। তার পর ক্রমশঃ বহুশাখায়িত ও বহুবিস্তৃত হয়ে দেশদেশান্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে সাগরবক্ষে। জনপদবাসী তারই করুণাধারায় তৃপ্ত ও পুষ্ট হয়ে তীরে তীরে বিস্তৃত করেছে নিজেদের ঐশ্বর্য ও সভ্যতা। কিন্তু তাদেরই মধ্যে যিনি যথার্থ ভৌগোলিক অনুসন্ধানী, তিনি তার গতিপ্রবাহ, তার প্রকৃতি, এমনকি, তার যথার্থ উৎসস্থল অনুসন্ধান করতেও ক্রটি করেন না।

রবীন্দ্ররচিত সাহিত্যরসে আজ সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যপিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্ত। কিন্তু এই সাহিত্যরসের যথার্থ স্বরূপটি কী এবং তার উদ্‌ভব সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টি না জানলে এই পিপাসা পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের কাজে আজ আর গবেষকের অভাব নেই। কিন্তু বাংলার ইতিহাসের নিশাবসানকালে সেই বিশ্বসাহিত্যকে জাগিয়ে তুলতে যে উদ্‌বোধন-মন্ত্রের অতন্দ্র সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল, তার পরিচয় আজও অনেকাংশেই অজ্ঞাত রয়ে গেছে।—

"ফুৎকার বাঁশির এক-একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছেন?··· সেই-যে সুরটা, সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে যে-একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ১

কবি তখন নিতান্তই শিশু। একদিকে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক আন্দোলনের যুগ, অপর দিকে সাহিত্যে এসেছে নবজোয়ার। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের আদর্শে দেশ জেগে উঠেছে, আর বঙ্কিম-মধুসূদন দেশবাসীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন সাহিত্যের নূতন নূতন ধারায়, নিত্যনূতন স্রোতে। এই পরিস্থিতিতে সর্বদিক্‌ থেকে সেদিন অগ্রগামী ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। আর তাঁদেরই কোল উজ্জ্বল করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সব মিলিয়ে সেদিন এই শিশুটিকে মানুষ করে

তুলতে দেশের একটি পূর্ণ পটভূমি নির্মিত হয়েই ছিল। আর তারই সঙ্গে যুক্ত হল শিশুটির অসাধারণ প্রতিভা। –

"বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষপর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে ; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়।··· ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল।···সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল। বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষভাবে দীক্ষিত করেছে।"

—কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'

এই দীক্ষামন্ত্রেই বালককবির অন্তরটি ক্রমশঃ বিকাশলাভের পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

২

কৈশোরের প্রারম্ভেই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবিই নন, নাটক প্রবন্ধ, গান ও গল্প-উপন্যাস রচনা— সর্বদিকেই তাঁর প্রতিভা সদা সচেতন ও সক্রিয়। আর কবিতা বা গদ্যরচনা করতে গেলে যে ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধেও সজাগ থাকা দরকার, সে বিষয়েও তিনি অনবহিত ছিলেন না। ফলে সর্বতোমুখী সচেতনতা নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়-কোরকটি উন্মীলিত হতে শুরু করল। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, নবজাগ্রত বাংলাসাহিত্যের যুগে বহু-সংখ্যক রথী কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধসাহিত্যের রথ ছুটিয়ে চলেছিলেন আপন আপন পথে। আর সেদিনকার সাহিত্যভারতীর কনিষ্ঠ সন্তানটি মুগ্ধবিস্ময়ে দেখছিলেন সেই অপূর্ব দৃশ্য, আকণ্ঠ পান করছিলেন তৎকালীন বহুধা-উৎসারিত সাহিত্যরস। কিছুকাল পর্যন্ত তিনি সেকালের সাহিত্য-রথীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। কিন্তু তার পর তাঁকে কে যেন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নূতন দিকে, নূতন পথে। কবি আপন পথে বিভ্রান্ত হয়েই যেন মনে করেছেন—

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়—
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগল-বেশে।

—চিত্রা, 'অন্তর্যামী'

বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পূর্ণ-উদ্ভাসিত পটভূমিকাটি পিছনে রেখে তাঁর 'অন্তর্যামী' তাঁকে যে পথে চালনা করলেন তা একান্তই তাঁর স্বকীয়। মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন—

"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

অর্থাৎ সহস্রগুণে ফিরিয়ে দেবার জন্যই রবি (সূর্য) বিভিন্ন জায়গা থেকে রস বা বাষ্প গ্রহণ করেন। সেদিনকার বাংলার শিশু 'রবি'ও স্বদেশী-বিদেশী বহু সাহিত্যের রস স্বাঙ্গীকৃত করছিলেন, সহস্রগুণে বর্ষণ করার জন্যই। এ ধারা-বর্ষণ পরিপূর্ণ হয়েছিল তাঁর পরিণত বয়সে। কিন্তু সূচনা না থাকলে পরিণতি সম্ভব নয়। এই আত্মপ্রকাশের সর্বাঙ্গীণ সূচনাই এই যুগের সার্থকতা।

পরিণতির যুগে কবি যখন নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল এই সূচনাপর্বটি নেহাতই কচিবয়সে আত্মপ্রকাশের নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র। তার ফলে জমে উঠেছিল শুধু অনুকরণের স্তূপীকৃত আবর্জনা, সযত্ন-সংরক্ষণের অযোগ্য। কিন্তু এই বর্জিত স্তূপের মধ্যেও যে সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে, সে উপলব্ধিও তাঁর মনে কখনও কখনও দেখা দিয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই··· পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। · বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না।

তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ।"

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায়-১

পরবর্তী জীবনে তিনি এ কথাও উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর সাহিত্যরসসৃষ্টির ফলে বাংলার সাহিত্যজীবনে বসন্তের মুকুল প্রস্ফুটিত হয়। শীতের জীর্ণতা ঘুচে গিয়ে সাহিত্য-বনে ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল। 'রবি'র পূর্ণ উদয়ে বাঙালীর জাতীয়জীবনে তমসাময় নৈশপর্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। সেই আনন্দেই কবি গেয়েছিলেন—

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।···

৩

প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কবি সেদিন খণ্ড করে, ক্ষুদ্র করে দেখেছিলেন বলেই বোধহয় আশার মধ্যেও এসেছে তাঁর নিরাশা, হতাশা। তাই কবির হৃদয় বলে উঠেছে—

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীনবেশ।

'আশা'কেই তাঁর 'নিরাশা'র মতো 'বিষণ্ণবদন' বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু নৈরাশ্যই জীবনের অবলম্বন হতে পারে না। তাই 'সন্ধ্যাসংগীতে'র তরী নিয়েই কবি অন্ধকারের অকূল পাথার অতিক্রম করে পৌচেছেন প্রভাতের তীরে। "কাঁচাবয়সের মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে", কিন্তু মনের 'তরল' অবস্থায় সেগুলি "ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা" হয়েই প্রকাশ পাচ্ছিল (সূচনা, প্রভাত সংগীত)। তবু তরল হলেও তাঁর অন্তরের অবরুদ্ধ নির্ঝরের 'স্বপ্নভঙ্গ'ও হয়েছে। তিনি উন্মুক্ত হৃদয়ে জগতের রূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বারেবারে 'প্রভাতসংগীতে' 'ছবি ও গানে'— জীবনকে দেখতে চেয়েছেন অখণ্ডরূপে। সেই আবেগেই তাঁর হাতে সৃষ্ট হয়েছে নাটকের রূপ, গানের বাণী। একদিকে বাল্মীকির

কবিত্বলাভের আদর্শ তাঁর মনকে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ করেছে, অপর দিকে, গানে গানে কখনও তিনি দেবতার পায়ে আত্মনিবেদনের সুর অঞ্জলি দিয়েছেন, কখনও ভাবে বিভোর হয়ে অজানাপ্রিয়ার উদ্দেশে নিবেদন করেছেন তাঁর হৃদয়ের প্রেম। এককথায়, বিচিত্র ভাবধারায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন শাখায়। অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষকে ও জীবনকে জানতে চেয়েছেন সহজভাবে—কল্পনালোক থেকে বাস্তবলোকে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। তাই ভাষায় ও ছন্দে, কল্পনা ও বাস্তবে মিলেমিশে আলো-আঁধারি পথে কবি পা বাড়িয়েছেন। 'ছবি ও গানে' তাঁর এই অবস্থাটা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

স্বপ্ন, তুমি এস কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি।
ওই-যে মায়ের কোলে মেয়েটি ঘুমায়ে আছে,
একবার নিয়ে যাও ওদের প্রাণের কাছে।
দেখিব কোমল প্রাণে সুখের প্রভাতহাসি
সুধায় ভরিয়া প্রাণ কেমনে বেড়ায় ভাসি।

—ছবি ও গান, 'নিশীথচেতনা'

তিনি কখনও স্বপ্নলোকে, কখনও এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করবার জন্য আগ্রহী। তখনও নিশ্চিতপথের সন্ধান পান নি। তবে ক্রমশঃই এই পৃথিবীর প্রতি তাঁর অনুরক্তি দেখা দিচ্ছিল। এইভাবেই "'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।"

কড়ি ও কোমলেই কবি সোজাসুজি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। একদিকে এই কাব্যের কবিতাগুলিতে, অপর দিকে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে তিনি এই পৃথিবীকে যেন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চাইলেন। কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে ভরা জোয়ারের স্রোতে তিনি যৌবনকে পেতে চেয়েছেন 'কড়ি ও কোমল'-এ। আবার পৃথিবীতে মৃত্যুর যে কঠিন বাস্তবতা তাও তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন সমকালীন কবিতা, গানে, প্রবন্ধে। এককথায়, রবীন্দ্রজীবনের এক একটি বিশেষ ধারা ও বিশেষ বাণী ক্রমশঃ রূপ পরিগ্রহ করতে চেয়েছে এই সময় থেকেই (১২৮৮-৯৩)।—

"জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।"

—জী-স্মৃ, 'কড়ি ও কোমল'

ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

—কড়ি ও কোমল, 'প্রাণ'

প্রধানতঃ এই আশা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর কাব্যের ভাষা ও ছন্দ স্বকীয় রূপ পেতে থাকে।

৪

এই পর্যন্ত গেল কবির উপলব্ধির একটি পর্ব। এর পরেই তিনি যেন নিজেকে পেলেন আবার নূতন করে। কবির জীবনে মোড় বদল হয়েছে বারেবারে, সে কথা তিনি নিজেও বলেছেন। এই নূতন পর্বে তিনি তাঁর আপন সত্তাকে উপলব্ধি করলেন মানসদৃষ্টিতে, শুরু হল 'মানসী' রচনার পালা।

"পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নতুন কাব্যরূপের প্রকাশ। ···নতুন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নব দেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না।··· কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[১]

'পূর্বতন রচনাধারা'টিকে কবি বর্জন করলেও জীবনের এই পর্বটিকে বিস্মৃত হতেও পারেন নি। যে মাটিতে এতদিন তিনি তাঁর অন্তরপ্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন তার স্বরূপটি বারেবারে বোঝাতে চেয়েছেন সমকালীন রচনায়, 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি' এবং 'আত্মপরিচয়ে'। কিন্তু যেদিন তাঁর মানস-প্রতিমা পূর্ণ রূপ পেল সেদিন তিনি এই বিশ্লেষণের কাজ থেকে ছুটি নিলেন।

১ মানসী, সূচনা

"মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।" তাই 'খাসমহলের দরজার কাছ পর্যন্ত' এসে কবি 'জীবনস্মৃতি'র সমাপ্তি টেনেছেন।

'মানসী' থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত কবির অন্তরকে বোঝবার ও বোঝাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। তাই বর্তমান আলোচনাতে সেই ব্যাখ্যা থেকে নিরস্ত থাকা গেল। কিন্তু যে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া হল, যে ভিত্তির উপর সৌধ রচিত হল, তার স্বরূপ ও শক্তি বিচার করার প্রাথমিক কাজটুকুও নিতান্তই মূল্যহীন নয়। তাই বর্তমান গ্রন্থে 'মানসী'-প্রতিমা গড়ার পূর্বে কবির প্রস্তুতিপর্বটির মূল্য নির্ণয় করার প্রচেষ্টা করা গেল।

একদিকে তাঁর কবিস্বরূপ উপলব্ধির অশান্ত প্রচেষ্টা প্রশান্তি লাভ করল 'মানসী' রচনার পর্বে (১৮৮৭-৯০)। এইসঙ্গে নাট্যধারাও প্রবাহিত হয়ে পরিণত রূপ পরিগ্রহ করল 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) ও 'বিসর্জনে' (১৮৯০)। আর অপর দিকে, তাঁর মননপ্রচেষ্টা ভাবে ও ভাষায় স্বপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠা পেল 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে (১৮৯১)।

'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনার মধ্যে দিয়ে লেখকের নাট্যরচনার হাতেখড়ি। তবে ভগ্নহৃদয়ে কাব্যগুণই ছিল নাটকের চেয়ে বেশি। তাই গ্রন্থটির আলোচনাও করা হয়েছে কাব্যালোচনার অধ্যায়ে। রুদ্রচণ্ডেও নাট্যরস অসম্পূর্ণ রয়েছে। কবি নিজ প্রতিভার আলোকেই বুঝেছিলেন সেগুলি যথার্থ নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। আসলে এগুলি সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীতের মতোই 'অবরুদ্ধ-আলোকে' লেখা। সেখানে "নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।"

'তার পরের অবস্থায় মনের মানুষের স্পর্শ লাগল', রচিত হল 'ছবি ও গান'। নাট্যসাহিত্যে "এই পথে প্রথম দ্বার খুলেছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না।" 'গানের ছাঁচে ঢালা নয়' অথচ নাট্যলক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে এমন সর্বপ্রথম নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। এই নাটকে মানবজীবনের অন্যতম পরম সত্য প্রকাশিত হল নাট্যরূপ ধরে— 'শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক।'[২] অর্থাৎ লেখক তাঁর কাব্যগুলির মতো নাটকেও ক্রমশঃ মানবজীবন-রসের সন্ধানে সার্থকতার পথে অগ্রসর হলেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ, সূচনা

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'র সুরই ব্যাপকতর রূপে দেখা দিল 'রাজা ও রানী'তে। লেখকের মতে এর 'নাট্যভূমি'তে 'লিরিকের প্লাবন' দেখা দিয়ে নাটককে দুর্বল করলেও 'রাজা ও রানী'তে নাটক দেখা দিল 'বড়ো আকারে' এবং "যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।" আসলে নাটকটিতে তখনও 'তরলতা' মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করলেও কবির নাট্যচিন্তা ক্রমপরিণতির দিকেই অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটককে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে লেখেন 'তপতী' নাটক (১৩৩৬)। ঐ নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেন, 'রচনার দোষে' রাজা ও রানী নাটকের মূল ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি— এই 'ত্রুটি' তাঁকে বহুদিন ধরেই 'পীড়া' দিচ্ছিল।—

> "স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।"

বলা বাহুল্য, আঙ্গিক বা আর কোনো কোনো দিকে তপতীর সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু রাজা ও রানীতে কবি সে যুগেই যে সাফল্য লাভ করেছিলেন— তা ভাবগতই হোক, আর নাটকীয় সংঘাতের ব্যাপারেই হোক, তার সার্থকতাও কোনাদিন ক্ষুণ্ন হয় নি। তপতী পরিণতির চিন্তায় উন্নততর; কিন্তু যৌবনের সূচনায় রাজা ও রানীর যে স্থান তা-ও ম্লান হবার নয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও জমাট হয়েছে বিসর্জনে। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের যে চিরন্তন আদর্শ তা সার্থকতর হয়েছে 'বিসর্জনে'র নাট্যরসের মাধ্যমে। 'বিসর্জন'-এর কাল থেকেই কবির অন্তরের নাট্যকার রূপ ক্রমশঃ স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং তাঁর বিশিষ্ট অভিনয়-প্রতিভাও হয়েছে তীক্ষ্ণতর।

অপর দিকে প্রাবন্ধিক ও ভাষাশিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথ সাগরসংগমে উপনীত হয়েছেন 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে। এই পর্বের মধ্যে দুইবার বিলাতযাত্রার (১৮৭৮ ও ১৮৯০) ফলে সমাজ, জীবন ও দেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেকখানি প্রসারিত ও বিবর্তিত হয়েছিল। সেযুগে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব যখন আমাদের দেশে এসে পড়ে, আবির্ভাব হয় রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর, তখনই বালক রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, নূতন ও পুরাতন সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে বিদেশী সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার ফলে সে ধারণা

স্পষ্টতর হয়। তার পরেই বিলাতযাত্রা ও য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী রচনার শুরু। য়ুরোপের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয় পত্রগুলিতে এবং 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হতে থাকে। ফলে গ্রন্থটিকে একাধারে ভ্রমণকাহিনী ও সামাজিকচিন্তার প্রকাশক্ষেত্র বলা যেতে পারে। এর পূর্বেও কোনো কোনো প্রবন্ধে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থেই তার সর্বপ্রথম স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সুশৃঙ্খল প্রকাশ।

তারপর দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রার পর য়ুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত তিনি লিখলেন 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে ('সাধনা' ১২৯৮ ৯৯)। কিন্তু বিলাত থেকে ফেরার পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সম্বন্ধে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন জাগতে থাকল। 'য়ুরোপের অন্ধ গতি ও ভারতের অন্ধস্থিতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়', এই দুই দেশের কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জনীয়, এই সব চিন্তা তাঁকে অধীর করে তুলল। তিনি তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করলেন 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র 'ভূমিকা'[৩] হিসাবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলনই ছিল তাঁর কাম্য। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই গভীরচিন্তা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করলেন চলতিরীতির গদ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রায় কাছাকাছি সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছিলেন 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থদ্বয়। গ্রন্থদুটিতেও একদিকে আছে ভ্রমণের কাহিনী, অপর দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে সমন্বয়-সাধনের আগ্রহ। তাঁর রচনাগুলিও চলতিভাষার আশ্রয়েই লিখিত। একই যুগে বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর হাতে একইভাষায় ও চিন্তায় লেখা গ্রন্থগুলি বাংলা দেশ তথা সাহিত্যের ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব ও পশ্চিম দেশের সভ্যতার যথানুপাতিক সমন্বয়েই দেশের উন্নতি হতে পারে, এ বিষয়ে দুই মনীষীই ছিলেন একমত। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> "অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন-যাপন

৩ চৈতন্য লাইব্রেরিতে পঠিত— ১২৯৮ বৈশাখ ১৬

রবীন্দ্রগদ্যগ্রন্থাবলী প্রকাশকালে (১৯০৭-০৯) য়ুরোপ-যাত্রীর 'ডায়ারি' অংশ 'বিচিত্রপ্রবন্ধে'র অন্তর্গত করা হয় এবং ভূমিকাটিকে দুইভাগে ভাগ করে একাংশ 'নূতন ও পুরাতন' নামে 'স্বদেশ' গ্রন্থে এবং অপর অংশ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'সমাজ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উভয় অংশ একত্রে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে সংকলিত।

করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়।··· রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতুস্থাপন করিয়াছেন।··· দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন।··· বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

—সমাজ, 'পূর্ব ও পশ্চিম'

বলা বাহুল্য, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মিলনের পথে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের ইতিহাস যে মনীষী রচনা করলেন, তিনিও ছিলেন সেই ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র যুগ থেকে। আর তাই প্রবাহিত হয়ে এসেছিল তাঁর জীবনপথের শেষ সীমা পর্যন্ত। এই চিন্তা-প্রকাশের বাহন যে ভাষা তাকেও তিনি তাঁর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূর। এ-বিষয়ে বিবেকানন্দও ছিলেন তাঁর সমকক্ষ এবং হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রণী। বিবেকানন্দের ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রাণবন্ত ও প্রখর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। কিন্তু পরিণামে রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী ও বহুদূরপ্রসারী।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে যে মননশীলতার সূচনা, শেষজীবন পর্যন্ত সেই ধারাই ছিল তাঁর চিন্তাক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাহন। সর্বচিন্তার উদ্ভব একই সময়ে সম্ভব নয়। কিন্তু অগ্রবর্তী ও পরবর্তী বহু চিন্তাধারাই যে এইভাবে জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ছিল, সে ধারণাটি এখান থেকেই করে নেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি তারই প্রতিভূ ও ভূমিকা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য।

কাব্যে-গানে-নাটকে-প্রবন্ধে-উপন্যাসে এবং হাসি-কান্না-আনন্দ-বিষাদ ও শোক-বেদনায় যে রবীন্দ্রসাহিত্য আজও বিশ্বের সম্মুখে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার

করে আছে, দেখা গেল, তারই প্রায় সর্বাঙ্গীণ উন্মেষ ঘটেছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই (১৮৬১-৮৬)। তাই রবীন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণরূপে জানার জন্য জীবনের এই অংশটি একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। পরবর্তী চারবৎসরে (১৮৮৭-৯০) সেই প্রাথমিক রূপটি পূর্ণ বিকাশ লাভ ক'রে বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে দিল।

উৎস-নির্দেশ

রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঐ পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন রচনাবলীও ব্যবহার করতে হয়েছে বহুবার। বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা-প্রসঙ্গে যথাযোগ্যস্থানে ও 'পরিশেষে'র তালিকায় সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ করলে তালিকার আয়তন অতি দীর্ঘ হয়ে যাবে বিবেচনায় সেগুলি বর্জিত হল। আদিপর্বের যে-সব রচনা তৎকালীন পত্রিকাগুলির অন্তর্গত হয়ে আছে, তার মধ্যে 'বঙ্গদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতী', 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'অমৃতবাজার', 'বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার মূল দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে।

বর্তমানে রবীন্দ্রগ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল। বিভিন্ন লেখকের নাম ও তাঁদের রচনাবলীকে যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে গ্রন্থগুলির পরে প্রবন্ধগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থগুলির যে-সংস্করণ ব্যবহার করবার সুযোগ হয়েছে তার তারিখ এবং প্রবন্ধগুলি কোন্ পত্রিকায় ও কবে প্রকাশিত হয়েছিল তাও সেইসঙ্গে উল্লিখিত হল।

অজিতকুমার ঘোষ: বাংলা নাটকের কথা ১৩৬৮

অমলেন্দু বসু: 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা', রবীন্দ্রায়ণ ১ম খণ্ড, পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত, ১৩৭২ মাঘ

অমিতাভ চৌধুরী: 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক', দেশ, শারদীয় ১৩৭৭

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য: বঙ্কিমকৃত সাহিত্য সমালোচনা— দুষ্প্রাপ্য রচনা-সংগ্রহ ১৩৮১

অমিয়কুমার সেন: প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৩৬৮

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস ১৩৭৪

অরুণ বসু: 'রবিরশ্মি ও রবিচ্ছায়া', কবি ও কবিতা, শারদীয়া ১৩৮২

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৬৭; বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ১৩৭৩

আদিত্য ওহ্‌দেদার: 'রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' পাঠভেদের পুনর্বিচার', অমৃত ১৩৭৯ বৈশাখ

আনন্দমোহন বসু: বাংলা পদাবলীর ছন্দ ১৯৬৮

আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড ১৯৬১; রবীন্দ্রনাট্যধারা ১৩৭৩
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী: 'রবীন্দ্রস্মৃতি', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ মাঘ-চৈত্র
উজ্জ্বল মজুমদার: 'ফরাসী ও বাংলা সাহিত্য: মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮২ মাঘ-চৈত্র
কানাই সামন্ত: রবীন্দ্রপ্রতিভা ১৯৬১
কালিদাস নাগ: 'রবিচ্ছায়া', মাসিক বসুমতী ১৩৫৭ আষাঢ়; 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব', প্রবাসী ১৩৪৯ ফাল্গুন
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (রাহু): মিঠে ও কড়া ৫ম সংস্করণ, ১৯০২
কালীপ্রসন্ন ঘোষ: 'কবিকাহিনীর সমালোচনা', বান্ধব ১২৮৫, ১০ম সংখ্যা; 'রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা', বান্ধব ১২৮৮, ৩য় সংখ্যা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত রবীন্দ্র-বিতান (১৩৬৮) গ্রন্থে সংকলিত
গুরুদাস ভট্টাচার্য: বাংলা কাব্যে শিব ১৯৬১
চন্দ্রনাথ বসু: পত্র, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ বৈশাখ
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: রবিরশ্মি— পূর্বভাগে ৪র্থ সংস্করণ ১৩৫৯
জগদীশ ভট্টাচার্য: 'পুষ্পাঞ্জলি ও লিপিকা', কবি ও কবিতা ১৩৮১ বৈশাখ
জীবেন্দ্রকুমার গুহ: 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধের আদিপর্ব', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ আষাঢ়
জ্যোতির্ময় ঘোষ: রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায় ১৩৭৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় -প্রণীত ১৩২৬ ফাল্গুন
দেবীপদ ভট্টাচার্য: রবীন্দ্রচর্যা ১৯৭৩
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: স্বপ্নপ্রয়াণ ১৮৭৫
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত: 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণবকবিতা', প্রবাসী ১৩৩৯ বৈশাখ
নীহাররঞ্জন রায়: রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ১ম খণ্ড ১৩৫১
পম্পা মজুমদার: রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস ১৯৭২
পশুপতি শাশমল: স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য ১৩৭৮
পুলিনবিহারী সেন: রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী ১৯৭৩;
'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র', দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি, ১৩৬৯

প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দজিজ্ঞাসা ১৩৮১ বৈশাখ ; ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩৫২ আষাঢ় ; বাংলার ইতিহাস সাধনা ১৩৬০ ভাদ্র ; ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ ১৩৬৯ কার্তিক ; ভারতবর্ষের জাতীয়সংগীত ১৩৫৬ বৈশাখ ;

'অগ্রদূত', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ় ; 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদিকথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৯ শ্রাবণ-আশ্বিন ; 'উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৭ কার্তিক-পৌষ ; 'কড়ি ও কোমলের ছন্দপরিচয়', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ ; 'ঝান্‌সীর রাণী', আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ বার্ষিক সংখ্যা ; 'বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ', কালি ও কলম ১৩৭৯ বৈশাখ ; 'বাংলায় জাপানী ছন্দ', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৯ মাঘ-চৈত্র ; 'বাণী ও বীণা', গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮ বৈশাখ ২৫ ; 'ভোরের পাখি', শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ, জয়ন্তী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ ; 'ভোরের পাখি' দ্বিতীয় পর্যায় : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ কার্তিক-পৌষ ; 'মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়', রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত ১৯৬৫ ; 'রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ', দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৪ ; 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', শশিভূষণ স্মারকগ্রন্থ ১৩৭৪, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ; 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা', বেতার জগৎ ১৯৬৩ সেপ্টেম্বর ১-১৫ ; 'রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ ; 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ', কথাসাহিত্য ১৩৭০ ফাল্গুন , 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ', দিব্যদর্শন ১৩৭৬ আশ্বিন ; 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়', বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ, আজাহারউদ্দিন খান্‌ ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ১৯৭৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১৩৮০ ; ভারতে জাতীয় আন্দোলন ১৯৬৫ ; রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ১৯৭০, ২য় খণ্ড ১৩৫৫ ;

'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী', রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, ১৯৬৫

প্রমথনাথ বিশী : বাংলা সাহিত্যের নরনারী ১৯৬৬ ; রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১৩৭৭ ; রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ ১৩৭৩ ; রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১৩৬১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিবিধপ্রবন্ধ ১ম খণ্ড
বিমানবিহারী মজুমদার : রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ১৩৬৮
বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত : 'বাংলা থিয়েটারের বয়ঃসন্ধি ও ঠাকুরবাড়ির নাট্যালয়', দেশ ১৩৮০ বৈশাখ ২২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয় ১৩৫০ ; 'আলোচনা', প্রবাসী ১৩৫০ বৈশাখ

ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী ১৯৬৬ ;
'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩৭১ প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা ; 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রায়ণ ১ম খণ্ড ১৩৭২ মাঘ

ভূদেব চৌধুরী : বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার ১৯৬২
মহম্মদ মনসুর উদ্দীন : হারামণি ১৯৪২
মোহিতলাল মজুমদার : কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ১ম খণ্ড ১৩৫৯ ; বাংলার নবযুগ ১৩৫২

যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত ১৯৬৮
রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী : 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা', দেশ ১৯৭৬ মে ২৯

শরৎকুমারী চৌধুরানী : 'ভারতীর ভিটা', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস ১৩৬৮ ; বাংলাসাহিত্যের নবযুগ ১৩৬৩

শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত ১৩৪৯ ;
'রবীন্দ্রনাথের একটি গান', দেশ ১৩৬০ চৈত্র ২৬

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ১৩৬২
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ১৩৮০ ; রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা ১৩৭২

শ্রীমন্তকুমার জানা : 'হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনীসভা এবং রবীন্দ্রনাথ', কালি ও কলম ১৩৭৬ ভাদ্র

সজনীকান্ত দাস : রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য ১৩৬৭
সরোজকুমার বসু : রবীন্দ্ররঙ্গ ১৯৭৩

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রনাথের একটি নবাবিষ্কৃত কবিতা' (আলোচনা), দেশ ১৯৭৬ জুলাই ২৪

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় ও ৩য় খণ্ড ১৩৭৬; বাংলাসাহিত্যে গদ্য ১৩৭৩;

'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার', রবীন্দ্রায়ণ ১ম খণ্ড ১৩৭২ মাঘ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাভাষা', রবীন্দ্রায়ণ ১ম খণ্ড ১৩৭২ মাঘ

সুশান্তকুমার মিত্র : 'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা', অমৃত ১৯৭৫ জুন ২৫-জুলাই ১৮; পুস্তিকা ১৯৭৫ অক্টোবর; 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা', অমৃত ১৯৭৬ জুলাই ২ ও ৯

স্মরণকুমার আচার্য : 'রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস', দেশ ১৩৬৯ শ্রাবণ ১৯

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন :-অনূদিত, রামায়ণ ১ম খণ্ড, ভারবি সং ১৩৮২ বৈশাখ

Edward Thompson : Rabindranath Tagore, 2nd Ed. 1948

Bimanbehari Majumdar : Heroines of Tagore 1968

Bipinchandra Pal : Memories of My Life and Times 1932

সম্পাদিত-গ্রন্থ

দেবীপদ ভট্টাচার্য : গিরিশ রচনাবলী ২য় খণ্ড ১৯৭১

নীলরতন সেন : রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলনগ্রন্থ ১৩৬৮

প্রবোধচন্দ্র সেন : রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' ৩য় সং ১৯৭৬

ভবতোষ দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ১৯৬৮

বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ : সাহিত্যসাধকচরিতমালা

এই গ্রন্থমালার অনেক গ্রন্থই ব্যবহার করেছি। বাহুল্যবোধে এই তালিকায় খণ্ড-সংখ্যা উল্লেখ করলাম না। গ্রন্থের বিভিন্ন আলোচনায় যথাস্থানে সেগুলির পরিচয় আছে।

নির্দেশিকা

এই নির্দেশিকা কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত; প্রতিটি বিভাগই বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। রবীন্দ্র-রচিত গ্রন্থের সঙ্গেই গ্রন্থভুক্ত কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি দেওয়া হল। অন্যান্য রচয়িতার রচনা 'সাহিত্য : অন্যান্য' বিভাগে সংকলিত। কবিতা বা গানের ছত্র এবং প্রবন্ধের নাম : ' '-চিহ্ন ও পাদটীকার বিন্দু চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হল।

ব্যক্তি

সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ

কাব্য

গান

উপন্যাস

গল্প

প্রবন্ধ

ভ্রমণকথা

চিঠিপত্র

সাহিত্য : অন্যান্য

অলংকার

পত্রপত্রিকা

আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনা যে-সব বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা 'পরিশেষ'-এর তালিকায় নির্দেশ করা হয়েছে।

বিবিধ

পরিশেষ

রবীন্দ্ররচনা-পরিচয়

আদিপর্ব

(১৮৭৪-৮৮)

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রতিটি কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার বা প্রথম প্রকাশের কালক্রম, উল্লেখযোগ্য পাঠপরিবর্তন, গ্রন্থভুক্তি বা বর্জন ইত্যাদির পরিচয়সূচক একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

এই তালিকায় প্রতি অব্দের সঙ্গেই উক্ত সময়ে রচিত বা প্রকাশিত রচনা-সংখ্যা মুদ্রিত হল। যেসব রচনা ধারাবাহিকভাবে একাধিকবার প্রকাশিত সেগুলির ক্রম-সংখ্যাও মোট সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই তালিকায় প্রধানতঃ বাংলা তারিখই অনুসরণ করা হয়েছে। যেসব স্থলে মূলতঃ ইংরেজি তারিখ আছে, সেসব স্থলে ইংরেজির সঙ্গে বাংলা তারিখও নির্দেশ করা গেল।

তালিকাটি প্রণয়নে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের অনুসরণ করেছি তারও একটি তালিকা দেওয়া গেছে 'উৎস-নির্দেশ' অংশে। তবে প্রায় সর্বত্রই মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। এ-জাতীয় সামগ্রিক তালিকা পূর্ণাঙ্গ-রূপে প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নয়। এ-রকম অনালোকিত পথযাত্রায় সর্বত্র সমভাবে নিঃসংশয় হতে পারি নি, হওয়া সম্ভবও নয়— এ কথা বলে রাখা কর্তব্য। এই তালিকাতে সমগ্র রচনাবলীর যে মোট সংখ্যা নির্দিষ্ট হল, তা নিখুঁত বা চূড়ান্ত এ কথা বলার দাবিও রাখি না। এ বিষয়ে গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে নিশ্চিততর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কিছু অবকাশ এখনও রইল।

বর্তমান তালিকায় দেখা যাচ্ছে : ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৪ বছরে (বয়স ১৩ থেকে ২৭) রবীন্দ্রনাথের মোট ২৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসটি (৮ সর্গ) ৭ কিস্তিতে, 'কবিকাহিনী' কাব্য (৪ সর্গ) ৪ কিস্তিতে ও 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস (৪০ পরিচ্ছেদ) ১২ কিস্তিতে সম্পূর্ণ হয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া 'ভগ্নহৃদয়' (৩৪ সর্গ) কাব্যটির কিয়দংশ (৬ সর্গ) ৫ দফায় ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস (৪৪ পরিচ্ছেদ, উপসংহার ও পরিশিষ্ট সহ) আংশিকভাবে (২৬ পরিচ্ছেদ) ৭ দফায় প্রকাশ পায়। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত 'করুণা' (২৭ পরিচ্ছেদ) ও 'মুকুট' (১১ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট) উপন্যাস যথাক্রমে ১১বারে ও ২বারে প্রকাশিত হয়। 'ভিখারিনী' গল্পটিও বেরিয়েছিল ২ বারে। অপর পক্ষে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রবন্ধ দীর্ঘতার জন্য ৬ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থটি ১৩টি পৃথক্ পত্রাকারে, 'বিবিধ প্রসঙ্গ'র রচনাগুলি ৩৭ দফায়, 'আলোচনা' গ্রন্থ ৬ ভাগে, 'চিঠিপত্র' গ্রন্থটি ৯টি পৃথক্ পত্রে ও 'সমালোচনা'র ১৫টি

প্রবন্ধ পৃথক্ আকারে প্রকাশ হয়েছিল। উল্লিখিত কিস্তিগুলিকে পূর্ণগ্রন্থ বা রচনার হিসাবে গণনা করা হয় নি। যেগুলি প্রথমেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কেবল সেগুলিকেই গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই সময়ের মধ্যে (ভিখারিনী ছাড়া) ছোট গল্প লিখেছিলেন ২টি। হেঁয়ালি নাট্য রচিত হয় ১৩টি এবং 'ছিন্ন-পত্রে'র পত্রসংখ্যা ৮টি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি পত্রিকায় বা গ্রন্থে প্রকাশ পায় অন্ততঃ ৬৮৩ বার। এ ছাড়া পাণ্ডুলিপিভুক্ত অপ্রকাশিত রচনা আছে ৪টি। সেগুলি প্রকাশিত হলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৮৭। রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান থাকায় ১৬টি রচনার নাম ২ বার এবং একটির ৩ বার উল্লিখিত হয়েছে। ?-চিহ্নাঙ্কিত রচনা ও প্রবন্ধের অন্তর্গত অনুবাদ-কবিতাগুলিও মোট সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধানতম সম্পদ্ যে কবিতা, তার সংখ্যা তিন শতাধিক (সম্ভবতঃ ৩০৮)। কবিতাগুলির অধিকাংশই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত, কতকগুলি প্রথমেই গ্রন্থভুক্ত এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত।

আর কবিতার বাণীরূপকেই সুরসংযোগে কবি যে অপূর্ব সংগীতমহিমা দান করেছিলেন তার সংখ্যা নির্ণয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতসংগ্রহ-গ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া'ই (১২৯২ : ২০০টি গান) এ বিষয়ে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা গেল। তবুও নাটক ও উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনি যেসব সংগীত সংযোজন করেছিলেন সেগুলির একটা হিসাব দেবার চেষ্টা করেছি।— ভগ্নহৃদয় (২৬), রুদ্রচণ্ড (২), বৌঠাকুরানীর হাট (১১) এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ (১১)। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' সম্পূর্ণরূপেই গীতিনাট্য। বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণে ছিল ২৬টি গান; দ্বিতীয় সংস্করণে ২টি বর্জিত এবং ২৪টি নূতন যুক্ত হয়। মোট ৪৮। কালমৃগয়ায় ৩৮টি গান। স্বর্ণকুমারী দেবী-রচিত 'বিবাহ-উৎসব' নাটিকার জন্যও কবি ২৮টি গান রচনা করে দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', 'পুরুবিক্রম', 'স্বপ্নময়ী', 'মানময়ী' প্রভৃতি নাটকগুলিতেও কবি-রচিত অন্ততঃ ১৮টি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া 'ভানুসিংহে'র প্রত্যেকটি পদই গান হিসেবে গেয়। 'শৈশব সংগীত', 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'-এর অনেকগুলি কবিতার গীতরূপ আছে। তবে এগুলিকে বর্তমান তালিকায় কবিতা রূপেই গণ্য করা হয়েছে। কারণ, তাঁর গান যে প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট 'গীতিকবিতা' সে কথা তিনি নানা জায়গাতেই বলেছেন।[১] তাঁর কতকগুলি গান নানা কাব্যে

[১] দ্রষ্টব্য : প্রবাহিণী, ভূমিকা ; গীতবিতান, বিজ্ঞাপন।

ও নাটকে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ‘তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা’, ‘শুন নলিনী, খোল গো আঁখি’, ‘আঁধার শাখা উজল করি’, ‘নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়’, ‘বলি, ও আমার গোলাপবালা’, ‘কাছে তার যাই যদি’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই কালপর্বের মধ্যে রচিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। প্রকৃত পক্ষে, প্রবন্ধগুলিই তাঁর চিন্তাবিকাশের প্রধানতম উপকরণ। প্রবন্ধগুলি গণনা করে দেখা গেছে, এ যুগে তিনি কম করেও ১৫৩টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে নানা কারণে এই সংখ্যা-নিরূপণেও সংশয়ের অবকাশ আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, দীর্ঘ প্রবন্ধ বা গ্রন্থগুলি কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। অপর পক্ষে, কয়েকটি প্রবন্ধগুচ্ছ আছে যেগুলিকে এই তালিকায় একটি প্রবন্ধ হিসাবেই গণ্য করেছি, কারণ সেগুলি একই ভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেমন ‘পুষ্পাঞ্জলি’ (১০), ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ (১৩)। ‘রামমোহন রায়’ প্রবন্ধটি বর্তমানে ‘ভারতপথিক রামমোহন রায়’ গ্রন্থের অঙ্গীভূত হলেও প্রথমে একটি পৃথক্ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই এটি গ্রন্থসূচীরই অন্তর্ভুক্ত হল।

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের লেখা এই বিপুল সাহিত্যকৃতির অনেকাংশই এখনও অজানা রয়ে গেছে। *-চিহ্নিত রচনাগুলি থেকে দেখি ৪টি কবিতা ও ৪৯টি প্রবন্ধ শুধু সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল, কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সর্বজনপরিচিত হতে পারে নি। আরও ১৩টি কবিতা ও ১২টি প্রবন্ধ পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধে (সাময়িক পত্রে) বা গ্রন্থে, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত ‘জীবনস্মৃতি’ (১৯৬২) ও ‘রূপান্তর’ গ্রন্থে (১৩৭২) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত ‘রবীন্দ্ররচনাবলী’তে।[২]

---

২ দ্রষ্টব্য;— কালিদাস নাগ : রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব (প্রবাসী. ১৩৪৯ ফাল্গুন) ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয় (১৩৫০) ; সজনীকান্ত দাস : ‘রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী’, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭) ; যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (১৯৬৮)—অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ‘হিন্দুমেলায় উপহার’ কবিতার প্রতিলিপিচিত্রসহ ; বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭২ মাঘ-চৈত্র ; দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি (১৩৬৯) ; নীলরতন সেন -সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রবীক্ষা’ (রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি অর্ঘ্য) ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড : শৈশব সংগীত : সংযোজন : ১৫শ খণ্ড : সম্পূরণ ; সুশান্তকুমার মিত্র : ‘রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা’ (অমৃত, জুন ২০--জুলাই ১৮, ১৯৭৫) এবং ‘রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা’ (অমৃত, জুলাই ২ ও ৯, ১৯৭৬) ; রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : ‘রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা’ (দেশ, ১৩৮৩ জ্যৈষ্ঠ ১৫/২৯মে ১৯৭৬)—‘বান্ধব’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘হোক্ ভারতের জয়’ কবিতার প্রতিলিপিচিত্রসহ। বার্ণিক রায় -সম্পাদিত, ‘লা পয়েজি’, ১৯৭৪

সেই রচনাগুলিকে **-চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা গেল। ক-চিহ্নিত রচনাগুলি এত দিন পর্যন্ত 'মালতীপুঁথি' নামক পাণ্ডুলিপিতেই ছিল। এখন এগুলি 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা' সংকলন-গ্রন্থে (১৯৬৫) মুদ্রিতরূপে পাওয়া যায়। কিন্তু এখনও রবীন্দ্ররচিত কোনো পৃথক্ গ্রন্থে বা রবীন্দ্ররচনাবলীতে (বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ) সংকলিত হয় নি। 'ঝান্সীর রানী', 'কাজের লোক কে', 'বীর গুরু' ও 'শিখ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধগুলি সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল। কিছুকাল আগে মাত্র 'ইতিহাস' গ্রন্থের (১৩৬২) অন্তর্গত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'ঝান্সীর রানী' স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্রসহ প্রকাশিত হয় (১৯৫৭)। তাই ঐ রচনাগুলি অ-চিহ্নিতই রইল। কয়েকটি রচনা ?-চিহ্নিত, রবীন্দ্ররচিত কিনা সে বিষয়ে এখনও সংশয়ের অবকাশ আছে।

সংকেত-চিহ্ন ও শব্দ-সংক্ষেপণ

… ॥ পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল অনিশ্চিত

ক ॥ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে

? ॥ রচয়িতা সংশয়জনক

* ॥ পত্রপত্রিকাতেই প্রকাশিত; কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি

** ॥ পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী বা অন্য কোনো লেখকের গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

গ্রন্থ ॥ জী-স্ম=জীবনস্মৃতি (১৯৬২); প্রভাত সং=প্রভাত সংগীত; বিবিধ=বিবিধ প্রসঙ্গ; বৌঠাকুরানী=বৌঠাকুরানীর হাট; ভানুসিংহ=ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী; র-জি=রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড (১৯৬৫); র-জী=রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (১৯৭০); শৈশব-সং=শৈশব সংগীত; সন্ধ্যা-সং=সন্ধ্যা সংগীত

প্রবন্ধ ॥ য়ুরোপ-যাত্রী=য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র

বিবিধ ॥ আ=আনুমানিক

কালক্রম

আ ১২৮০-৮২ : ৪

নিম্নলিখিত রচনাগুলি ঠিক কোন্ সনে কোন্ তারিখে রচিত হয়েছিল তা চূড়ান্তভাবে বলা যায় না। কবির বর্ণনা থেকে মনে হয়, তিনি 'ঘরের পড়া'-যুগে এগুলি লিখেছিলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রবেশের অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরের পড়া'র যুগ শুরু হয় (আ ১৮৭৪)। এই সময়ে তাঁকে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের অনুবাদ করতে হয়েছিল। প্রথমোক্ত দুটির পাণ্ডুলিপি রয়েছে মালতীপুঁথিতে। পরে এগুলি পরিমার্জিত-পরিবর্তিত নামে ও রূপে ভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় রচনাটিরও আংশিক পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথিতে পাওয়া গেছে।

** বিচ্ছেদ ('শকুন্তলা' কাব্যের একটি অংশের অনুবাদ-কবিতা)

দ্রষ্টব্য : ভারতী ১২৮৪ মাঘ

** 'মদনভস্ম' ('কুমারসম্ভব' কাব্যের 'মদনভস্ম' অংশের অনুবাদ-কবিতা)

দ্রষ্টব্য : ভারতী ১২৮৪ মাঘ

ঝান্সীর রানী[৩] (প্রবন্ধ, 'ইতিহাস') দ্রষ্টব্য : ভারতী ১২৮৪ অগ্রহায়ণ

* ম্যাক্‌বেথ

পরে 'ডাকিনী অংশটি' 'বিশেষত্ব'পূর্ণ ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ (ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন)। সম্পূর্ণ ম্যাক্‌বেথ অনুবাদের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। দ্রষ্টব্য : জী-স্মৃ, 'ঘরের পড়া', পৃ ৬১-৬২

১২৮০ : ১

রচনা	পত্রিকা	রচনাকাল/প্রকাশকাল
** ভারতভূমি (কবিতা, অ-নামে)	বঙ্গদর্শন	১৮৭৪ জানুআরি/মাঘ

অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৭ মাঘ/১৮৭৪, জানুআরি ২৯) কবিতাটি আংশিক প্রকাশিত।

বঙ্গদর্শনে সম্পাদকের মন্তব্য : "এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।" একই সঙ্গে দ্বিভাষিক

৩ দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন : 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাস', 'ইতিহাস' পত্রিকা ১৩৬২ ভাদ্র-কার্তিক ; লেখকের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৬৯ কার্তিক) 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা' নামে পুনর্মুদ্রিত ('ঝান্সীর রানী' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি চিত্র-সহ), পৃ ২৭৮-৮১।

অমৃতবাজারে (১৭ মাঘ) এই কবিতাটির ৮টি স্তবককে কেন্দ্র করে সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের 'মা ভৈঃ' শীর্ষক সম্পাদকীয় রচনা। কবিতাটি রবীন্দ্র-রচিত প্রথম কবিতা বলে ইদানীং আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত।[৪]

১২৮১ : ৬

**[অভিলাষ (কবিতা, অ-নামে) তত্ত্ববোধিনী ১৭৯৬ শক, অগ্রহায়ণ

শিরোনামে বর্ণিত আছে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত।'

?[গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি (প্রবন্ধ) তত্ত্ববোধিনী ১৭৯৬ শক, পৌষ

'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' (গান) … …

সম্ভবতঃ 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রেরণায় রচিত (আ ১৮৭৪ সালের শেষে অথবা ১৮৭৫ সালের প্রথমে)। পরে গানটি 'উৎসর্গ-গীতি' নামে ভারতীতে প্রকাশ (১২৮৪ আশ্বিন)। আরও পরে 'জাতীয়সংগীত' প্রথম ভাগে (২য় সং, ১২৮৫/১৮৭৮) ও 'রবিচ্ছায়া'য় (১২৯২) সংকলিত।

'একস্থত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' (গান) … …

সম্ভবতঃ সঞ্জীবনী সভার প্রেরণায় রচিত। 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতা-পাঠের পূর্বে রচিত বলে অনুমান (আ ১৮৭৪ সালের শেষে বা ১৮৭৫ সালের প্রথমে)। পরে গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে (২য় সং, ১২৮৬ / ১৮৭৯) মুদ্রিত। পুরুবিক্রম প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ১৮৭৪ জুলাই। ওই সংস্করণে গানটি নেই। তাই গানটি তখনও রচিত হয় নি বলে মনে করা যায়।

** 'হোক্ ভারতের জয়' (কবিতা, 'র' স্বাক্ষরিত) বান্ধব (১ম বর্ষ) মাঘ

কবিতাটি রবীন্দ্র-রচিত বলে অনুমান করা হয়েছে ইদানীং কালে। এই কবিতাটি সম্ভবতঃ আবৃত্তি করা হয় ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১১/১২৮১ মাঘ ৩০, হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনের প্রথম দিনে।[৫]

** হিন্দুমেলায় উপহার (কবিতা) … পঠিত সম্ভবতঃ ১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১৪ / ১২৮১ ফাল্গুন ৩

---

৪ সুশান্তকুমার মিত্র : 'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা', 'অমৃত' ১৯৭৫, ২০ জুন-১৮ জুলাই (১৫ বর্ষ, ৬ থেকে ১০ সংখ্যা)। পুস্তিকারূপে প্রকাশিত অক্টোবর ১৯৭৫

৫ রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা', দেশ ৪৩ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৩৮৩ জ্যৈষ্ঠ ১৫/১৯৭৬ মে ২৯, পৃ ৩০৯-১১ এবং সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রনাথের একটি নবাবিষ্কৃত কবিতা' দেশ (আলোচনা বিভাগ) ১৯৭৬ জুলাই ২৪, পৃ ৯০৫-০৭

সম্ভবতঃ হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনের চতুর্থদিনে (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১৪) কবি স্বয়ং কবিতাটি পাঠ বা আবৃত্তি করেন। সুতরাং তার পূর্বেই রচিত। পরে কবির নামযুক্ত হয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৭৫ ফেব্রুআরি ২৫ / ১২৮১ ফাল্গুন ১৪) এটিই তাঁর স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

১২৮২ : ৭

** প্রকৃতির খেদ (কবিতা, অ-নামে) পঠিত : বৈশাখ ২০

কবি কর্তৃক বিদ্বজ্জন-সভায় পঠিত এবং প্রতিবিম্ব পত্রিকায় (১২৮২ বৈশাখ) প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর পরিমার্জিত ও পরিবর্তিতরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৭৯৭ শক, ১২৮২ আষাঢ়) পুনঃপ্রকাশিত। শিরোনামে আছে 'বালকের রচিত'।

'জ্বল্ জ্বল্ চিতা' (গান) ... অগ্রহায়ণ ১৫

উক্ত তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের প্রয়োজনে গানটি রচিত।

** প্রলাপ (কবিতা-১)	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	অগ্রহায়ণ
বনফুল (কাব্য) প্রথম সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	অগ্রহায়ণ
বনফুল (কাব্য) দ্বিতীয় সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	মাঘ
** প্রলাপ (কবিতা-২)	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	
বনফুল (কাব্য) তৃতীয় সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	চৈত্র

১২৮৩ : ৬

** প্রলাপ (কবিতা-৩)	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	বৈশাখ
বনফুল (কাব্য) চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	জ্যৈষ্ঠ
বনফুল (কাব্য) ষষ্ঠ সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	শ্রাবণ
বনফুল (কাব্য) সপ্তম সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	ভাদ্র
বনফুল (কাব্য) অষ্টম সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	আশ্বিন-কার্তিক
** ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী (প্রবন্ধ)	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	আশ্বিন-কার্তিক

১২৮৪ : ৫৪

ভারতী (কবিতা)	ভারতী	শ্রাবণ
ভিখারিনী (গল্প-১)	ভারতী	শ্রাবণ

** মেঘনাদবধ কাব্য (প্রবন্ধ-১)	ভারতী	শ্রাবণ
* হিমালয় (কবিতা)	ভারতী	ভাদ্র
ভিখারিনী (গল্প-২)	ভারতী	ভাদ্র
মেঘনাদবধ কাব্য (প্রবন্ধ-২)	ভারতী	ভাদ্র
* আগমনী (কবিতা)	ভারতী	আশ্বিন
সজনী গো শাঙন গগনে (ভানুসিংহ : অভিসার)	ভারতী	আশ্বিন
মেঘনাদবধ কাব্য (প্রবন্ধ-৩)	ভারতী	আশ্বিন
করুণা (উপন্যাস, ভূমিকা ও ১ম পরিচ্ছেদ)	ভারতী	আশ্বিন
উৎসর্গ-গীতি : তোমারি তরে মা (গান)	ভারতী	আশ্বিন

দ্রষ্টব্য : ১২৮১।

† 'প্রথম সর্গ' (কবিতা) ··· ২৪ আশ্বিনের পূর্বে

মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত। মালতীপুঁথির 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটির সমকালে বা কিছু পূর্বে রচিত।[৬] পূর্ববর্তী 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যেরই সংস্করণ বা রূপান্তর বলে অনুমিত। পরবর্তী 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) নাটিকার সঙ্গে কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। ভাবের দিক্ থেকে 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতা ও 'কবিকাহিনী' কাব্যের সঙ্গে মিল খুব বেশি।

† শৈশবসঙ্গীত (কবিতা) ··· আশ্বিন ২৪

রচনার স্থান ও কালসহ মালতীপুঁথিতে পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত। সম্ভবতঃ এটিই রবীন্দ্রনাথের তারিখ দেওয়া প্রথম কবিতা। ভারতী বা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি। 'শৈশব সংগীত' গ্রন্থে (১৮৮৪) পরিমার্জিত ও সুসংস্কৃতরূপে 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে গৃহীত।[৭]

† উপহার গীতি (কবিতা) ··· আ আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ

এর পাণ্ডুলিপি আছে মালতীপুঁথিতে। রচনাটির নীচে লেখা আছে 'Les poetes হইতে অনুবাদিত'। মালতীপুঁথিতে 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটির (১২৮৪ আশ্বিন ২৪) ঠিক পরে ও 'কবিকাহিনী'র (রচনারম্ভ ১২৮৪ কার্তিক ১) ঠিক আগে লিখিত। তাই উপরি-উক্ত কালটি অনুমিত।[৮]

৬ প্রবোধচন্দ্র সেন : মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়, র-জি, পৃ ১৫৮-৬০

৭ পূর্ববৎ, পৃ ১৪৩-৪৬

৮ পূর্ববৎ, পৃ ১৫২

? শারদ জ্যোৎস্নায় (ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছাস, কবিতা) ভারতী কার্তিক

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা গ্রন্থে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জীবনস্মৃতিতে কবি অন্য কোনো কবির বলে উল্লেখ করে একটি স্তবকও উদ্‌ধৃত করেছেন। সম্ভবতঃ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর এবং ভাবের দিক্‌ থেকেও তা অসম্ভব নয়।[৮ক]

করুণা (উপন্যাস ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ) ভারতী কার্তিক

মেঘনাদবধ কাব্য (প্রবন্ধ-৪) ভারতী কার্তিক

'কবিকাহিনী' কাব্যের খসড়া ... ১-১২ কার্তিক

প্রাথমিক খসড়া মালতীপুঁথিতে পাওয়া যায়। মাঝে "৪ দিন লিখি নাই" অর্থাৎ ৮ দিনে লেখা। ভারতী পত্রে প্রকাশের সময় ও মুদ্রিত গ্রন্থে মালতীপুঁথির পাঠ কিছু কিছু পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত।

ছিন্নলতিকা (কবিতা, শৈশব-সং) ভারতী অগ্রহায়ণ

গহনকুসুমকুঞ্জ-মাঝে (ভানুসিংহ : অভিসার) ভারতী অগ্রহায়ণ

করুণা (উপন্যাস, ৫ম পরিচ্ছেদ) ভারতী অগ্রহায়ণ

ঝান্সীর রানী (প্রবন্ধ, 'ইতিহাস') ভারতী অগ্রহায়ণ

মালতীপুঁথিতে এর পাণ্ডুলিপি আছে। ভারতীতে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ। দ্রষ্টব্য : আ ১২৮০-৮২।

ক 'পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়' (কবিতা) ... 'শনিবার অগ্রহায়ণ ১৮৭৭'

পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথিতে দ্রষ্টব্য। 'কবিকাহিনী'র শেষাংশের ঠিক পরেই। অগ্রহায়ণ মাসের তারিখটি দেওয়া নেই। ১৮৭৭ অর্থাৎ বাংলা ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শনিবার ছিল চারটি ৩, ১০, ১৭ ও ২৪ এবং ইংরেজি তারিখ যথাক্রমে নভেম্বর ১৭, ২৪ ও ডিসেম্বর ১ ও ৮। কবিতাটি এই চারদিনের মধ্যে যে-কোনো একদিন রচিত।[৯]

কবিকাহিনী (কাব্য, ১ম সর্গ) ভারতী পৌষ

বজাও রে মোহন বাঁশি (ভানুসিংহ : ব্যাকুলতা) ভারতী পৌষ

করুণা (উপন্যাস, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদ) ভারতী পৌষ

মেঘনাদবধ কাব্য (প্রবন্ধ-৫) ভারতী পৌষ

ভারতীবন্দনা (কবিতা, শৈশব-সং) ভারতী মাঘ

কবিকাহিনী (কাব্য, ২য় সর্গ) ভারতী মাঘ

৮ক দ্রষ্টব্য : জী-স্মৃ, 'ভগ্নহৃদয়', পৃ ১০২-০৪

৯ দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন : মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়, র-জি, পৃ ১৪৮

হম সখি দারিদ নারী (ভানুসিংহ)	ভারতী	মাঘ
** বঙ্গে সমাজ বিপ্লব (প্রবন্ধ)	ভারতী	মাঘ
** বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য (প্রবন্ধ)	ভারতী	মাঘ

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি দেশ পত্রিকায় (১৩৬৯) শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে "বঙ্গে সমাজ বিপ্লব" এবং "বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য" প্রবন্ধ দুটি সংযোজিত।

সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ কবিতা)	ভারতী	মাঘ

১. বিদায়-চুম্বন—Burns

২. কৃষকের প্রেমালাপ—Burns

৩. জীবন উৎসর্গ—Moore, Irish Melodies

৪. বিচ্ছেদ—Moore, Irish Melodies

৫. বিদায়—Mrs. Opic

৬. কষ্টের জীবন—Byron

৭. সঙ্গীত—কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে—Shakespeare

৮. বিচ্ছেদ—কালিদাসের শকুন্তলা (অংশ)
পাণ্ডুলিপি আছে মালতীপুঁথিতে। 'ভারতী'তে পরিমার্জিত।
দ্রষ্টব্য : আ ১২৮০-৮২।

৯. মদনভস্ম—কালিদাসের কুমারসম্ভব ('মদনভস্ম' অংশ)।
পাণ্ডুলিপি আছে মালতীপুঁথিতে। 'ভারতী'তে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে।
দ্রষ্টব্য : আ ১২৮০-৮২।

কবিকাহিনী (কাব্য, ৩য় সর্গ)	ভারতী	ফাল্গুন
করুণা (উপন্যাস, ৮ম, ৯ম, ১০ম পরিচ্ছেদ)	ভারতী	ফাল্গুন
মেঘনাদবধ কাব্য (প্রবন্ধ-৬)	ভারতী	ফাল্গুন
সখিরে, পিরীত বুঝবে কে (ভানুসিংহ)	ভারতী	ফাল্গুন
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী (ভানুসিংহ : প্রতীক্ষা)	ভারতী	ফাল্গুন
** দিল্লী দরবার (কবিতা)	...	1877

ফেব্রুআরির শেষ বা মার্চের প্রথম (১২৮৩ মাঘ-ফাল্গুন)। হিন্দুমেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা। সমকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী' এই খবর দিয়েছেন 1877, March 4/১২৮৩ ফাল্গুন ২২

রবিবার। সমকালে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পরে সামান্য পরিবর্তিত আকারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে (১৮৮২, মার্চ) গৃহীত হয়।

* সান্ত্বনা (প্রবন্ধ)	ভারতী	চৈত্র
কবিকাহিনী (কাব্য, ৪র্থ সর্গ)	ভারতী	চৈত্র
করুণা (উপন্যাস, ১১শ-১৪শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	চৈত্র
বাদর বরখন নীরদ গরজন (ভানুসিংহ : বর্ষা)	ভারতী	চৈত্র
অয়ি বিষাদিনী বীণা (গান)	...	...

'জাতীয়সঙ্গীত' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৮ অগাস্ট ৩০/১২৮৫ ভাদ্র) গানটি গৃহীত। ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৭৬ ফেব্রুআরি ১৭/১২৮৩ ফাল্গুন) গানটি ছিল না। তাই ১৮৭৬-এর ফেব্রুআরির পর ও ১৮৭৮-এর ৩০ অগাস্টের আগে যে-কোনো সময়ে রচিত বলে অনুমিত। আ ১৮৭৭/১২৮৪ সনের কোনো সময়ে রচিত। গানটি সমকালীন কোনো গীতগ্রন্থে নেই। ১৮৭৭ সালে হিন্দুমেলায় পঠিত বা গীত বলে অনুমান। পরে গীতবিতানে (১৯৬০) মুদ্রিত।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা (গান)	...	...

এই গানটিও 'জাতীয়সঙ্গীত' দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৫) গৃহীত। রচনাকাল 'অয়ি বিষাদিনী'র সমকালে বলে অনুমান। রবিচ্ছায়া (১২৯২) ও গীতবিতানে সংকলিত।

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি (গান)	...	...

এই গানটিও 'জাতীয়সঙ্গীত' দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৫) গৃহীত। রচনাকাল 'অয়ি বিষাদিনী' ও 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা'র সমকালে বলে অনুমান।

১২৮৫ : ৫১

করুণা (উপন্যাস, ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	বৈশাখ
* সামুদ্রিক জীব— প্রথম প্রস্তাব কীটাণু (প্রবন্ধ)	ভারতী	বৈশাখ
তুকারাম (অনুবাদ-কবিতা)	ভারতী	বৈশাখ

সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে অভঙ্গের রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ।

বারবার সখি বারণ করনু (ভানুসিংহ : দূতীর প্রতি)	ভারতী	বৈশাখ
করুণা (উপন্যাস, ১৭শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
* ইংরেজদিগের আদব কায়দা (প্রবন্ধ)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
করুণা (উপন্যাস, ১৮শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	আষাঢ়

দিক্‌বালা (কবিতা, শৈশব-সং) ভারতী আষাঢ়

সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ-কবিতা) ভারতী আষাঢ়

Moore-এর ১টি ও Byron-এর ২টি কবিতার অনুবাদ। কবিতাগুলির নাম নেই।[১০]

** অবসাদ (কবিতা) … 1878, July 6th

২৩শে আষাঢ়, শনিবার। পাণ্ডুলিপি আছে মালতীপুঁথিতে। পরে 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ চৈত্র) প্রকাশিত।[১১]

করুণা (উপন্যাস, ১৯শ-২২শ পরিচ্ছেদ) ভারতী শ্রাবণ

প্রতিশোধ (গাথা, শৈশব-সং) ভারতী শ্রাবণ

গাথাটির প্রাথমিক খসড়া আছে মালতীপুঁথিতে।

* স্যাক্‌সন্‌ জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন্‌ সাহিত্য ভারতী শ্রাবণ
(প্রবন্ধ, ১টি কবিতানুবাদসহ)

করুণা (উপন্যাস, ২৩শ-২৭শ পরিচ্ছেদ) ভারতী ভাদ্র

** বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য ভারতী ভাদ্র
(প্রবন্ধ, ১২টি কবিতানুবাদসহ) ; আমেদাবাদে রচিত।

* কবিতাপুস্তক (প্রবন্ধ)
বঙ্কিমের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ভারতী ভাদ্র

** পিত্রার্কা ও লারা (প্রবন্ধ, ৬টি কবিতানুবাদসহ) ভারতী আশ্বিন

লীলা (গাথা, শৈশব-সং) ভারতী আশ্বিন

গাথাটির প্রাথমিক খসড়া পাওয়া যায় মালতীপুঁথিতে।

** গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ (প্রবন্ধ) ভারতী কার্তিক

ফুলবালা (গাথা, শৈশব-সং) ভারতী কার্তিক

গাথাটির প্রাথমিক খসড়া আছে মালতীপুঁথিতে। "গোলাপফুল ফুটিয়ে আছে" ও "দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা" গান দুটি 'ফুলবালা'র অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য : ১২৮৮ চৈত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটক।

১০ Moore-এর "যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়" ভারতী মাঘ-সংখ্যায় কিছু পৃথক্ রূপে আছে Mrs. Opie-এর নামে। কবিতাগুলি কবি-কৃত অনুবাদ কিনা তাতেও সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (দ্রষ্টব্য : র-জি, পৃ ২৪১-৪২)।

১১ দ্রষ্টব্য—সজনীকান্ত দাস : রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭), পৃ ১০৬-০৭ ; র-জি, (কালানুক্রমিক সূচি, পৃ ২৪১) ও র-জি, (পাণ্ডুলিপি-পরিচয়, পৃ ১৫৪-৫৮)।

* নর্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্মান সাহিত্য

(প্রবন্ধ, ১ম প্রস্তাব) ভারতী ফাল্গুন

অপ্সরা প্রেম (গাথা, শৈশব-সং) ভারতী ফাল্গুন

গাথাটির প্রাথমিক খসড়া আছে মালতীপুঁথিতে। "কেন গো সাগর এমন চপল" গানটি 'অপ্সরা প্রেম' গাথার অন্তর্গত। রবিচ্ছায়ায় নেই।

'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়' (গান) ... ...

আমেদাবাদে রচিত। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে ৪ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত আছে। সমগ্র গানটি 'ভগ্নহৃদয়ে'র (১৮৮১/১২৮৮) অন্তর্গত। সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'রবিচ্ছায়া'য় (১২৯২) সংকলিত এবং ঐ রূপেই 'গীতবিতানে' গৃহীত।

'বলি ও আমার গোলাপবালা' (গান) ... ...

আমেদাবাদে রচিত। ভগ্নহৃদয়ের পাণ্ডুলিপিভুক্ত ছিল, কিন্তু বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত। পরে ভারতীতে (১২৮৭ অগ্রহায়ণ) মুদ্রিত। 'গোলাপবালা' (গোলাপের প্রতি বুলবুল) নামে 'শৈশব সংগীতে' (১২৯১) গৃহীত। রবিচ্ছায়ার (১২৯২) অন্তর্গত।

'শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি' (গান) ... ...

আমেদাবাদে রচিত। ভগ্নহৃদয়ের অন্তর্গত (১২৮৮)। পরে রবিচ্ছায়া ও গীতবিতানে গৃহীত।

'আঁধার শাখা উজল করি' (গান) ... ...

আমেদাবাদে রচিত। ভগ্নহৃদয়ের অন্তর্গত। পরে রবিচ্ছায়ায় গৃহীত। দ্রষ্টব্য : ১২৮৭ মাঘ।

'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর' (গান) ... ...

বোম্বাই বাসকালে রচিত। পরে রবিচ্ছায়া ও গীতবিতানে গৃহীত। দ্রষ্টব্য : ১২৮৮ চৈত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটক।

'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' (গান) ... ...

গানটির প্রাথমিক খসড়া রয়েছে মালতীপুঁথিতে। অনুমান করা যেতে পারে, কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে বিলাতযাত্রা কালে লিখিত (১৮৭৮এর শেষাংশে)। পরে 'ভগ্নহৃদয়ে'র 'উপহার' নামে ভারতীতে (১২৮৭ কার্তিক) কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত। আরও পরে ব্রহ্মসংগীত-

রূপে গৃহীত (দ্রষ্টব্য : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০২ শক/১২৮৭ ফাল্গুন)। রবিচ্ছায়া (১২৯২) ও গীতবিতানে ঐরূপে গৃহীত।[১২]

১। **কবিকাহিনী** (গ্রন্থ) ১৮৭৮ নভেম্বর ৫/১২৮৫ কার্তিক ২০

১২৮৬ : ৫০

য়ুরোপ-যাত্রী (১ম পত্র, ১ম অংশ) ভারতী বৈশাখ

মাধব ! না কহ আদর বাণী (ভানুসিংহ : অনুতপ্তা) ভারতী বৈশাখ

য়ুরোপ-যাত্রী (১ম পত্র, ২য় অংশ) ভারতী জ্যৈষ্ঠ

* নর্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্মান সাহিত্য
(প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রস্তাব, ৯টি কবিতানুবাদসহ) ভারতী জ্যৈষ্ঠ

য়ুরোপ-যাত্রী (২য় পত্র) ভারতী আষাঢ়

* চ্যাটার্টন —বালক কবি (প্রবন্ধ, ৩টি
কবিতানুবাদসহ) ভারতী আষাঢ়

ভগ্নতরী (গাথা, শৈশব-সং) ভারতী আষাঢ়

১ম-৫ম সর্গের খসড়া আছে মালতীপুঁথিতে। কবিতাটি রচিত কবির বিলাত-বাসকালে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর-১৮৮০ ফেব্রুআরি)। 'পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল' ও 'ওই কথা বল সখা বল আর বার' 'ভগ্নতরী'র অন্তর্গত দুটি গান।

য়ুরোপ-যাত্রী (৩য় পত্র) ভারতী শ্রাবণ

৪র্থ পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ এই পত্রের অঙ্গীভূত হয়ে মুদ্রিত হয়।

'ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরোপরি' (গান) ভারতী ভাদ্র

গানটি পরে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আকারে 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ আষাঢ়) প্রকাশিত। কোনো গীতগ্রন্থভুক্ত নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সমবেতভাবে গানটির বাণীরূপ দিয়েছেন বলে অনুমান। তবে রচনাশৈলীর বিচারে রবীন্দ্রনাথেরই প্রাধান্য।[১৩]

য়ুরোপ-যাত্রী (৪র্থ পত্র)
পঞ্চম পত্রের কিয়দংশ এই পত্রের সঙ্গে মুদ্রিত। ভারতী ভাদ্র

য়ুরোপ-যাত্রী (৫ম পত্রের অবশিষ্টাংশ) ভারতী আশ্বিন

নিন্দাতত্ত্ব (প্রবন্ধ) ভারতী আশ্বিন

১২ দ্রষ্টব্য—পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী, পৃ ২২-২৩ ; র-জি, পৃ ১৫১ ও পৃ ২৫০ র-জী, পৃ ৮২ ও ১১৪

১৩ দ্রষ্টব্য : গীতবিতান (১৩৮০ পৌষ) পরিশিষ্ট ৪, পৃ ৯৫২ ; গ্রন্থপরিচয়—পৃ ১০১৫-১৬

য়ুরোপ-যাত্রী (৬ষ্ঠ পত্র, গ্রন্থে ৮ম পত্র)	ভারতী	কার্তিক
সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ-কবিতা)	ভারতী	কার্তিক

১. জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন

২. পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির

৩. মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে (গান), রবিচ্ছায়া (১২৯২)

৪. বল গো বালা আমারি তুমি (গান), রবিচ্ছায়া

৫. বুঝেছি, বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয় (গান)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী'র (১৮৮২) তৃতীয় অঙ্ক ; ভগ্নহৃদয়ের ১৯ সর্গ (১৮৮১ জুন) ; 'রবিচ্ছায়া' (১২৯২ / ১৮৮৫) ; গীতবিতান।

৬. কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি (গান)
ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) ৭ম সর্গ ; শৈশব সংগীতে (১৮৮৪) 'লাজময়ী' কবিতা ; রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) ; গানের বহি (১৮৯৩), গীতবিতান। দ্রষ্টব্য : ১২৮৮ বৈশাখ।

৭. কি করিব বল সখা, তোমার লাগিয়া (গান)
রবিচ্ছায়া, গীতবিতান।

৮. গিয়াছে যেদিন, যেদিন হৃদয় (গান)—Moore, Irish Melodies
রবিচ্ছায়া, গীতবিতান।

৯. রূপসী আমার প্রেয়সী আমার—Burns

১০. সুশীলা আমার জানালার পরে—Burns

১১. কোরো না ছলনা কোরো না ছলনা—Chappel

১২. চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া

১৩. রাখ মোর কথা

১৪. না সখা মনের ব্যথা কোরো না গোপন

১৫. এখন ত আর নাই কোন আশা—Lord Cantalupe

১৬ নিঝর মিশেছে তটিনীর সাথে—Shelley

১৭. লীলাময়ী নলিনী, চপলিনী নলিনী—Tennyson

য়ুরোপ-যাত্রী (৭ম পত্র ; গ্রন্থে ষষ্ঠ পত্র)	ভারতী	অগ্রহায়ণ
য়ুরোপ-যাত্রী (৮ম পত্র ; গ্রন্থে ৯ম পত্র)	ভারতী	পৌষ

১২৮৬ মাঘে কবির বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন

য়ুরোপ-যাত্রী (৯ম পত্র ; গ্রন্থে ৭ম পত্র)	ভারতী	ফাল্গুন
প্রেম-মরীচিকা (কবিতা, শৈশব-সং)	ভারতী	ফাল্গুন
'আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি' (গান)	...	...

বিলাত থেকে ফিরে (১৮৮০ ফেব্রুআরি / ১২৮৬ ফাল্গুন) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ী" (১৮৮০) গীতিনাট্যের জন্য রচিত। পরে 'ভারতী ও বালক' (১২৯৩) পত্রিকায় প্রকাশ। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫), গানের বহি (১৮৯৩), গীতবিতান।

বিষ ও সুধা (কবিতা)[১৪]	...	...

'সন্ধ্যাসংগীত' প্রথম সংস্করণের (১২৮৯ / ১৮৮২) অন্তর্গত উক্ত কবিতাটির আংশিক পাঠ পাওয়া যায় মালতীপুঁথিতে, তারিখ নেই। 'শৈশব সংগীত' (১৮৮৪) গ্রন্থের ভূমিকায় কবি তাঁর "তেরো হইতে আঠারো" বছর বয়সের (১২৮১-১২৮৬) লেখাগুলিকে বাল্যরচনা বলেছেন। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র (১ম সং) ভূমিকাতেও 'বিষ ও সুধা'কে বাল্যরচনা বলেছেন। তাই কবিতাটিকে তাঁর বাল্যরচনার শেষসীমা আঠারো বছরের (১২৮৬) লেখা বলে অনুমান করা যায়। বর্তমানে পাঠান্তর সংবলিত 'সন্ধ্যাসংগীতে' (১৯৬৯) সংকলিত।

২:। **বনফুল (কাব্যোপন্যাস)** গ্রন্থ। ১৮৮০ মার্চ ৯/১২৮৬ ফাল্গুন ২৭

১২৮৭ : ৫২

য়ুরোপ-যাত্রী (১০ম পত্র)	ভারতী	বৈশাখ
দেখলো সজনী চাঁদনী রজনী (ভানুসিংহ : সংশয়)	ভারতী	বৈশাখ

কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৮৯৬) পাঠ আছে, "হম যব না রব সজনী" ; গীতবিতানে ঐ পাঠই গৃহীত।

য়ুরোপ যাত্রী (১১শ পত্র)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
দুদিন (কবিতা, সন্ধ্যা-সং)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ

ভারতীতে লেখকের নাম শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য। কবিতাটির কিয়দংশের খসড়া পাওয়া যায় মালতীপুঁথিতে। কিন্তু 'ভারতী' বা গ্রন্থে

১৪ দ্রষ্টব্য : সন্ধ্যাসংগীত, পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৬৯), গ্রন্থপরিচয়।

পরিবর্তিতরূপে মুদ্রিত। ভারতীর পাঠ ও গ্রন্থের পাঠেও পার্থক্য আছে।

য়ুরোপ-যাত্রী (১২শ পত্র)	ভারতী	আষাঢ়
য়ুরোপ-যাত্রী (১৩শ পত্র)	ভারতী	শ্রাবণ
বাঙ্গালী কবি নয় (প্রবন্ধ)	ভারতী	ভাদ্র
কামিনী ফুল (কবিতা, শৈশব-সং)	ভারতী	ভাদ্র

রবিচ্ছায়াতে গৃহীত। কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩) "কৈশোরক" অংশে 'কামিনী' নামে গৃহীত। গীতবিতান।

তারকার আত্মহত্যা (কবিতা, সন্ধ্যা-সং)	...	আ ভাদ্র/আশ্বিন
বাঙ্গালী কবি নয় কেন ? (প্রবন্ধ)	ভারতী	আশ্বিন

'বাঙ্গালী কবি কেন ?' (বঙ্গদর্শন, ১২৮২ পৌষ) প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালী কবি নয়' (ভারতী, ১২৮৭ ভাদ্র) ও 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন ?' প্রবন্ধ দুটি লিখিত হয়। পরে প্রবন্ধ দুটি একযোগে পরিবর্তিত আকারে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে 'সমালোচনা' (১২৯০/১৮৮৮) গ্রন্থে প্রকাশিত।

* অকারণ কষ্ট (প্রবন্ধ, ১টি কবিতানুবাদসহ)	ভারতী	আশ্বিন

পূর্বপ্রকাশিত প্রেম-মরীচিকা কবিতাটিও এইসঙ্গে সংযোজিত।

সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ-কবিতা ডাকিনী, ম্যাকবেথ)	ভারতী	আশ্বিন
হরহৃদে কালিকা (কবিতা, শৈশব সং)	ভারতী	আশ্বিন
শরতে-প্রকৃতি (কবিতা, প্রভাত-সং, ১ম সং)	ভারতী	আশ্বিন
ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য, ১ম সর্গ)	ভারতী	কার্তিক
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (গান)	ভারতী	কার্তিক

ভগ্নহৃদয়ের 'উপহার'রূপে প্রকাশ। মূল পাঠটি আছে মালতীপুঁথিতে (৮ পঙ্‌ক্তি) ; ভারতীতে উপহার-রূপে প্রকাশ কালে শেষ ২ পঙ্‌ক্তি সংযোজিত হয়ে ১০ পঙ্‌ক্তি হয়। ব্রহ্মসংগীতরূপে গ্রহণ কালে (তত্ত্ববোধিনী ১৮০২ শক, ১২৮৭ ফাল্গুন) ৮ পঙ্‌ক্তি হয়। দ্রষ্টব্য : ১২৮৫, ১২৮৭ মাঘ।

ক্ষমা কর মোরে সখি, শুধায়ো না আর (গান)	ভারতী	কার্তিক

ভগ্নহৃদয় প্রথম সর্গ ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২) ; রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান।

কে গো বলে দেবে এ কেমন ভাব (গান) ভারতী কার্তিক

ভগ্নহৃদয় প্রথম সর্গ ; গান বলে উক্ত হলেও সুরহীন।

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য, ২য় ও ৩য় সর্গ) ভারতী অগ্রহায়ণ

নাচ্ শ্যামা তালে তালে (গান) ভারতী অগ্রহায়ণ

ভগ্নহৃদয় ২য় সর্গ; রবিচ্ছায়া; গানের বহি (১৩০০/১৮৯৩) গীতবিতান।

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
(ভানুসিংহ : বিদায়) ভারতী অগ্রহায়ণ

গোলাপবালা (কবিতা, শৈশব সং) ভারতী অগ্রহায়ণ

[গোলাপের প্রতি বুলবুল] পাণ্ডুলিপিতে ভগ্নহৃদয়ের অন্তর্গত ছিল, বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত। আমেদাবাদে রচিত, দ্রষ্টব্য : ১২৮৫। রবিচ্ছায়া, গানের বহি ও গীতবিতানের অন্তর্গত।

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য, ৪র্থ সর্গ) ভারতী পৌষ

'কবি' শীর্ষক অংশে ৮টি গান আছে। ১ম ও ৭ম গান দুটি রবিচ্ছায়ায় গৃহীত।

১. বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই
কাব্যগ্রন্থ কৈশোরকে 'প্রথম দর্শন' কবিতা; রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

২. প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া দেখি সেই মুখখানি।

৩. প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি?

৪. কাল যবে দেখা হোল পথে যেতে যেতে চলি।

৫. সত্য কি তাহারে ভালবাসি?

৬ মোর এ যে ভালবাসা রূপ-মোহ এ কি?

৭. দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পারে। রবিচ্ছায়া।

৮. শুনেছি-শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি-শুনেছি তাহা!
নলিনী-নলিনী-নলিনী-নলিনী
কেমন মধুর আহা!

পথিক (কবিতা, শৈশব-সং) ভারতী পৌষ

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত রূপে গৃহীত।

বল দেখি সখি লো নিরদয় লাজ তোর (গান)[১৫] ··· ···

স্বরদাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। গীতবিতান ছাড়া কোনো গীতগ্রন্থে নেই।

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য, ৫ম সর্গ) ভারতী মাঘ

আঁধার শাখা উজল করি (গান) ভারতী মাঘ

আমেদাবাদে রচিত ১২৮৫। দ্রষ্টব্য : জীবনস্মৃতি-পাণ্ডুলিপি। ভগ্নহৃদয়ের পঞ্চম সর্গ ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী'র (১৮৮২) দ্বিতীয় অঙ্ক ; রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; কাব্যগ্রন্থ 'কৈশোরকে' 'একাকিনী' কবিতা ; গীতবিতান।

কে আমার সংশয় মিটায় (গান) ভারতী মাঘ

ভগ্নহৃদয়ের ৫ম সর্গ ; রবিচ্ছায়া।

খেলা কর, খেলা কর কামিনী কুসুমগুলি (গান) ভারতী মাঘ

ভগ্নহৃদয়ের ৫ম সর্গ ; রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান।

শীত (কবিতা, প্রভাত-সং ; ১ম সং) ভারতী মাঘ

পরে সংক্ষিপ্ত আকারে 'শিশু' (১৯০৯) গ্রন্থে স্থান পায় ও প্রভাত-সংগীতে বর্জিত হয়।[১৬]

তুমি কি গো পিতা আমাদের (গান) ··· মাঘ ১১

রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ (গান) ··· মাঘ ১১

রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (গান) ·· মাঘ ১১

(দ্রষ্টব্য : ১২৮৫, ভারতী ১২৮৭ কার্তিক) ; রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান।

আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন (গান) ··· মাঘ ১১

রবিচ্ছায়া, গানের বহি, গীতবিতান

এ কি এ সুন্দর শোভা (গান) ··· মাঘ ১১

রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান

দিবানিশি করিয়া যতন (গান) ··· মাঘ ১১

রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান

---

১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গানটিকে ভারতী ১২৮৭ পৌষ-সংখ্যায় নির্দেশ করেছেন (র-জি. পৃ ২০২) ; কিন্তু ভারতীর ঐ সংখ্যায় গানটি নেই।

১৬ দ্রষ্টব্য— সজনীকান্ত দাস : রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬১), পৃ ২৪৩

কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন (গান) ··· মাঘ ১১

গুজরাটী ভজন ; রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান ; উপরি-উক্ত সাতটি গান ১২৮৭ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত ও গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮০২ শক/১২৮৭ ফাল্গুন) প্রকাশিত।

৩। **বাল্মীকি প্রতিভা** (গ্রন্থ)— প্রথম সংস্করণ

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১২৮৭ ফাল্গুন ১৬ শনিবার / ১৮৮১ ফেব্রুআরি ২৬। অভিনয়ের পূর্বেই পুস্তক রচিত। অর্থাৎ ফাল্গুন মাসেই বা তৎপূর্বে।

দুঃখের আহ্বান (কবিতা)

সন্ধ্যা-সং ১২৮৯, ['দুঃখ আবাহন' নামে] ভারতী ফাল্গুন

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য, ৬ষ্ঠ সর্গ) ভারতী ফাল্গুন

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায় (গান) ভারতী ফাল্গুন

আমেদাবাদে রচিত। জীবনস্মৃতি-পাণ্ডুলিপিতে ৪ পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত। ভগ্নহৃদয়-৬ষ্ঠ সর্গ, ১ম সং ; রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; গীতবিতান।

সখি ভাবনা কাহারে বলে (গান) ভারতী ফাল্গুন

ভগ্নহৃদয়-৬ষ্ঠ সর্গ, ১ম সং ; রবিচ্ছায়া ; গানের বহি ; কাব্যগ্রন্থাবলীর কৈশোরকে—'সমস্যা' নামক কবিতা ; গীতবিতান।

* পারিবারিক দাসত্ব (প্রবন্ধ) ভারতী চৈত্র

১২৮৮ : ১৩৬

সংগীত ও ভাব (প্রবন্ধ) ··· বৈশাখ ৮

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার (যদিও হয় নি) পূর্বদিন সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন (বৈশাখ ৮)। প্রবন্ধটি তৎপূর্বে রচিত। পরে ভারতীতে (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত। দ্রষ্টব্য : ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

৪। **ভগ্নহৃদয়** (গ্রন্থ) উৎসর্গ—শ্রীমতি 'হে' [কাদম্বরী দেবী] কে।

৯ বৈশাখের পূর্বে

৫। **রুদ্রচণ্ড** (গ্রন্থ) উৎসর্গ—'ভাই জ্যোতিদাদাকে'। ৯ বৈশাখের পূর্বে

১২৮৮ বৈশাখ ৯ তারিখে কবি দ্বিতীয়বার বিলাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। উভয় গ্রন্থের 'উপহার' কবিতায় যাত্রার বিচ্ছেদ-

বেদনার সুর শোনা যায়। অতএব, 'উপহার' সহ গ্রন্থ দুটি ঐ তারিখের পূর্বে সম্পূর্ণ রচিত বলে অনুমিত।[১৭]

Hindoo Patriot দৈনিক পত্রে (১৮৮১ মে ২৩/১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ ১১) রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা প্রকাশ হয়। তারও দুই সপ্তাহ পূর্বে (১৮৮১ মে ৯) ঐ পত্রে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকৃত হয়। অতএব, গ্রন্থ তৎপূর্বেই প্রকাশিত। সম্ভবতঃ ভগ্নহৃদয় গ্রন্থও ঐ সময়েই প্রকাশিত। বেঙ্গল-লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থ দুটির প্রকাশকাল যথাক্রমে—

ভগ্নহৃদয়—১২৮৮ আষাঢ় ১০/১৮৮১ জুন ২৩

রুদ্রচণ্ড—১২৮৮ আষাঢ় ১২/১৮৮১ জুন ২৫

ভগ্নহৃদয়ের প্রথম-ষষ্ঠ সর্গ ভারতীতে (১২৮৭ কার্তিক-ফাল্গুন) প্রকাশিত। ৭ম-৩৪শ সর্গ একসঙ্গে গ্রন্থে রচিত। এই সর্গগুলির অন্তর্গত গানের তালিকা—

১ম সর্গ—কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে।

ভারতীতে (১২৮৭ কার্তিক, ভগ্নহৃদয় ১ম সর্গ) গানটি ছিল না; গ্রন্থে নূতন। রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

৭ম সর্গ—কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি।

ভারতীতে (১২৮৬ কার্তিক, সম্পাদকের বৈঠক, অনুবাদ-কবিতা-রূপে) প্রকাশ। রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

৮ম সর্গ—যে ভালবাসুক, সে ভালবাসুক।

রবিচ্ছায়া; গানের বহি; গীতবিতান।

৯ম সর্গ—কি হল আমার? বুঝিবা সজনী হৃদয় হারিয়েছি।

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান (কথা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত)।

১০ম সর্গ— কে গো তুমি খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার।

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

১১শ সর্গ—কিছুই তো হল না।

রবিচ্ছায়া (৭ পঙ্‌ক্তি); কাব্যগ্রন্থের (১৩০৩) কৈশোরক অংশে 'ছায়া' নামক কবিতা (৭ পঙ্‌ক্তি ছাড়া ভগ্নহৃদয় থেকে আরও ১৬ পঙ্‌ক্তি গৃহীত); গীতবিতান।

১২শ সর্গ— বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয়।

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

---

১৭ র-জী, পৃ ১০৭

২০শ সর্গ—সখি লো, শোন লো তোরা শোন, আমি যে পেয়েছি একমন।
(সুর জানা না থাকায় গীতবিতানের অন্তর্গত হতে পারে নি)।
২২শ সর্গ— তুই রে বসন্ত সমীরণ।
রবিচ্ছায়া (সংক্ষিপ্ত আকারে) ; গীতবিতান।

রুদ্রচণ্ডের অন্তর্গত দুটি গান—
১. বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
রবিচ্ছায়া (সুর দেওয়া নেই) ; কাব্যগ্রন্থের কৈশোরক অংশে 'আরম্ভে' নামক কবিতা ; গীতবিতান (সংক্ষিপ্ত রূপ)।
২. তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
রবিচ্ছায়া ; কাব্যগ্রন্থের কৈশোরক অংশে সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'অবসান' নামক কবিতা ; গীতবিতান। রুদ্রচণ্ডের দুটি গানেরই খসড়া পাওয়া যায় মালতীপুঁথিতে। রুদ্রচণ্ডের গান দুটি সংক্ষিপ্ত আকারে গীতবিতানে সংকলিত। গ্রন্থ দুটির রচনাকাল অনুযায়ী গানগুলিরও রচনাকাল দেওয়া হল ১২৮৮ বৈশাখ তালিকায়।

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী বৈশাখ
প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ বিলাতে রচিত (১২৮৫-৮৬/১৮৭৮-৭৯)। ১২ পঙ্‌ক্তির একটি কবিতা আছে—'দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ গতি'।

তারকার আত্মহত্যা (কবিতা, সন্ধ্যা-সং) ভারতী জ্যৈষ্ঠ
কবিতার আরম্ভে Shelley-র ৪ পঙ্‌ক্তির অনুবাদ আছে ; গ্রন্থে নেই। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) 'হৃদয়অরণ্য' অংশে সামান্য পরিবর্তিত রূপে। রচনাকাল পূর্ব (আ ১২৮৭ ভাদ্র/আশ্বিন)।

• জুতাব্যবস্থা (প্রবন্ধ) ভারতী জ্যৈষ্ঠ

•] যথার্থদোসর (প্রবন্ধ) ভারতী জ্যৈষ্ঠ
প্রবন্ধারম্ভে Shelley থেকে ১২ পঙ্‌ক্তি অনুবাদ আছে।

• চীনে মরণের ব্যবসায় (প্রবন্ধ) ভারতী জ্যৈষ্ঠ

সংগীত ও ভাব (প্রবন্ধ) ভারতী জ্যৈষ্ঠ
১২৮৮ বৈশাখ ৮ তারিখে মেডিক্যাল কলেজ হলে ভাষণ। দ্রষ্টব্য : ১২৮৮ বৈশাখ।

? জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব (প্রবন্ধ)[১৮] ভারতী জ্যৈষ্ঠ

১৮ দ্রষ্টব্য : র-জি, প্রভাতকুমারের প্রবন্ধ : পৃ ২৫৯

* জাপানের বর্তমান উন্নতির মূল পত্তন (প্রবন্ধ)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
* গোলাম চোর (প্রবন্ধ)	ভারতী	আষাঢ়
সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (প্রবন্ধ)	ভারতী	আষাঢ়
* নিমন্ত্রণসভা (প্রবন্ধ)	ভারতী	আষাঢ়
* জাপানের বর্তমান উন্নতি (প্রবন্ধ)	ভারতী	আষাঢ়

একটি দীর্ঘ জাপানী কবিতার অনুবাদ আছে প্রবন্ধটিতে। 'কড়ি ও কোমলে' (১ম সং, ১২৯৩) 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' অংশে সন্নিবেশিত। কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩) অনুবাদ অংশের শেষ কবিতা—'বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া'।

সুখের বিলাপ (কবিতা, সন্ধ্যা সং)	ভারতী	আষাঢ়

কাব্যগ্রন্থের 'হৃদয়ারণ্য' অংশে পরিমার্জিত।

† জাতীয়তার নিবেদন (প্রবন্ধ)	ভারতী	আষাঢ়
সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ-কবিতা)	ভারতী	আষাঢ়

১. ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া (প্রভাত-সং ; শিশু) —V. Hugo

২. যে তোরে বাসে রে ভালো (প্রভাত-সং ; শিশু)—V. Hugo

৩. কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাসে (প্রভাত-সং)—V. Hugo

৪. মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম (প্রভাত-সং)—V. Hugo

৫. ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে (কড়ি ও কোমল) —Mrs. Browning

৬ নিদাঘের শেষ গোলাপ (কড়ি ও কোমল)—Moore

৭. দিনরাত্রি নাহি মানি··· —Moore

৮. দামিনীর আঁখি কিবা (মালতীপুঁথি)—Moore

অনুবাদগুলি আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসকালে (১৮৭৮) রচিত বলে অনুমান। মালতীপুঁথিতে কিছু কিছু খসড়া পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ) চতুর্থ খণ্ড—'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ'।

† জাতীয়তার নিবেদনে বিজাতীয়তার বক্তব্য (প্রবন্ধ)	ভারতী	শ্রাবণ
কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন (প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	শ্রাবণ
দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি (গান)	···	১৫ শ্রাবণের পূর্বে
শুভদিনে এসেছ দোঁহে (গান)	···	১৫ শ্রাবণের পূর্বে
জগতের পুরোহিত তুমি (গান)	···	১৫ শ্রাবণের পূর্বে

রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতী দেবীর বিবাহ (১২৮৮ শ্রাবণ ১৫/ ১৮৮১ জুলাই ২৯) উপলক্ষে রচিত। সমকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮০৩ শক, ১২৮৮ ভাদ্র, পৃ ৯৮) এই সংবাদ প্রকাশ। লীলাবতী দেবীও তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন, "...শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ... সংগীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।" দ্রষ্টব্য : মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৭। ঐ গায়কদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) অন্যতম।

মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান (ভানুসিংহ : মরণ) ভারতী শ্রাবণ

'ছবি ও গানে' (১২৯০/১৮৮৪) 'অভিসার'; রবিচ্ছায়া; গানের বহি; গীতবিতান।

আশার নৈরাশ্য (কবিতা, সন্ধ্যা-সং) ভারতী শ্রাবণ

* চর্ব চোষ্য-লেহ্য-পেয় (প্রবন্ধ) ভারতী শ্রাবণ

* প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ [বিদ্যাপতি] (প্রবন্ধ) ভারতী শ্রাবণ

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র সমালোচনা।

? প্যাস্কেলের ছোট চিঠি লেখা সম্বন্ধে মত (প্রবন্ধ) ভারতী শ্রাবণ

মনের বাগানবাড়ি (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী শ্রাবণ

গরিব হইবার সামর্থ্য (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী শ্রাবণ

কিন্তুওয়ালা (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী শ্রাবণ

দয়ালু-মাংসাশী (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী শ্রাবণ

* দারোয়ান (প্রবন্ধ) ভারতী ভাদ্র

শিশির (কবিতা, সন্ধ্যা-সং) ভারতী ভাদ্র

শূন্য (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী ভাদ্র

স্ত্রৈণ (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী ভাদ্র

জমা খরচ (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী ভাদ্র

মনোগণিত (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী ভাদ্র

নৌকা (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী ভাদ্র

বসন্ত ও বর্ষা (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী ভাদ্র

* প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ [উত্তর-প্রত্যুত্তর] (প্রবন্ধ) ভারতী ভাদ্র

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে পদাবলীর অর্থ নিয়ে বিচার।

ডি প্রোফাণ্ডিস (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী আশ্বিন

Tennyson-এর De Profundis কাব্যের সমালোচনা। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্ররচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ, ১৩শ খণ্ড), আধুনিক সাহিত্য।

ফলফুল (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
মাছধরা (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
ইচ্ছার দাম্ভিকতা (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
অভিনয় (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
খাঁটি বিনয় (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
ধরা কথা (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
দ্রুতবুদ্ধি (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	আশ্বিন
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ১ম-৫ম পরিচ্ছেদ)[১৯]	ভারতী	কার্তিক
বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ (গান)	ভারতী	কার্তিক

বৌঠাকুরানী ৫ম পরিচ্ছেদ; গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদ, কারণ গ্রন্থে ১ম পরিচ্ছেদ বর্জিত। 'প্রায়শ্চিত্তে'ও আছে; গানের বহি; গীতবিতান।

* বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট (প্রবন্ধ)	ভারতী	কার্তিক
* জীবন ও বর্ণমালা (প্রবন্ধ)	ভারতী	কার্তিক
পরাজয়-সংগীত (কবিতা, সন্ধ্যা-সং)	ভারতী	কার্তিক
সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ-কবিতা)	ভারতী	কার্তিক

১. রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে (কড়ি ও কোমল) —Swinburne

২. কেমনে কি হল পারিনে বলিতে (কড়ি ও কোমল)—Rossetti

৩ দেখিনু যে এক আশার স্বপন (কড়ি ও কোমল)—Rossetti

৪. অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম একরেখা—M. Arnold

৫. এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে—Robust Buchanan

৬. সেথায় কপোতবধূ লতার আড়ালে (প্রভাত-সং, 'সম্মিলন' কবিতা)—Shelley

১৯ 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে ও 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা'র অন্তর্গত প্রবন্ধে প্রভাতকুমার লিখেছেন আশ্বিন। সেটি ঠিক নয়।

৬। **য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র** (গ্রন্থ)—উৎসর্গ 'ভাই জ্যোতিদাদাকে।'
১৮৮১ অক্টোবর ২৫/১২৮৮ কার্তিক ১০

বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ৬ষ্ঠ-৮ম পরিচ্ছেদ) ভারতী অগ্রহায়ণ
আজ তোমারে দেখতে এলেম (গান) ভারতী অগ্রহায়ণ
বৌঠাকুরানী ৭ম পরিচ্ছেদ; রবিচ্ছায়া; গানের বহি; প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯); পরিত্রাণ (১৯২৯); গীতবিতান।
মলিন মুখে ফুটুক হাসি (গান) ভারতী অগ্রহায়ণ
বৌঠাকুরানী ৭ম পরিচ্ছেদ; প্রায়শ্চিত্ত; গীতবিতান।
* অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি (প্রবন্ধ) ভারতী অগ্রহায়ণ
গান-সমাপন (কবিতা, সন্ধ্যা-সং) ভারতী অগ্রহায়ণ
* রেলগাড়ি (প্রবন্ধ) ভারতী অগ্রহায়ণ
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ৯ম-১০ম পরিচ্ছেদ) ভারতী পৌষ
সারা বরষ দেখি নে মা (গান) ভারতী পৌষ
বৌঠাকুরানী ১০ম পরিচ্ছেদ; প্রায়শ্চিত্ত; গীতবিতান।
এক চোখো সংস্কার (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী পৌষ
কবিতা সাধনা ('গান আরম্ভ' কবিতা, সন্ধ্যা-সং) ভারতী পৌষ
মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) পরিবর্তিত আকারে 'আবাহন' নামে কবিতা।
জগতের জন্মমৃত্যু (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী পৌষ
অসংখ্য জগৎ (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী পৌষ
জগতের জমিদারী (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী পৌষ
ছোট ভাব (প্রবন্ধ, বিবিধ) ভারতী পৌষ
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ১১শ-১২শ পরিচ্ছেদ) ভারতী মাঘ
কবরীতে ফুল শুকাল (গান) ভারতী মাঘ
বৌঠাকুরানী ১২শ পরিচ্ছেদ; গীতবিতান।
অনুগ্রহ (কবিতা, সন্ধ্যা-সং) ভারতী মাঘ
মহাস্বপ্ন (কবিতা, প্রভাত-সং) ভারতী মাঘ
সংগীত ও কবিতা (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী মাঘ
* সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (প্রবন্ধ) ভারতী মাঘ
গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাট্যদ্বয়ের সমালোচনা।

আত্মীয়ের বেড়া (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	মাঘ
বেশী দেখা ও কম দেখা (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	মাঘ
লজ্জাভূষণ (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	মাঘ
ঘর ও বাসাবাড়ি (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	মাঘ
নিরহংকার আত্মম্ভরিতা (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	মাঘ
আত্মময় আত্মবিস্মৃতি (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	মাঘ
* সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় (প্রবন্ধ)	ভারতী	মাঘ
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ১৩শ-১৫শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	ফাল্গুন
ওরে যেতে হবে আর দেরী নাই (গান)	ভারতী	ফাল্গুন
বৌঠাকুরানী ১৪শ পরিচ্ছেদ ; রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান।		
আমার যাবার সময় হল (গান)	ভারতী	ফাল্গুন
বৌঠাকুরানী ১৪শ পরিচ্ছেদ ; রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান।		
সংগ্রাম-সংগীত (কবিতা, সন্ধ্যা-সং)	ভারতী	ফাল্গুন
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি (প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	ফাল্গুন
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	ফাল্গুন
আদর্শ প্রেম (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	ফাল্গুন
বন্ধুত্ব ও ভালবাসা (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	ফাল্গুন
আত্মসংসর্গ (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	ফাল্গুন
বধিরতার সুখ (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	ফাল্গুন
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ১৬শ-১৯শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	চৈত্র
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় (কবিতা, প্রভাত-সং)	ভারতী	চৈত্র
প্রকৃতি-পুরুষ (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	চৈত্র
জগৎপীড়া (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	চৈত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটক প্রকাশ হয় ১২৮৮ চৈত্র ১২/১৮৮২ মার্চ ২৪। এই নাটকে নিম্নলিখিত গানগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা।—

১ বল্ গোলাপ মোরে বল্
রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান

২. আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
বোম্বাই বাসপর্বে রচিত (দ্রষ্টব্য : ১২৮৫) ; রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান।

৩. আঁধার শাখা উজল করি

আমেদাবাদে রচিত (দ্রষ্টব্য : ১২৮৫); ভগ্নহৃদয় ৫ম সর্গ (১২৮৭); রবিচ্ছায়া; গানের বহি; গীতবিতান।

৪. হৃদয় মোর কোমল অতি

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

৫ হাসি কেন নাই ও নয়নে

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

৬. ক্ষমা কর মোরে সখি

ভগ্নহৃদয় ১ম সর্গ; রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

৭. এসো গো এসো বনদেবতা

গীতবিতান

৮. দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে

গীতবিতান।

৯. বুঝেছি, বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয়

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

১০. দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে

১১. বলি গো সজনি, যেও না যেও না

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

১২. দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা

'ফুলবালা' গাথার অন্তর্গত (ভারতী ১২৮৫ কার্তিক); রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

১৩. আয় তবে সহচরী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'তে (১২৮৬/১৮৮০); ভারতী ও বালক (১২৯৩); রবিচ্ছায়া; গানের বহি; গীতবিতান।

১৪. কে যেতেছিস আয় রে হেথা, হৃদয় খানি যা-না দিয়ে

গীতবিতান।

১৫. অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া

রবিচ্ছায়া; গীতবিতান।

১২৮৯ : ৪৪

বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ২০শ-২১শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	বৈশাখ
আমি হারা (কবিতা, সন্ধ্যা-সং)	ভারতী	বৈশাখ
অনধিকার (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	বৈশাখ
অধিকার (প্রবন্ধ, বিবিধ)	ভারতী	বৈশাখ
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ২২শ-২৪শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
বিজ্ঞতা (প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ২৫শ-২৮শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	আষাঢ়
মা আমি তোর কি করেছি (গান)	ভারতী	আষাঢ়

বৌঠাকুরানী ২৬শ পরিচ্ছেদ; স্বতন্ত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি; 'রবিচ্ছায়া'য় ব্রহ্মসংগীত অংশ; গীতবিতান।

৭। সন্ধ্যা-সংগীত (গ্রন্থ) ১৮৮২ জুলাই ৫/১২৮৯ আষাঢ় ২২

নিম্নলিখিত কবিতাগুলি কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গ্রন্থেই প্রকাশ। বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন, "ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।"

১ উপহার [১-প্রবেশক]; ২. সন্ধ্যা; ৩. পরিত্যক্ত; ৪ হৃদয়ের গীতধ্বনি [গীতিধ্বনি]; ৫. শান্তি-গীত; ৬. অসহ্য ভালবাসা; ৭ হলাহল; ৮. পাষাণী; ৯. আবার; ১০. কেন গান গাই; ১১ কেন গাই শুনাই; ১২. উপহার [২]।

বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ২৯শ-৩৩শ পরিচ্ছেদ)	ভারতী	শ্রাবণ
বসন্তরায় (প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	শ্রাবণ
বৌঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস, ৩৪শ ৩৫শ পরিচ্ছেদ)[20]	ভারতী	ভাদ্র
মেঘনাদবধ কাব্য (দ্বিতীয় প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	ভাদ্র
* প্রত্যুত্তর (প্রবন্ধ)	ভারতী	ভাদ্র

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী-লিখিত 'দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধের (ভারতী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৮৯) প্রত্যুত্তরে লেখা।

২০ র-জী'তে আছে ৩২শ-৩৪শ পরিচ্ছেদ

বৌঠাকুরানীর হাট
(উপন্যাস, ৩৬শ-৪০শ পরিচ্ছেদ) ভারতী আশ্বিন
আর কি আমি ছাড়ব তোরে (গান) ভারতী আশ্বিন
বৌঠাকুরানী ৩৬শ পরিচ্ছেদ ; গীতবিতান।
আজ আমার আনন্দ দেখে কে (গান) ভারতী আশ্বিন
বৌঠাকুরানী ৩৬শ পরিচ্ছেদ ; 'বৌঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থ বা অন্য কোনো গীতগ্রন্থে নেই ; গীতবিতান।
অনন্ত মরণ (কবিতা, প্রভাত-সং) ভারতী আশ্বিন
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (কবিতা, প্রভাত-সং) ভারতী অগ্রহায়ণ

৮। **কালমৃগয়া** (গ্রন্থ) ১২৮৯ অগ্রহায়ণ/১৮৮২ নভেম্বর ডিসেম্বর
বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য নাটকটি রচিত হয়েছিল। জোড়াসাঁকো বাড়িতে অভিনীত হয় ১৮৮২ ডিসেম্বর ২৩/১২৮৯ পৌষ ৯ শনিবার।
প্রভাত-উৎসব (কবিতা, প্রভাত-সং) ভারতী পৌষ
অনন্ত-জীবন (কবিতা, প্রভাত-সং) তত্ত্ববোধিনী ১৮০৪ শক/ ১২৮৯ পৌষ

৯। **বৌঠাকুরানীর হাট** (গ্রন্থ) ১৮৮৩ জানুআরি ১১/১২৮৯ পৌষ ২৮
উৎসর্গ—'শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু'। 'আমি শুধু রইনু বাকি' গানটি গ্রন্থে (২৭শ পরিচ্ছেদ) আছে ; ভারতীতে ছিল না।
দেখ্‌, চেয়ে দেখ্‌ তোরা জগতের উৎসব (গান) ... গীত মাঘ ১১
কী করিলি মোহের ছলনে (গান) ... গীত মাঘ ১১
বড় আশা করে এসেছি গো (গান) ... গীত মাঘ ১১
আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে (গান) ... গীত মাঘ ১১
যাও রে অনন্ত ধামে (গান) ... গীত মাঘ ১১
শেষ গানটি প্রথমে কালমৃগয়ার জন্য রচিত হয় (১২৮৯ অগ্রহায়ণ)। পরে ব্রহ্মসংগীতরূপে মাঘোৎসবে গীত। গানগুলি সবই রবিচ্ছায়ায় প্রকাশিত ; গীতবিতানে সংকলিত।
পুনর্মিলন (কবিতা, প্রভাত-সং) ভারতী চৈত্র
বর্ষ ওই চলে গেল (গান) গীত ৩০ চৈত্র, বর্ষশেষ
রবিচ্ছায়া ; গীতবিতান।
প্রভু, এলেম কোথায় (গান) গীত ৩০ চৈত্র, বর্ষশেষ

* চেঁচিয়ে বলা (প্রবন্ধ) ভারতী চৈত্র

পূর্ণিমায় (কবিতা, ছবি ও গান) আ ১০ চৈত্র ১২৮৯/ ১০ বৈশাখ ১২৯০/৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০/৫ আষাঢ় ১২৯০

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে (১২৮৯ চৈত্র) কবি কারোয়ারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় ফেরেন ঐ বছরের জুনের শেষে (১২৯০ আষাঢ়)। কোনো এক 'শুক্লপক্ষের গোধূলি'তে[২১] কবিতাটি রচিত, এ কথা কবি বলেছেন। কবিতার নামানুসারে মনে হয় কোনো পূর্ণিমা রাত্রেই লেখা। ঐ সময়ের মধ্যে ৪টি পূর্ণিমা ছিল; ১. ১০ চৈত্র ১২৮৯/২৩ মার্চ ১৮৮৩; ২. ১০ বৈশাখ ১২৯০/২২ এপ্রিল ১৮৮৩; ৩. ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০/২২ মে ১৮৮৩; ৪. ৫ আষাঢ় ১২৯০/ ১৮ জুন ১৮৮৩। শেষ তারিখটি না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। কবির লেখা থেকে মনে হয়, এরপরে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখেছিলেন; অর্থাৎ তার পরে আরও কিছুদিন কারোয়ারে ছিলেন। আরও লক্ষণীয়, কবির বর্ণনায় কোনো প্রখর তাপের কথা নেই। তাই ধরা যায় সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমারও আগে কবিতাটি লেখা। ১০ চৈত্র ১২৮৯ বা ১০ বৈশাখ ১২৯০, যে-কোনো একটি তারিখ ঐ কবিতাটির রচনাকাল বলে অনুমান করা বোধহয় অসংগত হবে না। পরে ভারতীতে (১২৯০ পৌষ) প্রকাশিত।

১২৯০ : ৬১

১০। **প্রকৃতির প্রতিশোধ** (গ্রন্থ) রচনাকাল আ ১২৯০ বৈশাখ-আষাঢ় কারোয়ার বাস-পর্বে রচিত। 'পূর্ণিমায়' কবিতার পরে রচনা হলে ১২৯০ বৈশাখ-আষাঢ়ের মধ্যে কোনো এক সময়ে রচিত বলে অনুমান করা যায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮৪ এপ্রিল ২৯/১২৯১ বৈশাখ ১৮। উৎসর্গ "তোমাকে [কাদম্বরী দেবী] দিলাম"। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' নিম্নলিখিত গানগুলি আছে।—

১। হেদে গো নন্দরানী; ২। বুঝি বেলা বহে যায়; ৩। ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে; ৪। কথা কোস্‌নে লো রাই; ৫। প্রিয়ে তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে; ৬। আজ তোমায় ধরব চাঁদ; ৭। আয় রে আয় রে সাঁজের বা; ৮। বনে এমন ফুল ফুটেছে; ৯। মরি লো মরি;

২১ জী-স্মৃ, 'কারোয়ার'

১০। যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে ; ১১। মেঘেরা চলে চলে যায়। গানগুলি গ্রন্থরচনার সমকালে রচিত। তবে কয়েকটি গান ফেরার পথে জাহাজে লেখা (১২৯০ আষাঢ়)। তার মধ্যে 'হেদে গো নন্দরানী' উল্লেখযোগ্য।[২২]

সম্প্রতি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এর পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (১৩৮৪)।

সখা, তুমি আছ কোথা (গান)	...	গীত ১লা বৈশাখ, নববর্ষ
সাধ (কবিতা, প্রভাত-সং)	ভারতী	বৈশাখ
স্রোত (কবিতা, প্রভাত-সং)	তত্ত্ববোধিনী ১৮০৫ শক	বৈশাখ
বাউলের গান (প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	বৈশাখ

১১। **প্রভাত-সংগীত** (গ্রন্থ) ১৮৮৩ মে ১১/১২৯০ বৈশাখ ২৯

নিম্নলিখিত কবিতাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গ্রন্থপ্রকাশের সমকালে রচিত।—

১. স্নেহ উপহার [গ্রন্থোৎসর্গ] ; ২. প্রভাতবিহঙ্গের গান (আহ্বান-সংগীত : প্রবেশক) ; ৩. প্রতিধ্বনি ; ৪. চেয়ে থাকা ; ৫. সমাপন। এই গ্রন্থের 'অভিমানিনী-নির্ঝরিণী' শীর্ষক কবিতাটি (ভারতী ১২৮৯ অগ্রহায়ণ) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা। তাই প্রভাত সংগীতের তালিকাভুক্ত করা হল না।

উৎসর্গ—'শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।'

আজু সখি মুহু মুহু (ভানুসিংহ : রসাবেশ) ছবি ও গানে 'মুহু'।	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ
নিশীথচেতনা (কবিতা, ছবি ও গান)	ভারতী	আষাঢ়
নিশীথজগৎ (কবিতা, ছবি ও গান)[২৩]	ভারতী	শ্রাবণ
অনাবশ্যক (প্রবন্ধ, সমালোচনা)	ভারতী	শ্রাবণ
* জিহ্বা আস্ফালন (প্রবন্ধ)	ভারতী	শ্রাবণ

২২ দ্রষ্টব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

২৩ প্রভাতকুমার বলেছেন, নিশীথচেতনা, নিশীথজগৎ, যোগী প্রভৃতি কবিতাগুলি সম্ভবতঃ কারোয়ারে লিখিত ; কারণ, 'পূর্ণিমায়' কবিতার সঙ্গে সংযোগ আছে। তাঁর এই অনুমান সঠিক বলে মনে হয় না। কবি বিজ্ঞাপনে বলেছেন, নিশীথচেতনা, নিশীথজগৎ পূর্বকার লেখা।

* সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা (প্রবন্ধ) ভারতী শ্রাবণ

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা।

কে (কবিতা, ছবি ও গান) ভারতী ভাদ্র

* সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার [প্রতিবাদ] (প্রবন্ধ) ভারতী ভাদ্র

১১। **বিবিধ-প্রসঙ্গ** (গ্রন্থ) ১৮৮৩ সেপ্টেম্বর ১২/১৮০৫ শক/১২৯০ ভাদ্র ২৭

শেষ প্রবন্ধ 'সমাপন ও উৎসর্গ' ['সমাপন' নামে] গ্রন্থেই প্রকাশ। এই অংশ উৎসর্গ হিসাবে গণ্য, কারণ এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র উৎসর্গপত্র নেই। উৎসর্গের ভাব অনুযায়ী মনে হয় কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যেই লেখা।

যোগী (কবিতা, ছবি ও গান) ভারতী আশ্বিন

তার্কিক (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী আশ্বিন

* তৃতীয়পক্ষ (প্রবন্ধ) ভারতী আশ্বিন

সুখের স্মৃতি (কবিতা, ছবি ও গান) ভারতী কার্তিক

* ন্যাশনাল ফণ্ড (প্রবন্ধ) ভারতী কার্তিক

পূর্ণিমায় (কবিতা, ছবি ও গান) ভারতী পৌষ

* চৌনহলের তামাশা (প্রবন্ধ) ভারতী পৌষ

১৩। **ছবি ও গান** (গ্রন্থ) ১৮৮৪ ফেব্রুআরি ২৩/১৮০৫ শক ১২৯০ ফাল্গুন ১২

ভারতী পত্রে প্রকাশিত মাত্র ৮টি কবিতা ছাড়া অন্যান্য সবগুলি কবিতাই [২২টি] গ্রন্থপ্রকাশের প্রায় সমকালে রচিত বলে অনুমান। বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন, "এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।" সেই তিনটি কবিতা— নিশীথচেতনা, নিশীথজগৎ ও অভিসার [মরণ রে]। উৎসর্গ—'কাদম্বরী দেবী'কে বলেই অনুমিত।

ধর্ম (প্রবন্ধ, আলোচনা) ভারতী চৈত্র

'আলোচনা' গ্রন্থের 'ধর্ম' অংশের উপবিভাগগুলি যথাক্রমে— প্রেমের যোগ্যতা, পথ, পাপপুণ্য, চেতনা, অচৈতন্য, বিস্মৃতি, জগতের বন্ধন, জগতের ধর্ম, উদাহরণ, সচেতন ধর্ম (গ্রন্থসূচীতে 'সচেতনতা'), অপক্ষপাত, সকলে আত্মীয়, জড় ও আত্মা, মৃত্যু, জগতের সহিত ঐক্য, মূলধর্ম, একটি রূপক।

* অকালকুষ্মাণ্ড (প্রবন্ধ) ভারতী চৈত্র

১২৯১ : ৪২

ডুবদেওয়া (প্রবন্ধ, আলোচনা) ভারতী বৈশাখ

'আলোচনা' গ্রন্থের 'ডুবদেওয়া' অংশের উপবিভাগগুলি যথাক্রমে— ছোটবড়, ডুবিবার ক্ষমতা, ডুবিবার স্থান, পুরাতনের নূতনত্ব, সাম্য, স্বদেশ, কেন, এক কাঠা জমি, জগৎ মিথ্যা, তুলনায় অরুচি, জগৎ সত্য, প্রেমের শিক্ষা।

১৪। **নলিনী (নাটক)** গ্রন্থ রচনা ৮ বৈশাখের পূর্বে।

গ্রন্থ প্রকাশ ১৮৮৪ মে ১০/১২৯১ বৈশাখ ২৯। নলিনী নাটক অভিনয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে (৮ বৈশাখ ১২৯১) বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পুষ্পাঞ্জলি (প্রবন্ধ) ... বৈশাখ

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর (১২৯১ বৈশাখ ৮/১৮৮৪ এপ্রিল ১৯) পর রচিত। সম্ভবতঃ ঐ বৎসরের বৈশাখ মাসেই লিখিত। ভারতীতে (১২৯২ বৈশাখ) প্রকাশ। 'কোথায়' (কড়ি ও কোমল) কবিতাটির প্রথম খসড়া পাওয়া যায় পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির মধ্যে। পরে কবিতাটি ভারতীতে (১২৯১ পৌষ) প্রকাশিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে প্রকাশিত 'লিপিকা'র (১৯২২) কয়েকটি রচনার ভাব ও ভাষার সঙ্গে 'পুষ্পাঞ্জলি'র মিল পাওয়া যায়। হয়তো কবি নূতন ভঙ্গিতে পুরাতন ভাবকে ব্যক্ত করেছেন।[২৪]

কোথায় (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ... বৈশাখ

ভারতী ১২৯১ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সরোজিনী প্রয়াণ (প্রবন্ধ) ... জ্যৈষ্ঠ ১১

পরে ভারতীতে (১২৯১ শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত। বর্তমানে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

১৫। **শৈশব সংগীত** (গ্রন্থ) ১৮৮৪ মে ২৯/১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ১৭

এই গ্রন্থের প্রায় সবগুলি কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। কেবল 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' বাল্যরচনা 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতার রূপান্তর; 'প্রভাতী' [শুন নলিনী খোলো গো আঁখি] আমেদাবাদে রচিত গান; 'লাজময়ী' [কাছে তার যাই যদি] ভগ্নহৃদয়ের গান ও

---

২৪ দ্রষ্টব্য: র-জী, পৃ ১৯৬

ভারতী ১২৮৬ কার্তিকে অনুবাদ-কবিতা। অর্থাৎ এই কবিতাগুলি প্রকারান্তরে পূর্বেই প্রকাশিত। 'ফুলের ধ্যান' সম্ভবতঃ গ্রন্থেই প্রকাশ। উৎসর্গ—"তোমাকেই [কাদম্বরী দেবী] দিলাম।"

সৌন্দর্য ও প্রেম (প্রবন্ধ, আলোচনা) ভারতী আষাঢ়

'আলোচনা' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য ও প্রেম' অংশের উপবিভাগগুলি যথাক্রমে—সৌন্দর্যের কারণ, সৌন্দর্য বিশ্বপ্রেমী, মনের মিল, উপযোগিতা, আমরা সুন্দর, সুদূর ঐক্য, সুন্দর সুন্দর করে, শাস্তি, উদ্ধার, কবির কাজ, কবিতা ও তত্ত্ব, তত্ত্বের বার্ধক্য, সৌন্দর্যের কাজ, স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, পুরাতন কথা, জ্ঞান ও প্রেম, নগদ কড়ি, আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার, লক্ষ্মী।

১৬। **ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী** (গ্রন্থ)

১৮৮৪ জুলাই ১/১২৯১ আষাঢ় ১৮

নিম্নলিখিত সাতটি তারিখহীন পদ গ্রন্থপ্রকাশের সমকালে রচিত বলেই অনুমিত।—

বসন্ত আওল রে [বসন্ত বর্ণনা], শুনলো শুনলো বালিকা [শূন্যকানন], হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে [বিফল রজনী], শ্যামরে, নিপট কঠিন মন তোর [বিরহবেদনা], সজনি সজনি রাধিকা লো [মিলনসজ্জা], বঁধুয়া, হিয়া পর আও রে [মিলন], শুন সখি বাজত বাঁশি [বংশিধ্বনি]। গহির নীদমে বিবশ শ্যাম মম [নিদ্রা] পদটির প্রাথমিক খসড়া পাওয়া গেছে মালতীপুঁথিতে। গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র প্রকাশিত হয় নি। গ্রন্থে গ্রহণ কালে পদটির অনেকাংশ পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত। এই একটিমাত্র পদেরই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে (আশ্বিন ১৩৭৬) পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত।

কথাবার্তা (প্রবন্ধ, আলোচনা) ভারতী শ্রাবণ

'আলোচনা' গ্রন্থের 'কথাবার্তা' অংশের উপবিভাগ 'সন্ধ্যাবেলায়'।

আত্মা (প্রবন্ধ, আলোচনা) তত্ত্ববোধিনী ১৮০৬ শক শ্রাবণ

'আলোচনা' গ্রন্থের 'আত্মা' অংশের উপবিভাগগুলি যথাক্রমে—আত্মগঠন, আত্মার সীমা, মানুষ চেনা, শ্রেষ্ঠ অধিকার, নিষ্ফল আত্মা, আত্মার অমরতা, স্থায়িত্ব।

অনুবাদ-কবিতা ভারতী শ্রাবণ

১. মধুর সূর্যের আলো, আকাশ বিমল (কড়ি ও কোমল)—Shelley.

২. সারাদিন গিয়েছিনু বনে (কড়ি ও কোমল)—Mrs. Browning

৩. আমায় রেখ না ধরে আর (কড়ি ও কোমল)—Ernest Myers.

৪. প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস (কড়ি ও কোমল)—Aubrey De Vere

৫. গোলাপ হাসিয়া বলে, "আগে বৃষ্টি যাক্‌ চলে" (কড়ি ও কোমল)
—Augusta Webster.

৬. এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে (কড়ি ও কোমল)—Augusta
Webster.

৭. হাসির সময় বড় নেই (কড়ি ও কোমল)—P. B. Marston.

৮. বেঁচেছিলে, হেসে হেসে (কড়ি ও কোমল)—Victor Hugo.

** ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী (ব্যঙ্গপ্রবন্ধ) নবজীবন শ্রাবণ

পাঠান্তর-সংবলিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর (১৩৭৬) পরিশিষ্টে সংকলিত।

* হাতেকলমে (প্রবন্ধ) ... পঠিত ভাদ্র ১১

সাবিত্রী লাইব্রেরির ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৮৮৪ আগস্ট ২৬/১২৯১ ভাদ্র ১১) পঠিত। পরের মাসে ভারতীতে (১২৯১ আশ্বিন) প্রকাশ।

যোগিয়া (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী কার্তিক

কাঙালিনী (কবিতা, কড়ি ও কোমল) প্রচার কার্তিক

ঘাটের কথা (ছোটগল্প, গল্পগুচ্ছ ১) ভারতী কার্তিক

বৈষ্ণব কবির গান (প্রবন্ধ, আলোচনা) নবজীবন কার্তিক

'আলোচনা' গ্রন্থের 'বৈষ্ণব কবির গান' অংশের উপবিভাগগুলি যথাক্রমে— মর্তের সীমানা, স্বর্গের সামগ্রী, মিলন, স্বর্গের গান, মর্ত্যের বাতায়ন, সাড়া, সৌন্দর্যের ধৈর্য, জ্ঞানদাসের গান, বাঁশির স্বর, বিপরীত, বিবাহ।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি (কবিতা, কড়ি ও কোমল) প্রচার অগ্রহায়ণ

শরতের শুকতারা (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী অগ্রহায়ণ

একটি পুরাতন কথা (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী অগ্রহায়ণ

রাজপথের কথা (ছোটগল্প, গল্পগুচ্ছ ১) নবজীবন অগ্রহায়ণ

১৩১৩ সালে গল্পটি স্থানচ্যুত হয়ে 'বিচিত্র-প্রবন্ধে' স্থান লাভ করে। বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছে (১৩৩৩) আবার গল্পের মর্যাদা পায়।

কোথায় (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী পৌষ

কবিতাটি রচিত হয় ১২৯১ বৈশাখ।

* কৈফিয়ৎ (প্রবন্ধ) ভারতী পৌষ

বঙ্কিমের 'আদিব্রাহ্মসমাজ ও নবহিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা।

মথুরায় (কবিতা, কড়ি ও কোমল) প্রচার মাঘ

১৭। **রামমোহন রায়** (প্রবন্ধ) ... পঠিত মাঘ ৫

সিটি কলেজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন (১২৯১ মাঘ ৫)। পরে প্রবন্ধটি একটি পুস্তিকায় প্রকাশ ১৮৮৫ মার্চ ১৮/১২৯১ চৈত্র ৬। ভারতীতে মাঘ-সংখ্যায় ও তত্ত্ববোধিনীতে (১৮০৬ শক চৈত্র) প্রকাশিত। এই প্রবন্ধ পরে খণ্ডিত-আকারে 'চারিত্রপূজা' (১৩১৪) গ্রন্থের অন্তর্গত হয় এবং পরবর্তীকালে বর্জিতও হয়। বর্তমানে 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' গ্রন্থে (শতবার্ষিক সংস্করণ) ঐ খণ্ডিত রূপ পরিমার্জিত আকারে সংকলিত। বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) ও পশ্চিমবঙ্গ রচনাবলীতে (১১শ খণ্ড) মূল পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সমস্যা (প্রবন্ধ, সমালোচনা) ভারতী ফাল্গুন

উপকথা (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী ফাল্গুন

পুরাতন (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী চৈত্র

সাময়িক পত্রে 'বিদায়' নামে।

দশদিনের ছুটি (প্রবন্ধ) ... চৈত্র

'বালক' পত্রিকা প্রকাশের (১২৯২ বৈশাখ) পূর্বে ইস্টারের ছুটিতে (১৮৮৫ এপ্রিল ৫/১২৯১ চৈত্র ২৫) সুরেন্দ্র ইন্দিরা-সহ দশদিনের জন্য হাজারিবাগ ভ্রমণ কালে রচিত। পরে 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ আষাঢ়) প্রকাশ। 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' গ্রন্থে (১৩১৪) 'ছোটনাগপুর' নামে সংকলিত।

১২৯২ : ৭৮

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখ তাপ (গান) ... ১লা বৈশাখ

দুঃখের কথা তোমায় বলিব না (গান) ... ১লা বৈশাখ

গাও বীণা, বীণা, গাও রে (গান) .. ১লা বৈশাখ

নূতন (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী বৈশাখ

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	বালক	বৈশাখ
কাজের লোক কে (প্রবন্ধ, 'ইতিহাস')	বালক	বৈশাখ
* গুটিকত গল্প ১।২।৩ (প্রবন্ধ)	বালক	বৈশাখ
ফুলের ঘা (কবিতা)	বালক	বৈশাখ
'শীতের বিদায়' নামে শিশু গ্রন্থে সংকলিত।		
রসিকতার ফলাফল (কৌতুক প্রবন্ধ, ব্যঙ্গকৌতুক)	বালক	বৈশাখ
** পুষ্পাঞ্জলি (প্রবন্ধ)	ভারতী	বৈশাখ
দ্রষ্টব্য : ১২৯১।		
মুকুট (উপন্যাস, ১ম-৫ম পরিচ্ছেদ)	বালক	বৈশাখ

১৮। **আলোচনা** (গ্রন্থ) ১৮৮৫ এপ্রিল ১৫/১২৯২ বৈশাখ ৩

উৎসর্গ — 'এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।'

১৯। **রবিচ্ছায়া** (গীতগ্রন্থ) ১৮৮৫ জুন ২/১২৯২ জ্যৈষ্ঠ ২১

"১২৯১ সনের শেষদিন পর্যন্ত" লেখা প্রায় সমস্ত সংগীতের সংকলন গ্রন্থ।

মা লক্ষ্মী (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	বালক	জ্যৈষ্ঠ
* লাঠির উপর লাঠি (প্রবন্ধ)	বালক	জ্যৈষ্ঠ
রোগের চিকিৎসা (হেঁয়ালি নাট্য)	বালক	জ্যৈষ্ঠ
চিরঞ্জীবেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	জ্যৈষ্ঠ
মুকুট (উপন্যাস, ৬ষ্ঠ-১১শ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট)	বালক	জ্যৈষ্ঠ

গ্রন্থ হিসাবে অ-মুদ্রিত। সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস হিসাবে প্রকাশযোগ্য। তদনুযায়ী এর রচনাকাল ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ। বর্তমানে 'গল্পগুচ্ছে'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত। নাটক হিসাবে মুকুট প্রকাশিত হয় ১৯০৮ ডিসেম্বর ৩১। ঐ নাটকের ভূমিকায় লিখিত—

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে বালক-পত্রে প্রকাশিত [১২৯২] 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।"

* বিবিধ-প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ

গ্রন্থাকারে 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' প্রকাশের পর নূতন প্রবন্ধগুচ্ছ।

সাত ভাই চম্পা (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	বালক	আষাঢ়
হেঁয়ালি নাট্য : পেটে ও পিঠে	বালক	আষাঢ়
শ্রীচরণেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	আষাঢ়
ভাসিয়ে দে তরী তবে নীলসাগরোপরি (গান)	বালক	আষাঢ়
দ্রষ্টব্য : ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র।		
রাজর্ষি (উপন্যাস, ১ম-৩য় পরিচ্ছেদ)	বালক	আষাঢ়
* আকবর শাহের উদারতা (প্রবন্ধ)	বালক	আষাঢ়
শাস্তি (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	ভারতী	শ্রাবণ
হাসিরাশি (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	বালক	শ্রাবণ
* ন্যায় ধর্ম (প্রবন্ধ)	বালক	শ্রাবণ
চিরঞ্জীবেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	শ্রাবণ
হেঁয়ালি নাট্য : ছাত্রের পরীক্ষা	বালক	শ্রাবণ
বীরগুরু (প্রবন্ধ, 'ইতিহাস')	বালক	শ্রাবণ
রাজর্ষি (উপন্যাস, ৪র্থ-৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)	বালক	শ্রাবণ
** বর্ষার চিঠি (প্রবন্ধ)	বালক	শ্রাবণ
পুরানো বট (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	বালক	ভাদ্র
শ্রীচরণেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	ভাদ্র
হেঁয়ালি নাট্য : অভ্যর্থনা	বালক	ভাদ্র
রাজর্ষি (উপন্যাস, ৭ম-৯ম পরিচ্ছেদ)	বালক	ভাদ্র
আকুল আহ্বান (কবিতা)	বালক	আশ্বিন-কার্তিক
কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে তিনভাগে বিভক্ত।— ক. পাষাণী মা ; খ. আকুল আহ্বান ; গ. মায়ের আশা।		
চিরঞ্জীবেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	আশ্বিন-কার্তিক
হেঁয়ালি নাট্য : চিন্তাশীল	বালক	আশ্বিন-কার্তিক
শিখ স্বাধীনতা (প্রবন্ধ, 'ইতিহাস')	বালক	আশ্বিন-কার্তিক
* বরফ পড়া : দৃশ্য (প্রবন্ধ)	বালক	আশ্বিন-কার্তিক
রুদ্ধগৃহ (প্রবন্ধ, বিচিত্র প্রবন্ধ)[২৫]	বালক	আশ্বিন-কার্তিক
১২৯২ আশ্বিনে পূজার সময় সোলাপুরে লিখিত।		
উত্তর-প্রত্যুত্তর ('রুদ্ধগৃহ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ)	...	আশ্বিন-কার্তিক

প্রবন্ধটির প্রথমাংশ শ্রীঅঃ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] স্বাক্ষরিত ও দ্বিতীয়াংশ

২৫ র-জী, পৃ ২২৭-২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্বাক্ষরিত ; নীচে লেখা সোলাপুর, ২৬ আশ্বিন। ঐ তারিখে 'প্রত্যুত্তর' রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত। পরে 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ পৌষ) প্রকাশ।

পথপ্রান্তে (প্রবন্ধ, বিচিত্র-প্রবন্ধ) ... আশ্বিন-কার্তিক

সোলাপুরে বাসকালে রচিত। পরে 'বালকে' (১২৯২ অগ্রহায়ণ) প্রকাশ।

রাজর্ষি (উপন্যাস, ১০ম-১৮শ পরিচ্ছেদ) বালক আশ্বিন-কার্তিক

বাঙ্গালা উচ্চারণ (প্রবন্ধ, 'শব্দতত্ত্ব') বালক আশ্বিন-কার্তিক

ছিন্নপত্র (পত্র-২) ... সোমবার অক্টোবর ১৮৮৫/১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক

সোলাপুর থেকে লেখা। 'তারিখ ঠিক জানিনে' উল্লিখিত। ১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাসে সোমবার ছিল ৪টি। যথাক্রমে ৫, ১২, ১৯ ও ২৬ অক্টোবর / ১২৯২ আশ্বিন ২০ ও ২৭ এবং কার্তিক ৪ এবং ১১। ঐ ৪ দিনের যে-কোনো একদিন পত্রটি লিখিত।

* শিউলি ফুলের গাছ (প্রবন্ধ) বালক অগ্রহায়ণ

হেঁয়ালি নাট্য : ভাব ও অভাব বালক অগ্রহায়ণ

রাজর্ষি (উপন্যাস, ১৯শ-২২শ পরিচ্ছেদ) বালক অগ্রহায়ণ

একটি প্রশ্ন (প্রবন্ধ, 'শব্দতত্ত্ব') বালক অগ্রহায়ণ

* বৈজ্ঞানিক সংবাদ (প্রবন্ধ) বালক অগ্রহায়ণ

পত্র ১, ২, ৩ (কবিতাত্রয়, কড়ি ও কোমল) ... ...

এই কবিতাগুলিও বন্দোরা-বাসপর্বে রচিত। পরে 'কড়ি ও কোমলে'র (১২৯৩) অন্তর্গত।

আহ্বানগীত (কবিতা, কড়ি ও কোমল) বালক পৌষ

রবীন্দ্রনাথ ১২৯২ সালের কার্তিক থেকে 'মাঘোৎসবে'র পূর্ব পর্যন্ত বন্দোরায় ছিলেন। সম্ভবতঃ সেখানেই রচিত।

লাইব্রেরি (প্রবন্ধ, বিচিত্র-প্রবন্ধ) বালক পৌষ

উত্তর-প্রত্যুত্তর (প্রবন্ধ) বালক পৌষ

দ্রষ্টব্য : ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক।

শ্রীচরণেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র) বালক পৌষ

হেঁয়ালি নাট্য : রোগীর বন্ধু বালক পৌষ

রাজর্ষি (উপন্যাস, ২৩শ-২৪শ পরিচ্ছেদ) বালক পৌষ

চিঠি (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ...		মাঘ
মাঘোৎসবের পূর্বে গঙ্গাবাস কালে রাজহংস স্টীমারে লিখিত। পরে 'বালকে' (১২৯২ ফাল্গুন) প্রকাশ।		
পত্র (কবিতা— প্রিয়নাথ সেনকে, কড়ি ও কোমল) ...		আ মাঘ
'নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া' সম্ভবতঃ ঐ মাসেই লিখিত। পরে 'ভারতী'তে (১২৯২ ফাল্গুন) প্রকাশ।		
চিরঞ্জীবেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	মাঘ
হেঁয়ালিনাট্য : খ্যাতির বিড়ম্বনা	বালক	মাঘ
রাজর্ষি (উপন্যাস, ২৫শ-২৬শ পরিচ্ছেদ)	বালক	মাঘ
হেঁয়ালি নাট্য : আর্য ও অনার্য	বালক	ফাল্গুন
সংজ্ঞা বিচার (প্রবন্ধ, 'শব্দতত্ত্ব')	বালক	ফাল্গুন

বাল্মীকি-প্রতিভা (গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ

১৮৮৬ ফেব্রুআরি ২০/১২৯২ ফাল্গুন ৯

জন্মতিথির উপহার [একটি কাঠের বাক্স] (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	বালক	চৈত্র
শ্রীচরণেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	চৈত্র
চিরঞ্জীবেষু (প্রবন্ধ, চিঠিপত্র)	বালক	চৈত্র
অবসাদ (কবিতা)	বালক	চৈত্র
দ্রষ্টব্য : ১২৮৫/1876 July		
ডেঙে পিঁপড়ের মন্তব্য (ব্যঙ্গ প্রবন্ধ, ব্যঙ্গকৌতুক)	বালক	চৈত্র
* সত্য (প্রবন্ধ)	বালক	চৈত্র
* বানরের শ্রেষ্ঠত্ব (প্রবন্ধ)	বালক	চৈত্র
** কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন	বালক	চৈত্র

১২৯৩ : ৮৪

আশীর্বাদ (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	ভারতী ও বালক	বৈশাখ
চিরদিন (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	ভারতী ও বালক	জ্যৈষ্ঠ
সত্য (১) এবং সত্য (২) (কবিতা, কড়ি ও কোমল)	তত্ত্ববোধিনী ১৮০৮ শক	শ্রাবণ

পাখীর পালক (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী ও বালক শ্রাবণ
বিরহীর পত্র (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী ও বালক ভাদ্র-আশ্বিন
হেঁয়ালি নাট্য : অন্ত্যেষ্টি সংকার
(হাস্যকৌতুক) ভারতী ও বালক ভাদ্র-আশ্বিন
বিরহ (কবিতা, কড়ি ও কোমল) ভারতী ও বালক ভাদ্র-আশ্বিন
** নাসিক হইতে খুড়ার পত্র (ব্যঙ্গ কবিতা) ভারতী ও বালক ভাদ্র-আশ্বিন
'প্রহাসিনী' : সংযোজন।
আয় তবে সহচরী (গান,
প্রতিভা দেবী কৃত স্বরলিপি সহ) ভারতী ও বালক ভাদ্র-আশ্বিন
দ্রষ্টব্য : ১২৮৬।

২০। **রাজর্ষি** (গ্রন্থ) ৪৪ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ ১২৯৩ আশ্বিন
বেঙ্গল লাইব্রেরিতে লিপিবদ্ধ ১৮৮৭ ফেব্রুআরি ১১/১২৯৩ মাঘ ৩০

হেঁয়ালি নাট্য : আশ্রম পীড়া ভারতী ও বালক কার্তিক
ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন (গান) ··· কার্তিক ৯
একটি কন্যার জন্মের পর রচিত। বর্তমানে 'শিশু' গ্রন্থের অন্তর্গত।

২১। **কড়ি ও কোমল** (গ্রন্থ) ১৮৮৬ নভেম্বর ১৭/১২৯৩ অগ্রহায়ণ ২
এই গ্রন্থে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ'-সহ মোট ১১৭টি কবিতা। ৪৫টি কবিতা ভারতী, প্রচার, তত্ত্ববোধিনী, বালক, ভারতী ও বালক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। এরমধ্যে 'বাতাসে অশথ পাতা' জাপানী কবিতার অনুবাদ এবং 'জাপানের বর্তমান উন্নতি' (ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়) প্রবন্ধে প্রকাশিত। 'কো তুঁহু' কবিতাটি 'প্রচারে' (১২৯২-৯৩) প্রকাশিত। বন্দোরা পর্বে রচিত পত্র (১, ২, ৩) তিনটির রচনাকাল তালিকায় উল্লিখিত। বাকি ৬৯টি কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ নেই। গ্রন্থেই এগুলি প্রকাশিত বলে অনুমান। 'কড়ি ও কোমল' দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) কতকগুলি কবিতা বর্জিত, ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলীর কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সংস্করণ একত্রে উক্ত তিনটি গ্রন্থেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। উৎসর্গ—'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দাদা মহাশয় করকমলেষু'।

হেঁয়ালি নাট্য : রসিক (হাস্যকৌতুক) ভারতী ও বালক ফাল্গুন

** কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট (প্রবন্ধ) ভারতী ও বালক চৈত্র

সংযোজন : 'সাহিত্য' (তৃতীয় সংস্করণ) শ্রাবণ ১৩৬১

হেঁয়ালি নাট্য : গুরুদেব (হাস্যকৌতুক) ভারতী ও বালক চৈত্র

১২৯৪ : ১

২২। **চিঠিপত্র** (গ্রন্থ) ১৮৮৭ জুলাই ২/১২৯৪ আষাঢ় ১৯

২৩। **সমালোচনা** (গ্রন্থ) ১৮৮৮ মার্চ ২৬/১২৯৪ চৈত্র ১৪

'সত্যের-অংশ' প্রবন্ধটি গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশ।

উৎসর্গ—'পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর করকমলে'।

১২৯২-৯৫ : ৭

'ছিন্নপত্রাবলী' (৮টি পত্র)

আলোচ্য পর্বের সমকালে রচিত কবির কয়েকটি পত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায়; যদিও এগুলির কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় নি। সংখ্যা-অনুযায়ী পত্রগুলির কালক্রম-পারম্পর্যও রক্ষিত হয় নি এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলি আলোচ্য পর্বের কালসীমাও অতিক্রম করেছে। তবুও ভাববৈচিত্র্য দেখাবার জন্য পত্রগুলিকে তালিকার অন্তর্গত করা হল।[২৩] এরমধ্যে একটি পত্র (১৮৮৫ অক্টোবর) যথাস্থানে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

মোট কথা

এই তালিকায় উল্লিখিত রচনার প্রকাশ-সংখ্যা ৬৮৩ এবং পাণ্ডুলিপিভুক্ত অপ্রকাশিত রচনা-সংখ্যা ৪। মোট ৬৮৭। রচনাকাল ও প্রকাশকালে ব্যবধান থাকায় এগুলির মধ্যে ১৭টি রচনার নাম ২ বার ধরা হয়েছে। তার মধ্যে একটি (তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—১২৮৫) বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে ২ বার। মোট বাড়তি সংখ্যা ১৭+১=১৮

একটি প্রবন্ধ (মেঘনাদবধ-প্রথম) এবং একটি গল্প (ভিখারিনী) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ৬ ও ২ কিস্তিতে। মোট বাড়তি সংখ্যা ৬।

২৩ দ্রষ্টব্য : 'ছিন্নপত্র', গ্রন্থপরিচয়

কয়েকটি অখণ্ড গ্রন্থ খণ্ডিতাকারে বিভিন্ন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়— বনফুল (৭), কবিকাহিনী (৪), বৌঠাকুরানীর হাট (১২), ভগ্নহৃদয় (৫), রাজর্ষি (৭), করুণা (১১), মুকুট (২), য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১৩), চিঠিপত্র (৯)। মোট কিস্তিসংখ্যা ৭০।

উক্ত ত্রিবিধ বাড়তি সংখ্যা ১৮+৬+৭০=৯৪।

অতএব, এই সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, প্রবন্ধ এবং গল্পের মোট সংখ্যা : ৬৮৭ − ৯৪ = ৫৯৩।

গ্রন্থের সংখ্যা ॥ কাব্য : কাহিনীকাব্য ৩+কবিতা-সংকলন ৬=৯

নাটক : গীতিনাট্য ২+নাট্যকাব্য ২+গদ্য নাটক ১=৫

গান : ১

উপন্যাস : ২

প্রবন্ধ : সমগ্র ৩+সংকলিত ৩=৬

মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৩। 'করুণা' ও 'মুকুট' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। সেগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা পাবারই যোগ্য। তাই ওগুলি যুক্ত করলে গ্রন্থের সংখ্যা হবে ২৫।

উৎস-নির্দেশ (নির্বাচিত)

কালিদাস নাগ— 'রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব', প্রবাসী (১৩৪৯, ফাল্গুন)

পুলিনবিহারী সেন— রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (১৯৭৩); 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র', দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি (১৩৬৯)

প্রফুল্লকুমার দাস— রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড (১৩৬৯)

প্রবোধচন্দ্র সেন— 'মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়', রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা, প্রথম খণ্ড (১৯৬৫); 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', শশীভূষণ স্মারকগ্রন্থ (১৩৭৪ অগ্রহায়ণ / 1967 Nov.-Dec.); 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা', ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯ কার্তিক); 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা', বেতার জগৎ (১৯৬৩, সেপ্টেম্বর ১-১৫)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী, প্রথম খণ্ড (১৩৭৩) ; রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৯৭০) ; 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা: কালানুক্রমিক সূচী', রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা, প্রথম খণ্ড (১৯৬৫)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'আলোচনা', প্রবাসী (১৩৫০ বৈশাখ) ; রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয় (১৩৫০)

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী—'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা', দেশ, ১৩৮৩ জ্যৈষ্ঠ ১৫/১৯৭৬ মে ২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— গীতবিতান (১৩৮০), গ্রন্থপরিচয় ; জীবনস্মৃতি (১৯৬২)

সজনীকান্ত দাস—'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী', রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭)

সুকুমার সেন— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ সং, (১৩৭৬) ; বাংলা সাহিত্যের কথা, ৩য় সং (১৩৪৯)

সুশান্তকুমার মিত্র—'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা', 'অমৃত' ১৯৭৫, ২০ জুন - ১৮ জুলাই ; পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকা অক্টোবর ১৯৭৫ ; 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা', অমৃত, ১৯৭৬ জুলাই ২ ও ৯।

সংযোজন

সম্প্রতি শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় (১৩৮৪) শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে "বিলুপ্তির পথে রবীন্দ্রনাথের শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে"র একটি তালিকা দিয়েছেন। সর্বজনপরিচিত পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ায় রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষকদের কাছে রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ পর্ব উদ্ঘাটনের সহায়ক হল। ইতিপূর্বে অবশ্য শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সূচী 'দেশ' এবং অন্য কোনো কোনো পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর তালিকায় তিনি অপ্রকাশিত রচনাগুলি চিহ্নিত করেও দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই গ্রন্থের কালসীমার অন্তর্গত রবীন্দ্ররচনার সমগ্র তালিকা একত্রে গ্রথিত হওয়ায় আশা করি রবীন্দ্র-গবেষক ও রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের বিশেষ সুবিধা হবে।

শ্রীভট্টাচার্য তাঁর তালিকায় রবীন্দ্রনাথের যে-কয়টি অগ্রন্থভুক্ত রচনার নাম করেছেন, তাতে বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্যপর্বের মধ্যে (১৮৭৪-৮৮) সাঁইত্রিশটি (৩৭) প্রবন্ধের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে তিনি 'গুটিকত গল্প' (বালক ১২৯২) প্রবন্ধটিকে তিনটি পৃথক্ প্রবন্ধ হিসাবে গণনা করেছেন। মৎ-কৃত তালিকায় প্রবন্ধটি ১টি হিসাবেই গণ্য হল। 'একটি প্রশ্ন' প্রবন্ধটি (১২৯২ অগ্রহায়ণ) 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে—ওটিকে অপ্রকাশিত তালিকার বহির্ভূত করাই সমীচীন। সেই অনুযায়ী এই পর্বের প্রবন্ধের যথার্থ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪।

সম্ভবতঃ তিনি আরও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে দেখতেন, এই পর্বের মধ্যে গ্রন্থে অপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা সঠিক না হলেও অন্ততঃ ৪৯টি। বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তালিকার * -চিহ্নিত রচনাগুলি দেখলেই এই সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ হবে। তদনুযায়ী এই পর্বের কবিতা-সংখ্যাও অন্ততঃ পক্ষে ৪টি।

শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৪

সম্পূরণ

দেশের এত দক্ষিণে পড়ে যে, বাল্মীকিকে আধুনিক ধরিলেও তাঁহাকে এত অজ্ঞ বলিয়া ধরিতে পারা যায় না যে তথা দিয়া ভরতের পথ নির্দ্দেশ করিবেন। পরন্তু অযোধ্যা হইতে উহা এত অন্তরে যে তথায় সৈন্য পশ্চাৎ রাখিয়া ভরত নির্ভয়ে একাকী যাইতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বে কথিত কাশীপুরের নিকট প্রাচীন উজ্জনি নগর ধরিলে, উত্তর পথে আসিতে উহা পথের উপরে পড়ে। উহা কোশল রাজ্যের অনেক নিকট, এবং তথায় সৈন্যাদি পশ্চাৎ রাখিয়া, ভরতের একাকী গমন করা সম্ভব।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত ভুমি।

এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।

বং সম্পাদক।

[১]

কতদিন দিবাকর উদেছে গগনে;
কৃত্রিম বরণ ধরি, বিহারিয়া শূন্যোপরি,
রঞ্জন করেছে যত ভারত সন্তানে।
এবে কেন সেই সূর্য্য নাহি লাগে মনে?

[২]

সুনীল অম্বরে ঐ ভাসে শশধর।
লইয়া তারকা মালা, গগনে করিছে খেলা,
অমরবেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর।
নৈশ নীল অন্তরীক্ষে শোভে ক্ষপাকর।

[৩]

বিধৌত ধরণীতল স্নিগ্ধ চন্দ্র করে।
স্বচ্ছ শ্বেতবাস পরি, অবনী সাজিল মরি,
কিবা শোভা মনো লোভা ভূতলে, অম্বরে।
এ সকলে দুঃখ কেন হতেছে অন্তরে?

[৪]

কেন নাহি ভাল লাগে বসন্ত শ্বসন?
যবে দুই ফুলবালা, গলেধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন;
কেন বা সবার সুখে দুঃখী এত মন?

[৫]

কেনইবা কোপানলে দহয়ে অন্তর?
শুনে পর বীর দাপ, হৃদে হয় মহাতাপ,
মনে করি উপাড়িব হিমাদ্রি শিখর।
রসাতলে পাঠাইব পৃথ্বী সসাগর।

[৬]

সুপুচ্ছ বিস্তৃত করি যত শিখিগণ
দেখি নব জলধর, আহ্লাদিত পরস্পর,
তালে তালে করে যবে নৃত্য আরম্ভন,
বিষাদ সাগর কেন উথলে তখন?

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতভূমি' কবিতার
একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

ভারত ভূমি।

এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। বং সম্পাদক।

[১]

কতদিন দিবাকর উদেছে গগনে ;
রক্তিম বরণ ধরি, বিহারিয়া শূন্যোপরি,
রঞ্জন করেছে যত ভারত সন্তানে।
এবে কেন সেই সূর্য্য নাহি লাগে মনে ?

[২]

সুনীল অম্বরে ঐ ভাসে শশধর।
লইয়া তারকা মালা, গগনে করিছে খেলা,
অমরবেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর।
নৈশ নীল অন্তরীক্ষে শোভে ক্ষপাকর।

[৩]

বিধৌত ধরণীতল স্নিগ্ধ চন্দ্র করে।
স্বচ্ছ শ্বেতবাস পরি, অবনী সাজিল মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা ভূতলে, অম্বরে।
এ সকলে দুঃখ কেন হতেছে অন্তরে ?

[৪]

কেন নাহি ভাল লাগে বসন্ত শ্বসন ?
যবে তুই ফুলবালা, গলে ধরি করে খেল
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন ;
কেন বা সবার সুখে দুঃখী এত মন ?

[৫]

কেনই বা কোপানলে দহয়ে অন্তর ?
শুনে পর বীর দাপ, হৃদে হয় মহাতাপ,
মনে করি উপাড়িব হিমাদ্রি শিখর।
রসাতলে পাঠাইব পৃথ্বী সসাগর।

[৬]

সুপুচ্ছ বিস্তৃত করি যত শিখিগণ
দেখি নব জলধর, আহ্লাদিত পরস্পর,
তালে তালে করে যবে নৃত্য আরম্ভন,
বিষাদ সাগর কেন উথলে তখন ?

[৭]

এই যে বিটপী শ্রেণী আছে সারি সারি
ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ; হাসে চন্দ্র কর পেয়ে ;
জ্বলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি।
এ দেখে উথলে কেন দুখসিন্ধু বারি ?

[৮]

এই প্রবাহিণী তটে হাসে কুমুদিনী ;
দোলায়ে নীহার হার, গরবেতে বারেবার
মলয় হিল্লোলে স্বল্প দুলে গরবিণী।
তা দেখিয়া কেন আমি হই অভিমানী ?

[৯]

মনে করি একদিন আমাদের তরে
সৃজিয়াছিলেন ধাতা, ভুবনে ভারত মাতা
প্রাণভয়ে দিনু তাঁরে, যবনের করে।
ডুবিল হিন্দুর নাম কলঙ্ক সাগরে॥

[১০]

পড়িলেক ইরম্মদ কালমেঘ হতে।
ভাঙ্গিয়া ভারত মুণ্ড, জ্বালি এ অনল কুণ্ড,
দহিল মায়ের দেহ, অতুল্য জগতে।
অস্থি ভস্ম ভিন্ন আছে কি আর ভারতে॥

[১১]

সেইদিন উদিলেক ম্লান শশধর।
সেইদিন নিশিথিনী, জ্যোৎস্নাসত্ত্বে তমস্বিনী,
সেইদিন হতে দুখে ভাসয়ে অন্তর।
সেইদিন ছারখার ভারত সুন্দর॥

[১২]

কত দিবা অস্তে যায় কত রাত্র আসে,
এ রাত্র কি না পোহাবে, এমনি রহিয়া যাবে,
হবে নাকি সূর্য্যোদয় ভারত আকাশে?
অন্ধকার রহিবে কি ভারত আবাসে?

[১৩]

কি লাগিয়ে রত্ন ভূমি দুখের আগার?
জাগো ভারতস্থজন, মিথ্যা ঘুমে অচেতন,
আলস্য মূর্খতা দোষে দিবসে আঁধার।
জ্ঞানেতে করিয়া বল সত্য কর সার।

[১৪]

সম্মুখেতে দেখ সবে অত্যুচ্চ ভূধর,
যাহার শিখর দেশ, চক্ষে নাহি পড়ে লেশ,
উহাতে উঠিতে যত্ন করে যত নর।
বহু যত্ন সাধ্য হয় ঐ গিরিবর।

[১৫]

উঠে তার মধ্যদেশে কত শত জন।
হইয়া অশক্ত কায়, আর না উঠিতে পায়,
তলদেশে কত লোক করিছে ভ্রমণ।
নাহি পারে, তবু করে উঠিতে যতন॥

[১৬]

কত শত জন উঠি শৃঙ্গের উপরে
ভুঞ্জিছে অতুল সুখ, নাহি ভবে কিছু দুখ,
সুবর্ণ নির্ম্মিত ছত্র শিরে শোভা করে।
দেখ কত শত জন গিরির শিখরে।

[১৭]

কেহ বা উঠিয়ে শৃঙ্গে হতেছে পতন।
তুঙ্গ শৃঙ্গ পানে চায়, আবার উঠিতে ধায়,
আবার শিখর দেশে, করে আরোহণ।
ভারতবাসীরা কেন না করে তেমন॥

[১৮]

একবার উঠেছিলে এ শিখর শিরে।
আজি কেন বসি তলে ? হুঙ্কারি উঠহ বলে,
গাইয়ে ভারত জয়, আরোহ গিরিরে॥
বাখানিবে এ ভুবনে নব হিন্দু বীরে॥

[১৯]

যদি বা পড়িয়া যাও গিরি আরোহণে
হানি কিবা তায় তবে ? উদ্ধারিয়া পাপভবে
চলি যাবে আনন্দেতে দেব নিকেতনে
কেন বা করিবে ভয় এ তিন ভুবনে ?

[২০]

ঐ শুন মৃদু মন্দ হয় বংশীধ্বনি।
পর্ব্বত শিখরোপর, বলে "হে ভারতনর
গিরির উপরে সবে আইস এখনি।"
ঐ শুন পর্ব্বতেতে হয় বংশীধ্বনি॥

[২১]

শুন বংশী প্রতিধ্বনি গভীর কন্দরে;
শুন প্রস্রবণ ঝরে, কল কল নাদ করে,
"চক্ষু মেল" বলি ডাকে ভারতের নরে।
ঐ শুন কল্লোলিয়া প্রস্রবণ ঝরে॥

[২২]

তথাপি ভারতবাসী ঘুমে অচেতন?
কাদম্বিনী ডাকে ঘন, ঘন ডাকে গিরিগণ,
ঘন ঘন ঘন ডাকে বংশীর নিস্বন।
জন্মমত ভারত কি ঘুমাবে এমন?

বঙ্গদর্শন। ১২৮০ মাঘ। পৃ ৪৫৬-৪৫৮

অমৃতবাজার পত্রিকার 'কলিকাতা :— ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার সন মাঘ ১২৮০ সাল। ইং ২৯এ জানুয়ারী ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ' সংখ্যার ৪০২ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের কিয়দংশ :

মা ভৈঃ।

... পূর্ব্বকালে লোকের কোন মহাপাপ হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাহারা বলিদান দিয়া পাপ হইতে উদ্ধার হইত। যথন সংসার পাপপূর্ণ হইয়া উঠে তখন যীশু খৃষ্ট নিজের রক্তপাতে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আমাদের শাস্ত্রে

কথিত আছে যে প্রথমে পৃথিবী মনুষ্য জাতির বাসযোগ্য ছিল না। বিষ্ণু মধুকৈটভ বধ করিয়া উহার উন্নতি সাধন করিলেন। আমেরিকা দাস ব্যবসায় জন্য যে মহা পাপ করেন তিনি সে দিবস আত্মীয় স্বজনের রক্তে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আমাদের যদি সেকালের ন্যায় বলিদান দ্বারা পাপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে এইরূপ বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে নয় আমরা সহস্র পশুমেধ যজ্ঞ করিতাম, প্রয়োজন হইলে নয় নরবলি দিতাম। কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস গিয়াছে এবং নরবলি দিয়া দেশ উদ্ধার করার মহত্ত্বও হিন্দুজাতির আর নাই। কিন্তু মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে একটি কবিতা পাঠে আমাদের অনেক আশার সঞ্চার হইল। এই কবিতাটী একটী চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক বালকের রচিত। আমরা বোধহয় এই বালকটিকে চিনি। কবিতাটীর কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

ঈশ্বর করুণাময়। তিনি তাঁহার একটি পুত্রের ক্রন্দন চক্ষে দেখিতে পারেন না। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২০ কোটী লোক এবং ইহার চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক যখন দেশের দুর্গতির নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছে তখন আর ভয় নাই। ঈশ্বর পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্যের ক্রন্দন শুনিয়াও যদি স্থির থাকিতে পারেন কিন্তু যখন সুমতি বালকেরাও দেশের দুর্গতির নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ভারতবর্ষের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।

[illegible]

"হোক্ ভারতের জয়।"*

এস এস ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে,
সরল প্রীতির ভরে,
সবে মিলি পরস্পরে,
আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।

এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ,
ভারত সমাজে তবে,
হৃদয় খুলিয়া সবে,
এস এস এস করি প্রিয় সম্ভাষণ

দূর কর আত্মভেদ বিপদ অঙ্কুর,
দূর কর মলিনতা,
বিলাসিতা অলসতা,
হীনতা ক্ষীণতা দোষ কর সবে দূর।

ভীরুতা বঙ্গীয়জনকলঙ্ক প্রধান,
সে কলঙ্ক দূর কর,
সাহসিক তেজ ধর,
স্বকার্য্য-কুশল হও হয়ে এক তান।

হ'ল না কিছুই করা যা করিতে এলে
এই দেখ হিন্দু মেলা,
তবে কেন কর হেলা,
কি হবে কি হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে

* হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।

সাগরের স্রোত সম যাইছে সময়।
তুচ্ছ কাজে কেন রও,
স্বদেশ হিতৈষী হও,
স্বদেশের জনগণে দাও রে অভয়।

নাহি আর জননীর পূর্ব্ব সুতগণ,
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর,
অনন্ত জলধিতলে হয়েছে মগন।

নাহি সেই রাম আদি সম্রাট প্রাচীন,
বিক্রম আদিত্য রাজ,
কালিদাস কবিরাজ,
পরাশর পারাশর পণ্ডিত প্রবীণ।

সকলেই জল বায়ু তেজ মৃত্তিকায়,
মিশাইয়া নিজদেহ,
অনন্ত ব্রহ্মের গেহ,
পশেছে কীর্ত্তিরে শুধু রাখিয়ে ধরায়।

আদরে সে প্রিয় সখী আচ্ছাদি গগনে,
সে লোক-বিশ্রুত নাম,
সে বিশ্ব বিজয়ি ধাম,
নির্ঘোষে ঘুষিছে সদা অখিল ভুবনে।

যবনের রাজ্যকালে কীর্ত্তির আধার,
চিতোর নগর নাম,
অতুল বীরত্ব ধাম,
কেমন ছিলরে মনে ভাব একবার।

এইরূপ কতশত নগর প্রাচীন,
সুকীর্ত্তি তপনকরে
ভারত উজ্জ্বল ক'রে,
অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।

নাহি সেই ভারতের একতা বিভব,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে,
সকলের পদতলে,
লুটাইছে আর্য্যগণ হইয়া নীরব।

গেল হায়! সব সুখ অভাগী মাতার,
ছিল যত মন আশা,
নিল কাল সর্ব্ব নাশা,
প্রসন্ন বদন হ'ল বিষণ্ণ তাঁহার।

কি আর হইবে মাতা খুলিয়া বদন,
দীপ্তভানু অস্ত গেল,
এবে কাল রাত্রি এল,
বসনে আবরি মুখ কাঁদ সর্ব্বক্ষণ।

বিশাল অপার সিন্ধু! গভীর নিস্বনে,
যেখানে যেখানে যাও,
কাঁদিতে কাঁদিতে গাও,
ডুবিল ভারত-রবি অনন্ত জীবনে।

সুবিখ্যাত গৌড় যেই বঙ্গের রতন,
তার কীর্ত্তি প্রতিভায়,
খ্যাতাপন্ন এ ধরায়,
হয়েছিল একদিন বঙ্গবাসি গণ।

গেল সে বঙ্গের জ্যোতিঃ কিছুকাল পরে,
কোন চিহ্ন নাহি তার,
পরিয়া হীনতা হার,
ডুবিয়াছে এবে বঙ্গ কলঙ্ক সাগরে।

হিন্দু জন ভ্রাতৃগণ! করিছে বিনয়,
একতা উৎসাহ ধর,
জাতীয় উন্নতি কর,
ঘুষুক ভুবনে সবে ভারতের জয়।

জগদীশ! তুমি নাথ! নিত্য নিরাময়
কর কৃপা বিতরণ,
অধিবাসিজনগণ,
করুক উন্নতি "হোক্ ভারতের জয়।"
(র)

বান্ধব। ১২৮১ মাঘ। পৃ ২০২-২০৩

সংশোধন

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩/১২	আধুনিক সাহত্যি	আধুনিক সাহিত্য
৪২/১৪	বক্কমচন্দ্র	বঙ্কিমচন্দ্র
৪৪/২৯	রচিয়তা	রচয়িতা
৬২/পা-টী	পৃ ১৭	পৃ সতর
৬৮/৯	অক্ষয়চন্দ্র দত্ত	অক্ষয়কুমার দত্ত
৮০/৭, ৩৫৫/৬	টোনহলের তামাশা	টৌনহলের তামাশা
৮৫/৯	অনার্য ও আর্য	আর্য ও অনার্য
৯৪/পা-টী	১৯৩/১২৯ কার্তিক	১৯৮১/২৯ কার্তিক
১১৯/২	৮॥৮॥৪	৮॥৮॥১৪
১৬১/৪	varnacular	vernacular
১৮৯,২৪	রবীন্দ্রজবনীকার	রবীন্দ্রজীবনীকার
২২৩/২৮	যদি ন	যদি না
২২৪/১	পদে পদ	পদে পদে
২৫৫/৩ ও ৫	প্রবাহিনী	প্রবাহিণী
৩০৬/৮	নিবন্ধের	গ্রন্থের
৩১৪/২৬	‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’	‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’
৩১৬/১৫	‘রুদ্ধদ্বার’	‘রুদ্ধগৃহ’
৩৪১/৯	প্রাচীন্য	প্রাচীন
৩৪১/২৫	যে দুঃখ কাঁদে	যে দুঃখে কাঁদে
৩৪২/১৬	ভারতচর	ভারতচন্দ্রের
৩৪২/১৭	Came	Come
৩৪২/৩১	বলবত্ত	বলবত্তা
৩৪৯/৩-৪	আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়	আদিব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দুসম্প্রদায়
৩৮৭/২৪	নানা নানা দৃষ্টান্ত	নানা দৃষ্টান্ত